

আয়ুর্বেদ

আর্য্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক
মাসিক পত্র ও সমালোচক

—:o:—

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি
কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র কবিরত্ন
মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন
কর্তৃক সম্পাদিত।

—
৭ অবধি

(১৩২২ আখ্রিণ হইতে ১৩৩০ সালের তাজ পর্য্যন্ত)

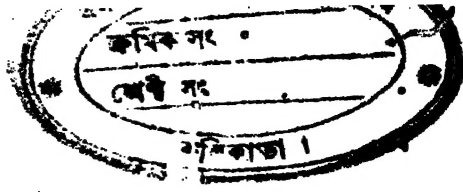
কলিকাতা

১৭১৯ শ্যামবাজার ব্রীজরোড

অক্ষয় আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় হইতে

কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্তৃক
প্রকাশিত

[বার্ষিক মূল্য ৩৮/০]

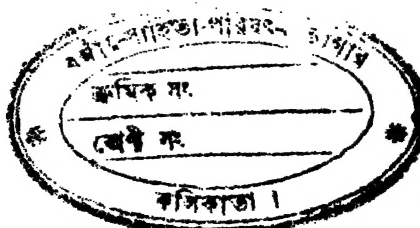


৭ম বর্ষের বর্ষ সূচী।

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
আইন আয়ুর্কেন্দে বিভাগের কথা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম		বি, ৬২, ২০০, ২৭৪
অল্প চিকিৎসাসৌভাগ্য—ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ মজুমদার		২০৬
আয়ুর্কেন্দে অ্যানাটমী—কবিরাজ শ্রীমুকুন্দনাথ সেন ও গুপ্ত ভিষগুর, আয়ুর্কেন্দে শাস্ত্রী এল, এ,		এম, এস, এইচ, এম, বি, ৬৫
আয়ুর্কেন্দে পুরাতত্ত্ব ২৭
আয়ুর্কেন্দে কি অবৈজ্ঞানিক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ		১৮৮
আয়ুর্কেন্দে হাতুড়িয়া—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ		২৮২
আর্য চিকিৎসা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র রায় চট্টোপাধ্যায় বি, এল		২৩২
আচমন ও প্রাণায়াম—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যাতীর্থ বেন্দ্য শাস্ত্রী		১৫২
ইনফ্রারেড—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ		৩০২
উদ্ভূত—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন ও গুপ্ত বি-এ		১৬৭
ওলাউঠার কারণ নির্ণয়—		১১৬
কচুরিগাছার ম্যালেরিয়া—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ		৮০
কতিপয় ফলপ্রসূ মৃষ্টিযোগ—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়		৩১৪
কবিরাজী ও ডাক্তারী মতে নাড়ী পরীক্ষা—ডাঃ পি, কে চৌধুরী		১৮৬
করেকটি বনৌষধি—কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন		৫৯
কলের জিনিস—নমস্কার—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ		৩২৮
কায় চিকিৎসাক্রমোপদেশ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন ও গুপ্ত কবিরত্ন		৭৫, ১০২
গর্ভাবস্থার চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস সেন কাব্যাতীর্থ		২১৮
চক্ষুস্বাস্থ্যের প্রথম স্কেলের টীকা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্যোতিষেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ		১৭৫
চরকের চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন ও গুপ্ত কবিরত্ন		৩৩
চরক ও সূত্র—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ সেন ও গুপ্ত ভিষগুর, আয়ুর্কেন্দে শাস্ত্রী এল, এ,		এম, এস, এইচ, এম, বি ২০৩
চুলের কলপ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যাতীর্থ		২২৭

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
ডেপুটি—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান		৩৪২
কঠোর—ডাঃ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত এল, এম, এস		২৬
অরের কথা—ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস		২২১
জীবনীগণ—ডাঃ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত এল, এম, এস,		৫০
মঙ্গলী জীবন—কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ-ভর্তুতীর্থ		১৫৩
ছইটি বনোষি—কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন		২২৭
ধ্বংসের পথে বাঙ্গালী—ডাঃ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ		১৬১
নিজাতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ		১৩৭
পরমায়ু প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিজ্ঞানবিনোদ		৫৫, ১২২
পলাশ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন		১২৫
পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত		২৭২
পরিত্রাণ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরত্ন		৩২
পাশ্চাত্য মতে নাকীতত্ত্ব—ডাঃ শ্রীযুক্ত আর, এল, সুর এম, ডি		৩১৭
পিপুল—কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন		২৭২
প্রাচীন চিকিৎসকের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত ত্রিভঙ্গ		
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী এল, এ; এম, এস, এইচ, এম, বি,		১৮৪
পঞ্জীয়তার অরণ্যে রোদন—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ		১৫০
পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা—ডাঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়		
এল, এম, এস,		৩৩০
বহু মূত্রের নব বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা—ডাঃ বৈজ্ঞ		১৭০
বসন্ত প্রতীকার—কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ		২৬২
বসন্তরোগে নিষেধ প্রভাব—কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত কাব্যতীর্থ		৩৪২
বলে লোক সংখ্যা	...	৩০১
বনোষি—কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন		২২
বাবু মহলৈ হার্টকেল—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ		৮৫
বাঙ্গালীর ধ্বংসের কারণ—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়		১০৮
বাঙ্গালী ছেলেদের স্বাস্থ্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরত্ন		৩২৪
ব্রহ্মচর্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরত্ন		২১৪
বদে লৌকিক		২৮১
বিবিধ প্রসঙ্গ—সম্পাদক	৩০, ১২৭, ১৫২, ২০৮, ২৫২, ৩০৮	
বৈজ্ঞানিক—শ্রীযুক্ত রাধেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিজ্ঞান		২৭০
বৈদ্য চিকিৎসা		২০২

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বায়ু, পিত্ত, কফ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত ব্যাকরণ তীর্থ		৩৫৮
ম্যালেরিয়া—শ্রীপাইকর—দীপক		৮১
ম্যালেরিয়া জ্বরের স্বরূপ ,,		১২০
মুটিযোগ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ সেন গুপ্ত ভিষগরত্ন, আবুর্কেদ শাজী এল, এ, এম, এস, এইচ, এম, বি		১৫০
মোক্ষ রহস্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন		২৫৭
রোগ বিজ্ঞান—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর রায় কাব্যতীর্থ		৭২
রোগীর পথ্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি		৩২১
রাষণ কৃত নাকী বিজ্ঞান—কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ		৯২
রোগতত্ত্ব—কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীননাথ শাজী		২২১
শিবচতুর্দশী—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ		১৮৩
শিতচর্চা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখাল দাস সেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ		১২৩
শোধ চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন		৩৫২
শিত চিকিৎসা		৩১৬
সমালোচনা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন		২২৮, ৪০৭
স্বাস্থ্য লক্ষ্যে বুদ্ধির বচন—শ্রীযুক্ত কীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ		২৭৮
স্বাস্থ্য দর্পণ—বৈজ্ঞানিক কবিরাজ ৮ কালিদাস বিদ্যাত্মক		৩৩৩
স্বপ্নতের সাক্ষ্য—কবিরাজ ইন্দ্রভূষণ সেন গুপ্ত ভিষগরত্ন আবুর্কেদ শাজী		১১৩
স্বর্ণ বন্ধ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাজী বিদ্যাত্মক		৩০৩
হাঁপানির কতিপয় মুটিযোগ—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়		২৯০
হিন্দু স্বাস্থ্যনীতি—ডাঃ শ্রীযুক্ত মোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য		৫
হোমে আবুর্কেদ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত শাজী		১১১
হিতরূপা—শ্রীযুক্ত কীরোদ লাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ		১৩৫
কুখা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		১৪৭
কিঞ্চিৎ কুখর দংশন চিকিৎসা—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		১২৮



স্বায়ংক্ৰিয়

৭ম বর্ষ

১৩২৯ সাল আশ্বিন

১ম সংখ্যা

শিশুচর্চা ।

[কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ]

স্তম্ভ-বুদ্ধির যোগ ।

(পূর্ণাঙ্গবৃত্তি)

—:—

প্রস্থতির অল্পকারণে অসন্তুষ্ট হওয়া, অথবা সর্বদা রাগ করা উচিত নয়। উহাতে স্তনের দুগ্ধ অল্প হইয়া যায়। তা' ছাড়া অনবরত শোক, দুঃখ, চিন্তা বা অল্প কোনপ্রকার মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাইলেও প্রস্থতির স্তনদুগ্ধের অল্পতা ঘটিয়া থাকে। এছাড়া সন্তানের জননীকে সর্বদা শ্রম ও প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করা উচিত এবং সন্তানের প্রতি, যাহাতে দিন দিন স্নেহ-মমতার বৃদ্ধি হয়, একরূপ ভাবে সন্তানের লালনপালন করা কর্তব্য। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহমমতার অভাব হইলেও স্তনদুগ্ধ অল্প হইয়া যায়।

আজকাল প্রস্থতির স্তনদুগ্ধের অল্পতা

বা অভাব ঘটিলে তাহার প্রকৃত কারণ অসুস্থকান বা প্রতীকারের কোনপ্রকার ব্যবস্থা না করিয়াই শিশুর জন্ম গন্ধ, ছাগল বা গাধার দুগ্ধের অথবা বিলাতী টিনের দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল অবৈধ অদৃষ্টিকর ব্যবস্থায় শিশুর স্বাস্থ্য বৃদ্ধি বা স্বাস্থ্যের হানি ঘটিয়া থাকে কি না সে বিষয়ে কেহ লক্ষ্য করেন না। এই যে শৈশবাবস্থায় যকৃতের অতিবৃদ্ধি ও জ্বর প্রভৃতি অভিনব রোগ-সকলের উৎপত্তি হইতেছে, সে সকল যে শিশুখাতের কৃত্রিমতার জন্ম নহে—ইহা কি কেহ বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন? যেখানে খাদ্যদ্রব্যের কৃত্রিমতা যত অধিক,

সেখানে রোগেরও তত বাড়াবাড়ি। পল্লীগ্রামে শিশুর অকলম্বুতা সহরের অপেক্ষা অনেক কম। সেখানে অর্ধের অভাবেই হউক, অভিজ্ঞতার অভাবেই হউক, কৃত্রিম খাওয়ার বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না। প্রসূতির স্তনদুগ্ধের অভাব হইলে, কি প্রকারে স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইবে, এই চিন্তাই গৃহস্থগণের মধ্যে জাগিয়া থাকে। তখন তাহারা বিলাতী টিনের দুগ্ধের জন্ত ব্যস্ত না হইয়া স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধির জন্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাদের সে চেষ্টা প্রায়ই ফলবতী হইয়া থাকে, শিশুগণ আকর্ষ্য মাতৃসুত্ত পান করিয়া দিন দিন স্বাস্থ্যলাভ করিতে থাকে। চেষ্টার দ্বারা একান্ত যত্ন স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না, তখনই তাহারা গোদুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

১। স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি করিতে হইলে,— বনকাপাস ও আকের মূল,— প্রত্যেকটা চারি আনা পরিমাণে কাঁটিয়া কাঁজির সহিত গুলিয়া প্রসূতিকে প্রত্যহ একবার অথবা দুইবার খাইতে দিবে। অথবা—

২। ভূমিকুম্বাও চূর্ণ আধতোলা মস্তুর সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ একবার খাওয়াইবে। অথবা—

৩। শালিতুল চূর্ণ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিবে। কিংবা—

৪। প্রসূতিকে প্রত্যহ কিছু অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এইরূপ সপ্তাহকাল সেবন করিলে নিশ্চয়ই প্রসূতির স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইবে। অথবা—

৫। হরিজা, দারুহরিজা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু—ইহাদের প্রত্যেকটি ছয় আন পরিমাণে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিবো এবং আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া প্রসূতিকে পান করিতে দিবে। ইহাতে যে কেবল স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইবে এমন নয়, ঐ দুগ্ধ সম্পূর্ণ নির্দোষ ও শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে সমধিক উপযোগী হইবে। অথবা—

৬। বচ, মুখা, আতাইচ, দেবদারু, শুঠ, শতমূলী ও অনন্তমূল—ইহাদের প্রত্যেকটি সওয়া চারি আনা পরিমাণে লইয়া পূর্ববৎ আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া প্রসূতিকে পান করাইবে। ইহা দ্বারাও নির্দোষ স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইবে। অথবা—

৭। বেণার মূল, শালিধাত্ত, আকের কৌরা, উলুখড়ের মূল, কাশের মূল, গুলক, ইকড়া ও গন্ধত্বণ,—ইহাদের প্রত্যেকটি দুই-আনা পরিমাণ,— আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া প্রসূতিকে পান করিতে দিবে। ইহাও নির্দোষ স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধির একটি মহৌষধ।

৮। এতদ্ভিন্ন যবের পালো, যব, গমের ময়দার কটী, শালি বা যষ্টিক চাউলের অন্ন, মাংসরস, হুয়া, রসুন, মৎস্ত, লাউ, কলমীশাক, কেশুর, পানিফল, যুগাল প্রভৃতি ভোজন করিলে অথবা—

৯। ভূমিকুম্বাও চূর্ণ বা যষ্টিমধু চূর্ণ কিংবা শতমূলীর রস অথবা শতমূলী চূর্ণ দুগ্ধের

সহিত পান করিলেও শুনহুয়ের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শিশুর জ্ঞান।

যতদিন শিশুর নাভি শুকাইয়া না পড়িয়া যায়, ততদিন তাহাকে তৈল মাখাইয়া একটু গরম জলে 'গামছা' দিয়া গা মুছাইয়া দিবে। তা'র পর নাভি পড়িয়া গেলে ও নাভির ঘা শুকাইয়া গেলে প্রত্যহ একটু গরম জল দিয়া শিশুকে জ্ঞান করাইয়া দিবে। কিন্তু জ্ঞানটা ফাঁকা বা খোলা জায়গায় না করাইয়া ঘরের মধ্যে করানই ভাল। তাহাতে কোনরূপে ঠাণ্ডা লাগিয়া অস্থখ হইবার ভয় থাকে না। জ্ঞান প্রত্যহ অভ্যাস করান ভাল। জ্ঞানের পর বেশ করিয়া গা মুছাইয়া দিবে এবং বগল ও কুঁচকী প্রভৃতি স্থানে যাহাতে জল না থাকে—সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। জ্ঞানের পর একটা পাতলা জামা গায়ে জড়াইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

শিশুর প্রতি যত্ন।

শিশুকে কোলে লইবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। বিছানা হইতে শিশুকে কোলে লইতে হইলে কদাচ হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবে না। ঘাড় ও মাথার বীটে একটা হাত, আর একটা হাত পাছা ও পায়ের নীচে দিয়া ধীরে ধীরে শিশুটাকে তুলিয়া কোলে লইবে এবং একরূপ ভাবে কোলের ভিতর রাখিবে—যাহাতে তাহার কোনরকম অস্থবিধা বা কষ্ট না হয়। তা' ছাড়া কখনও তাহাকে তর্জন করিবে না, বা ভয় দেখাইবে না।

অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় শিশুদিগের বেশী বেশী ঘুম হওয়াই স্বাভাবিক। যাহাতে বালক নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতে পারে, পিপীলিকা বা মশা-মাছিতে কোনরূপ বিরক্ত করিতে না পায়, সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিবে। শিশু ঘুমাইলে হঠাৎ তাহাকে জাগাইয়া কোলে লইবে না, যেখানে সেখানে শোয়াইয়া বা বসাইয়া রাখিবে না এবং কাহারও নিকট হইতে জোর করিয়া টানিয়া লইবে না, অথবা হঠাৎ শোয়াইয়া দিবে না। বিনা প্রয়োজনে কঁদাইবে না। অনেকেরই অভ্যাস,—শিশুকে অনর্থক কঁদাইয়া আনন্দ অহুভব করা; সেরূপ করা কদাচ উচিত নয়। বালক যদি কোন জিনিস লইতে জেদ করে, এবং ঐ জিনিসে যদি তাহার কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকে, তবে তাহা তখনই তাহাকে দিবে, নচেৎ অন্য কোন জিনিস দিয়া ভুলাইবে। বালকের মন যাহাতে সর্বদা প্রফুল্ল থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবে এবং বালক যাহাতে উঁচু জায়গায় না উঠে বা বসে, সে বিষয়েও সর্বদা দৃষ্টি রাখিবে। বালকের নিজের হিতাহিত জ্ঞান নাই, সেজন্ত উহাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিবে, কখন কি বিপদ ঘটিতে পারে, তাহা কে বলিবে?

বালকদিগকে যে সকল খেলনা দিবে, সে সকল যেন ছেলেদের মনভুলান হয়, শব্দ করে ও হালকা হয়। যে সকল খেলনার মুখ খুব সরু, সে সকল বালকদিগকে দিতে নাই; কখন কোথায় খোঁচা লাগাইতে পারে। বালক কাদিতে আরম্ভ করিলে, খাইতে না চাহিলে অথবা কথা না বলিলে

তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য ভুত, ও প্রেত
রাক্ষস প্রভৃতির অদ্ভুত গল্প বলিয়া অথবা
বিকট বীভৎস মূর্তির বর্ণনা করিয়া বালক-
গণের বিভীষিকা উৎপাদন করিবে না।

শিশু বাহাতে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
থাকে, খোলা পরিষ্কার হাওয়ায় আপনার
ইচ্ছামত হাত পা ছুড়িয়া খেলা করিতে
পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে, এবং ঝড়,
বুড়ি, রোদ, বিদ্যুতের আলো, গাছের তলা,
শুষ্ক গৃহ প্রভৃতি হইতে শিশুকে সর্বদা রক্ষা
করিবে। তদ্বিত্ত অপবিদ্র হানে, উন্মুক্ত
আকাশের তলে, বর্ষার সময় অনাবৃত দেহে
ধূলিসমাকীর্ণ হানে, ধূমাক্ত গৃহে ও জল-
সিক্ত গৃহে বালককে কদাচ রাখিবেনা।

শিশু ইটিতে শিথিলে, তাহাকে আপন
মনে ইটিতে দিবে। ইটিবার শক্তি না
হইতেই তাহাকে কখনও হাত ধরিয়া ইটা-
ইয়া লইয়া বেড়াইবে না, অথবা ইটিতে
ইটিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, উহার হাত
ধরিয়া জোড় করিয়া ইটাইতে চেষ্টা করিবে
না এবং কখনও বালকের হাত ধরিয়া
টানিয়া উঠে উঠাইবে না।

বাল্যকাল হইতেই শিশুকে সময় মত
খাওয়া, স্নান করা, ঘুমান ও ঘুম হইতে উঠা,
মলমূত্র ত্যাগ করা, প্রভৃতি অভ্যাস করান
উচিত। বয়োবৃদ্ধির সহিত বাহাতে দীর্ঘা,
বেধ, কলহ প্রভৃতি কুসংস্কার সকল না আগিতে
পারে ও সর্বদা খেলা করিয়া না বেড়ায়,
অভ্যাস আচার না করে, রাগ করিয়া আহা-
রাদি ত্যাগ করিয়া চূপ করিয়া না বসিয়া
থাকে,—এই সকল অনিষ্টকর বিষয় হইতে
বালককে সর্বদা রক্ষা করিবে। কোন

কুঅভ্যাস ছাড়াইতে, হইলে তাহাকে সদয়-
ভাবে ও মিষ্ট কথায় শাসন করিবে।

শিশুর রোগ-বিজ্ঞানোপায়।

যে সকল বালক কথা কহিতে পারে না,
তাহাদের অস্থখ হইলে, রোগের লক্ষণ সকল
বিশেষ অস্থখাবন করিয়া রোগ নির্ণয় করিতে
হয়। বালকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যদি কোন
প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, অথবা পেট কাম-
ডায়, তাহা হইলে বালক সেইসকল স্থানে
বারংবার হাত দেয় ও কাদিতে থাকে, এবং
ঐ সকল স্থানে বা পেটে হাত বুলাইয়া দিলে
বালক সুস্থ হয়, আর কাদে না। মাথার
অস্থখে, শিশু মাঝে মাঝে চমকইয়া উঠে ও
ভয় পাওয়ার মত চীৎকার করিতে থাকে,
অথবা ঘুমানর মত চোখ বুজিয়া অজ্ঞান
হইয়া পড়িয়া থাকে এবং মাথা তুলিতে পারে
না। তলপেটে কোনপ্রকার রোগ-যন্ত্রণা
অস্থখাবন করিলে শিশুর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া
যায়। কিছুই খাইতে চাহে না, ক্ষুধা তৃষ্ণা
থাকে না। শিশুর মলমূত্র রোধ হইলে,
পেটের মধ্যে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। সর্বদা
ছটফট করে ও কাদে, তদ্বিত্ত বমি, পেটফাঁপা,
পেটে শব্দ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণসকল প্রকাশ
পায়। এতদ্বিত্ত শিশু সমস্ত শরীরটা অস্থখ
বিবেচনা করিলে কেবলই কাদিতে থাকে।

বালকের চিকিৎসা।

যে সকল শিশু জননী-অথবা ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ
পান করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের
অস্থখ হইলে, স্তন্যদাত্রী জননী বা ধাত্রীকে
বিশেষ সাবধানে থাকিতে হয়। আবস্তক

হইলে শিশুর আরোগ্যের জন্য খাদ্য বা জননীকেই ঔষধ ও পথ্য সেবন করিতে হয় এবং উপবাসও দিতে হয়। যে সকল শিশু কেবল স্তনদুগ্ধে জীবিত থাকে, অতি বড় অসুখ হইলেও কদাচ তাহাদিগকে স্তন্যপান করান বন্ধ করিবে না।

যে সকল শিশু দুগ্ধায় অর্থাৎ দুধসাপ্ত বা দুধ বালি খাইয়া থাকে, তাহাদের অসুখে, শিশু ও জননী, উভয়কেই ঔষধ খাওয়াইতে পারা যায়। যে সকল শিশু কেবল দুগ্ধের উপর নির্ভর না করিয়া অন্নাদি ভোজন করিতে অভ্যাস করিয়াছে; তাহাদের অসুখ

হইলে কেবল সেই রোগ শিশুকেই ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বর্তমান সময়ে শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে যেমন চিকিৎসকের উপর শিশুর চিকিৎসার ভার দিয়া জননী নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী হইয়া থাকেন, সেরূপ করা কখনই উচিত নয়। শিশুর আরোগ্যের জন্য জননীকেও রোগিণী সাজিয়া সন্তানের জন্য যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হয়; তাহা না করিতে পারিলে, অসুখ সন্তান-সুখ-লাভ ভাগ্যে ঘটে না।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু-স্বাস্থ্যনীতি ।

[ডাঃ শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ]

(পূর্বাভ্যুত্থি)

—:0:—

স্নানবিধি ।

১। সুস্থ শরীরে বেলা ২ ঘটিকার মধ্যেই স্নান করিতে হয়। দুর্বল এবং পীড়িত ব্যক্তি নিজ হইতে অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ লইয়া স্নানের নিয়ম প্রতিপালন করিবে। অবগাহন স্নানই প্রকৃত স্নান। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শীতল জলে স্নান করা প্রশস্ত। স্নাতকের জলে স্নান করিলে শরীরের রক্ত এবং দেহস্থিত উষ্ণ তড়িত ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া শরীরে ক্ষুধা এবং তৃপ্তি বৃদ্ধি করে। আধ্যাত্মিক স্নান পাঁচ প্রকার (ক) অবগাহন

(খ) গাত্রমার্জন এবং মস্তক ধোতকরণ, (গ) হাত পা ধুইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করণ (ঘ) শুষ্ক তৈল মর্দন করিয়া বস্ত্র ত্যাগ করণ (ঙ) গঙ্গা বা তুলসী জল স্পর্শ করণ। ইহার মধ্যে ১ম এবং ২য় স্নানই প্রশস্ত। বস্ত্রভঙ্গ স্নানের উদ্দেশ্য শরীর পরিষ্কার রাখা আর বায়ুপিত্তের সমতা সংস্থাপন রাখা। এতদ্ব্যতীত শীতল জল এবং স্নেহাধিক্যে লবণ মিশ্রিত অল্প উষ্ণ জল ব্যবহার করা ভাল। প্রত্যহ উষ্ণ জলে স্নান করিলে শরীরের মাংসপিণ্ড অর্থাৎ পেশী সূত্র অতি কোমল এবং ঢিলা হইয়া কার্য্য শক্তি কমিয়া যায়। যাহারা

তাড়াতাড়ি একটুই জন্মিয়া স্নানকার্য সমাধা করে, তাহার স্নান কার্যে উপকারের ফল অপেক্ষা অত্যধিক অপকারই লাভ করিয়া থাকে।

হিন্দু শাস্ত্রে অন্ত্যাত ব্যক্তি অন্তি এবং দৈব বা পারত্রিক কার্যের অহুপযুক্ত বলিয়া কথিত। ইহার অর্থ এই যে, নানাবিধ কার্য দ্বারা এবং প্রকৃতির পরিবর্তনে শরীর ও মন উষ্ণ, বিরক্ত, চঞ্চল এবং অপরিষ্কৃত থাকে। ইহাতে দৈব ও পারত্রিক কোন কার্যই সুন্দর ভাবে হইতে পারে না। হিন্দু শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, শ্বাস ক্রিয়া বায়ু নাসিকায় প্রবাহিত হইবার সময় স্নান করিলে শীতলতা জনিত অপচয় অর্থাৎ সন্ধি হইতে পারে না। শ্বাস ক্রিয়ার অতি সূক্ষ্ম বিচার শীল প্রাণায়ামপরায়ণ যোগিগণ এই বাক্যের সম্পূর্ণ পরীক্ষা পাইয়া শ্বাস গতির বহুবিধ ক্রিয়া, ভঙ্গী এবং ব্যবহার বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের স্নান বিধি সাধারণ লোকের উপযুক্ত নহে।

২। স্নান করিবার পূর্বে পদের বৃদ্ধাজুষ্ঠের মাথায় তৈল দিবে। ইহার পর অনামিকা দ্বারা নাভিতে তৈল লাগাইবে কিন্তু নাভিদেশ নাড়া চাড়া করিবে না। ইহার পর কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা কর্ণে এবং নাসিকায় তৈল প্রদান করিবে। ইহার পর অন্ত্রান্ত্র অঙ্গে ধীরে ধীরে মর্দন করিয়া তৈল লাগাইবে। বলা বাহুল্য তৈল বলিতে তিল তৈলই বুঝায়। কিন্তু আমরা বর্তমানে সরিষা, নারিকেল, রেড়ি, তিসি ইত্যাদিকে তৈল সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া লইয়াছি।

এখনকার দিনের অনেক পেটেন্ট তৈল

ব্যবহারে আজকাল অনেকের মস্তকের কেশ নষ্ট আর নানা রূপ চর্ম রোগ ও শ্বাস দুর্বল প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইতেছে। বিজ্ঞাপনের চটকে মুগ্ধ হইয়া নব্য বঙ্গ স্বেচ্ছা মিশ্রিত তৈল মাখিয়া বিলাসিতা বৃদ্ধির সহ অর্থ আর দেহ বিনষ্ট করিতেছে। পূর্বকালের ব্যবহৃত তিল তৈল অভাবে নারিকেল বা সরিষা তৈল মাখিলে শ্বাসের অপচয় আর অর্থের অপব্যয় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে বাঙ্গালী জাতি একমাত্র সরিষার তৈল ব্যবহার করিলেও শরীরের স্নিগ্ধতা পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারেন।

পায়ের বৃদ্ধাজুলীতে তৈল মাখিলে দৃষ্টি শক্তি আর চক্ষুর তেজ পূর্ণরূপে রক্ষা হইয়া থাকে। এখনো ৮০।২০ বর্ষের বহু বৃদ্ধ বিজ্ঞাপনের তৈল ব্যবহার না করিয়া তিল, নারিকেল বা সরিষার তৈল পুরোক্ত নিয়মে মাখিয়া শ্ববক গণের অপেক্ষা অধিক দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন। বলা বাহুল্য, এই নিয়মে তৈল মাখিলে চক্ষু উঠা পীড়া হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। নাভিতে তৈল দেওয়ায় জঠরাগ্নি সতেজ ও চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা ব্যান বায়ুর গতিবিধি অর্থাৎ শরীরের নিম্ন ভাগের বায়ু প্রবাহ সরল ও সহজ রাখা যায়। নাভিমূলে সমান বায়ু (নাইট্রোজেন) থাকে। ইহাকে অধিক নাড়া চাড়া করিলে উদর ভগ্ন এবং অজীর্ণ রোগ জন্মিতে পারে। এই জন্ত শাস্ত্রতত্ত্ববিদগণের আদেশ যে, প্রত্যেক ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্র নাভির চারি অঙ্গুলি নিয়ে বা উপরে পরিধান করিবে। নাভি

বা কোন ইজিয়াদি অধিক মর্দন করিবে না।

৪। স্নান সময়ে জলে ডুব দিয়া স্নান করিতে গিয়া অন্ত কোন পাত্র অথবা গামছা দ্বারা মাথার উর্ক হইতে জল দিলে মাথা অধিক নীতল হয়। মাহাদের মস্তকের উপরাংশ সর্বদা উষ্ণ এবং চক্ষু অধিকাংশ সময় গিছুটি যুক্ত—তাহারা চক্ষু মেলিয়া জলে ডুব দিবে। ইহাতে মস্তক নীতল এবং চক্ষুর উষ্ণতা নিবারিত হইবে।

চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে অথবা মাথা ঘুরিলে কিম্বা উর্কিলে জল চক্ষুর কোন রোগ জন্মিলে বা শিরঃশূলাদি কোন বিকৃতি লক্ষণ ঘটিলে নিম্নলিখিত নিয়মে প্রতিদিন স্নান করা উচিত। স্নান করিতে গিয়া প্রথমে এক অঞ্জলি জল মাথায় দিবে। পরে ডুব দিয়া মুখে যত জল ধরে—তত জল নিয়া চক্ষু চাহিয়া অন্ততঃ ৫।৬টি ডুব দিবে। ইহার পর শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিবে। দেহে অধিক জল শোষণ করিবে না।

৫। অপরের পরিধেয় অথবা গামছা ব্যবহার করা কদাপি কর্তব্য নহে। ইহাতে একের ছোঁয়াতে ব্যাধি অপরের শরীরে সংক্রমিত হইতে পারে।

বিগত শ্রাবণ মাসে আমি মতিহারীতে এইরূপে বিপদস্থ হইয়াছিলাম। সঙ্গে গামছা ছিলনা, তাই একটি পণ্ডিত ব্রাহ্মণের নিকট গামছা চাহিয়া ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার ফলে ব্যক্তিভেদে চক্ষুর পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। বলা বাহুল্য যে, পণ্ডিত মহাশয় ইতিপূর্বে ‘চক্ষুউঠা’ পীড়ায় ভুগিয়াছিলেন। তিনি রোগযুক্ত হইয়া গামছা পরিষ্কৃত করিলেও উহা হইতে চক্ষুউঠা পীড়ার বিষ

পরিভ্যক্ত হয় নাই। আয়ুর্বেদে দক্ষ, পীড়াকে ব্রহ্মহৃষ্ট শ্রেণী মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। দক্ষ পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তির বস্ত্র পরিয়া আমার এক পরিচিত ব্যক্তি উৎকট “মহিষা দাম” রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। ঐ পীড়ায় তাহাকে “ক্রাইসোক্যানিক সালসার এমেটিক এসিড” প্রভৃতি ঔষধ দ্বারাও আরোগ্য করিতে পারি নাই শেষে গোমুত্র আর তুলসী পত্র এবং লিভারপুলি লবণ প্রত্যহ খাওয়াইয়া আর মাখাইয়া অনেক আরোগ্য করিয়াছি।

৬। স্নান কালে অন্ন স্নাতার কাটা মন্দ নহে, কিন্তু তাই বলিয়া বাজী রাখিয়া স্নাতার কাটা অতীব অশ্রায়। কেননা ইহাতে প্রধানতঃ শ্বাস গতি দীর্ঘ হয়, দ্বিতীয়তঃ ফুসফুসে রক্তাধিক্য জন্মে, তৃতীয়তঃ মস্তকের ক্রিয়া অধিক হইয়া পরিশেষে “সর্বমত্যস্ত গর্হিতম” হইয়া সন্তান প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে।

৭। স্নান সময়ে সর্বদা ঘর্ষণ করিয়া জল দ্বারা ধুইয়া ফেলিলে চর্ম পরিষ্কার হয় এবং বর্ণ সংস্কার আর মাংসপেশী সতেজ হয়। ঘাঁহারা তৈল মাখিয়া থাকেন তাঁহাদের তো গামছায় অল্প মুছা নিত্য আবশ্যক—তৈল ধুইয়া ফেলিলে বস্ত্র পরিষ্কার আর চর্ম মৃদু হয়। আর ঘাঁহারা তৈলের পরিবর্তে সাবান ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পক্ষেও একটুকু জোরে অল্প মার্কিন নিত্য আবশ্যক। সাবানের চূর্ণ বা পটাস অংশ লোমকূপে আবদ্ধ থাকিলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। প্রত্যেক লোমকূপ পরিষ্কার এবং স্বচ্ছিন্ন না থাকিলে শরীরের ক্লেদ ঘর্ষণ

সহ বাহির হইতে পারে না, প্রত্যুতঃ উহাতে
হৃৎ কিম্বা পটাস ভাগ লাগিয়া থাকিলে ক্ষত
এবং একজিয়া নামক উৎকট চর্মপীড়া হইবার
অতি সম্ভাবনা । পাশ্চাত্য প্রধার সাবান
ব্যবহার অপেক্ষা ভারতের সরিষা তৈল ব্য-
হার শরীর রক্ষার পক্ষে শতগুণে উৎকৃষ্ট ।
অবশ্য সর্বদা ভালরূপ ধোত করা চাই ।

৮। স্নান কালে অস্ত্রমনক হইয়া বা
গল্প করিতে করিতে কিম্বা হাস্ত, ক্রন্দন এবং
সঙ্গীত করিতে করিতে স্নান কার্য নিষিদ্ধ ।
ইহাতে শরীর মন উভয়েরই অনিষ্ট হয় ।
অস্ত্রমনক স্নানার্থি জলে ডুবিয়া কিম্বা জল-
জন্ত কর্তৃক আক্রান্তও হইতে পারে ।

৯। স্নানকালে একগলা জলে দাঁড়াইয়া
৭ বার মুখে জল লইলে বায়ুর উর্দ্ধগতি নিবা-
রিত হয় ।

১০। প্রাতঃস্নানে শরীর রক্ষ হয় ।
সন্ধ্যাস্নানে স্নেহা জন্মে, বেলা ৯টা ১০টার
স্নানই প্রশস্ত কাল ।

১১। শীতকালে এবং বর্ষাকালে প্রত্যহ
স্নান না করিলে তত হানি নাই । আবার
অল্প জলে ভিজিয়া শরীর ঠাণ্ডা হওয়া অপেক্ষা
অবগাহন স্নান করিয়া পদবস্ত্র শুষ্ক করতঃ গরম
সরিষার তৈল পায়ের তালুতে মাখিলে এক
দিনেই সন্ধি আরোগ্য হয় । অতি বৃদ্ধ,
অতি শিশু এবং সত্ত্বঃ প্রসূতা নারী এবং
পীড়িত ব্যক্তি প্রত্যহ স্নান করিবেনা ।
পক্ষান্তরে পরিশ্রমী, কেরাণী, উকিল, মোক্তার
লেখক, চিত্রকর, প্রভৃতি ব্যক্তির পক্ষে স্নানের
সময় পরিবর্তন কখনই কর্তব্য নহে ।

শয়ন ও নিদ্রা ।

১। পরিকার-পরিচ্ছন্ন শয্যা ব্যবহার

করিবে । উপাধান অর্থাৎ বালিশ যেন অধিক
উচ্চ, অধিক নীচ এবং কঠিন না হয় । কিন্তু
অতি কোমল বালিশও ভাল নয় । বালিশ
হীন শয়নে রক্ত গতি পরিচালনের বহু বিঘ্ন
জন্মে । ইহার ফলে প্রায়ই মস্তিষ্ক পীড়া আর
ফুসফুস জনিত বহু রোগ উপস্থিত হইতে
পারে । পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে—
হিন্দুস্থানের সাধারণ গৃহস্থগণের অধি-
কাংশই মাথার পীড়া, কর্ণের পীড়া এবং
স্নেহা ঘটিত পীড়ার আক্রান্ত হয় । ইহারা
একে কঠিন কস্মী, তাহার উপর বালিশ
ব্যবহার ইহারা প্রায়ই করেনা, হয় এক
খানা বস্ত্র পাতিয়া খাটিয়ার ডাঁসায় মাথা
রাখিয়া না হয় হাতের উপর মাথা দিয়া
মাটিতে শয়ন করে । আমি দীর্ঘ ১৫।১৬ বর্ষ
হিন্দু স্থানের বহু প্রদেশে থাকিয়া ভাস্করি
করিয়াছি, এই সকল স্থানে বাঙ্গালা
দেশ অপেক্ষা মাথার ব্যাধি, কর্ণের
রোগ আর ঘূর্জল ফুসফুস প্রবণ রোগী বহু
পাওয়া যায় । অতি বড়লোক ভিন্ন—
“গ্যারদা” (বালিশ) সাধারণের ব্যবহার্য
নহে । বাঙ্গালা দেশের মজুরেরাও
বিনা বালিশে শয়ন করে না । বালিশ
প্রস্তুত করিতে কিন্তু কার্পাস, তুলা ভাল
নহে । শিমূল তুলা আর আট্টার তুলাচিনার
(একপ্রকার শস্ত) বালিশই প্রশস্ত ।
আকস্ম তুলা নির্মিত উপাধানই সর্বশ্রেষ্ঠ ।

ছুই ব্যক্তির পক্ষে এক বালিশে শয়ন
সর্বথা পরিত্যজ্য । ইহাতে একের
নিঃশ্বাস অপরেকের টানিয়া লওয়ায় উভয়ের
স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে । বঙ্গসমাজে
পতি-পত্নী একই বালিশে শয়ন করিয়া

করিয়া থাকেন। এ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে ঠিক নহে। এক সময়ে এই কারণে স্ত্রীর গুপ্ত নাসিকার ব্যাধি স্বামীর—হইয়াছিল ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বস্তুতঃ এক উপাধানে দুই জনের শয়ন করা কখনই কর্তব্য নহে।

২। শয়নের পূর্বে পাদবয়ষিক্ত করা অল্পচিত। আবার কোন কোন ঋষি শয়নকালে গামছা দ্বারা উভয় পদ মুছিয়া— শুইতে বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় এ ব্যবস্থা অপ্রযুক্ত নহে, কারণ পা ধুইয়া এবং মুছিয়া শয়ন করিলে সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ হইয়া সুনিদ্রা হয়। যে সকল ব্যক্তি অত্যধিক দুর্বল, তাহারা শয়নকালে পায়ে একটু তৈল মাখিয়া শয়ন করিলে যথেষ্ট সুস্থতা অল্পভব করিতে পারেন।

৩। দক্ষিণ-পূর্বদিকে মাথা রাখিয়া শয়নই প্রশস্ত। কখনো উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না—কারণ এই দিকে চুষকের আকর্ষণ অধিক। রক্তে লোহের ভাগ অধিক আছে বলিয়া উত্তর দিকে মাথা রাখিলে অনেক প্রকার ব্যাধি জন্মিতে পারে। এই তত্ত্বের মীমাংসার উদ্দেশ্যে পুরাণে একটা চমৎকার গল্প বর্ণিত আছে, যথা—পার্কতীর গুহে গণেশ উত্তর শিখরে শয়ন করিয়াছিল বলিয়া শনির দৃষ্টিতে তাহার মাথা উড়িয়া যায়। তাহার পর উত্তরলিঙ্গের ঐরাবতের মাথা আনিয়া উহাতে সংযোগ করা হয় বলিয়া গণেশ গজমুণ্ড হইয়া যান। যাহা হউক সর্বদা পূর্ব শিখরে শয়ন করিবে। দক্ষিণে যমের অধিকার, এদিকেও মস্তক রাখিবে না। স্বাস্থ্যতত্ত্বের এই নিয়ম প্রতি-

পালন জন্ম বর্ধনমূলক এতগুলি উপদেশ আছে। কোশলী হিন্দুস্বাস্থ্যবিদগণ ধর্মের সহিত শরীর রক্ষার নিয়মগুলি পালন করাইবার জন্য পৌরাণিক গ্রন্থনিচয়ে এই সকল উপদেশ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

৪। নিদ্রিতাবস্থায় বাহিরের শীতল বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিবে না। করিলে সাধারণতঃ সর্দি, হাঁচি, কাশী এবং বাতব্যাধি জন্মিতে পারে। কারণ শ্বাস গতিই জীবনযন্ত্রের মূলকেন্দ্র।

৫। নিদ্রা যাইবার সময় বালিশ বা হস্তাদির চাপ যেন বুকে না লাগে—এরূপ ভাবে সতর্ক হইয়া শয়ন করিবে। কলকথা এই যে, ফুসফুসের কার্য যেন নিয়মিত-ভাবে চলিতে পারে। আবার নাসিকা আবৃত করিয়া শয়ন করিতে নাই। যাহাতে নিদ্রিতাবস্থায় পরিকৃত বায়ু নাসিকা-সাহায্যে গ্রহণ করা যায়—তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। পরের পরিত্যক্ত প্রশ্বাস যেন নাসিকা পথে কদাচ না যায়।

৬। প্রত্যহ নিদ্রা, শয়ন, আহার ও স্নানের নিদিষ্ট সময় স্থির রাখা সুসঙ্গত। রাত্রি দশটা-সাত্বে দশটায় নিদ্রা যাওয়া উচিত।

৭। রাত্রিতে শয়ন করিবার কিছু পূর্বে দুধ পান করা পরম উপকারী এবং স্বাস্থ্যকর। দুধের অভাবে শীতল জল পান করাও চলিতে পারে। নিদ্রিতাবস্থায় শরীরের সমস্ত যন্ত্রের বিশেষতঃ শ্বাস-কেন্দ্রের কার্য সামান্য ভাবে পরিচালিত হয়। এই জন্য উহার বলবৃদ্ধিকল্পে দুধ—অভাবে জলপান করিবার বিধি। পাকস্থলী থাকে পূর্ণ

থাকিলে অন্ততঃ অর্ধ ছটাক দুধ খাইলে উদ্বেগ সিক্ত হয়।

৮। শয়ন জন্ত যুক্তিকায় শয্যা পাতিয়া শয়নই প্রাপ্ত, তবে দেশকাল-পাত্রভেদে অবস্থা ভিন্নরূপ হয়। খাট-পালঙ্ক-খাটিয়া প্রভৃতিতে শয়ন করিলে কোন ক্ষতি নাই। তবে শয়ন করিয়া বাহাতে ভূমিতল স্পর্শ করা যায়—এরূপ ভাবে উহা নির্মিত হওয়া উচিত।

৯। রাত্রিতে আহারান্তে আচমন করিয়া মুখ জলপূর্ণ করতঃ প্রস্রাব অন্তে ধর্ম-মূলক সদগ্রন্থ অন্ততঃ ১ ঘণ্টা পড়িয়া বা বন্ধুসহ মিষ্ট আলাপ করিয়া আবার প্রস্রাব হইলে শয়ন করিবে। আহারান্তে নিয়মিত জলপান করিলে প্রস্রাব পরিকৃত হয়। ইহাতে স্ননিদ্রা এবং পরিপাক শক্তি বর্ধিত হয়।

১০। শয়নকালে দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিতে হয়। তবে ঋতুভেদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে হানি নাই। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত ও বসন্তে শরীরের উত্তাপ সহজে বাহির হইতে পারে। একজন্ত সূক্ষ্ম চাদর ব্যবহার করিতে হয়। অত্যধিক গরমে মশারী ব্যবহার করিলে চলিতে পারে। শীত ঋতুতে লেপ-কম্বলই যথেষ্ট। শয়নকালে অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতে শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন, উহার অর্থ সুগন্ধি চন্দনাদি দ্বারা মনের প্রকল্পতা জন্মিয়া থাকে, কিন্তু হিন্দু-বৈজ্ঞানিকেরা চন্দনাদির এই ভাবে ব্যবহার কেবল মাত্র শীত এবং বসন্ত ঋতুতেই করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার উদ্বেগ আমরা বুঝিতে অক্ষম। বাহা

হটুক দুর্গন্ধময় স্থানে নিদ্রা যাইবে না ইহা আমরা আর্ধ্যঋষির কথায় স্থির করিয়া লইলাম। শয়ন গৃহে, বিড়াল, কুকুর, ভেক—চামচিকা, গো, অশ্ব, কপোত ইত্যাদি তির্য্যক প্রাণী (পংক্তি জাতি) মুক্ত বা আবদ্ধ অবস্থায় কখনো রাখিবে না। যেহেতু ইহাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা আছে। আবার উহাদের জন্ত অন্তরূপ হিংস্র জীব গৃহে উপস্থিত হইতে পারে।

ইউরোপীয় জাতি কুকুর লইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। এ অবস্থা আর্ধ্য ঋষির উপদেশে বহির্ভূত। আর্ধ্য ঋষি এইরূপ নিকৃষ্ট জীব গৃহে থাকায় সর্পাদি জীবের দ্বারা মাহুষের অনিষ্ট হইতে পারে। বিবেচনা করিয়াই এরূপ কার্য্য করিতে নাই বলিয়া গিয়াছেন। এরূপ নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করিয়া এক সময় আমারই এক ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। আমার শয়ন গৃহের জানালার পার্শ্বে একটা হংস ডিম 'তা' দিতেছিল। সহসা সর্প আসিয়া আমার নিকটস্থ দুইটি শিশুর শয্যায় উপস্থিত হইল। অতি কষ্টে কার্কলিক এসিড সাহায্যে সর্প তাড়াইয়া বিপদ মুক্ত হই। নিকৃষ্ট জীব শয়ন গৃহে থাকিলে কুষ্ঠ-বন্দাদি পীড়াক্রান্ত হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা।

১১। রন্ধন গৃহে শয়ন করিতে নাই। কেননা 'অথায়' কার্কলনের অংশ অধিক থাকিতে পারে। কার্কলিক 'বায়ু' নর শরীরের গর্ভে স্বাস্থ্যকর নহে। নাসিকাগ্র হইতে পায়ের বৃদ্ধাকৃষ্ট পর্য্যন্ত তিন হস্ত পরিমিত স্থান শকার চারিদিকে মুক্ত রাখা উচিত। মোটের

উপর কথা এই যে, শয়ন গৃহে অধিক ভ্রাবাদি রাখিতে নাই, কেননা নিজাকালে প্রাণাসের গতি ১২ অঙ্গুলি স্থান বিস্তৃত হয়। বায়ু, ডেকস, তোরন এবং তৈজসাদি বেশী করিয়া রাখিলে শ্বাস প্রাণাসের গতিরোধ হইতে পারে। ইহাতে দেহে তাপাধিকা হইলে প্রাণবাহী শুক্র তরল হইয়া জ্বাতজ্বাত ভাবে নির্গত হইয়া যায়।

১২। অধিক রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় কেহ ডাকিলে সহসা উত্তর দেওয়া উচিত নহে। ভালরূপ জানিয়া শুনিয়া তবে গৃহ হইতে বাহির হইতে হয়।

১৩। স্নান শরীরে দ্বাদশ দণ্ডে অধিক নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। সাড়ে সাত দণ্ডে ১ প্রহর হয়। স্তত্রাং ১২ দণ্ডে প্রায় দুই প্রহর। ১২ ঘণ্টা নিদ্রার পক্ষে যথেষ্ট সময়। রাত্রি ১০টায় নিদ্রা গিয়া অতি প্রত্যয়ে উঠিলে নিদ্রার সময় এবং বিশ্রাম যথেষ্ট হয়। ইহার অধিক সময় নিদ্রা যাওয়া আর স্বর্ষা উদয় পর্যন্ত শয়ান থাকা দেহ নষ্টের মূল।

১৪। রাত্রি-জাগরণ সর্বদা পরিহার করিবে। যে কোন কারণেই হউক আদৌ রাত্রি জাগরণ করিবে না। জীব নিদ্রিতাবস্থায় জীবনীশক্তি—মহাশক্তি হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই মহা কার্যের বিষয় হইলে অল্লায়ু হইতে হয়। বিলাসিতা আর থিয়েটার বা বাজা শুনিয়া যাহারা রাত্রি জাগরণ করে, তাহারা অধিকাংশই রুগ্ন ও অল্লায়ু। বিশেষতঃ কোন কারণে যদি রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তবে, প্রাতে উঠিয়াই স্নান করা অবশ্য অবশ্য কর্তব্য।

১৫। শয়ন গৃহে প্রত্যহ প্রাতে আর সন্ধ্যায় ধূপ ধুনা দেওয়া উচিত। ধুনায় প্রাণবায়ু (অম্লিজেন) প্রবাহিত হয়। হিন্দু দার্শনিকগণ ধূলা আর গোময়কে ফেনাইল প্রভৃতি হইতে প্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। যেখানে কার্বনিক গ্যাস উৎপত্তির কথা, সেই স্থানেই গোময় ও ধূনার ধূম দিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। গোময় আর পূজার ধূনা এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১৬। চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করা একান্ত কর্তব্য। যেহেতু এই সময় সমীরণ “নামে বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ুই জীবের নিদ্রা ভঙ্গ করে এবং জীবকে আরোগ্য পথে উপস্থিত করে। আবার এই বায়ুর গতিই চিন্তের স্বৈর্য্য রক্ষাকারী। এইজন্য স্নানিগণ এবং গুণ-কর্মশালী প্রকৃত ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে ভগবদারাধনা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই সময়েকে “ব্রাহ্মমূর্ত্ত্ত” কহে। ব্রাহ্ম-মূর্ত্ত্তে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর বায়ু সেবন উদ্দেশ্যে মুক্ত স্থানে, উত্তানে, নদীতীরে, রাজপথে ভ্রমণ করিয়া—পবিত্র আসনে বসিয়া অভ্যাস এবং প্রবৃত্তিমূলক ইষ্টনাম স্মরণ ও পূজন করিবে। পরে পুষ্টি-কারক অন্ন খাওয়া খাইয়া তবে সংসার কার্য্যে মন দিবে।

১৭। নিদ্রা হইতে উঠিয়া সহসা অনাবৃত দেহে বাহিরের বায়ু শরীরে লাগাইবে না। খালিপায়ে পায়খানায় যাইবে। এই সময় কিন্তু গাত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত করা উচিত। কারণ বিষ্ঠাদির দূষিত বায়ু শরীরে লাগিলে ব্যাধি হইবার আশঙ্কা

আছে। নিত্রাকালে শরীর উষ্ণ হয়। এই উষ্ণবাহার শীতল বায়ু সহসা শরীরে লাগিলে স্নেহাব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। তাহা ব্যতীত অন্যান্য ব্যাধিও হইতে পারে।

১৮। নিত্রা হইতে উত্তিয়াই কথা বলিবে না, শৌচ কার্য করিয়া তবে কথা বলিবে। বহুভাবী ব্যক্তি বহু রোগের আধার। স্বাস্থ্যকামী মাত্রেয়ই ইহা মনে রাখা কর্তব্য।

১৯। দিবানিত্রা আয়ুষ্করকর। কেবল গ্রহণী, অজীর্ণ এবং বায়ু পীড়িত লোকের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ নহে। আর্ষ্যশাস্ত্রে উপবীত হইবার সময় একটা বৈদিকমন্ত্র পড়িতে হয়। উহার একস্থলে আছে, “মাদিবা সালি”। এই মন্ত্রের উপদেশ বর্ষে বর্ষে পালন করা সকলের উচিত।

২০। শয়ন গৃহে আলো জালিয়া নিত্রা বাইবেন। কারণ অগ্নি হইতে যে অন্ধারক বায়ু (কার্বনিক গ্যাস) উৎপন্ন হয়, উহাতে গৃহস্থিত প্রাণ বায়ু (অকসিজেন বা অক্সিজেন) জালিয়া সমস্ত গৃহকে এবং শায়িত ব্যক্তিকে বিপন্ন করে।

২১। রাত্রিতে মশারী ব্যবহার করায় দোষ, গুণ—দুই-ই আছে। যে স্থানে মশাদি জীবের অধিক অত্যাচার, তথায় বাধ্য হইয়া মশারী ব্যবহার করিবে। আবার অন্য মশা আছে—অথচ সেই প্রদেশ ম্যালেরিয়া-প্রবণ—তথায় মশারীই একমাত্র শরীর রক্ষার উপায়। কিন্তু যে স্থানে মশা নাই, ম্যালেরিয়াও নাই—তথায় মশারী ব্যবহার ঠিক নহে। এই সমস্ত স্থানে মাত্র বর্ষা ঋতুতে মশারী ব্যবহার করিলে হানি

নাই। অনেক স্থল ব্যক্তি আছেন—যাহারা জীবনেও মশারী ব্যবহার করেন নাই। মোটের উপর মশারী ব্যবহার অসুচিত নহে।

অতঃপর প্রাত্যহিক বিহার এবং আহার আদি বিষয়ে লিখিত হইতেছে।

প্রাতরুত্থান ও শৌচ ক্রিয়া।

পূর্ব গগনে সূর্যালোক প্রকাশিত হইবার মাত্র শয্যা পরিত্যাগ করিতে হয়। আর্ষ্য শাস্ত্রে এই সময়কে “ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত বলে। এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সাধারণ বায়ু যে পাঁচভাগে বিভক্ত, তাহার প্রধান ভাগের নাম “সমীরণ”, ইহা এই সময় প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর অপর নাম প্রাণবায়ু। জীবের জীবনী শক্তি রক্ষা করিতে আর ক্ষুধা এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে এই বায়ুই সর্ব প্রধান। রাত্রির নিত্রা জনিত ক্লান্তি এই বায়ুদ্বারা নষ্ট হয়। এইজন্য ঋষিগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা-প্রাণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। প্রাচীন আর্ষ্যগণ এই সমস্ত স্বাস্থ্য বিধি পালন করিয়া জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

১। কখনো মল মূত্রের বেগ ধারণ করিবে না—কেমনা উহাতে উদরাগ্নি কুপিত হইয়া দেহের সমস্ত স্নেহাকে আকর্ষণ পূর্বক বক্ষ গহবরে প্রবেশ করে, উহাতে পেট এত গরম হয় যে শুক্রকে তরল করিয়া যক্ষ পীড়া পর্যন্ত জন্মাইতে পারে। আবার আবদ্ধ মলরাশি “এলিমেন্টারী কেনাল” নামক উত্তরের স্থান বিশেষে গমন করিয়া একরূপ উৎকট পীড়া জন্মাইয়া থাকে। কখনো কখনো মলো মধ্য সঞ্চিত হইয়া উর্ধ্বে গমন করতঃ

মুখ দ্বারা বাহির হইয়া পড়ে । সাধারণতঃ মল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে শরীরে অশান্তি এবং ক্রোধহীনতা, মাথাধরা, মূত্ররোধ, জ্বর, বমি প্রভৃতি হইয়া থাকে । একটা কেরাণী সাহেবকে ক্যাস বুঝাইতে বসিয়া ছইবার প্রস্তাবের বেগ সামলাইয়া “লেজার-বুক” দেখানার সময় শরীর উক হইয়া সহসা টেবিলের উপর পড়িয়া যান । তাহার পর ডাক্তার মুকিন গিয়া কারণ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন যে ৩ পাউণ্ড প্রস্তাব বাহির করেন—কিন্তু ঘণ্টা দেড়েক পরে কেরাণীরা ইহা লীলা সমাপ্ত হয় ।

২। অনাবৃত দেহে কখনো মলমূত্র ত্যাগ করিবে না । দেহ আবৃত না থাকিলে মলমূত্র ত্যাগের স্থান হইতে দূষিত বায়ু উৎপন্ন হয় । উহা গাত্রে লাগিলে চর্ম-পীড়া—এমন কি কুষ্ঠ রোগ পর্যন্ত হইতে পারে । ঐ সময় দেহে শীতল বাতাস লাগিলে মল-মূত্র স্থল্লরূপে হয় না । এই সময় দস্তে দস্তে সজোরে চাপিয়া কার্য করিলে দস্ত পীড়া জন্মিতে পারে না । তৈল মাখিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিও না । কেন যে এই বিধি তাহার কোন বিশেষ হেতু আমরা খুঁজিয়া পাই নাই । রাজ চিন্তা শক্তিধারা ইহাই জানিয়াছি যে, সজোরে মলবেগ ও প্রস্তাব বেগ দিবার সময় শরীরের অপান বায়ুর বে নিষ্কমণ হয়, উহা তৈল দ্বারা আবদ্ধ লোম কূপের মুখা দিয়া সহজে আসিতে বাধা পায় । দেখিয়াছি বই প্রাচীন ব্রাহ্মণ-কাব্যস্থান সময়ে তৈল মাখিয়াই পার্শ্বানার গিয়া থাকেন । ইহাদের কখনো চর্মপীড়া বা চুলকানি পর্যন্ত হয় নাই । তাহারা বলেন

তৈল মাখিয়া পার্শ্বানার গেলে বরং বান-বায়ুর ক্রিয়া সূচাত্তরূপে সম্পন্ন হয় । ইহা হইতে আমাদের মতে শাস্ত্রোপদেশ মান্ত করিয়া চলাই সুসঙ্গত ।

৩। শাস প্রশাস লইয়া—স্বাস্থ্য-তত্ত্বের অনেক কথাই ঋষিপ্রণীত স্বাস্থ্য-তত্ত্ব আছে । নাসিকার নিঃশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ লইয়া শরীর রক্ষার অনেক কথা শাস্ত্রে লিখিত । আমরা যোগী নহি বা প্রাণায়াম পরায়ণ নহি । এই তত্ত্বের সূত্র ক্রিয়া বৃত্তিতে অক্ষম । তথাপি শরীর রক্ষা ব্যপদেশে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া দুই চারিটি কথার যাত্রা আলোচনা করিলাম ইহা অতি সাধারণ । ক্রিয়ামিত ব্যক্তি মর্ষ বৃত্তিয়া লইবেন । দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস প্রবাহকালে মলত্যাগ আর বাম নাসিকার প্রবাহকালে মূত্র ত্যাগ করিবে ।

৪। মলভাণ্ড পরিষ্কার রাখা প্রমায় বৃদ্ধির একটি প্রধান ক্রিয়া—এইজন্ত যোগিগণ প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা—আর বৈদ্যগণ ভেজ ক্রিয়া দ্বারা উদর পরিষ্কার অর্থাৎ কোষ্ঠশুদ্ধি করিতেন । মল মূত্র, নিষ্টিবন বা ধুঁধু, শুক্র, রজঃ, ঘর্ম, কফ, পিত্ত এই আটটির নাম মল । ইহা জীবশরীর হইতে সর্বদা পরিত্যক্ত হয় । ইহার একটীর বিরুদ্ধি ঘটিলে দেহ রোগ-প্রবণ হইয়া থাকে । ভুক্ত অন্নাদির পরিপাকাবশিষ্ট বস্তুই মল বা বিষ্ঠা—পানীয় বস্তুর পরিপাকাবশিষ্ট অলীয়াংশের নাম মূত্র । খাদ্য পরিপাকের পাঁচ প্রকারে রসের মূল রসটির নাম নিষ্টিবন বা ধুঁধু । মেদধাতুর অসার অংশের নাম ঘর্ম । শুক্রের অসার অংশ কফ আর রক্ত, রস, মেদ, মল্লা ইহাতে

উৎপন্ন অষ্ট ধাতুময় পরিণত প্রধান রসের নাম ত্ত্বক। রক্তের অঙ্গার অংশ পিত্ত। আট প্রকার ধাতুময় শোণিত জাত অংশের নাম আর্ন্তব বা রক্তঃ। এই আট প্রকার মলকে প্রাণ, অপান (অস্মিজন, হাই ড্রোজেন বা অন্নজান উদজান) বশক্তিতে দেহরক্ষাকারী অংশ রাখিয়া অতিরিক্ত ভাগকে শ্রাবন গ্রন্থি দ্বারা শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই সকল মনের চালক, পালক, ধ্বংস ও প্রস্তুতকারক মহাবল্লভই প্রাণবায়ু বা অস্মিজন। স্তত্রাং প্রাণবায়ুর সাম্যভাব রক্ষা করাই স্বাস্থ্যরক্ষা নামে অভিহিত। স্তত্রাং মলমূত্রের বেগ ধারণ আর অস্ত্রবিধ অনিয়ম করাই স্বাস্থ্য-হীনতার প্রধান কারণ।

৫। মলত্যাগকালে মাটি খুঁড়িয়া তাহার পর মাটি চাপা দেওয়া অভিজ্ঞ জীবহিতকারী ব্যক্তির পক্ষে অতি হুনিয়ম। ভগবান এই নিয়মটিকে জীব বিশেষ দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। মলের উপর জলধৌত না করিয়া ধুলা বা ভস্মাচ্ছাদিত রাখা সজ্ঞত। কেননা মলমূত্র ত্যাগে যে দূষিত গ্যাস উৎপন্ন হয়, উহাতে সাধারণ ভূ-বায়ু দূষিত হইয়া নিজের ও পরের অনিষ্ট করিতে পারে। সূক্ষ্মদর্শী সর্বজীবে দয়ালু ঋষিগণ এইজন্তই এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অধিক কি, তিনবার হাতে তালি দিয়া গ্রীবা হেলাইয়া আকাশ দৃষ্টিতে মল-ত্যাগ করিতেও ঋষি পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাতে শব্দ হইতে হিংস্র জীবের আশঙ্কা এবং বায়ুর গতি প্রবর্তনের সুবিধা হয়।

৬। মলত্যাগের বেগ হউক, আর না হউক প্রত্যহ দুইবেলা পায়খানায় গিয়া

অন্ততঃ জলদ্বারা মলদ্বার ধৌত করা আবশ্যিক। প্রবাদ আছে যে, “হয় না হয় দুইবার যায়, তার কড়ি না বৈজে পায়।” দুইবার দাঁত হউক আর না হউক সামান্য বায়ুনিঃসরণ হইলেও উপকার আছে। এই স্থানে তন্ত্র শাস্ত্রের একটা আদেশ প্রতিপালন করিলে অর্শ, ভগন্দর, গুহ্য কণ্ডূর প্রভৃতি নিবারিত হয়। তন্ত্রকার ঋষি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে অন্ততঃ বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলী তৈলবিক্ত করিয়া ২৩ বার মলদ্বার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া জলাশয়ে ধৌত করে, তাহার ঈঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত থাকে এবং সে উপরোক্ত ব্যাধিগুলিতে আক্রান্ত হইতে পারে না, এই ব্যবস্থা দ্বারা কোষ্ট কাটিস্ত থাকিলে তাহা নিরাময় হয়। আবার এই সময় থুং ফেলিবে না—কেননা থুংই গুপ্ত ত্ত্বকের রূপান্তর বস্তু।

মলত্যাগ হইলে “হাতে মাটি” দেওয়া স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে উৎকৃষ্ট নিয়ম। অন্ততঃ তিনবার যুষ্টি দ্বারা বাম হস্ত ধৌত করিবে। এই কার্যটি দ্বারা দুইটি মহাকাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। চূর্ণদ্রবীকরণ আর হস্ত তলের লোমকূপ দ্বারা দূষিত বস্তুর—প্রবেশ নিবারণ। বহল নব্য ব্যক্তি জলদ্বারা হাত ধুইয়া চলিয়া আসেন, —মাটি ব্যবহার অতি নিম্ননীয় এবং দুষ্টা বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। ষাাঁহাদের অল্পকরণে এইরূপ কার্য্য শিক্ষা, তাহারা সাবান ব্যবহার না করিয়া “কমট” বা পায়খানা পরিভ্রমণ করেন না। হিন্দুর নিকট প্রস্তাব অন্তে জল না লওয়া আর হাতে মাটি না করা—অতীব ঘৃণাজনক, আবার তাই বলিয়া বহু “ওচিবাই”

গ্রন্থ ব্যক্তির জ্ঞান কেবলই বাহ্য পৰ্য্যন্ত যুক্তিকা-
লেপন আর ধোত করণ গোঁড়ামি ভিন্ন আর
কিছুই নহে। মোটের উপর কথা এই যে,
হস্তে মাটি দেওয়া, প্রস্রাব করিয়া জল গ্রহণ
স্বাস্থ্য-তত্ত্বের নিয়ম।

৮। শীতল জলের অভাবে বা সময়
গুণে উষ্ণ জলে মুখ ধুইবার নিয়ম আছে।
এই সময় দস্ত পরিষ্কার আর জিহ্বা আচড়ান
অতি উৎকৃষ্ট। যাহাদের দস্ত অপরিষ্কার
এবং জিহ্বা ক্লেদপূর্ণ—অজীর্ণ ব্যাধি তাহাদের
চিরসঙ্গিনী। দস্ত পরিষ্কার করিতে পূর্বাপর
ভারতবর্ষে এঁঠেল মাটি, অন্ধার চূর্ণ আর
খাড়িমাটি চলিয়া আসিতেছে। দাঁতন করি-
বার জন্য আইসেসেওড়া, নিম, ভেরেণ্ডা, বকুল,
আম, অম্বুখ, যজ্ঞভস্ম, বেল প্রভৃতির শাখা
ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ কসযুক্ত তিক্ত অথবা
পিবত্র বৃক্ষ শাখাই একরূপ কার্যে প্রযুক্ত। খুলনা-
যশোহর প্রভৃতি জেলায় দাঁত মাজিবার জন্য
একরূপ নাতিহুশ নাতি দীর্ঘ বনজ উদ্ভিদ
আছে। উহার নামই “দাঁতনগাছ”। উহাকে
আবার আঁসবেলও কহে। ইহার পাতা ছোট
আকারের এবং ইহা ক্ষুদ্র ফলযুক্ত হয়। যাহা
হউক প্রত্যহ দস্ত পরিষ্কার আর জিব আঁচ-
ড়ান স্বাস্থ্য-তত্ত্বের একান্ত পালনীয় বিধি।
কিন্তু তাই বলিয়া শক্ত জিনিস চিবান বা
অতি জোরে দাঁতন করিবেনা। যেহেতু দস্ত
শিরা অতি কোমল এবং ক্ষুদ্র। উহা হইতে
রক্তপাত হইলে বিপদ উপস্থিত হইতে পারে।
একরূপ দস্ত শিঙ দিগের আছে উহাকে
“পানছে দাঁত” কহে। এইরূপ দস্ত হইতে

সহজে রক্তপাত হয়। নিয়মিত দাঁত না
মাজিলে দস্ত হইতে পাথুরি নামক দস্তাংশ
পতিত হয়। উহাতে জিহ্বার অন্তঃস্থ, স্নায়ুশূল
এবং আরও নানারূপ ব্যাধি উপস্থিত হয়।
আহারান্তে “খড়কে খাওয়া” আর
দাঁতন করার একাই উদ্দেশ্য। খাওয়াংশ দস্ত
ফাঁকে থাকিয়া দুগ্ধ ক্ষত প্রভৃতি পীড়া
হইয়া থাকে। আবার তাই বলিয়া সর্বদা
বা অনাবশ্যক স্থানে দস্তে আঘাত করিতে
নাই। যে সময়ই মুখ ধুইবে, সমগ্র মুখ
অর্থাৎ নাসিকা, চক্ষু, কপাল, খুঁতু এবং
কর্ণের পার্শ্ব সহ কর্ণ ধুইয়া ফেলিবে।

দিবসের দুই সন্ধি সময় অর্থাৎ প্রাতে ও
সায়াকে মাথা গরম বোধ হইলে অথবা
ডিসপেন্সিয়া (অজীর্ণ) বোধ হইলে গ্রীবাদেশ,
কর্ণদ্বয়ের চতুর্দিক, মুখ মণ্ডল, ধোত করিবে।
নাসারন্ধ্র, কর্ণবিধর, চক্ষুদ্বয়, মেরুদণ্ড অঙ্গুলী
দ্বারা অল্প ভাবে ধোত করিবে। মুসলমান
সমাজে হজাকে “অজু” কহে। হিন্দুগণ ইহার
সংক্ষেপ বিধিকে “মাঙ্কন ও আচমন কহেন।
ইসলাম ধর্মগুরু মহামতি হজরত মহম্মদ
এইরূপ ক্রিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে দিনে রাত্রে
পাঁচবার করিতে বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা
শরীরের শীতলতা হইয়া শারীরিক শক্তির
উন্নতি হয়, স্তব্রাং স্বাস্থ্য রক্ষা কল্পে এই
নিয়ম অতি উৎকৃষ্ট।

শৌচ শুদ্ধি বলিয়া হিন্দু সমাজে যতগুলি
বিধি ব্যবহৃত আছে, সমস্তই শরীর রক্ষা
কার্যের প্রধান সহায়। বস্তুতঃ হিন্দু জ্ঞানেন
“শরীরমাণ্ডং ধনুর্ধর্ম সাধনং”।

জঠরানল।

(ডাঃ শ্রীশরণ কুমার দত্ত এল, এম, এস)

“ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মণ! আমি অগ্নি অগ্নির বিষয় কীর্তন করিয়া বলবান অনিল প্রাণীগণের দেহে যেরূপে বিচরণ করিতেছে, তাহা কীর্তন করিতোছি, শ্রবণ কর। অগ্নি প্রাণীগণের মস্তকে অবস্থান পূর্বক শরীর রক্ষা এক প্রাণবায়ু সেই মস্তকস্থিত অগ্নি সমভি-
বাহারে সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। প্রাণ—ভূতগণের আত্মা, সনাতন পুরুষ, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও রূপাদি বিষয় স্বরূপ। প্রাণ দেহমধ্যে অবস্থানপূর্বক অগ্নিকে সর্বত্র পরিচালিত করিতেছে এবং সমান বায়ু উহাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। অপানবায়ু, বস্তুমূল ও গুহ্যদেশে বহ্নিকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও পুরীষকে বহন করিতেছে। বাহা একমাত্র হইয়া লোকে প্রযত্ন কর্তব্য ও বল এই তিন বিষয়ে অবস্থিত আছে—
অধ্যাত্মবিদ পণ্ডিতেরা তাহাকে উদান বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ব্যানবায়ু মস্তকের শরীর-সন্ধিতে অবস্থিত রহিয়াছে। অগ্নি শরীরমধ্যে বিস্তীর্ণ ও সমানবায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া লোকের রস, ত্বগাদি ও পিত্তাদি দোষ পরিপাক এবং নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও উর্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া উহাদের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে। আশ্রয় দেশ হইতে পায়ু পর্যন্ত একটা শ্রোত আছে, ঐ শ্রোতের অন্তর্ভাগেই গুহ্য। সেই শ্রোতের চতুর্দিক হইতে দেহমধ্যে অসংখ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জঠরানল শরীরস্থ প্রাণাদি

পঞ্চ বায়ব সাহায্যে ঐ সমুদায় শিরার দ্বারা সমুদায় শরীরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐ অনলের নাম উন্ম। উহাই প্রাণীগণের ভূক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু অগ্নিবেগ প্রভাবে গুহ্য দেশ পর্যন্ত গমন করে এবং তথা হইতে প্রতীহত হইয়া পুনরায় মস্তকে আগমন পূর্বক অগ্নিকে উৎক্লিষ্ট করিয়া থাকে। নাভির অধোভাগে পকাশয়, উর্দ্ধভাগে আমাশয় আছে এবং জঠরানলে সমুদায় ইন্দ্রিয় অবস্থান করিতেছে। প্রাণীগণের ভূক্ত অন্নের রস প্রাণাদি পাচ ও নাগকৃষ্ণাদি পাচ—এই দশবিধ বায়ু প্রভাবে নাড়ী সমুদায় দ্বারা শরীর মধ্যে উর্দ্ধ, অধ ও তির্ধ্যগ ভাবে পরিচালিত হয়। আশ্রয় দেশ হইতে পায়ু পর্যন্ত যে শ্রোত বিস্তৃত আছে, উহা যোগীগণের যোগ সাধনের পথ। যে মহাত্মারা ঐ পথ দ্বারা আত্মাকে মস্তকে সমানীত করিতে পারেন, তাঁহাদেরই ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মণ! এইরূপে অগ্নি—প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ুর সহযোগে শরীর মধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। ৯ মহাভারত শান্তি পর্ব, মোক্ষধামপর্ব, মহাত্মা ৮ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

“ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! আত্মা প্রথমতঃ বিপক্ষ হইয়া মনকে বাক্যোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলে মন—জঠরানলকে সংস্কৃত করে। জঠরানল সংস্কৃত হইলেই তাহার প্রভাবে প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইয়া অপানে গমন করে। তৎপরে ঐ বায়ু

উদান বায়ুর প্রভাবে উর্দ্ধে নীত ও মস্তকে প্রতিহত এবং বানপ্রভাবে কঠতাষাদি স্থানে অভিহিত হইয়া বেগ বশতঃ বর্ণোৎপাদন পূর্বক বৈথরীকপে লোকের অবগণপথে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর যখন উহার বেগ এককালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন উহা পুনরায় সমানভাবে পরিণত হয়।” মহাভারত আশ্ব-মেধিকপর্ক, অস্থীতাপর্ক, মহাত্মা কালী-প্রসন্ন সিংহের অমৃতবাদ।

আমি “আয়ুর্বেদোক্ত জীবনীযগণ” ও “বায়ু, পিত্ত ও কফ” নামক প্রবন্ধদ্বয়ে জঠরানল সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় বলিয়াছি, সম্প্রতি আরও কয়েকটি কথা আলোচনা করিবার উদ্দেশে মহাভারত হঠাতে ২।১ অংশ উদ্ধৃত করিলাম। উক্ত ২টি উদ্ধৃত অংশে আমাদের শরীরে অগ্নি ও বায়ু কি প্রকারে অবস্থান করিতেছে এবং বাক্যোচ্চারণের পূর্বে আমাদের শরীরে কি কি ক্রিয়া হয় তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি (Animal Heat) মস্তকে (Heat centre) উপস্থিত হইয়া প্রাণবায়ু দ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। এই জঠরানল (যাহা নাভিমণ্ডলে অবস্থিত আছেন) তাহা Pituitary centre দ্বারা পরিচালিত হন এবং এই Pituitary Adrenal centre দ্বারা adrenal হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়, তাহা দ্বারা নিশ্বাস হইতে রক্তে oxygen শোষণ করে এবং এই centre রই শ্বাসপ্রশ্বাসের কারণ বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। আমাদের শরীরে যে কোন ব্যাধি আক্রমণ করুক না কেন, এই শক্তি সেই বিষণ্ণ

করিতে সক্ষম। চেষ্টা, কঠে, কিন্তু এই শক্তি নিজে বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আয়ুর্বেদ বাতরক্ত (Gout) বলিয়া উল্লেখ করেন। এই জঠরানলের বিকার ঘটিলে অনেক প্রকার চর্মরোগ উপস্থিত হয় এবং এই চর্ম রোগের শেষ পরিণতি বাতরক্ত ব্যারামে। এই জন্তই সমস্ত চর্মরোগকে আয়ুর্বেদে কূঠরোগের পর্যায়ে স্তম্ভ করিয়াছে। আয়ুর্বেদে এই কূঠ অষ্টাদশ প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। Gout ব্যারামে এই সমস্ত প্রকার চর্মরোগ হইয়া থাকে।

এই সকল চর্মরোগ আত্মকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে সূর্য্য কিরণ দ্বারা (x rays) আরোগ্য হইতেছে। আয়ুর্বেদে ইহা বহু-পূর্বেই অবগত ছিলেন। তাহার সূর্য্যো-পাসনা যে কূঠ রোগের প্রতিষেধক—তাহা বহুস্থলে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই চর্ম-বোগ শরীরের দুর্বলতা আনয়ন করে এবং সূর্য্যদেব যে দুর্বলতা নাশের মূলীভূত কারণ ও অনন্ত শক্তির আধার—তাহা মহাভারত কার অনেক স্থলেই উল্লেখ করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে আমি বাতরক্ত রোগের লক্ষণ সনূহ দ্বারা মহাভারতোক্ত বিষয়গুলি সঙ্গ্রহণ করিব। বাতরক্ত ব্যারামে এই জঠরানল স্থানচ্যুত হয় এবং pituitary body র ক্রিয়ার বিপর্য্য ঘটবে। জঠরানল স্থানচ্যুত হইলে ইহার সহিত সমান বায়ুরও স্থানচ্যুতি ঘটে এবং শরীরের সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে জ্বালা অমৃতভূত হয়; কারণ সমান বায়ু অগ্নিকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। এই ব্যাধি উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসিত হইলে প্রশমিত হয়। সমান বায়ু

স্থানচ্যুত হইলে প্রাণ ও অপানের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, কারণ সমান বায়ু প্রাণ ও অপানের সমতা রক্ষা করিতেছে। প্রাণ ও অপানের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে এই ব্যারামে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্লান্ততা অল্পভব হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ হয়। প্রাণবায়ুর বিকৃতি ঘটিলে উদান ও ব্যান বায়ুর ও বিকৃতি ঘটে, এই জন্য এই ব্যারামে বাক্যোচ্চারণ ও অধিক কথা বলিলে কষ্ট অল্পভব ও শরীর শক্তি সমূহে (ব্যানবায়ুর স্থানে) বেদনা অল্পভূত হয়। সূচিকিৎসিত হইলে শরীরের দীর্ঘ ক্রমশঃ সর্বশরীর হইতে নাভিমণ্ডলের উপরিভাগের চর্মে আসে; তৎপরে নাভিমণ্ডলের উপরিভাগের চর্ম হইতে ক্রমশঃ ঐ স্থানের নিম্নের মাংসপেশীর ভিতরে জালা অল্পভব হয় এবং জঠরানল স্থানে প্রবেশ করিলে মলের এবং শ্বাসবায়ুর অত্যধিক উষ্ণতা অল্পভূত হইয়া থাকে। জঠরানল স্থানচ্যুত হয় বলিয়া এই ব্যাধিতে ক্ষুধা একবারেই থাকে না। উদান বায়ুর বিকার ঘটে বলিয়া এই ব্যারামে রোগীর কর্মে অনিচ্ছা হইয়া থাকে। শরীরে শক্তিহীনতা অল্পভব হয়, কারণ উদান বায়ুতে প্রবৃত্ত, কর্ম ও বল এই তিনটি অবস্থান করিতেছে। জঠরানলে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবস্থান করিতেছে বলিয়া এই ব্যারামে সমস্ত ইন্দ্রিয়ার বিকার লক্ষিত হয়। ছয়টি ইন্দ্রিয়বিকার এই :— চর্মে প্রদাহ হয়। চক্ষু হইতে জল পড়ে ও দৃষ্টি-শক্তির হীনতা হয়, কণ ও নাসিকার স্রাবগুলি উত্তেজিত হয়, জিহ্বার অগ্রভাগ অসাড় ও চিনচিন করে। মনের চাঞ্চল্য অল্পভূত হয়। মুখ-বিবরের সমান্তরালে মেরুদণ্ড

হইতে শুষ্কদেশ (মূলধার) পর্যন্ত মেৰুদণ্ডের সম্মুখভাগে sympathetic system রহিয়াছে, ইহাই যোগিগণের যোগ সাধনের পথ। এই বাতরক্ত ব্যাধিতে উক্ত sympathetic-এর বিকার ঘটে, তাহাতে মূলধার, স্বাদিষ্ঠান, মণিপূর প্রভৃতি ষট্চক্রের স্থান গুলিতে এবং ক্রমগুলের মধ্য বর্তী স্থানে (ইহাও একটি ষট্চক্রের স্থান) পাঁচড়ার স্রাব ক্ষুদ্র বিফোটক জন্মে অথবা ঐ স্থান গুলিতে বেদনা অল্পভূত হয় এবং এই sympathetic এর কেন্দ্র pituitary body-র বিকার হয় বলিয়া নিদ্রাবস্থা হইতে জাগরিত হইবার কালীন হস্ত পদাদির অঙ্গুলীর বক্রতা এবং ক্রমগুল, গুহগায় ও হস্ত-পদাদির স্রাব সমূহের চিনচিনানি অল্পভূত হয় কারণ, pituitary body-তে নিদ্রার কেন্দ্র অবস্থিত আছে। এই ব্যাধি উপশমের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত লক্ষণগুলি ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

আধ্বমেধিক পর্কের উদ্ধৃত অংশ হইতে বাক্যোচ্চারণের পূর্বে আমাদের শরীরে কি কি ক্রিয়া হয়—তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রে বাক্য তেজোময় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বাক্য উচ্চারণ করিলে শরীরে শক্তির হীনতা লক্ষিত হয়। এই জন্য মহাভারতকার অনেক স্থলে মোনীত্রতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বাক্যোচ্চারণে শরীরে শক্তির হীনতা হয় বলিয়া “আত্মা বিপক্ষ হইয়া মনকে বাক্যোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করেন”— ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন। মন তৎপরে জঠরানলকে সজ্জিত করে। বাক্যোচ্চা-

রণের পূর্বে জঠরানল সঞ্চালিত হয় বলিয়া আহারের সময় কথা বলা হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা সকলেই জানেন যে, যে সময়ে অগ্নি স্থির ভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন তাহাতে দাহ বস্তু নিক্ষেপ করিলে তাহা শীঘ্র এবং সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া যায়। যদি অগ্নি বিচলিত হয়, তাহাতে দাহ পদার্থ দিলে তাহা শীঘ্র পুড়িয়া যায় না। প্রধানতঃ এই জন্তই বাক্যোচ্চারণ কালীন অগ্নি সঞ্চালিত হয় বলিয়া আহারের সময় বাক্যোচ্চারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর একটা কথা এই যে, যত অধিক জ্বরে বাক্যোচ্চারণ করা যায়, জঠরাগ্নিও তত অধিক মাত্রায় সঞ্চালিত হয়। এই জন্তই উক্তভাষণ আয়ুর্বেদে অনেক ব্যারামের নিদানরূপে উক্ত হইয়াছে এবং অমূল্যরূপে কথা বলা অত্যন্ত হিতকর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

জঠরানল সঞ্চালিত হইলে তদ্বারা প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইয়া অপানে (মূলাধারে—In Front of last coccy geal vetebra ও লিঙ্গমূলের সমন্বয়পাত স্থানে) গমন করে। মূলাধার হইতে প্রতিহত হইয়া ঐ বেগ (vibration) পুনরায় নাভিমণ্ডলে আসে এবং নাভিমণ্ডল হইতে উদান বায়ু দ্বারা (Afferent sensation of vagus) মস্তকে নীত হয় এবং তাহা পুনরায় vagus এর Recurrent Laryngeal অংশ (ব্যান বায়ু) দ্বারা কণ্ঠ ভাষাদি স্থানে প্রতিহত হইয়া বেগবশতঃ বাক্যরূপে উচ্চারিত হয়। বাতরক্ত ব্যারামে জঠরানল স্থানচ্যুত হয় এবং উদান বায়ু প্রভৃতি পঞ্চবায়ুর বিকৃতি ঘটে বলিয়া ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এই

বাতরক্ত ব্যারামে (Gout) উদান বায়ু বিকৃত হইয়া বাক্যোচ্চারণে বাধা প্রদান করে এবং তজ্জন্ত রোগী বাক্যোচ্চারণ কুরিতে গেলে নাভিপ্রদেশ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত উদান বায়ু বাক্যোচ্চারণে বাধা প্রদান করিতেছে বলিয়া অনুভব করিতে পারে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র বাক্যোচ্চারণের পূর্বে Splanchnic area হইতে vagus দিয়া একটা Afferent Sensation মস্তকে যায়—এই টুকু মাত্র অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে বাক্যোচ্চারণের পূর্বে যে বেগ উৎপত্তি হয় তাহা অপানে মূলাধার হইতে প্রতিহত হইয়া আসে বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রের অনেক স্থলে মূলাধার শক্তিই বাক্যোচ্চারণের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

আমি এক্ষণে বাতরক্ত ব্যারামের চিকিৎসার বিষয় সক্ষেপে উল্লেখ করিব। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে গন্ধক, Sulphar জঠরানলের ক্রিয়াকে প্রকৃতিস্থ করে, তজ্জন্ত গন্ধকই এই ব্যাধির সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ, তজ্জন্ত আয়ুর্বেদের চিকিৎসকগণ এই ব্যারামে হরিতাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও Sulphar গন্ধক gout এর একটা সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ এবং রোগিগণ যে সকল স্থানের জলে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক (Sulphar) থাকে তথায় কিছুকাল বাস করেন। গন্ধকও সর্বপ্রকার চর্ম রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পাশ্চাত্য জগতে বহু মনোবিদ জঠরানল (Splanchnic area) আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন ও করিতেছেন কিন্তু

আর্য্যাবিগণ এবিষয়ে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন, পাশ্চাত্য মনীষিগণ তাহার অতি অল্পমাত্রই অল্পধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে বিখ্যাত এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এলোপ্যাথিক ঔষধ সমূহের ক্রিয়ার বিভিন্নতা দিন দিন যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে তাহারা যে

এবিষয়ে কৃতকার্য হইবেন তদ্রূপ আশা করা দূরশা মনে করিনা।

আয়ুর্বেদে যেরূপ বাতরক্ত ব্যারাম স্থবী ও ভোগী ব্যক্তির হইয়া থাকে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও gout is a rich man's disease ঠিক এই কথায় প্রচলন দেখা যায়।

আয়ুর্বেদোক্ত ঘৃত, তৈল পাকবিধি।

(সমালোচনা)

—:o:—

(কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরঞ্জন)

জাতীয় উন্নতি অবনতির সহিত জাতীয় শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি সর্ব বিষয়ের উন্নতি ও অবনতি অবশ্যস্বাবী। তাই মধ্যযুগের অবনতির ফলে আজ আমরা বহু আয়ুর্বেদীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি লাভে বঞ্চিত। বর্তমানে যে সকল আয়ুর্বেদীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং তাহা হইতে চিকিৎসা আধুনিক গ্রন্থাদি দেখা যায়, তাহাতে বহুগ্রন্থের এবং গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ সে সমস্ত গ্রন্থের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ঐ সমস্ত গ্রন্থ বর্তমানে লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক ঐ সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে সমস্ত ঘৃত, তৈল, চূর্ণ, বটীকা, মোদকাদির উল্লেখ ছিল, তন্মধ্যে যে সকল যোগ প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া মহামতি চক্রপাণি দত্ত “চক্রদত্ত” নামে এক উপাদেশ সংগ্রহ গ্রন্থ

প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং সেই গ্রন্থই বর্তমান আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক সমাজকে ঘৃত-তৈলাদি ঔষধার্থ ব্যবহারে অন্ধের যষ্টির জ্বায় সাহায্য করিতেছে। শ্রীমিশ্রভাব বিরচিত “ভাবপ্রকাশ” নামক উৎকৃষ্ট সংগ্রহ গ্রন্থখানিও বর্তমান সময়ে চিকিৎসক সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। চক্রদত্ত ও ভাবপ্রকাশ উভয়ই বর্তমানে দায়িত্বপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে বিরাজমান।

যাহারা চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, বাগ্ভট্টাচার্য্যের অষ্টাঙ্গ হৃদয় প্রভৃতি প্রাচীন মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা ই অবগত আছেন যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থে বহু ঘৃত-তৈল ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হওয়ার উপদেশ থাকা সত্ত্বেও ঘৃত-তৈলের মুচ্ছাবিধির কোথাও উল্লেখ নাই এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থ ও অপরাপর লুপ্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া পূর্বোন্নিখিত

চক্রদত্ত নামক সংগ্রহ গ্রন্থে প্রয়োজনানুসারে বিক্ষিপ্ত পরিভাষার সহিত বহু ঘৃত-তৈলাদির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের মুচ্ছাবিধির কোথাও উল্লেখ নাই। এমন কি, চক্রদত্ত ঐশীত হওয়ার বহু পরে শিবদাস সেন উক্ত গ্রন্থের বিস্তৃত টীকা করিয়া যেখানে যেখানে পরিভাষার প্রয়োজন—সেই সেই স্থানেই উপযুক্ত পরিভাষার সমাবেশ করেন, কিন্তু শিবদাস সেনের টীকাতেও কোথাও ঘৃত তৈলের মুচ্ছার কথা ঘূর্ণাকরেও উল্লিখিত হয় নাই। ভাবপ্রকাশ একখানা আধুনিক গ্রন্থ। পাশ্চাত্য জাতি সমূহ এদেশে আসিতে আরম্ভ করিলে পর তাহাদের সংসর্গে ফিরঙ্গ (বর্তমান মিকিলিজ) নামক সংক্রামক ব্যাধি প্রথমে আমাদের দেশে সংক্রমিত হয়। ফিরঙ্গ রোগ এদেশে সংক্রমণের কথা ও তাহার চিকিৎসা একমাত্র “ভাবপ্রকাশ” ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। সুতরাং ভাবপ্রকাশ যে কোন্ সময়ের রচিত ইতি হাস্য ব্যক্তি মাদ্রেই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন। এই গ্রন্থেও বর্তমানে ব্যবহৃত বহু ঘৃত তৈলাদির উল্লেখ আছে এবং পরিভাষা অধ্যায়ে তাহাদের পাকবিধির সরলভাবে উল্লেখ আছে, অথচ মুচ্ছা পাক সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। ঐতিহ্যারা ইহাই সপ্রমাণিত হইতেছে যে, ঘৃত ও তৈলের মুচ্ছা বিধি চরক-বৃক্ষভাদি ও বাগভট্টাচার্যের সময়ে তো ছিলই না, এমন কি ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত ঐশীত হওয়ার সময়ে এবং চক্রদত্তের টীকা করার সময়েও উহা প্রচলিত ছিল না। উপরোক্ত যুক্তিতে যদি কেহ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, এমন অনেক

বিধি থাকিতে পারে—যাহা অতি প্রাচীন লুপ্ত গ্রন্থে ছিল এবং উহা আধুনিক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ভাব প্রকাশ, চক্রদত্ত প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ নাই বলিয়া যে পূর্বে মুচ্ছা বিধি ছিল না তাহার প্রমাণ কি? প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই “ভাব প্রকাশে” পরিভাষার জন্য পৃথক ভাবে একটা অধ্যায় করিয়া ঘৃত-তৈলাদির পাক বিধি সরলভাবে লিখিত হইয়াছে, এমতাবস্থায় মুচ্ছাবিধি রূপ একটা স্থূল বিষয় প্রচলিত থাকিলে তাহার পরিহার কি সম্ভব? আবার পূর্বেই বলিয়াছি, চক্রদত্ত বর্তমানে ঘৃত তৈল ঔষধার্থ ব্যবহারের উপদেশ পূর্ণ একমাত্র উৎকৃষ্ট সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহাতে চক্রপাণি দত্ত প্রয়োজন বোধে বহু পরিভাষার সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু ঘৃত ও তৈলের মুচ্ছাবিধি তাহার ৭ময় প্রচলিত থাকিলে তাহা তিনি স্থান দিতেন না কি? গ্রন্থে এত পরিভাষার স্থান দিয়া এমন একটা গুরুতর বিষয় তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন—একথা কি বিশ্বাস যোগ্য এবং শিবদাস সেন মহাশয় চক্রদত্তের টীকা করিতে যাইয়া পুস্তকের প্রায় প্রতি পাতায় পাতায় বহু পারিভাষিক বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, এমন কি, প্রয়োজন বোধে এক পরিভাষার পুনঃ পুনঃ উল্লেখেরও ক্রটি করেন নাই। এমতাবস্থায় ঘৃত ও তৈল মুচ্ছাবিধি রূপ একটা প্রকাণ্ড বিষয়ে উল্লেখে তিনি অবহেলা করিয়াছেন একথা কে বিশ্বাস করিবে? আরও এক কথা, যাহারা চরক-বৃক্ষভাদি প্রাচীন গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাহারা যদি পরিভাষা প্রদীপোক্ত মুচ্ছাবিধির ভাষার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য

করেন, তবে উক্ত প্রাচীন গ্রন্থাদির ভাষার সহিত উহার ভাষাগত বহু পার্থক্য লক্ষ্য করিবেন এবং ভাষাতেই যেন উহার আধুনিকত্ব ফুটিয়া রহিয়াছে বলিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি করিবেন। সমালোচনার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কার মূল শ্লোক তোলা হইল না। মুর্ছাবিধির আধুনিকত্ব সন্নিবেশিত এতগুলি অকাটা যুক্তি থাকার সত্ত্বেও যদি আমরা কল্পনা করিয়া লই যে, প্রাচীন কোন লুপ্ত গ্রন্থে ইহা ছিল, তবে বিচারে কি দাঁড়ায় দেখা যাক। মুর্ছাবিধি কোন প্রাচীন গ্রন্থে উক্ত থাকিলে ভাব-প্রকাশ, চক্রদন্ত অথবা চক্রদত্তের চাকায় উল্লেখ না থাকার কি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে? ত্রিমিশ্রভাব, চক্রপাণি দন্ত এবং শিব দাস সেন মুর্ছাবিধিকে অযৌক্তিক ভিত্তিহীন এবং সমর্থনের অযোগ্য মনে করায় উহাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপন আপন গ্রন্থে স্থান দেন নাই,—ইহাই কি একমাত্র অহুসরণের কারণ বলিয়া এক্ষেত্রে নির্দেশ করা যায় না? বাহ্য মিশ্রভাব, চক্রপাণি প্রভৃতি ঋষিকল্প চিকিৎসকগণ সমর্থন করেন নাই, তাহার সমর্থন ও প্রচারের আমাদের কি ক্ষমতা থাকিতে পারে? বাহ্য ইউক মুর্ছাবিধির প্রাচীনত্বের কল্পনা নিতান্ত কষ্টকল্পনা মাত্র।

এই সমস্ত কারণ হইতে স্বত তৈলের মুর্ছাবিধি যে আধুনিক ও মধ্যযুগে কোন বৈজ্ঞানিক আয়ুর্বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে বিচার্য, আমাদের বর্তমানে ব্যবহৃত আয়ুর্বেদোক্ত স্বত তৈলাদি চক্রদত্তে উক্ত আছে। কাজেই প্রাচীন এবং মুর্ছাবিধি আধুনিক, এমন অবস্থায় মুর্ছাবিধির

অহুসরণ যুক্তিযুক্ত কি না? অনেকেই হয়তো বলিতে পারেন—মুর্ছাবিধি আধুনিক হইলেও বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক ব্যবহারসম্মত বলিয়া চিকিৎসক সমাজে আদৃত হইতেছে এবং পরিভাষা প্রদীপেও সাদরে স্থান পাইয়াছে। সে ক্ষেত্রে বক্তব্য, বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক ব্যবহারসম্মত বলিয়াই যে বিনা বিচারে যে কোন বিষয় অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে—তাহার অর্থ কি? “মুনিমাত্ত মতিভ্রম”, কেহই বলিতে পারেন না যে আমি অজ্ঞান, যদি মুর্ছাবিধি সর্বত্র নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত না হয়, তবে কেবল বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের দোহাই দিয়া “দাদা বলেছেন ভানুতে ধান, ভানুতে আছি ওদা ধান”—এই মতের সমর্থন করা কতদূর সম্ভব তাহা বিবেচ্য। প্রথমে দেখা যাক কি কারণ প্রদর্শন করিয়া স্বত ও তৈলের মুর্ছার প্রয়োজনীয়তা উক্ত হইয়াছে। স্বত সন্নিবেশিত উক্ত হইয়াছে, “তন্মাদান্যোপ দোষঃ হরতি চ সকলং বীৰ্য্যবৎ দৌৰ্ভাগ্যম্”। অর্থাৎ ইহাতে স্বতের আমদোষ নষ্ট হয় এবং উহা বীৰ্য্যশালী ও স্বথদায়ক হয়। সর্বপ তৈল সন্নিবেশিত উক্ত হইয়াছে, “কটু তৈলং পচেৎ তেন আমদোষ হরঃ পরম্”। এখানে কেবল আমদোষ নাশের জন্য মুর্ছার উল্লেখ দেখা যায়। এড়ও তৈল সন্নিবেশিত কিছু উক্ত না থাকিলেও উহার সন্নিবেশিত আমদোষ নাশ ও উত্তম গন্ধ বর্ণের জন্য মুর্ছা পাক বৃত্তিতে হইবে। আর তিল তৈল সন্নিবেশিত হইয়াছে, “দুর্গন্ধঃ বিনিহন্তিতৈলমক্ষণঃ . সৌরভ্যমাকুর্তে” অর্থাৎ মুর্ছা জিয়া দ্বারা দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া তৈল স্বগন্ধ ও অকণবর্ণ হয়।

প্রথমে দেখা যাক, আমদোষটা কি।

ঘৃত সম্বন্ধে আমদোষ কল্পনা একটা কথার কথা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু গব্যদুগ্ধত অনেকে কাঁচাই গরম ভাতের সঙ্গে খান, অথবা ডাল, তরকারী, মাংস, পোলাও প্রভৃতিতে প্রক্ষেপ রূপে দিয়া খাইয়া থাকেন। মিঠাই ওয়ালাদের বহু মিঠাই ঘৃতে পক হয় এবং তাহা অতি উপাদেয় জলখাবার বলিয়া সাধারণ্যে বাহ্যিক রূপে ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল ঘৃত কিন্তু মূর্ছাপক নহে। উহার এবিধ ব্যবহারে আমদোষ প্রযুক্ত কোনরূপ অনিষ্ট পাতের আশঙ্কা করেন কি? পারদের অষ্টমহাদোষ ও সপ্তকঙ্কাদি অথবা তাগের জাতি বাণাদি দোষের দ্বারা ঘৃতে কোনরূপ অনিষ্টকারী বা মারাত্মক দোষ আছে কি, যে দোষ দূর করিতে হরিদ্রা লেবুর রস, ত্রিফলা প্রভৃতির সহিত ঘৃত সংস্কৃত হওয়ায় দরকার? আম শব্দের অর্থ অপক, ঘৃত অগ্নিজালে নিফেন হইলে অথবা কাথ ও কঙ্কাদির সহিত পক হইলে ঘৃতের অপকত্ব কোথায় যাইবে? অগ্নিজালে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে উক্ত জলীয় অংশ বাষ্পাকারে চলিয়া যায় এবং তৈলের আমদ্য দূর হয়। এড়ও তৈল অত্যন্ত বিরোচক ও ঋণরূপে ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া উহা বন্ধনাদি কার্যে ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু শর্ষণ তৈল বা তিল তৈল রন্ধনাদি কার্যে প্রত্যহ প্রতি গৃহে বিনা অনিষ্টপাতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রন্ধনাদি কার্যে নিপুণ ব্যক্তিমাজেই অবগত আছেন যে কটাহে তৈল দিয়া উহা নিফেন না হইতে যদি উহাতে বেগুন প্রভৃতি ডাল ইয় অথবা ডাল প্রভৃতি, সন্টার দেওয়া হয়, তবে উক্ত ঋণদ্রব্যে কাঁচা তৈলের গন্ধ

অহৃত হয়, কিন্তু তৈল নিক্ষেপ হইলে ঋণ দ্রব্যে উক্ত দোষ দাঁদায় না। তৈলে উক্ত জলীয় ভাগের বিত্তমানতাকেই একমাত্র আমদোষ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; ইহা ভিন্ন অন্য কোনরূপ দোষ তৈলে নাই। যদি আমদোষ বলিয়া অনিষ্টকারী বা মারাত্মক কোন দোষ তৈলে থাকিত তবে উক্ত তৈলাদি ঋণদ্রব্যে যথেষ্টভাবে আবহমান কাল হইতে ব্যবহৃত হইত কি? আরও এক কথা, পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, মূর্ছাবিধি আধুনিক, কাজেই মূর্ছাবিধি প্রবর্তনের পূর্বে চক্রপানিদত্ত, শ্রীভাব মিশ্র, বাগভট্টাচার্য প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত করিতেন আমদোগ প্রযুক্ত তাহাদের ঔষধ কোনরূপ অনিষ্টকারী হইত কি? আমদোষ শব্দের উল্লেখ করিয়া কিন্তু ঘৃত তৈলাদির দোষা-রোপ করা হইয়াছে, কিন্তু তৎপ্রযুক্ত যে কি অনিষ্টপাত হইতে পারে তাহার কিছু উল্লেখ নাই কেন? স্থল কথা মধ্যযুগে উপযুক্ত চর্চা ও প্রচারের অভাবে আয়ুর্বেদ এত অল্প সংখ্যক চিকিৎসকের গভীর ভিতর সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে তখন যে কোন বিষয় বিনা আপত্তিতে আয়ুর্বেদে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া বিশেষ স্বযোগ ঘটিয়াছিল। তাই আমার বিশ্বাস কোন পাণ্ডিত্যম্যানী চিকিৎসক মধ্যযুগে বাহাদুলী লুটিবার জন্ত ঘৃত ও তৈলে আমদোষের আরোপ করিয়া বহু মাথা ঘামাইয়া মূর্ছাবিধির সৃষ্টি করিয়া আয়ুর্বেদকে উপকার দিয়াছেন। এই গেল আমদোষ সম্বন্ধে কথা।

অতঃপর তিল তৈল মূর্ছাবিধিতে যে উক্ত হইয়াছে, “মূর্ছাদ্বারা দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া

তৈল স্ফুট ও অরুণবর্ণ হয়”। যে সম্বন্ধে সমালোচনার প্রয়োজন। তিল তৈলে কাঁচা তিলের গন্ধ বিद्यমান। ইহা ভিন্ন এমন কোন অগ্নীতিকর বা পুষ্টিগন্ধ ইহাতে নাই যাহাতে উহার গন্ধে রোগীর বমন অরুচি অথবা অন্ত কোন উপদ্রব উপাদান করিতে পারে। অবশ্যই বর্তমানে বাজারের স্ফুট তৈলাদি নানাপ্রকার ভেজালে পরিপূর্ণ কাজেই নানাপ্রকার অগ্নীতিকর গন্ধযুক্ত ও ঔষধার্থ অযোগ্য হুতরাং উহা আমাদের সমালোচনার স্থান পায় না। যাহা হউক তৈলে কাঁচা তৈলের গন্ধ অগ্নিজালে নিষ্ফেণ হইলেই অনেকাংশে দূর হয়। শাস্ত্রোক্ত বিশেষ তৈলের কঙ্কদ্রব্যে অল্পাধিক ক্রমে গন্ধদ্রব্যের এবং অরুণ বর্ণোৎপাদক যজিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিত্রা, কুঙ্কম প্রভৃতির বিद्यমানতা দেখা যায় উহা দ্বারা তৈলের সুন্দর গন্ধ ও বর্ণ সম্পাদিত হয়। (গন্ধপাকবিধি সম্বন্ধে আলোচনায় এ বিষয়ে পরে আরও উল্লেখ)। স্থল কথা আমাদের আয়ুর্বেদোক্ত তৈলাদি বিলাসের বস্তু নহে গন্ধবর্ণের প্রতি বিশেষ ঝোক না দিয়া যাহাতে তৈলাদি শাস্ত্রোক্ত ফলপ্রদ হয় তাহারই চেষ্টা চিকিৎসক মাত্রেরই কর্তব্য।

অতঃপর আমাদের বিচায্য, মুচ্ছা ক্রিয়া দ্বারা স্ফুট তৈলাদির গুণহানি বা গুণ বিপর্যায় হইতেছে কিনা। গুণ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সমালোচনা হইতে “মুচ্ছাক্রিয়া দ্বারা স্ফুট বীৰ্য্যশালী ও স্নেহদায়ক হয়” এই উক্তি কতদূর অর্থোক্তিক ও ভিত্তিহীন তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। স্ফুট এবং তৈলের দ্রব্যবিশেষের সহিত সংস্কৃত হইয়া প্রায় সর্ববিধ ব্যাধি নাশের শক্তি অর্জনের ক্ষমতা আছে বলিয়াই

উহারা ঔষধার্থ বহুলভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। স্ফুট ও তৈল যে জিনিষের সহিত সংস্কৃত হইবে তাহারই গুণ গ্রহণ করিবে ইহাই তাহাদের স্বভাব। আমাদের আয়ুর্বেদোক্ত স্ফুট তৈলাদির জ্বাবের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে উহাদের কাথাদ্রব্যের এবং কঙ্ক দ্রব্যের উপাদান নির্কীচনে এবং তাহাদের মাত্রা নির্ধারণে বহু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, কঙ্ক ও কাথাদ্রব্যে উপাদান নির্কীচন বিষয়ে লক্ষ্য করিলে এমন অনেক দ্রব্যের ব্যবহার দেখা যায় যাহা ব্যাধি বিপরিত বলিয়া সাধারণের চক্ষে প্রতিভাত হয় অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্য কেন দেওয়া হইল তাহা নিরূপণই করা যায় না। আমাদের আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধাবলী আযাঞ্চমিদিগের যোগ দৃষ্টীপ্রসূত। দশদিক ঠিক রাখিয়া উপাদান এবং তাহাদের মাত্রা নির্ধারণের ক্ষমতা একমাত্র তাহাদেরই ছিল। তাহারা কোথাও এক দ্রব্যের অনিষ্টকারিতা অন্ত দ্রব্য প্রয়োগে নষ্ট করিয়া, কোথাও প্রকৃতিসম সমদ্বারা দ্বারা, আবার কোথাও বিকৃতি বিষম সমবার দ্বারা অভিষ্ট গুণ লাভ করিতেন। এমতাবস্থায় আয়ুর্বেদোক্ত স্ফুট তৈলাদির উপাদান সমূহের ও তাহাদের মাত্রার পরিবর্তন করা চলে না। উহাদের পরিবর্তন ঘটাইলে কেত্র বিশেষে উপাদান বিপর্যায়জনিত দোষ এবং কেত্র বিশেষে মাত্রা বিপর্যায়জনিত দোষ অবশ্যজ্ঞাবী, হুতরাং ঔষধের গুণের পরিবর্তনও অপরিহার্য।

পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, আমাদের আয়ুর্বেদোক্ত স্ফুট, তৈলাদি প্রাচীন এবং মুচ্ছাবিধি আধুনিক; আধুনিক মুচ্ছা যে ঘটতেছে না, একথা স্বীকার করার উপায়

নাই। অতিশয় ব্যক্তিমায়েই অবগত আছেন, সমান গুণ সমান গুণের বৃদ্ধি করে এবং বিপরীত গুণ বিপরীত গুণের হ্রাস করিয়া থাকে। কাজেই মুছাঁ ক্রিয়ায় মুছাঁ অব্য হইতে যে গুণ নেহে দাঁড়ায়, সেই গুণ নেহের কাথ ও কক পাকজনিত গুণের সহিত পরস্পর উপহত হইয়া কাথ ও কক পাক জনিত গুণের বিপর্যয় ঘটাইয়া থাকে। মনে করুন প্রাণী-যকৃদাধিকারোক্ত “পিপ্পলীদ্রুত” পাক করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে মুছাঁ ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া ৪ সের দ্রুত ১ সের পিপ্পলী ১৬ সের ছুস্তের সহিত যথা নিয়মে পাক করিলে উক্ত দ্রুতে পিপ্পলীর উষ্ণবধ্য কটুরসের প্রাধান্য এবং প্রাণী, যকৃৎ ক্ষয় কাস প্রভৃতি রোগ নাশের শক্তি দাঁড়াইল, কিন্তু যদি ঐ পিপ্পলী দ্রুত পাক করিতে পূর্বে হরিদ্রা, লেবুর রস, ত্রিকলা, মৃতা প্রভৃতির সহিত মুছাঁ পাক করিয়া পরে উপরোক্ত দ্রুত পাক করা হয়, তবে মুছাঁ অব্যের তিক্ত-মধুর-কষায়-অন্ন রসাদি ধারা দ্রুতের কটু রসের প্রাধান্য অনেকটা নষ্ট হইবে, এইরূপ প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, মুছাঁপক দ্রুত দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ ও মুছাঁ ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে, তাহা এক জিনিস নয় এবং তাহাদের গুণও এক হইতে পারে না। ফলতঃ মুছাঁ ক্রিয়া দ্বারা দ্রুতের রস, বীৰ্য, বিপাকাদির পরিবর্তনই গুণ-বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ। দ্রুত সম্বন্ধে যেসকল যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তৈল সম্বন্ধেও সেই কথা। অনেকে হয় তো কোন কোন দ্রুত বা তৈলের মূলোক্ত আয়ে মুছাঁ দ্রব্যাদির বিত্তমানতা দেখাইয়া মুছাঁ পাকের

অপকারিতার অস্বীকার এবং পক্ষান্তরে নেহের গুণোৎকর্ষ দেখাইতে প্রয়াসী হইতে পারেন; কিন্তু সে ক্ষেত্রে মূল ঔষধের উপাদান ও মাত্রাবিপর্ক্যজনিত দোষ ঘটে। মনে করুন, কোন তৈলের কক অব্য ২ তোলা মজ্জিষ্ঠা দেওয়ার বিধান আছে, কিন্তু মুছাঁ পাকে সেই তৈল ১৬ তোলা মজ্জিষ্ঠার সহিত পক হইয়াছে; তবেই মোটের উপর সেই তৈল ২ তোলা মজ্জিষ্ঠার সহিত সংস্কৃত হওয়ার পরিবর্তে ১৮ তোলা মজ্জিষ্ঠার সহিত সংস্কৃত হওয়ার মজ্জিষ্ঠার আধিক্যে তৈলের শাস্ত্রোক্ত গুণের পরিবর্তন ঘটয়া গেল। আবার মনে করুন, কোন তৈলে মজ্জিষ্ঠা উপাদান রূপে বর্তমান নাই, এক্ষেত্রে মুছাঁ ক্রিয়াতে ১৬ তোলা মজ্জিষ্ঠার গুণ বজ্রাইয়া তৈলের শাস্ত্রোক্তগুণের পরিবর্তন ঘটাইয়া দেয়। স্থল কথা মুছাঁবিধি মানিয়া চলিলে দ্রুত-তৈলাদির জায়ে মুছাঁ দ্রব্যাদির উল্লেখ থাকিলে মাত্রা-বিপর্যয়জনিত দোষ আর জায়ে উক্ত দ্রব্যাদির উল্লেখ না থাকিলে উপাদান-বিপর্যয়জনিত দোষ অপরিহার্য। সুতরাং যদি ক্ষেত্রবিশেষে মুছাঁ দ্রুত ও তৈল দ্বারা প্রস্তুত কোন কোন ঔষধের গুণোৎকর্ষও হয়, তবুও উহাকে আমরা প্রকৃত শাস্ত্রোক্ত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ উহারা ঠিক শাস্ত্রোক্ত ফল প্রদান করিবে কিনা সন্দেহ।

অতঃপর মুছাঁপাকে এই বলিয়া আপত্তি চলিতে পারে যে, মুছাঁ ক্রিয়াতে নেহের চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিতে হয়, কাজেই মোটের উপর প্রত্যেক দ্রুত ও তৈলেই একটা কক পাকের তুল্য অগ্নিমান বেশী

পক্ষে, হুতরাং উহাতেও গুণের কিছু পরিবর্তন আশঙ্কা করা যায় ।

মূর্ছাবিধি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত আপত্তির উল্লেখ করিয়া প্রয়োজন বোধে তৈলের গন্ধপাক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য । মূর্ছাবিধির জায় গন্ধপাক বিধিও আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত, কারণ উহাও কোন মূল প্রাচীন গ্রন্থে অথবা দায়িত্ব পূর্ণ প্রামাণ্য আধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই । চক্রদত্তে মহারাজ প্রসারণী, মহামুগন্ধি লক্ষ্মীবীলাস প্রভৃতি তৈলে যে গন্ধপাক বিধি দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল তত্ত্ব তৈল সম্বন্ধেই বর্ণিত হইবে । সমস্ত তৈলের অন্ত সাধারণ গন্ধপাক বিধির কুত্রাপি উল্লেখ নাই ।

পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের আয়ুর্কোদোক্ত তৈল সমূহ বিলাসের সামগ্রী নহে, কাজেই উহার গন্ধবর্ণ উৎপাদনের জন্য ব্যগ্র হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই ।* বর্ণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই হইতে পারে না । প্রকৃত শাস্ত্রোক্ত তৈল প্রস্তুত করিতে যাইয়া যে বর্ণ হউক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । তবে গন্ধ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অপ্রীতিকর গন্ধ হইলে রোগীর বমন, অরুচি অথবা অন্ত কোনরূপ উদ্বেগ জন্মাইতে পারে । যাহারা এরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে আমি চক্রদত্তোক্ত তৈল সমূহের কঙ্ক দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি । তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে প্রত্যেক অধিকারোক্ত প্রায় প্রত্যেক তৈলেই কঙ্ক দ্রব্যে অল্পাধিক ক্রমে গন্ধ দ্রব্য বিদ্যমান । বাতব্যাধি অধিকারোক্ত তৈল গুলিতে গন্ধদ্রব্য বাহ্যিক রূপে

দৃষ্ট হয় । আর যাহারা তৈলকে অরুণবর্ণ করিতে ব্যগ্র, তাহারাও দেখিবেন যে, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, লাক্ষা, কুসুম প্রভৃতি অরুণবর্ণোৎপাদক উপাদানও অল্পাধিক ক্রমে প্রায় অধিকাংশ তৈলেই বিদ্যমান । ইহা হইতে নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের আয়ুর্ষািগণ তৈলাদিতে গন্ধবর্ণ উৎপাদন বিষয়েও উদাসীন ছিলেন না । দর্শনিক বিচার করিয়া, তৈলের প্রকৃত গুণ যোল আনা বজায় রাখিয়া যে যে তৈলে গন্ধবর্ণ উৎপাদনের প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, সেই সেই তৈলেই তাহার স্ববন্দোবস্ত করিতে ক্রটি করেন নাই ! এমতাবস্থায় পরিভাষা প্রদীপোক্ত প্রক্ষিপ্ত গন্ধপাক বিধির অঙ্গসরণ করিয়া পুনরায় গন্ধপাক দ্বারা মাত্রা বিপর্য্যয় জনিত অথবা উপাদানবিপর্য্যয় জনিত দোষ ঘটাইয়া তৈলের শাস্ত্রোক্ত গুণের হানি করা অথবা গুণের পরিবর্তন ঘটান যুক্তি সম্বত কি ?

যত ও তৈল পশ্চিম দেশে কিরূপে পাক করা হয়, সে দেশেও মূর্ছা ও গন্ধপাক বিধি প্রচলিত আছে কিনা, গোবিন্দ সেনের পরিভাষা প্রদীপের মত কোন পরিভাষা গ্রন্থ বাঙ্গালার বাহিরে আছে কিনা—সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের কোনই সুযোগ অদৃষ্টে ঘটে নাই ।

অতঃপর যত ও তৈল পাকের পাত্র সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ সমালোচনার প্রয়োজন । পরিভাষায় উক্ত আছে, “পাত্রেহম্বস্তেহু বৃন্যয়ন্”—অর্থাৎ বেধানে পাত্র বিশেষের

* একথা টিক কি ? বর্ণ গন্ধ ও রসোৎপত্তি যে মেহপাক সিদ্ধির প্রধান লক্ষণ । মেহপাক টিক হইয়াছে কিনা জানিতে হইলে গন্ধ ও বর্ণের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে । যথা—

যুনা কোমলগম তৈলে কোমলাস্তিত সর্পিধি ।

বর্ণগন্ধরসোৎপত্তিঃ সৈব সিদ্ধো তবোৎ তদা ।” আঃ সং

এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ বা ইহার সমর্থন লুপ্ত প্রবন্ধ পাইলে আবার সাবধে প্রকাশ করিব । আঃ সং

উল্লেখ না থাকিবে—সেখানে যুগপাত্র বৃদ্ধিতে
হইবে। কিন্তু অল্পসন্ধান করিলে দেখা
যায় যে, প্রায় যোল আনা কবিরাজই বর্তমান
সময়ে লৌহ-কটাহ অথবা রাস দ্বারা কলাই
করা তাত্র পাত্র তৈল-মুতাদির পাকে ব্যবহার
করিয়া থাকেন, অথচ শাস্ত্রবিধি মানিলে
কতিপয় উল্লিখিত স্থান ব্যতীত সমুদয় ঘৃত
ও তৈলই যুগপাত্রে পাক করা উচিত।
প্রথমে লৌহ পাত্র সম্বন্ধে বিচার করা
দরকার। বর্তমান পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্রে
অভিজ্ঞ কবিরাজমাত্রেই অবগত আছেন যে,
পাশ্চাত্য রসায়নে যাহাকে এসিড (Acid)
বলে, তাহা আমাদের আয়ুর্কেন্দ্রোক্ত অম্লরস।
প্রায় সমস্ত ধাতুই অম্লরস (Acid) সংযোগে
লবণ প্রাপ্ত হয়, এমতাবস্থায় যে তৈল বা
ঘৃত আমরা লৌহ পাত্রে পাক করিতে
বাইতেছি, তাহাতে ত্রিফলা, কাজি, দধি,
লেবুর রস অথবা অন্ত কোন অম্লরসায়িত
ত্রব্য উপাদান রূপে আছে কিনা—তাহা
বিচার্য। যদি না থাকে, তবে লৌহ পাত্রে
উক্ত স্নেহ পাকে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি
অম্লরস বিস্তারিত থাকে, তবে উহা লৌহ-
কটাহের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা লৌহের
দ্রাবণ করিয়া ঔষধের গুণহানি করিবে।
যদি কেহ বলেন যে, এত জিনিসের ভিতর
হাঃ তোলা ত্রিফলার অম্লরসে ঔষধের কি
হানি করিতে পারে? কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি
মাত্রেই জ্ঞানেন যে, জলমিশ্রিত এসিড
(diluted acid) হীনশক্তি হইলেও উত্তপ্ত
করিলে উহার শক্তি বাড়ে এবং তখন ধাতু
সমূহের দ্রাবণ করিতে পাড়; আর স্নেহ
পাকে কাথ বা জল বতই করিতে থাকিবে,

অম্লরস ততই শক্তিশালী হইবে, কাজেই
তখন উহা যথার্থশক্তি লৌহ পাত্রের দ্রাবণ
করিবে।

লৌহ পাত্র সম্বন্ধে যেরূপ আপত্তি
প্রদর্শিত হইল—তাত্র পাত্র সম্বন্ধে সে আপত্তি
তো আছেই, ইহা ভিন্ন আরও গুরুতর আপত্তি
প্রদর্শন করা বাইতে পারে। “ন বিষঃ
বিষমিত্যাহ স্তাত্রঞ্চ বিষমুচ্যতে”। বিষকেই
কেবল বিষ বলে না, তাত্রও একটা ভয়ঙ্কর
বিষ। অগুণ্ড তাত্রে ভ্রম, মূচ্ছা, বিদাহ,
বমনবেগ, শোথ, বমন অরুচি ও চিত্তসম্পাদ
এই আটটা বিবোপন্ন দোষ দৃষ্ট হয়।
এমতাবস্থায় কেবল রাং দ্বারা কলাই করা
তাত্র পাত্রে ঘৃত তৈলাদি পাক করা কতদূর
নিরাপদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা
বিবেচ্য। তাত্র আয়ুর্কেন্দ্রে অম্ল-মধুর-কষায়-
তিক্ত রস বলিয়া উক্ত আছে। কাজেই
অম্লরস—স্নেহ পাকের তাত্রপাত্রেই বিস্তারিত
রহিয়াছে। তাত্র পাত্রে পক অম্ল আহা
করিলে বমন উপস্থিত হয়। ইহা দ্বারাই
অল্পমান করা বাইতে পারে যে, তাত্র পাত্রে
ঔষধাদি পক হইলে কতদূর অনিষ্টকারী
হইতে পারে। রাং দ্বারা কলাই করা তাত্র
পাত্রে পক স্নেহে যে কোন রূপ দোষ দাঁড়ায়
না—একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না;
কারণ অম্লরস রাসেরও দ্রাবক। কলাই
বতদিন পর্য্যন্ত ঠিক থাকে, ততদিন তাত্র
পাত্রে পাকজনিত দোষ স্নেহে সাধারণ ভাবে
উপলব্ধি হয় না, কিন্তু কলাই কতক উঠিয়া
গেলে সে পাত্রে পক স্নেহ বহুবিধ অনিষ্টকারী
হইতে পারে।

অনেকে যুগপাত্র ভাঙ্গিয়া গেলে ক্ষতিগ্রস্ত

হইতে হইবে এই, ডয়েও যুৎপাত ব্যবহার করেন না, কিন্তু সাবধানতার সহিত কার্য করিলে, ডয়ের কি কারণ থাকিতে পারে? আর ভয় কোম কাজেই বা না আছে? সকল কাজেই অকৃতকার্যতার ভয় থাকিবেই; তাই বলিয়া কার্যে পরাভূত হইলে চলে না।

আমাদের দেশে মাটির হাড়িতেই প্রায় প্রত্যেক পরিবার ভাত পাক করেন এবং এই সকল হাড়ির এক একটিতে একমাস, দুইমাস অথবা ততোধিক কাল পর্যন্ত রন্ধনাদি কার্য চলে। বাহা হউক সকল কাজেই সাহসের উপর নির্ভর না করিলে সুস্থিৎ হয় না, ইংরাজিতে প্রবাদ আছে “cowards die man's times before their death!”

উপসংহারে বলিয়া, এই বর্তমান সময়ে আয়ুর্বেদের চিকিৎসকগণ রোগ শাস্তির জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত মুখ্যভাবে দ্রুত তৈলাদির প্রয়োগই ব্যবস্থা দেন না, দ্রুত ও তৈলাদি প্রয়োগের চিকিৎসা যেন ক্রমেই উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। আমার মনে হয়, তাহার একমাত্র কারণ দ্রুত, তৈলাদির ব্যবস্থা করিয়া বর্তমান সময়ে সর্বত্র আশাহু-রূপ আত্ম সুফল লাভ হয় না। পূর্বোক্ত কারণাদি হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, দ্রুত-তৈলাদি শাস্ত্রোক্ত ফলপ্রদ না হওয়ার প্রধান কারণ মুচ্ছাপাক এবং (তিল তৈলে) গন্ধপাক বিধির অহুসরণ এবং যুৎপাতের পরিবর্তে লৌহ কটাহ বা তাম্র পাত্রে উহাদের পাক সমাধান। উপরোক্ত সমা-লোচনা দৃষ্টে আমার কোন বন্ধু বলিয়াছেন যে, মুচ্ছা ও গন্ধপাক বিধি পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিলে ঔষধে কতদূর ফল লাভ

হইবে -তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ এবং বহু-প্রয়োগ দ্বারা তাহা নির্ণয়। তদন্তরে আমার বক্তব্য, মুচ্ছা ও গন্ধপাক বিধি পরিত্যাগ করিতে যাইয়া আমরা আয়ুর্বেদে একটা নূতন কিছু করিতে যাইতেছি বলিয়ামনে করা যম। যাহা বাগভট্টাচার্য, ত্রিমিশ্রভাব এবং চক্র-পাণি দত্ত প্রভৃতি ঋষিকল্প চিকিৎসকগণের সময় প্রচলিত ছিল না, মধ্যযুগে প্রকিষ্ট হইয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল, সে বিধি উঠাইয়া দিতে দ্রুত তৈলাদির গুণ সযত্নে কোন প্রদ্বই উঠিতে পারে না। উক্ত বিধিষয় পরিত্যাগ করিয়া বাগভট্টাচার্য, মিশ্রভাব, চক্র-পাণি দত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ দ্রুত তৈলা দিতে সুফল লাভ করিলে আমরা কেন তাহাতে বঞ্চিত হইব? দ্রুত-তৈলাদির গুণ সযত্নে শাস্ত্রে যেরূপ উক্তি দেখা যায়, মুচ্ছা বিধির অহুসরণ করিয়া ঐ দ্রুত তৈলাদি পাক করিয়া প্রয়োগে তদনুযায়ী ফল লাভ অধিকাংশ কবিরাজের অদৃষ্টেই ঘটিয়া উঠি-তেছে না কেন? অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, রোগা বহুকাল দ্রুত-তৈলাদি ব্যবহারেও আশাহুযায়ী বিশেষ কোন ফল লাভ না করায় চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিলে, কবি-রাজ মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলেন, “হাঁ, কবিরাজী দ্রুত-তৈলাদিতে একটু বিলম্বেই ফল লাভ হয়।” কি লজ্জার কথা! কি পরিত্যাগের বিষয়! আয়ুর্বেদোক্ত দ্রুত-তৈলাদির গুণপ্রতি কি মিথ্যা ও অসার না আমরা নানারূপ অনাচারে উক্ত ফল লাভে বঞ্চিত?

৩. পর আয়ুর্বেদজ্ঞ কৃতবিদ্য কবিরাজ মণ্ডল। নিকট জিজ্ঞাস্ত, দ্রুত ও তৈল সযত্নে

সমালোচনার অবতারণা করিয়া 'আমি' যে
অতিমত ব্যক্ত করিলাম—'তাহা যুক্তিযুক্ত ও
এই প্রশ্নে কি না এবং এমন কোন প্রবল
যুক্তি বিদ্যমান আছে কিনা—যাহারা মুছা
ও গন্ধপাক বিধি সম্বন্ধে করা যাইতে পারে।

বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশেই আয়ুর্বেদ চর্চা
ও প্রচার সম্বন্ধে ভারতের প্রাচীনতম স্থান
অধিকার করিয়াছে বলিয়া আমার সাহসের
নিবেদন এই, তাহার যদি স্বীয় স্বাধীন
চিন্তা দ্বারা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া
আমার মতের গন্ধপাকী হন, তবে আয়ুর্বেদের
ভবিষ্যত উন্নতির জন্য উক্ত প্রকৃষ্ট মুছা ও

গন্ধপাক বিধি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র
হইতে অপসারিত করিয়া দ্রুত-ভৈলাদিকে
যে যুক্তি স্বাভাবিক প্রতিভাত করিবার কি
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে—তাহা যেন সম্বন্ধ
নির্ধারণ করেন। সর্বশেষে আয়ুর্বেদ-
হিতৈষী ব্যক্তি যাহারাই নিকট আমার
সাহসের নিবেদন—তাঁহার যদি এ বিষয়ে
কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ কর্তব্য বন্ধীর কৃতবিত্ত
কবিরাজ মণ্ডলীর সহিত এক সভা আহ্বান
করিয়া সভার সিদ্ধান্ত পত্র দেশময় প্রচার
করিয়া দেন, তবে আয়ুর্বেদের এবং তৎসঙ্গে
দেশের একটা মহান কল্যাণ সাধিত হয়।

বনোবধি।

—:—

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায়, কবিরাজ]

বকুল ফুল—হিং—মৌলসিরি।

চলিত দন্তে বকুল—যে দন্ত অকালে
নড়িয়া শিথিল হইয়াছে, বকুল ফল চর্ষণ
করিলে ঐ শিথিল দন্তমূল দৃঢ় হয়। বকুল
ছালের চূর্ণ অথবা কাথ দ্বারা দন্ত ধাবন
করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়।

দন্ত রোগে।—বকুল ছাল ও বকুল ফল
বিশেষ হিতকারী। বকুল ছালের কাথের সহিত
কিকিৎ পিপুল চূর্ণ করিয়া ও মধু মিশ্রিত
করিয়া মুখে কবল ধারণ করিলে চলিত দন্ত
দৃঢ় হয়। এবং মুখের ক্ষত ও দুর্গন্ধ দূর
হইয়া থাকে। দন্তমূল হইতে রক্তস্রাবেও ইহা
বিশেষ ফলপ্রসূ।

বালকের কোঠ বন্ধে বকুল—শিশুদিগের

কোঠ বন্ধ হইলে বকুল বীজ জলে পেষণ
করিয়া দ্রুত মিশ্রিত করিয়া পানের বোটা
দ্বারা মলদ্বারে বস্তি প্রদান করিলে সহজে
কোঠ তত্ত্ব হইয়া থাকে। ইহা বালকদিগের
মল নিঃসরণ প্রশস্ত।

শিরোরোগে বকুল—যে বকুল পত্রের ও
বকুল ফলের নস্ত টানিলে শিরোরোগের
উপশম হয়। ইহা স্নেহা নিবারণক। লব্ধ
বকুল পুষ্ণ চূর্ণ করিয়া নস্ত টানিলে নাসিকা
হইতে প্রচুর পরিমাণে স্নেহা নির্গত
হয়।

অশ্বগন্ধা—হিং অশ্বগন্ধা।

অশ্বগন্ধা সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

মুখের অকালে অশ্বগন্ধার বহল উৎপত্তি

দেখিতে পাওয়া যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী ইহা বেণের দোকানেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অধগন্ধা বলকারী, রসায়ন। ইহার সহিত ত্র্যাস্তরযোগে পুষ্টিকারক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেবল মাত্র অধগন্ধার মূল চূর্ণ ও নাগর মুখা চূর্ণ—যথাক্রমে চারি আনা ও দুই আনা মাত্রায় সংমিশ্রণ করিয়া গরম দুধের সহিত সেবন করিলে শরীর বলিষ্ঠ ও শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শাসরোগে অধগন্ধা।—অস্তধূমে দহ্য করিয়া অধগন্ধার মূলের দ্বারা ২ তোলা, গব্য দুধ অর্দ্ধ পোয়া, একত্র জাল দিয়া দুধ শেষ থাকিতে নামাইবে এই দুধ বস্ত্রে ছাঁকিয়া পান করিলে শাস রোগে উপকার হয়।

বাতব্যাধি রোগে অধগন্ধা।—অধগন্ধার কাথ ও ককে গব্য স্তূতের চতুর্গুণ দুধসহ বধা নিয়মে স্তূত পাক করিয়া এই স্তূত সেবনে

বাতব্যাধি আরোগ্য হয়। ইহা বাতর, বৃষা মাস বর্ষক।

শোথ রোগে অধগন্ধা।—অধগন্ধা ২ তোলা, গব্য দুধ অর্দ্ধ পোয়া, জল দেড় পোয়া, একত্র জাল দিয়া দুধ শেষ প্রাথিয়া এই দুধ পান করিবে।

হৃদগত বায়ু রোগে ও হৃদ রোগে অধগন্ধা ১ তোলা গরম জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে হৃদরোগের উপশম হয়।

অনিদ্রায় অধগন্ধা।—অর্দ্ধ তোলা অধগন্ধা চূর্ণ কিঞ্চিৎ চিনি ও গব্য স্তূত সহ প্রত্যহ সেবন করিলে অনিদ্রা হইয়া থাকে। ইহা বৃষ ও রসায়ন। অধগন্ধার মূল কাঁচা ব্যবহার প্রস্তুত।

পুষ্টিবর্ধনে অধগন্ধা।—প্রত্যহ চারি আনা পরিমাণ অধগন্ধা মূলচূর্ণ, উষ্ণ গব্য দুধের সহিত সেবন করিলে দেহ পুষ্টি ও শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

দেশের কথা।—আমাদের দেশে রোগ-ব্রাহ্মণ্যের পরিচয় দেশে চিকিৎসকের আধিক্য দেখিলেই অনুমান করা বাইতে পারে। কলিকাতার তো কথাই নাই, কলিকাতার অলিতে গলিতে ডাক্তার কবিরাজের ছড়াছড়ি। মকঃবলেও ইহাদের সংখ্যা কম নহে। আগে এত চিকিৎসকও ছিল না, এত রোগের প্রাদুর্ভাবও ঘটত না। সুতরাং এখন যে এত চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, ইহা দেশের সৌভাগ্যের কি দুর্ভাগ্যের পরিচয়, তাহা ভাবিবার কথা।

রোগের বাহ্য। রোগের বৃদ্ধিতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি আশার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে রোগের আধিক্য কমিতেছে কই? ম্যালেরিয়া-কলেরা-বসন্ত তো বাতালার নিকরিয়ে রাজত্ব করিতেছে, প্লেগ-ইনফ্লুয়েন্সা-বেরিবেরিও আধিপত্য বিস্তার কম করছে নাই। মহিলা-সমাজে হিষ্টিরিয়ার বিস্তৃতিও অল্প নহে। হার্টকেল নর-নারীঃ মধ্যে তো কথায় কথায়। ডিসপেন্সিয়া বা আমাদের অকীর্ণ অগ্নিমান্দ্য—ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক হইতে না হইতেই বাবা-

লীর এক চেটিয়া। দেশে চিকিৎসক বাড়িতেছে, অথচ আর্থিব্যায়ির কেন এরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, দেশের চিন্তাশীলগণের ইহা তাবি-
বাক্য বিষয়।

রোগের কারণ।—কিন্তু চিকিৎসক
করবেন কি? আর্থ্য জাতি যে সদাচারপ্রভ
হইতেছে, তাহার নিবারণ করিবার উপায়
কোথায়? আর্থ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে মানুষের
দীর্ঘজীবন লাভের অল্প সদবৃত্তি পরা-
য়ণ হইবার বহুল উপদেশ প্রদত্ত হই-
য়াছে। কিন্তু সে উপদেশ এখন পালন
করে কে? যুগ বিপর্যয়ে অনাচার-পরায়ণ
আর্থ্য জাতির এই অজ্ঞাই তো দুর্গতি হইতেছে।

দেহ ধারণ করিলে রোগভোগ করিতে হইবে,
মরিতে হইবে—ইহা সত্য কথা, কিন্তু সেই
রোগ ভোগেরও একটা সীমা আছে। পাপের
ফল তথা অমিত আহার বিহারাদির ফল
রোগোৎপত্তির কারণ—এ কথা অস্বীকার
করিবার জো নাই। আগেকার লোকে এ
কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতেন, এখনকার মানুষ
ইহা ধর্মব্যয়ের মধ্যেই আনে না, ইহাই তো
দেশে রোগ-বাহুল্যের কারণ। যে পর্যন্ত
দেশ হইতে এ কারণের অপনয়ন না ঘটিবে,
সে পর্যন্ত যে আমাদের দেশ হইতে রোগের
হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে
ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

ব্রহ্মচর্য্য।—যোগ শাস্ত্রের সায় কথা,
“চিত্তবৃত্তির নিরোধ কর।” আগে যে
আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের ব্যবস্থা
ছিল তাহা হইতেই এই উপদেশ পালন
করা হইত। স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে
ব্রহ্মচর্য্য পালন একান্তই প্রয়োজনীয়।

প্রাচীন কালে রাজ পুত্র হইতে পণ কুটীর
বাসীর পুত্রকেও গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য
পালন করিতে হইত। এই অবস্থায় তাঁহারা
শিক্ষা করিতেন—

“মরণং বিন্দুপাতেন।

জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।”

কিন্তু এ শিক্ষা এখন দেশ হইতে লোপ
পাইয়াছে। যে ব্রহ্মচর্য্য আমাদের সকল
শিক্ষায় তত্ত্বরূপে গৃহীত হওয়া উচিত সে
শিক্ষা আমাদের বালকগণকে আর প্রদান
করা হয় না। স্কুল কলেজে শৈশবিক প্রদানের
তো ব্যবস্থাই নাই, গৃহেও ইহার একান্ত
অভাব। ইহার ফলে ছাত্র জীবনে ব্রহ্ম-
কীট প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে অসুস্থতার
শূন্য করিয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালীর
অজীর্ণ—বাঙ্গালীর অসুস্থ হুটি এবং
তাহার ভীষণ ফল বাঙ্গালীর শরীরে নানা
রোগের হুটি এবং তাহার শেষ পরিণতি
বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যভঙ্গ ইহারই ফলসম্মত।
বাঙ্গালীর এই দুর্দিনে বাঙ্গালীকে রক্ষা
করিবে কে?

বাঙ্গালীর অবস্থা। বাস্তবিক পৃথিবীর
সকল জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের
অবস্থা অধিক শোচনীয়। বাঙ্গালী যুবক
সম্প্রদায়ের অধিকাংশের দিকে চাহিয়া
দেখিলেই এ কথা যথার্থ উপলব্ধি হইবে।
তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের অল্প তাঁহা-
দের অভিভাবকগণ যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে-
ছেন, তাহার ফলে তাঁহারা শিক্ষালাভেও
অমনোযোগী নহেন, কিন্তু তাহাদিগের
দেহের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাদের

স্বাস্থ্যোন্নতির পরিচর্য্য তো পাওয়া যায় না। সত্য কথা বলিতে গেলে অনেকেরই মেহে বল নাই, মনে ক্ষুণ্ণি নাই, স্বাস্থ্যহীনতার জন্ত অনেকেরই যেন ক্ষম্যে শাস্তি নাই। এই অবস্থায় কোন একটা প্রবল রোগের আক্রমণ হইলে ইহারা আর সহ্য করিতে পারেন না। সকল জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালী জাতির অকাল মৃত্যু এইরূপেই বর্ধিত হইতেছে। সেই জন্তই তো বলিতেছিলাম চিকিৎসকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও বাঙ্গালা দেশে রোগের আক্রমণ কম না হইয়া বরং বাড়িয়াই যাইতেছে।

মরণের কারণ।—বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়া-পীড়িত রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক। ম্যালেরিয়ার বাঙ্গালীর মৃত্যুর হারও কম নহে। ইহার কারণও আমরা বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যের অভাব বলিয়া মনে করি। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে বাঙ্গালী যে অন্তঃসার শূন্য হইতেছে, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি তাহারই জন্ত কমিয়া আসিতেছে। ম্যালেরিয়াই

বলুন আর কালাজরই বলুন, অথবা অল্প কোনো রোগের কথাই উল্লেখ করুন, সেই রোগের আক্রমণ অল্পপ্রাণ-বাঙ্গালী সহ্য করিতে পারিতেছে না। বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু এমনই করিয়াই ঘটিতেছে। এক কথায় দুর্বল বাঙ্গালীর পক্ষে ভীষণ রোগের সঙ্গে যুদ্ধিবার ক্ষমতার অভাব হইয়াছে। দেশের চিন্তাশীলগণ সকল বিষয় অপেক্ষা এই বিষয়ের চিন্তা করুন—ইহাই আমাদের সনির্ভর অহরোধ।

“ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণা—

মারোগ্যমূলমুত্তমম্”।

“ধর্ম্ম বলুন, অর্থ বলুন, কাম বলুন, মোক্ষ বলুন—আরোগ্যই সকল বিষয়ের মূল। সুতরাং সেই আরোগ্য লাভের ব্যবস্থা আমাদেরকে সর্বাগ্রে করিতে হইবে। সেই ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট পন্থা ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা প্রাপ্তি। বাঙ্গালী বালক যে পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা লাভ না করিবে, সে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জাতির মধ্যে মৃত্যু-বাহন্য যে কমিবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

কবিরাজ ত্রিপুরেন্দ্রকুমার গাণ গুপ্ত কাব্যার্থ কর্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেণ হইতে মুদ্রিত

ও ২২ নং কলিকাতাপুস্তক দীপ্ত হইতে মুদ্রাকর কর্তৃক প্রকাশিত।





আয়ুর্বেদ

৭ম বর্ষ

কার্তিক, ১৩২৯ সাল।

২য় সংখ্যা।

চরকের চিকিৎসা।

[কবিরাজ শ্রীমন্তচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন]

যে শাস্ত্রে আয়ুর কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহারই নাম আয়ুর্বেদ। আয়ু শব্দের অর্থ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগ। আয়ুর অর্থ নাম—ধারণ, জীবিত, নিত্য ও অমৃত। মন, আত্মা ও শরীর—তিন খানি যেন ভিন্ন ভিন্ন বস্তু; এই তিনের সংযোগেই পুরুষের উৎপত্তির কারণ। পুরুষই পুমান। পুরুষই চেতন এবং পুরুষই আয়ুর্বেদের অধিকরণ। যে গুণ সর্বদাই পুরুষে অমৃতবর্তী তাহারই নাম মন। ইন্দ্রিয় সকল মনের অমৃতবর্তী হইয়াই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। মনের জ্ঞাতযোগ, জ্ঞান-যোগ ও মিথ্যা যোগ—প্রকৃত ও নিকৃতির কারণ। ইন্দ্রিয় ও মন অমৃতপত্নী রাখিতে না পারিলেই রোগের আক্রমণ হইয়া থাকে। দেহীগণ যখন ইন্দ্রিয় ও মন অমৃতপত্নী রাখিতে সমর্থ

হইল না, তখনই বিশ্বসংসারে রোগ-রাক্ষসগণ প্রাহুর্ভূত হইল। ইহার ফলে মানবদিগের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রত ও আয়ুর বিষয় উপস্থিত হইল, তখন জীবদিগের প্রতি দয়াবশতঃ পুণ্যকর্মা মহার্ঘগণ হিমালয় পার্শ্বে সমবেত হইলেন। তাঁহারা ধ্যান-নিরত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, ইন্দ্র এই বিপদের উদ্ধার কর্তা, অমৃতনাথই ইহার উপায় স্থির করিয়াছেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ এই জ্ঞান ইন্দ্র সমীপে গমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া আনিলেন এবং তাহা অজ্ঞাত ঋষিদিগকে শিক্ষা দিলেন; ইহাই হইল আয়ুর্বেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র।

বিশ্ব সংসারে আয়ুর্বেদ প্রচারের অন্ত

অধ্যায়ে আমরা জানিতে পারি, যে, যথার্থিও এই পরম কল্যাণকর লোক হিতৈ-
বিশিষ্ট বিজ্ঞা আয়ত্ত করিয়া গৃহ্যভূমি বারানসী
ধামে দিবোদাস রূপে অবতারণ হইয়াছিলেন
এবং এই বিজ্ঞা জনসমাজে প্রচার করিয়া
বিখ্যাত ছিলেন। তাহার শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে
মহর্ষি মিত্রের পুত্র মহর্ষি হৃদ্রত সর্বশ্রেষ্ঠ।
কিকির্দধিক আড়াই সহস্র বৎসর পূর্বে
হৃদ্রতের আবির্ভাব কাল নিরূপণ করিতে
পারা যায়। ভরদ্বাজ প্রবর্তিত চিকিৎসায়
দ্রব্য বিজ্ঞানের অপূর্ণ প্রভাব প্রকটিত, কিন্তু
হৃদ্রত প্রবর্তিত চিকিৎসা কেবল দ্রব্য
বিজ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া শারীর
স্থানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির নির্দেশ পূর্বক শত্রু
কর্মের উপদেশ লইয়া বর্ণিত। মহর্ষি ভরদ্বাজ
প্রবর্তিত চিকিৎসাশাস্ত্রের নামকরণ হইল
চরক সংহিতা এবং মহর্ষি হৃদ্রত প্রবর্তিত
চিকিৎসাশাস্ত্রের নামকরণ হইল হৃদ্রত
সংহিতা। চরকের চিকিৎসা এক কথায় বায়ু,
পিত্ত ও কফ—এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ
করিয়া লিখিত। অত্র চিকিৎসা সাপেক্ষ
রোগদিগের সম্বন্ধে তিনি কোনো কথাই
বলিব না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু
ঔষাদিগকেও বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিন
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া অতি সহজে
তাহাদিগের চিকিৎসার নির্দেশ করিয়া
দিয়াছেন।

চরক সংহিতার প্রত্যেক অধ্যায় তিন
শ্রেণীর অন্তর্গত লিখিত। উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, মধ্যম
বুদ্ধি ও অধম বুদ্ধি। কোনও রোগের
স্বভাব উচ্চ, উহার চিকিৎসা একত্র তদনুসরণ
হওয়া উচিত—উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদিগের অন্তর্গত এই

পর্যন্ত বলা হইয়াছে। মধ্যম বুদ্ধিদিগকে
বুঝাইবার জন্য আর একটু পরিষ্কার করিয়া
বলা হইয়াছে—ঐ রোগের চিকিৎসায়
ভিত্তিকগণ আবশ্যিক, কারণ ভিত্তিকগণ
শীতল। তাহার পর অধম বুদ্ধিদিগের জন্য
প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে—ঐ রোগের
চিকিৎসায় নিম্নহাল, বাসক ও গুলঞ্চ প্রভৃতির
পাচন প্রয়োগ করিতে হয়, এ স্থলে এই তিন
প্রকার কথাই অর্থই যে এক, ইহা বুঝিতে
অধিক কষ্ট হইবার কথা নহে, কিন্তু যে স্থানে
লিখিত আছে যে, শুক্র রোগ, প্রদর, রক্ত
পিত্ত ও ক্লেব্য প্রভৃতির চিকিৎসা এক, কিম্বা
যে স্থলে লিখিত আছে যে, পিত্তের ক্ষয় হইলে
বুদ্ধি প্রাপ্ত স্নেহা বৎকালে প্রকৃতিস্থ বায়ুকে
রোধ করে, তৎকালে শাতক, গোরব ও জ্বর
হয়—এরূপ সাক্ষাতক কথা মধ্যম বুদ্ধি বা
অধম বুদ্ধির বোধগম্য হয় না ; এ সকল
সাক্ষাতক নির্দেশ উত্তম বুদ্ধির জ্ঞান লিখিত।
পূর্বেই বালিয়াছি চরকের চিকিৎসা বায়ু,
পিত্ত ও কফের শ্রেণীভাগ করিয়া লিখিত,
একত্র শুক্র রোগ, প্রদর, রক্তাপিত্ত, ক্লেব্য
প্রভৃতির চিকিৎসা এক—এরূপ সাক্ষাতক
কথায় শুক্ররোগ, প্রদর, রক্তাপিত্ত ও ক্লেব্য
প্রভৃতি রোগে মানবের শারীরিক অবস্থা
একই প্রকার হয়—এরূপ অর্থ করিলে বোধ হয়
মন্দ হয় না, উত্তম বুদ্ধি ব্যক্তি ইহাই বিবেচনা
করিয়া ঐ সকল রোগের চিকিৎসা করিবেন
—ইহাই চরক সংহিতার সূক্তে।

চরকের চিকিৎসায় শত্রু-চিকিৎসার
উল্লেখ না থাকিলেও ফল মূল্যশি আখ্য ঋষি
উহাতে রোগের নির্ণয়ের বিচার যেরূপ ভাবে
করিয়া গিয়াছেন, এমন আর কোনো শাস্ত্রে

নাই। আর্থাৎ ঋষি ঐ সমাতন গ্রহে জোর করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, যদি তোমার যন্ত্রণে বিজ্রমি (at-cess) হইয়া থাকে, তবে তোমার খাস হইতে থাকিবে, যদি তুমি তেজস্বী পুরুষ না হও, তবে তোমার প্রস্রাবে রাশীকৃত চিনি থাকিলেও উহা তোমার মধুমৈত্র নহে, যদি তোমার জলোদর হইবার উপক্রম হইয়া থাকে, তবে জলপান পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে ঐ রোগ জলোদর রূপে পরিণত হইবে না, একরূপ নিশ্চয়াক্ষর কথা পৃথিবীর আর কোনো চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই। চরক বলিয়াছেন, ক্ষয়রোগ অষ্টাদশ প্রকার, আয়ুর্কর্মেদের সকল গ্রন্থ ইহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিয়াছেন। ক্ষয় রোগ সপ্তদশ প্রকার বা ক্ষয় রোগ উনবিংশ প্রকার—সাহস করিয়া এ পর্য্যন্ত আর কেহই এ কথা বলিতে পারিলেন না। ঋষি বলিয়াছেন, যদি তোমার রাজ্যবন্দ্য হইয়া থাকে, তবে তোমার স্বস্ত ও পার্শ্বদেশে কখন কখন বেদনা থাকিবে, হস্ত ও পদে দাহ থাকিবে এবং অষ্ট প্রহরই জ্বর থাকিবে। যদি এই তিনটি লক্ষণের একটি লক্ষণ না থাকে; তবে তোমার মুখ দিয়া রাশীকৃত কৃষ্ণ ও রক্ত পুষ্টি উঠিলেও তোমার রাজ্যবন্দ্য হয় নাই ইহা নিশ্চিত। ইচ্ছার বেগ ধারণ করিলে অমুক অমুক রোগ হয়, বমির রোগ ধারণ করিলে অমুক অমুক রোগ হয়, নিশ্বাসের বেগ ধারণ করিলে অমুক অমুক রোগ হয়—এ সকল কথা ব্রাহ্মণ্য করিতে হইলে শারীর তত্ত্বের জ্ঞান অপেক্ষা করে বটে, কিন্তু পাঁচাত্তা চিকিৎসা-দর্শন অন্ত্যদিকে অগ্রসর হইলেও এ সকল

কথার ব্যাখ্যার অভিপ্রেত তত দূর অগ্রসর হয় নাই। ইচ্ছা কিরূপে হয়, বমি কিরূপে হয়, নিশ্বাস-ক্রিয়া কিরূপে নিশ্বাস হয়, স্নেহবহ শ্রোত সকলের ক্রিয়া কি—এ সকল কথা ডাক্তারি শারীর তত্ত্বে স্থলরূপে লিখিত আছে। কিন্তু ঐ সকল ব্যাখ্যার সহিত চরকীয় ব্যাখ্যার সমাধান হইতেই পারে না।

কিরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ হইতে পারে ইহাই চরক সংহিতার মুখ্য উদ্দেশ্য। অমর-নাথ ইন্দ্রের নিকট এই জ্ঞানই মহাতপা ঋষি আয়ুর্কর্মে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,—

“দীর্ঘজীবিতমসিচ্ছন ভরদ্বাজ উপাঙ্গমং।

ইন্দ্রমগ্রতপা বুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরম্।”

কারণ ও কার্যের পরিভাষা নির্দেশ পূর্বক ধাতুর সাম্য বা অরোগিতার বিচার করিয়া চরক সংহিতা রচিত। চরকের মতে ইহাই চিকিৎসার প্রধান সূত্র। এই সূত্র বুঝিতে হইলে দর্শন শাস্ত্রে প্রগাঢ় অধিকার থাকা চাই, চরকের সূত্র স্থান সেই “বড় দর্শনের” মীমাংসায় প্রকটিত।

চরক বলিয়াছেন, যে গুণ সর্বদাই পুরুষের অস্থবর্তী হয়, তাহাকেই মন বলে। ইন্দ্রিয় সকল মনের অস্থবর্তী হইয়াই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ, রস ও স্পর্শন—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ার উপকরণ দ্রব্য যথাক্রমে জ্যোতিঃ, আকাশ, ক্ষিত্তি, জল ও বায়ু। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় স্থান যথাক্রমে অক্ষিষ্ণু, কর্ণধ্বজ, নাসাধ্বজ, জিহ্বা ও দ্বক। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ার ভোগ্য বিষয় যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ার বৃদ্ধি বা বোধ যথাক্রমে দর্শনবোধ, শ্রবণবোধ,

জ্ঞানবোধ, স্বাদবোধ ও স্পর্শবোধ। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্ঘ, মন ও আত্মা এক যোগ হইলেই তত্ত্ব বোধের উদয় হয়। সেই বুদ্ধি কণিকা ও নিশ্চয়াত্মিকা ভেদে বিবিধ। মন, মনের বিষয়, বুদ্ধি ও আত্মা—এই কয়টিই শুভাশুভ প্রবৃত্তির হেতু। পুরুষের ক্রিয়া দ্রব্যাপ্রতি, এজ্ঞাত ইন্দ্রিয় সকল পঞ্চ মহাভূতের বিকার। তেজ চক্ষুতে, আকাশ কর্ণে, ক্রিতি স্রোতে, জল রসনে ও বায়ু স্পর্শনে বিশেষরূপে বিস্তারিত। যে ইন্দ্রিয় যে মহা ভূতে নির্মিত, সেই ইন্দ্রিয় তদভাবাপন্ন বলিয়া সেই মহাভূত-করণ বিষয়েরই অনুসরণ করে। সেই বিষয়ের অতিযোগ, অযোগ ও মিশ্রাযোগ হইলেই মন ও ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়। এক কথায় রোগ ইহারই নামান্তর। দেহীদিগের শরীরে এইরূপ ভাবে যাগাতে রোগাক্রমণ না ঘটিতে পারে—মহর্ষি চরক গ্রন্থসমুহে তাহারই জ্ঞাত উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

“অসাত্ম্য বিষয় পরিহারপূর্বক সাত্ম্য বিষয়ের অনুসরণ করিবে, সমীক্ষাকারিতা সহকারে দেশ, কাল ও আত্মার অবিকৃত ব্যবহার করিবে, সর্বদা সর্ব বিষয়ে মন স্থির রাখিয়া সংকার্যের অনুষ্ঠান করিবে। এই সকল কার্য করিলেই যুগপৎ আরোগ্য লাভ ও ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ হইবে। চরকীয় চিকিৎসার ইহাই হইল মূখ্য অভিপ্রায়। চরকের এই অভিপ্রায় বুঝিয়া যিনি চিকিৎসা কার্যে ব্রতী হইবেন, তাহারই চিকিৎসা বৃত্তি সার্থক। রোগ হইলে রোগ প্রতিকারক উপায় করিবে—ইহা তো সকল দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রই নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাণীজগতে

যাগাতে রোগের আক্রমণ না হইতে পারে—চরক সংহিতার প্রারম্ভ ভাগে তাহাই উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত। জগৎবাসী সে ঘোষণা শুনিয়া যখন স্বস্থবিধি পালন করিতে জানিত, তখনই মানবের পরমাণু কাল সম্পূর্ণ হইত এক শত বৎসরে। এখনকার লোকের গড়ে পরমাণুর সংখ্যা দাঁড়াইছে ৫০। চরক বলেন, প্রতি এক শত বৎসরে মানুষের জীবন এক বৎসর করিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই হিসাবে এক শত বৎসর পরমাণু ৫০০ বৎসরে কমিয়া আসিতে কত বৎসর লাগে—ত্রৈরাশিকের নিয়মে তাহা স্থির করিলে চরকের প্রাদুর্ভাব কালের সময়-নির্দেশ সত্য ও ত্রেতা যুগের নিক্তি সময়ে অনুমান করিতে পারা যায়। চরকে সত্য ও ত্রেতা যুগের উল্লেখও আছে। যাহা ইউক তাঁহার প্রাদুর্ভাবকালের নির্দেশ করণ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সে কথা লইয়া এখন মাথা ঘামাইবারও আবশ্যকতা বিবেচনা করিতেছি না।

চরক স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দেশে যে সকল সদবৃত্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ যদি তাহা বর্ণে বর্ণে পালন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে যে রোগ-যজ্ঞনা পাইতে হয় না, নীরোগ ও সুস্থ দেহে তাহার যে দীর্ঘ জীবন লাভ ঘটিয়া থাকে—তাহা অনিশ্চিত। তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলীর সারমর্ম—“দেব, গো, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্য দিগকে অর্চন করিবে। পূরীক ও সায়ীক—দুইকালে জল দ্বারা আচমন করিবে। সর্বদা মলায়ন ও পাদদ্বয়ের নির্মলতা রক্ষা করিবে। এক পক্ষের মধ্যে তিন বার কেশ, শ্রব, লোম,

ও নথ ছেদন করিবে। সর্বদা অচ্ছিন্ন বস্ত্র ধারী, প্রসন্ন মনাঃ ও সুগন্ধ ধারী হইবে। সাধু বেশ ও শোভিতকেশ হইবে। মূর্দ্ধা, কর্ণ, নাসা ও পাদ নিত্য তৈল দ্বারা স্রব্ধ করিবে। শায়িত্ত্ব, ধূমপান করিবে। আগন্তুককে তুমিই অগ্রে সম্ভাষণ করিবে, মিষ্টমুখ হইবে। বিপন্নকে আশ্বাস দিবে। অতিথিদিগের পূজা করিবে। পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে। সময় ব্রহ্মা হিতকর অথচ পরিমিত ও মধুরার্থ যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিবে। সংযতাত্মা ও দক্ষাত্মা হইবে। যে কারণে যাহার উন্নতি হইয়াছে, সেই কারণের প্রতি ঈর্ষা করিবে। কিন্তু সেই কারণের ফলের প্রতি ঈর্ষা করিবে না। নিশ্চিন্ত নির্ভীক, লজ্জাশীল, বিমুখাকারী, উৎসাহী, দক্ষ, ক্রমাবান, ধার্মিক ও আন্তিক হইবে। বিনয়, বুদ্ধি ও বিজ্ঞা সম্বন্ধে যাহাদের উৎকর্ষ আছে, যাহারা বয়োবৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্য— তাহাদের উপাসনা করিবে। ছত্র, দণ্ড, উকীষ ও উপানহ ধারণ করিবে। চলিবার সময় সম্মুখে অস্ত্রতঃ চতুর্দিক স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। সর্বদা মঙ্গলাচরণ করিবে। কুংসিত বস্ত্র, পান্নি, কণ্টক, অপবিত্র কেশ, তুষ, জঙ্ঘাল, ভস্ম ও ইপাল সমূহের নিকট দিগা ঘাইবে না। বাসস্থান সকল পরিষ্কার করিবে। প্রাস্তি বোধ না হইবার পূর্বেই জল পরিষ্কার করিবে। সর্গ প্রাণীর প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিবে। ক্রুদ্ধদিগকে অহুন্নয়ও ও ভীতদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবে। দরিদ্রদিগকে অনুগ্রহ করিবে। সত্যসন্ধ হইবে এবং চতুর্দিকের মধ্যে সামগ্ৰণ প্রদানরূপে অবলম্বন করিবে। পরের পক্ষ

বাক্যে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবে, কিন্তু নিজে পক্ষ হইবে না। প্রশস্ত গুণসমূহের উৎসাহ দাতা হইবে। রাগ ও ঘেঘের দ্বারা কারণ— তাহা পরিহার করিবে। অসত্য কহিবে না। পরস্ব গ্রহণ করিবে না। অস্ত্র জী অভিশাপ করিবে না। পরস্বী কাতর হইবে না। বৈরীভাবে কল্পনা করিবে না। পাপ করিবে না। অপকারীও অপকার করিবে না। পরদোষ কহিবে না। পরের রহস্য প্রকাশ করিবে না। অধার্মিক বা রাজ-বিশিষ্টদিগের সহিত বাস করিবে না। উন্নত, পতিত, ক্ষণক্ষমা, ক্ষুদ্র ও দুষ্ট লোকদিগের সহিত বাস করিবে না। দুষ্টখানে আরোহণ করিবে না। কষ্টকর আসনে বসিবে না। অনাস্তীর্ণ, উপাধানহীন, অগ্রশস্ত্র বা অসম শয়নে শয়ন করিবে না। গিরি গহনে বা গিরি শিরে বিচরণ করিবে না। বৃক্ষে আরোহণ করিবে না। উগ্রশ্রোতঃ জলে অবগাহন করিবে না। কুলগাছের ছায়া সেবন করিবে না। অগ্ন্যুৎপাতের সম্মুখানে বিচরণ করিবে না। উচ্চাস্ত্র করিবে না। লোকের সম্মুখে সশস্ত্র বায়ু নিঃসরণ করিবে না। মুখ না ঢাকিয়া, জন্তন, কবচ কিম্বা হস্ত করিবে না। নাক খুঁটিবে না। দস্ত্র বিষড়িত করিবে না। নথ বাজাইবে না। অস্থিতে অভিঘাত করিবে না। ভূমি বিধিলন করিবে না। বৃক্ষ বা তৃণ ছিঁড়িবে না। অস্থ প্রত্যঙ্গগুলি কুংসিতভাবে প্রসারিত বা সঙ্কচিত করিয়া কোন কার্য করিবে না। উজ্জল জ্যোতিঃ পদার্থের প্রতি বা অপবিত্র অপ্রশস্ত অগ্নির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। রাজ্যিতে দেবালয়, চৈত্য, চন্দ্র, চতুপথ, উপবন,

অশ্রম ও বধ্যভূমি সেবা, করিবে না। পুত্র
গৃহে বা অটবীতে একাকী প্রবেশ করিবে না।
পাশাচারী জী, মিত্র ও ভৃত্যদিগকে ডঙ্কনা
করিবে না। উত্তমদিগের সহিত বিরোধ
করিবে না। নিকটদিগের উপাসনা করিবে
না। বক্র কচির অঙ্গসরণ করিবে না। অতি
নাহস, অতি নিদ্রা, অতি আগরণ, অতি
দ্রান, অতি পান ও অতি ভোজন করিবে
না। উর্দ্ধভ্রম হইয়া অধিকক্ষণ থাকিবে না।
সর্প, দ্বন্দ্বী ও শূলী জন্তুর নিকট থাকিবে না।
পূর্ব বায়ু, সমুখ রৌদ্র, হিম ও অতি বায়ু
পরিহার করিবে। কলহ করিবে না। শ্রান্তি
ও বর্ষের নিবৃত্তি না হইলে দ্রান করিবে না।
অকাচা কাপড়ে মাথা মুছিবে না। অকাচা
কাপড় পরিধান করিবে না। রক্ত, স্নাত,
পূজা দ্রব্য, মাংসাদি দ্রব্য ও গুল্ম স্পর্শ না
করিয়া বাহির হইবে না। হস্তে রক্ত ধারণ
না করিয়া, অন্নাত হইয়া, বস্ত্রত্যাগ না করিয়া,
জপ না করিয়া, হোম না করিয়া, দেবতা-
দিগকে নিবেদন না করিয়া, পিতৃ, গুরু ও
উপাসিতদিগকে দান না করিয়া, পবিত্র গন্ধ
দ্রব্য ও মাংস পরিধান না করিয়া, পানি, পাদ
ও বসন প্রক্ষালন না করিয়া, শুষ্ক মূখ ও উত্তর
মূখ না হইয়া ডঙ্কণ করিবে না। অপমানিত,
অভক্ত, অপিত, অশ্রুতি ও ক্ষুধিত পরিচরের
সমীপস্থ হইয়া, অমেধ্য ভোজন পায়ে,
অকালে, অস্থানে, আপন প্রভৃতি জনপূর্ণ
স্থানে ভোজন করিবে না। অগ্নিকে ভোজ-
নাগ্রভাগ না দিয়া, অগ্নকে প্রোক্ষণ অলম্বা
প্রোক্ষিত ও ময়ূরাদি অভিযুক্ত না করিয়া
ভোজন করিবে না। শক্রর আনীত
স্নান ভোজন করিবে না। শুক বা বাসি অন্ন

ভোজন করিবে না। রাজ্যে দধি ভোজন
করিবে না। দিবসে কেবল ছাতু খাইয়া
থাকিবে না। রাজ্যে ছাতু খাইবে না।
ভোজনের পর ছাতু খাইবে না। দন্তদ্বারা
চর্ষণ না করিয়া ভোজন করিবে না। শরীর
বক্র ভাবে রাখিয়া হাঁচিবে না, ভোজন
করিবে না বা শয়ন করিবে না। মল মূত্রের
বেগ হইলে উহা পরিত্যাগ না করিয়া অন্ত
কার্য্য করিবে না। পথে প্রস্রাব করিবে না।
রক্তশলা, আতুঙ্গা, অপবিত্রা ও অন্তঃকামা
জীতে গমন করিবে না। পরজীতে গমন
করিবে না। প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে জীগমন
করিবে না। ইন্দ্রিয়ের বশ হইবে না।
চঞ্চল মনকে অধিক চঞ্চল করিবে না। বুদ্ধি
ও ইন্দ্রিয়দিগকে অধিক ভারগ্রস্ত করিবে
না। অত্যন্ত দীর্ঘ সূত্রী হইবে না। ক্রোধ
ও হর্ষ হইলেই তদনুসারে কার্য্য করিবে না।
ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞান, দান, মৈত্রী, কারুণ্য ও হর্ষোৎ-
পাদন দ্বারা শাস্তিপরাণ হইবে। ইহা ভিন্ন
চরকে সদবৃত্ত অধ্যায়ে আরও অনেক উপদেশ
বর্ণিত আছে, আমরা প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে
যে শুনি বিশেষ প্রয়োজনীয়— তাহাই সংক্ষেপ
করিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

এই উপদেশের পুরে জীবিত এষণার
উপদেশ। এষণা শব্দের অর্থ চেষ্টা বা
অবেষণ। পুরুষের উচিত যে, মন, বুদ্ধি,
পৌরুষ ও পরাক্রম অব্যাহত রাখেন এবং
ইহ-পরলোকে মঙ্গলার্থী হইয়া তিনটি এষণার
অঙ্গসরণ করেন। ঐ তিনটি এষণার নাম
প্রাণেষণা, ধনৈষণা ও পারলৌকিকেষণা।
ইহার মধ্যে প্রাণেষণা বা প্রাণ রক্ষার চেষ্টা
সর্বোপযোগী। এই প্রাণ রক্ষা ব্যক্তির

উচিত স্বাস্থ্যের অহুসরণ করা এবং পীড়িতের উচিত পীড়ার শাস্তিবিধান করা। ইহার পরই দ্বিতীয় এষণা বা ধনৈষণার চেষ্টা করা কর্তব্য। কারণ ধন না থাকিলে পাপী হইতে হয় ও দীর্ঘায়ু লাভ ঘটে না। তাহার পর তৃতীয় এষণা বা পার্যলোকৈষণার অহুসরণ করিতে হয়। ইহলোক হইতে চ্যুত হইলে পুনরুৎপত্তির কিরূপে উৎপন্ন হইব কিংবা উৎপন্ন হইব কিনা এ সম্বন্ধে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে, কিন্তু যুক্তির দ্বারা পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম ও আত্মার সমন্বয় হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয়, এবং আত্মার সহিত পরলোকের সম্বন্ধ আছে। কর্তা ও কারণ—এই উভয়ের যোগেই জিয়া হয়। কৃতকর্মের ফল আছে, অকৃত কর্মের ফল নাই। বোজ না থাকিলে অহুরের উৎপত্তি হয় না। একজন্ম পরজন্ম স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। পরজন্ম স্বীকার করিতে হইলে ধর্মবুদ্ধি পরায়ণ হইতেই হইবে। পারলোকৈষণা তাহারই জন্ম অহুসরণ করা কর্তব্য। চরকের এই তিনটি এষণা যিনি অহুসরণ করিতে পারেন, তিনি ইহলোকে নীরোগ ও স্বস্থ দেহে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গ ভোগ করিতে পারেন।

চরক বলিয়াছেন,—আহার, হুনিজা ও ইন্দ্রিয় দমন—এই তিনটি শরীরের উপশান্ত বা ধারক। এই তিনটি উপশান্ত যুক্তি পূর্বক ব্যবহৃত হইলে আয়ু শেষ নীহওয়া পর্যন্ত শরীরে বল-বর্ধের উপচয় হয়। এই কারণের অর্হিত ব্যবহারই রোগ। এই রোগ আবার সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, নিজ, আগন্ত

ও মানস। যে সকল রোগ শরীরস্থ বাহ্য, পিত্ত ও কফ বশতঃ উৎপন্ন হয় তাহারা নিজ রোগ মধ্যে গণ্য। তৃত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও প্রহারাদি হইতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাহারা আগন্ত রোগ। আর প্রিয় বস্তুর অলাভ ও অপ্রিয় বস্তুর সমাগম হইতে মানস রোগ উৎপন্ন হয়। রোগস্থান বা রোগ মার্গ তিন প্রকার, শাখা, মর্দাঙ্গি সন্ধি ও কোষ্ঠ। শাখা শব্দের অর্থ রক্তাদি সপ্তধাতু ও ত্বক। ইহারাই রোগের বাহ্য মার্গ। বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি মর্দাঙ্গি সকল এবং অস্থি সন্ধি, অস্থি সংযোগ সমূহ মধ্যম রোগ মার্গ। কোষ্ঠের অন্তান্ত নাম মহা স্রোতঃ, শরীর মধ্য, মহা নিয় ও আম পক্ষাশয়। ইহাই হইল আভ্যন্তরিক রোগমার্গ। গলগণ্ড, পীড়কা, অপচী, চর্মকোল, অর্কুদ, অধিমাংস, অলসক, কুষ্ঠ রোগ ও ব্যাধ প্রভৃতি বাহ্য রোগ—বাহ্য মার্গজাত। বীসর্প, শোথ, গুল্ম, অর্শ, বিহিধি প্রভৃতি রোগ শাখাহুসারী। পক্ষাঘাত, অন্ধগ্রহ, অপতানক, অর্দিত, শোথ, রাজযক্ষ্মা অস্থি শূল, সন্ধি শূল, গুল্ম ভ্রংশাদি রোগ এবং শিরোগত, হৃদগত ও বস্তীগত রোগাদি মধ্যম মার্গাহুসারী। জ্বরাতিসার, বমি, অলসক, বিষটিকা, শ্বাস কাস, হিকা, আনাহ, উদর, ও প্রীহাদি রোগ এবং অন্তর্মার্গজাত বীসর্প, শোথ, গুল্ম, অর্শ ও বিহিধি প্রভৃতিকেও কোষ্ঠ মার্গাহুসারী রোগ বলা যায়। ইহাদের চিকিৎসার জন্ম চরক ৩ প্রকার ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন—দৈব ব্যাপাশ্রয়, যুক্তি ব্যাপাশ্রয় ও সম্বিভয়। মজ্জা, ওষধিধারণ; রক্ত ধারণ, মজ্জাচরণ এবং বলপূজা—হোম-নিয়ম-প্রায়শ্চিত্ত উপবা

ষড়্যয়ন প্রণিপাত্তীর্থ যাত্রাদিকে দৈব
 ব্যাপাশ্রয়, যুক্তি পূরক পথ্য ও ঔষধ বোজন্য
 নাম যুক্তি ব্যাপাশ্রয়, আর অহিত বিষয় হইতে
 মনকে সংযত করায় নাম বা শান্তির নাম
 সত্ব বিজয় । বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইলে
 শরীরে যে সকল রোগ হয়, তাহাদের প্রতি-
 কারার্থ যে সকল ঔষধের প্রয়োজন তাহাও
 ত্রিবিধ । অস্ত্রশার্ঙ্গজন, বহিঃশার্ঙ্গজন ও শত্রু
 প্রণিধান । যে সকল ঔষধ শরীর মধ্যে
 প্রবিষ্ট হইয়া আহারজাত ব্যাধি সকলকে
 নষ্ট করে, তাহাদের নাম অস্ত্রশার্ঙ্গজন, যে সকল
 ঔষধ স্পর্শনেক্রিয়কে আশ্রয় করিয়া অভ্যঙ্গ,
 স্বেদ, প্রলেপ, পরিবেক ও উষ্মর্জন প্রভৃতি সহ
 রোগ নষ্ট করে—তাহাদের নাম বহিঃ
 পরিমাঃশার্ঙ্গজন । আর শত্রু দ্বারা ছেদন, ভেদন,
 বন্ধন, বিদারণ, লেখন, উৎপাটন, পৃচ্ছন,
 সীবন, এষণ এবং ক্ষার ও জলোকাদিগকে
 শত্রু প্রণিধান কহে । চিকিৎসা কাণ্ডে এই
 তিন প্রকার চিকিৎসাই প্রয়োজনীয় ।
 চরকে শস্ত্রদ্বারা চিকিৎসার বিষয় বর্ণিত না
 হইলেও ত্রিকালজ্ঞ আর্ধ্যশাস্ত্রের গবেষণা এই
 সকল কথায় বিরূপ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে
 তাহা ভাবিলে বিষয়ে পুলকিত হইতে হয় ।
 ধীমান, বৈরাগ্যপরায়ণ কৃষ্ণাভ্রৈয় এষণা,
 উপসম্ভব, বল, কারণ, রোগ, রোগমার্গ, বৈজ্ঞ
 এবং ঔষধ এই আটটি বিষয়ের প্রত্যেকটিকে
 তিন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যে উপদেশ
 দিয়াছিলেন, তাহারই উপর চিকিৎসায়
 ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ।

বায়ু, পিত্ত, কফের বিচার নির্ণয়ই চরকের
 প্রধান চিকিৎসা । ইহাদিগের পরিচয়ে
 এক কথায় যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় ক্রিয়া ও

শারীরিক যন্ত্র সমূহের ক্রিয়া নির্বাহিত হয়,
 তাহারই নাম বায়ু । পিত্ত অন্ন স্নেহযুক্ত,
 উষ্ণ, দাহকত্ব প্রভৃতি তীক্ষ্ণ গুণ যুক্ত, দ্রব,
 অন্ন সারক স্বভাব এবং কটু । স্নেহা, শুষ্ক,
 শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির, ও পিচ্ছিল ।
 এই তিনটির বিকৃতি বৈষম্যই সকল রোগের
 নিদান । ইহাদিগের মধ্যে আবার
 বায়ুই প্রধান, কারণ বায়ুর বিকৃতি ভিন্ন
 কোনো প্রকার ব্যাধিরই উৎপত্তি হইতে
 পারে না । এক কথায় সকল প্রকার
 রোগকেই বাতব্যাধির মধ্যে ধরা যাইতে
 পারে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে,
 আমাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে হৃদয়,
 নাভি, পার্শ্ব, উদরে শূল, তৃষ্ণা, উদগার
 বিবৃচিকা, কাস, কণ্ঠ শোথ ও শ্বাস উপস্থিত
 হয় । এই সকল রোগের চিকিৎসা
 প্রথমতঃ কৃষ্ণ স্বেদ ও পরে স্নিগ্ধ স্বেদ । কারণ
 আমাশয় কক্ষের স্থান, বায়ু উহাতে আগন্ত
 মাত্র । পক্ষাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে
 অন্ন কুঞ্জন, শূল, আটোপ, মূত্রকৃচ্ছ, পুরীষকৃচ্ছ,
 অনাহার, ত্রিক বেদনা এবং কণ্ঠ প্রভৃতির
 শক্তি লোপ হইয়া থাকে । কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু
 কুপিত হইলে মূত্র-বিষ্ঠার বিবন্ধ, ভ্রম, হ্রজোগ
 গুল্ম, অর্শ ও পার্শ্বশূল, হইয়া থাকে । আমাশয়
 গ্রহণী, অস্ত্র, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয় উল্লুক
 ও ফুসফুস ইহাদিগের নাম কোষ্ঠ । শুষ্ক
 বায়ু কুপিত হইলে শুষ্ক, কক্ষ, ক্ষুটিত,
 মৃগ, কৃশ, কৃষ্ণ ও তৌদ যুক্ত এবং আতত
 ও রক্তবর্ণ হয় । বায়ু রক্তগত হইলে তীক্ষ্ণ
 বেদনা, সম্ভাপ, বৈবর্ণ, কৃশতা, অকচি, গাত্র
 অকণ্ঠি নামক ত্রণ সমূহের উদয় এবং
 ভোজনের পর শরীরের শুষ্কতা হইয়া থাকে ।

মাংস মেদোগত বায়ু কুপিত হইলে অঙ্গ সমূহের গুরুতা এবং দণ্ডাঘাত বা মৃষ্টাঘাতের বেদনার আয় বেদনা উপস্থিত হয়, ইহা ভিন্ন অত্যন্ত শূল ও অমবোধ হইয়া থাকে ।

মজ্জাগত ও অস্থিগত বায়ু কুপিত হইলে অস্থি ও পর্ব সমূহের ভেদ, সন্ধশূল, মাংস ও ক্ষয়, অনিদ্রা ও মতত বেদনা হয় । শুক্র সহ বায়ু কুপিত হইলে শুক্র ও গর্ভ শাঙ্গ শাঙ্গ মুক্ত হয় বা বদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা শুক্র ও গর্ভ—উভয়েরই বিকার উপস্থিত করে ।

স্নায়ুগত বায়ুর প্রকোপে পক্ষাঘাত রোগ উৎপন্ন হয় । বহুত্বকারও এইরূপ বায়ুর বিকৃতির কল । শিরাগত বায়ুর প্রকোপে শরীরে অল্প বেদনামুক্ত শোথ, শরীর শুষ্ক ও স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং শিরা সকল স্থপ্ত ও তনু বা স্থল হইয়া থাকে । সন্ধিস্থলে বাত শূর্ণদ্বিতর আয় স্পর্শ বিংশট গোথের উৎপত্তি সন্ধিগত বায়ুর প্রকোপের পরিণাম ।

আমবাত রোগ এইরূপ বায়ু বিকৃতির ফলে হইয়া থাকে । ফল কথা দেহে সকল প্রকার রোগের উপস্থিত কারণই বায়ুর বিকৃতি । দাতুক্য হেতু বা মার্গরোধ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া থাকে । বায়ু, পিত্ত ও কফ দেহের সর্ব স্রোতেরই অগ্রসরণ করিয়া দেহকে রক্ষা করিতেছে । বায়ু কুপিত হইয়া কফ ও পিত্তকে বহন করিয়া স্রোতঃ সমূহের মধ্যে যখন আক্লিপ্ত করে, তৎকালে বায়ুর সঞ্চারণ পথ পিত্ত ও কফ কর্তৃক আবৃত হওয়াতে রসাদি দাতু সকল শুষ্ক হইয়া রোগ সকল উৎপন্ন করে । যেমন ইহঁ জগতে বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র বিকৃত হইলে জগৎ পীড়িত ও অবিকৃত থাকিলে জগৎ

ধাবণ করে, সেইরূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বিত হইলে দেহকে পীড়ন ও অবিকৃত থাকিলে দেহকে ধারণ করে । এই বায়ু, পিত্ত, কফের প্রধান আশ্রয় মাংসের বস্তি, হৃদয় ও মূচ্ছা । অতএব চরকের মতে চিকিৎসা করিতে হইলে স্থান সন্ধ অগ্নে বৃদ্ধিতে হইবে । এই স্থান সন্ধ বৃদ্ধিয়া সাত্ব্য ও অসাত্ব্য বিচারপূর্ব্বক যিনি চিকিৎসা করিতে সক্ষম তিনই চিকিৎসা ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া থাকেন । সাত্ব্য ও অসাত্ব্যের বিচার বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেও চিকিৎসা করা যায় না । বায়ু, পিত্ত ও কফ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পরকে সাত্ব্য বলিয়া পরস্পরকে নষ্ট করে না । এ কথার প্রমাণ, সর্পবিষ অস্ত্রের শরীরে প্রাণঘাতী হইলেও উহা সর্পের সাত্ব্য বলিয়া সর্পকে নষ্ট করে না । ফল কথা দাতুর বৈষম্যই রোগ এবং সমধাতু দিগের স্থিরতা সম্পাদনের জন্যই চিকিৎসার প্রয়োজন । চিকিৎসা কুশল বৈজ্ঞ ইহা বিবেচনা করিয়া রোগীর রোগ-যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করিবেন—ইহাই মহর্ষি পুনর্কল্পের সার উপদেশ ।

চরকে সকল রোগের নাম ও লক্ষণ বলিয়া সকল রোগের বিশেষ বিবরণ বিশদ ভাবে বর্ণিত হয় নাই । যে সমস্ত রোগের কথা বিশদভাবে উল্লিখিত হয় নাই—চিকিৎসক বায়ু, পিত্ত, কফের লক্ষণ দোষণা যুক্তি পূর্ব্বক সেই সকল রোগের চিকিৎসা করিবেন, ইহাও পুনর্কল্পের উপদেশ । যথা রোগা যে হ্যপ্যত্র নোদিষ্টা বহুত্বানাম রূপতঃ । তেষামপ্যেতদেব ত্রাদোষাদীন বাক্য ভেদজম ।

চরক চিকিৎসা: ১২৬ শ্লো:

এই কথা বলিয়া চরক চিকিৎসার ইঙ্গিত করিয়াছেন,—“মুখ হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত, নাসিকা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং মলদ্বার হইতে উর্দ্ধসীমা পর্য্যন্ত যে সকল রোগ আশ্রয় করে, সেই সকল আভ্যন্তর রোগকে ঔষধের আভ্যন্তর প্রয়োগ দ্বারা শীঘ্র অথচ উত্তমরূপে হরণ করা যায়। শরীরের বাহ্য প্রদেশে যে সকল বাস্প ও পিড়কাদি হয়, স্থান বুঝিয়া প্রলেপাদির প্রয়োগে তাহাদের বিশেষরূপ প্রশমন হইয়া থাকে, ইত্যাদি। চরকের চিকিৎসা স্থানে সকল রোগের উল্লেখ না থাকিলেও চরকের আশ্রয় পাঠ করিলে কোনো রোগের চিকিৎসাই চরকে বাদ পড়ে নাই বুঝিতে পারা যায়। ক্রিমি, বিস্মটিকা, অলসক ও বিলম্বিকা রোগের নিদান ও ঔষধ বিধান স্থানের অষ্টমাধ্যায়ে, ভগন্দর, গণ্ডমালা, স্ফোটক, প্রভৃতি শোথোহাধ্যায়ে, শূল রোগের সংখ্যা প্রভৃতির নির্দেশ গ্রহণী রোগাধিকারে এবং বাত ব্যাধির পরিচ্ছেদে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অল্পপিত্ত—চরকে গ্রহণী রোগের অন্তর্নিবিষ্ট। গভিণী, বালক, প্রসূতি ও ধাত্রীর চিকিৎসা—শারীর স্থানের অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত। হস্তোগ মুত্রাঘাত এবং যে সকল শিরোরোগের কথা যথাস্থানে বিবৃত হয় নাই—তাহা বায়ু রোগ ও সিদ্ধি স্থানের নবম অধ্যায়ে উপদিষ্ট। স্তত্রাং চরকে সকল রোগের চিকিৎসাই যে বিবৃত হইয়াছে, তাহা উত্তম বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের বুঝিতে কষ্ট হয় না। চরক বলিয়াছেন, বাতিক, পৈত্তিক ও স্নৈয়িক ভেদে সকল রোগের চিকিৎসাই তিন প্রকার, অতএব চিকিৎসা স্থানে কোনো

রোগের চিকিৎসা, বিবৃত না থাকিলেও লক্ষণ দৃষ্টে তাহার চিকিৎসা হইতে পারে। এ স্থলে উদাহরণ স্বরূপ ডাক্তারি এসিয়াটিক কলেরার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এসিয়াটিক কলেরার আয়ুর্বেদীয় নাম বিস্মটিকা। এই বিস্মটিকার চিকিৎসা চরকে বর্ণিত হয় নাই—কিন্তু ইহার লক্ষণগুলি যদি মিলাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে চরকের মতে ইহার চিকিৎসা অতি সহজে করিতে পারা যায়। এসিয়াটিক কলেরায়—

- ১। বিষ্ঠার বর্ণ আমানির ত্রায় সাদা। চরকের মতে ইহা স্নেহ্যর লক্ষণ।
- ২। হঠাৎ বলক্ষয়। চরকে ইহা বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।
- ৩। সর্কাজ শীতল। চরকে ইহা বাত স্নেহাও পিত্তের লক্ষণ।
- ৪। খালধরা। ইহা বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।
- ৫। নাড়ী দমিয়া যাওয়া। বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।
- ৬। অনবরত ও অসহ্য তৃষ্ণা। বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।
- ৭। অন্তর্দাহ ও অঙ্গ বিকোপ। বাত স্নেহা প্রকোপের লক্ষণ।
- ৮। শ্রাব বর্ণ।—বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।
- ৯। সর্কাজে স্থচীভেদবৎ বেদনা। বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।
- ১০। শিরঃশূল। বায়ু বা বাত স্নেহা প্রকোপের লক্ষণ।
- ১১। চক্ষু ময়। বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।
- ১২। স্বরভঙ্গ। বায়ু বা বাত স্নেহ্যর প্রকোপ।

করা উচিত। যাহাতে তাঁহাদেরও রীতিমত কোষ্ঠ সরল থাকে, এরূপ আহারাদি করিতে হইবে, এবং গোদুগ্ধ পান করিতে থাকিলে, ঐ দুধের সহিত একটু সরও বেশ করিয়া গুলিয়া খাওয়ান আবশ্যক। তন্ত্রি সন্তঃ মল পরিষ্কারের আবশ্যক হইলে পানের বোটা অথবা এক টুকরা নরম সাবান সৰু বাতির মত করিয়া কাটিয়া শিশুর মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলে অল্পক্ষণ মধ্যেই মল পরিষ্কার হইয়া থাকে।

যে সকল শিশুর যকৃতের ক্রিয়ার দোষে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রাতে দশ পনের ফোটা করিয়া ‘কালমেঘের’ রস অথবা শিউলী পাতার রস, ফোটা কত মধুর সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

শিশুর পেট-কামড়ান।

অনিয়মিত আহার বা অতিভোজন কিম্বা অধিক পরিমাণে দুগ্ধ বা দূষিত মাচ্ছন্ত পান করিলে, অথবা পেটের মধ্যে ক্রমি জন্মিলে কিম্বা রীতিমত মল পরিষ্কার না হইলে শিশুদিগের পেটে শূল বেদনা অর্থাৎ পেট কামড়াইতে থাকে। পেটে ব্যথা আরম্ভ হইলে শিশু পেটটাকে শক্ত করে ও হাঁটু গুটাইয়া পেটের উপর চাপ দিতে চেষ্টা করে, কখনও বা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাদিতে থাকে।

আহারের অনিয়মে পেটব্যথা আরম্ভ হইলে গোটাকত যোয়ান, একটু গোলমরিচ ও অতি সামান্য একটু সৈন্ধব লবণ বেশ করিয়া কাটিয়া জলে গুলিয়া খাওয়াইয়া দিলে অথবা ফোটা চার পাঁচ ঘোয়ানের আরক

জল মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিলে তখনই পেটের ব্যথা ভাল হইয়া যায়, হজমও বেশ হয়।

আর যদি শিশুর ভাল দান্ত না, হওয়ার জন্ত, অথবা একেবারে মল বর্জ থাকার জন্ত পেট কামড়াইতে থাকে, তবে পেটে একটু গরম সর্ষপতৈল বা তারপিন তৈল মালিস করিয়া দিবে এবং একটু গরম ত্রাকড়া গুব গরম জলে ভিজাইয়া বেশ করিয়া নিড়াইয়া গরম গরম স্বেদ দিতে থাকিবে। এইরূপ করিলেই সব ভাল হইয়া যাইবে।

অচিরজ্ঞাত শিশুর মলবন্ধের জন্ত পেট কামড়াইতে থাকিলে, একটা “মুক্তাবরী” পাতা রগড়াইয়া বালকের মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে, অথবা পানের বোটার একটু রেড়ির তৈল লাগাইয়া শিশুর মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে—তখনই দান্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে; পেট ব্যথাও ভাল হইয়া যাইবে। সাবানের সৰু বাতি দিয়া দান্ত পরিষ্কারের কথাও পূর্বে বলা হইয়াছে। ডাক্তারেরা এরূপ স্থলে মিসিরিনের পিচকারী দিয়া ‘বাহে’ করাইয়া থাকেন।

আর যদি পেটকাঁচার জন্ত পেট কামড়াইতে থাকে, তবে শিশুর নাভির গর্তটুকু বাদ দিয়া উহার চারিদিকে একটু চূণ লাগাইয়া দিবে; দেখিবে অল্প সময়ের মধ্যেই শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, পেটের ফাঁপ চলিয়া গিয়াছে।

শিশুর উদরাময়।

শিশু সকল জন্মাবার পর হইতেই হুই হইতে পাঁচ ছয় বার পর্যন্ত মলত্যাগ করে, উহা তাহাদের স্বাভাবিক। বেশী বেশী দান্ত হইতে থাকিলে অস্থখ বলিয়া জানিবে।

সকল শিশুরই হেলেবেলায় পেটের অস্থখ হইয়া থাকে । পেটের অস্থখ হইলে শুদ্ধদাত্রী জননী বা ধাত্রীকে বিশেষ নিয়মে থাকিতে হয় । পেটের অস্থখে যে সকল আহারাদি নিষিদ্ধ, সে সকল দ্রব্য জননীকে সম্পূর্ণরূপে পরিভ্যাগ করিতে হইবে এবং যাহাতে মন সর্বদা প্রফুল্ল থাকে, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে । কেন না জননীর মানসিক উত্তেজনা বা অবসাদ ও অনেক সময় শিশুর উদরাময়ের কারণ হইয়া থাকে ।

স্থখ শিশুগণ যে মলত্যাগ করে, তাহার স্নং হৃদয়ে এবং তাহাতে কোন দুর্গন্ধ থাকে না । যদি মল খুব তরল ও মলের বর্ণ সাদা, কাল, সবুজ বা ছানা ছানা মত, কিম্বা ডিম ডিম মত হয়, তবে তাহাতে দুর্গন্ধ থাকে, পেট ফাঁপে, বমি করে ও শিশু খুব ছটফট করে বা স্নান হইয়া যায়, তবে তাহার পেটের অস্থখ বলিয়া জানিবে এবং শীঘ্রই তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবে ।

তত্ত্বপায়ী শিশুর পেটের অস্থখ হইলেই স্নান দেওয়া বন্ধ করিয়া দিবে ও স্নানদ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবে তাহাতে কোন প্রকার দোষ আছে কি না । যদি কিছু দোষ থাকে, তবে (১) পূর্বকথিত উপায় দ্বারা তাহার প্রতীকার করিবে এবং শিশুর আহারের স্তম্ভ পরিসুদ্ধ শটীচূর্ণ (২) অথবা খুব ভাল একতোলা বালি একসের আন্দাজ জলে গুলিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে ; যখন

(১) তত্ত্বচূর্ণ-প্রতীকার প্রকরণে দ্রষ্টব্য ।

(২) 'শটীচূর্ণ' বাছারে কিনিতে পাওয়া যায় । পশ্চিম প্রদেশে পরিসুদ্ধ শটীচূর্ণ 'কীপুর' নামে পরিচিত ।

আধপোয়া আন্দাজ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া একটু একটু করিয়া শিশুকে খাওয়াইতে থাকিবে এবং প্রতিবারে দু'চার ফোটা করিয়া চূর্ণের জল তাহার স্নিহিত মিশাইয়া দিবে ; কিম্বা বালি সিদ্ধ করিবার সময় সামান্য দু'টা ফোয়ান একটু পরিষ্কার জ্বাকড়ায় বাধিয়া, যখন বালি সিদ্ধ করিবে, তখন উহাতে ছাড়িয়া দিবে এবং বালি হইয়া গেলে ঐ ফোয়ানের পুটুলীটা উড়াইয়া লইবে । ইহাতে বালকের খাওয়া শীঘ্র পরিপাক হইবে এবং পেটের অস্থখেরও বিশেষ উপকার হইবে ।

যেসকল শিশু বিলাতি উপায়ে বোতলের দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, তাহাদের প্রায়ই পেটের অস্থখ হইতে দেখা যায় । কেন না বোতল ভাল করিয়া না ধুইয়া সেই শোভাল পুনরায় গবম দুগ্ধ পুখিলেই দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায় । ঐ বিকৃত দুগ্ধ পানে অচিরে বালকের পেট ফাঁপা, বমি ও অজীর্ণদোষ প্রভৃতি দেখা যায় । সুতরাং বালককে প্রথম হইতেই বোতলের দুগ্ধ পান বরাইতে অভ্যাস করান উচিত নয় । তন্ত্রিত শিশুদিগের ক্ষুদ্র যে সকল বিলাতী দুগ্ধ বা খাদ্য প্রদেশে বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে, সে সকল যে অবিকৃত অবস্থায় থাকে, একথাও দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায় না । ঐ সকল কৃত্রিম শিশুখাদ্য বিকৃত বা নষ্ট হইয়াছে কি না, তাহাও সাধারণের বক্রিবার উপায় নাই । যখন সচরাচর দেখা যায় যে, আহারের দোষেই শিশুদিগের উদরাময় ঘটিয়া থাকে, তখন ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া বিলাতী খাদ্য বা দুগ্ধ শিশুদিগের আহারের স্তম্ভ

প্রদান করা বুদ্ধিমানের কৃপা নহে। অনেকেই 'বিলাতি দুগ্ধ' নাম শুনিলেই আনন্দে অধীর হইয়া পড়েন এবং ভালমন্দ বিচার না করিয়াই শিশুদের ব্যবহার করিতে দিয়া থাকেন। আমাদের মতে ঐ সকল কৃত্রিম শিশুখাদ্য শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রায়ই অহুকুল হয় না। সেজন্য বিলাতী খাদ্যভোজী শিশুগণের যত্নের দোষ, উদরাময় ও অকাল মৃত্যু পর্য্যন্ত যত অধিক দেখা যায়, তত রোগের বাহ্যিক বা অকালমৃত্যু এদেশীয় গোছপায়ী শিশুগণের দেখা যায় না। খাদ্যের কৃত্রিমতার জন্য সহরের শিশুর মৃত্যুসংখ্যাও পল্লীশিশুর মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়া আমাদের ধারণা। এখনও পল্লীগ্রামে মাতৃত্বনে দুগ্ধের অল্পতা হইলে গৃহস্থগণ স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু সহরে মাতৃত্বনে প্রকৃত দুগ্ধ থাকিলেও যখন সে দুগ্ধের পরিবর্তে বিলাতী বিস্কট কৃত্রিম দুগ্ধ ভূমিষ্ট হইবামাত্রই শিশুকে পান করান হইয়া থাকে, তখন দুগ্ধের অভাব হইলে তো কথাই নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে,—আহারের দোষেই সাধারণতঃ শিশুদিগের পেটের অসুখ হইয়া থাকে। সুতরাং শিশুদিগের আহার সম্বন্ধে জননী বা খাদ্যিককে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত সন্তান স্তনদুগ্ধ পান করিবে, ততদিন জননী বা খাদ্যিকের অসুস্থিত আহার প্রভৃতি পরিত্যাগ করা একান্ত কর্তব্য এবং স্তনপায়ী শিশুর অজীর্ণ বা উদরাময় দেখা দিলে জননীকেও আহাৰাদি সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম প্রতিপালন

করিতে হইবে। যে সকল শিশু গোছপান করে, তাহাদের গোছপান বন্ধ করিয়া শটী বা বালি প্রভৃতি দিতে হইবে, এবং শিশুকে অত্যন্ত দুর্বল বিবেচনা করিলে বালি বা শটীর সহিত অল্প পরিমাণে দুগ্ধ মিশাইয়া দিতে পারা যায়।

অতঃপর আমরা উদরাময়ে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অব্যর্থ মুষ্টিযোগ সকল প্রকাশ করিতেছি।

উদরাময়।

সজোজাত শিশু প্রথমে মায়ের স্তনদুগ্ধ খাইয়া যে দিনে চার পাঁচ বার কি ছয়বার পর্য্যন্ত মলত্যাগ করে তাহাকে সাধারণতঃ পেটের অসুখ বলা হয় না। কেন না তখন পাঁচ ছয় বার মলত্যাগই স্বাভাবিক। যদি তাহার বেশী মল হয়, পেট কামড়ায়, সেজন্য শিশু প্রায়ই কাদিতে থাকে তখন বা পেট ফাঁপে, কখন কখন বা দুগ্ধ খাইয়াই ছানা ছানা বমি করিয়া ফেলে। শাদা শাদা কিংবা সবুজ সবুজ অথবা নানা রঙের বহুবার মলত্যাগ করে ও শিশুর মুখ চোক বসিয়া যায় বা ঘ্রান হয়, তবেই শিশুর উদরাময় হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

উদরাময় হইলেই শিশুর আহাৰের দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যেহেতু আহাৰের দোষেই সাধারণতঃ শিশুদিগের পেটের অসুখ হইয়া থাকে। এজন্য স্তনপায়ী শিশুর পেটের অসুখ হইলেই স্তনদাত্রী জননী অথবা খাদ্যিক আহাৰ সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করিতে বলিবে, এবং যাহাতে তাহাদের মানসিক কোনও প্রকার অশান্তি বা চিন্তা প্রভৃতি না জাগে, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিবে।

চিন্তা, রাজিভাগরণ, দ্বিবাশ্রিতা, শোক, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, দুগ্ধদ্রব্য জীর্ণ না হইতেই পুনরায় ভোজন প্রভৃতি নানাবিধ অস্বাস্থ্যকর আচরণের দ্বারা জননীগণের আভাবিক স্বাস্থ্যের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে এবং সেজন্য তাঁহাদের স্তনদুগ্ধও বিকৃত হইয়া থাকে। সেই বিকৃত দুগ্ধপান করিলে শিশুরও উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হয়। সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেও সর্বপ্রথমে তত্তদাত্ত্রী জননী বা খাত্ত্রীর স্বাস্থ্য কিরূপ আছে দেখিতে হইবে এবং আবশ্যিক মত তাঁহাদের আহারাদির বিশেষ পরিবর্তন করিয়া দিতে হইবে।

যে সকল সন্তান বেশীর ভাগ গোদুগ্ধ অথবা বিলাতী খাত্তের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের যদি পেটের অস্বাস্থ্য দেখা যায়, তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ গোদুগ্ধ বা বিলাতী দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। অনেক সময়ে বিলাতী খাত্ত বা টিনের দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিতেই শিশুর উদরাময়ের নিবৃত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। বিলাতী খাত্ত বা দুগ্ধ সব সময়েই যে অবিকৃত অবস্থায় এদেশে আসিয়া থাকে, এমন তো মনে হয় না।

যে সকল বালকের গোদুগ্ধ ব্যতিরেকে অন্য প্রকার খাত্ত প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগের পেটের অস্বাস্থ্য হইলে, গোদুগ্ধের বিশুদ্ধ জল ও দুগ্ধ এবং তাহাতে একটুকরা বেলশুঠ (কচিবেল খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইয়া লইলেই বেলশুঠ হয়) আর গোটাকত ঘোয়ান মাকড়সাতে বাধিয়া সবগুলি সিদ্ধ করিতে দিবে এবং খানিকটা জল থাকিতেই

দুগ্ধটা নামাইয়া লইয়া বেলশুঠ ও ঘোয়ান তাহা হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। সেই দুগ্ধ একটু বালি, সাণ্ড বা শটর পালোর সহিত মিশাইয়া বারে বেশী ও মাত্রায় কম করিয়া খাইতে দিলেই আহারের জন্ত আর শিশুর কোন প্রকার পেটের অস্বাস্থ্য হইবার ভয় থাকিবে না।

উদরাময়ের চিকিৎসা।

বিকৃত মাতৃদুগ্ধ পান করাতে যে সকল শিশুর পেটের অস্বাস্থ্য দেখা দেয় এবং শরীরও একটু জ্বর জ্বর বলিয়া মনে হয়, তাহাদিগকে,—

১। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটা ১০ ছুই আনা পরিমাণে লইয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া বুইয়া শীলে ছেঁচিবে এবং একটা মাটির পাত্রে আধপোয়া জল দিয়া কাঠের জালে সিদ্ধ করিবে। যখন জল মরিয়া আধছটাক আনান্ন অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহা নামাইয়া ছাঁকিয়া একবারে অথবা দুই তিন বারে শিশুকে পান করাইয়া দিবে। অথবা,—

হরিদ্রা, দেবদারু, সবুলকাঠ, গজপিপুল ব্রহ্মী, কণ্টকারী চাকুলে ও শুলফা এই সকলের চূর্ণ সমান পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মিশাইবে এবং তিন রতি হইতে ছয় রতি মাত্রায় দিনে তিন বার মধু দিয়া খালকঁকে খাওয়াইবে। যে সকল শিশু বহুদিন হইতে পেটের অস্বাস্থ্যে কষ্ট পাইতেছে, শরীর খুব দুর্বল ও কিছুই খাইতে চায় না, তাহাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

১৩। শ্বাস। বায়ু বা বাত শ্বাসের প্রকোপ।

১৪। মুত্রাঘাত। বায়ু জন্ত।

১৫। আখ্যান। বায়ু জন্ত।

১৬। তন্দ্রা। বায়ু বা বাত শ্বাস জন্ত।

এজন্ত স্থির করা যাইতে পারে, এই রোগ বাত শ্বাসাঘাত ও ক্ষীণ পিত্ত সন্নিপাত। অতএব তাপ ও শ্বেদাদি এবং দশমূল্যাদি উহার ঔষধ। সকল রোগের চিকিৎসাই এই রূপ লক্ষণ মিলাইয়া করা যাইতে পারে। ফল কথা চরকের চিকিৎসা অপূর্ণ চিকিৎসা। এ চিকিৎসার তুলনা নাই। জগতের কোনো চিকিৎসা শাস্ত্রই চরকের সমকক্ষ হইতে পারে

না, কিন্তু হৃৎশ্বের, বিষয় এ হেন অমূল্য চিকিৎসা এখন নৃপপ্রায়। ভারতবাসীর, দুর্বল ইন্দ্রিয়, অকাল বার্ধক্য ও অকাল মৃত্যু চরকের চিকিৎসারই লুপ্ত ভাবের জন্ত,—ভাক্তার ওয়াইজ এবং আমেরিকাবাসী ইংরাজেরা পর্যন্ত এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই আমরা এ কথা বুঝিতেছি না, তাই আমরা মহামূল্য রত্ন ভ্রমে আচ্ছ কাচের আদর করিতে শিখিয়াছি। এক কথায় আমাদের দুর্গতি—আমাদের মরণের পথ আমরাই যে পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছি—ইহাই খাটি সত্য কথা। ইহার প্রতিকূলে বলিবার কিছুই নাই।

শিশু-চর্চা।

(পূর্বাহ্নত্বিত্তি)

[কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেনগুপ্ত কাব্যভীর্থ]

চোক উঠা।

প্রসবের পরেই অথবা কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা বা ঘোঁয়া প্রভৃতি লাগিয়া অনেক শিশুর চোক উঠিতে দেখা যায়। চোক উঠিলে, চোক ফোলে, লাল হয়, পিচুটা কাটে, জল পড়ে, চোক জড়িয়া যায়, সেজন্য শিশুর অত্যন্ত কষ্ট হয়, চোকের যত্নপ্রায় সর্বদা কাঁদিতে থাকে ও আলোর নিকে তাকাইতে পারে না।

অনেক স্থলে রমণীর কুচরিত্র স্বামীসহ-বাসে বিষমহে (গণোরিয়া) প্রভৃতি, দুষ্টরোগ হইতে দেখা যায়। যদি ঐ দুষ্ট রোগের জন্ত প্রসবকালে শোণিত-পুষ্টিাদি শ্রাব বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ঐ দূষিত দ্রব্য সংযোগে চোক উঠার মত হইয়া থাকে। তাহাতে বিশেষ যত্ন করিয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা না করাইলে বালকের চোক একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।
তন্ত্ৰি,—

সাধারণ চোক উঠা, হইলে,—আমলা, হরীতকী ও বহেড়া খানিকটা জলে ভিজাইয়া রাখিবে; পরে উহা বেশ করিয়া দুই তিন পুঙ্ক কাপড়ে ছাঁকিয়া সেই জল দ্বারা বালকের চোক দু'টা ভাল করিয়া আস্তে আস্তে ধুইয়া দিবে এবং ঐ ত্রিফলার জল এক ছটাক আন্দাজ লইয়া তাহাতে একরতি আন্দাজ ফিটুকিরি মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখিবে, এবং মাঝে মাঝে ঐ জল তিন চার ঘণ্টা বালকের চোকের ভিতর দিবে। আর মনসাসিঞ্জের পাতায় কাজল করিয়া বালককে কাজল পরাইয়া দিবে, এবং রক্তচন্দন ঘষিয়া বালকের চোকের উপর চারিদিকে প্রলেপ দিবে। অথবা,—দারুহরিজা, মূতা ও গেরিমাটি ছাগলের দুধে বেশ চন্দনের মত করিয়া ঘষিয়া চোকের উপর প্রলেপ দিবে। আর যদি চোক বেশী বেশী ফোলা বলিয়া মনে হয়, তবে একখানা আলতা স্তনের দুধে ভিজাইয়া প্রদীপের শিখায় গরম করিয়া ধীরে ধীরে চোকের উপরে স্বেদ দিবে। এইরূপ দিনকতক করিলেই চোক উঠা সারিয়া যাইবে। আর যদি এই সকল ব্যবস্থায় বিশেষ কোন ফল না হয়, দিন দিন চোকের অবস্থা খারাপ হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক দিয়া চিকিৎসা করাইবে; নচেৎ পরিণামে বালকের চক্ষু দুইটা জন্মের মত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে।

শিশুর মূত্রক্ৰুদ্ধতা।

স্বেদোজাত শিশুর ঘন ঘন প্রস্রাব করা স্বাভাবিক। অতএব শিশু একেবারে প্রস্রাব

না করিলে অথবা ফোটা ফোটা প্রস্রাব করিতে থাকিলে, তাহাকে রোগ বলিয়া জানিবে।

যদি শিশুর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে পেট ফুলিয়া উঠে এবং তলপেটে মূত্রাশয়ে চাপ দিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে। তা' ছাড়া, প্রস্রাব আটকাইয়া যাওয়াতে শিশু অত্যন্ত অস্থির হয়, পা দুইটা গুটাইয়া পেটের কাছে রাখে ও সর্বদা কাঁদিতে থাকে, ঘুমাইতে পারে না, কেবল কৌথায় এবং সেজন্ত কখন কখনও শিশুর জরভাব হইতেও দেখা যায়।

যদি দেখা যায় বালকের মূত্রাশয়ে মূত্র জমিয়া রহিয়াছে অথচ প্রস্রাব হইতেছে না, তাহা হইলে, এক টুকড়া কাপড় (গরম কাপড়ের হইলেই ভাল হয়) গরম জলে ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া লইয়া তলপেটে মূত্রাশয়ের উপর সেক দিতে থাকিবে। এইরূপ কিছুক্ষণ করিলেই প্রস্রাব হইয়া যাইবে। অথবা,—একটা গাম্ভায়া বালকের সম্মত অল্প গরম জলে বালকের কোমর পর্যন্ত ডুবাইয়া বসাইয়া দিবে তাহাতে প্রস্রাব হইবে।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য।

সভোজাত শিশুর দিনে পাঁচ ছয়বার দাঙ্গ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি শিশু দিনান্তে একবার কি দুইবার অথবা একদিন অন্তর শক্ত শক্ত বাহে যায়, তাহা হইলে উহার প্রত্যেককার করা উচিত। নচেৎ নানাবিধ রোগ জন্মিয়া শিশুর স্বাস্থ্য হানি করিয়া থাকে।

প্রথমতঃ শিশুর জননী বা ধাত্রীর আহাৰাদি সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন

২। ধাইকল, বেলেচুঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মিশাইবে এবং আধ আনা হইতে এক আনা,—অথবা বালকের একটু বয়স হইলে দুই আনা পর্যন্ত মাত্রায় দিনে তিন বার মধু দিয়া চাটাইয়া খাওয়াইয়া দিবে। ইহাতেও বালকের পেটের অস্থখ, বমি ও জ্বর প্রভৃতির বিশেষ উপকার হয়। শিশুর জ্বর না থাকিলেও এই ঔষধ দিতে পারা যায়। অথবা,—

৩। মুখা, পিপুল, আতাইচ ও কাকড়া-শুদী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশাইবে এবং এক আনা মাত্রায়, দিনে তিন বার মধুর সহিত মিশাইয়া শিশুকে লেহন করাইবে। ইহাতে জ্বরাতিসার অর্থাৎ জরের সহিত পেটের অস্থখ বমি ও কাসি প্রভৃতি অচিরে আরোগ্য হয়। অথবা—

৪। আমড়ার ছাল, আমছাল ও জাম-ছাল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া এক আনা মাত্রায় দিনে তিনবার অথবা দুইবার মধু দিয়া বালককে সেবন করাইলে শিশুদের পেটের অস্থখ ভাল হইয়া থাকে। অথবা—

৫। যে সকল শিশু অনবরত ভেদ ও বমিতে বিশেষ কাতর হইয়া থাকে, তাহাদিগকে,—

ফুল, আমকল, কাকমাটী ও কয়েদবেল,— ইহাদের পাতা বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে অচিরে আরোগ্য লাভ করিয়া থাক।

শিশুর উদরাময়ের জননীর পথ্যাপথ্য।

যে সকল জননীর সন্তানের পেটের অস্থখ

হইয়াছে, তাহাদিগকে যদি ঐ পীড়িত সন্তানকে অনদ্রব্য পান করাইতে হয়, তাহা হইলে তাহারা নিম্নলিখিত পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন—

পথ্য—প্রাতে দেড় প্রহরের মধ্যে অর্থাৎ দশটা আশ্রায় সময়ের মধ্যে,—পুরাতন চালের বেশ স্থাপক ভাত, মসুরীরদাল অথবা কৈ-মাগুর মাছের ঝোল এবং পটোল কচি-বেগুন, কাঁচকলা, ডুমুর ও মোচা প্রভৃতির তরকারী খাইতে পারিবেন। মাছের ঝোলের সঙ্গে গোটাকতক গন্ধভাতুলের পাতা বাটিয়া দিয়া ভৈর্যারী করিয়া লইতে পারিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। এতদ্বির ইচ্ছা করিলে ভাতের সঙ্গে খোলও খাইতে পারেন। আর রাজিতে,—শটীর পালো, বালি, যবের মণ্ড কিংবা পানিকলের পালো খাইবেন। জলখাবারের মধ্যে,—সকালে মিছরীর গুড়া দিয়া বেলপোড়া অথবা দাড়িম, কেশুর ও পানিকল এবং বৈকালে বেলের মোরব্বা।

অপথ্য—ঘৃতপক ও গুরুপাকদ্রব্য, লকার ঝাল অধিক জলপান, গম, মাষকলায়, শাক, আকের গুড়, নারিকেল অধিক লবণাক্তদ্রব্য, গায়ে বেশী করিয়া তেল মাখা, রাজিভাগরণ ‘পটে’ ও ভাজা পোড়া দ্রব্য, দুই বেলা স্নান বা গা ধোয়া প্রভৃতি।

তাহারা সন্তানের স্বদীর্ঘজীবন ও অস্থখ স্বাস্থ্য কামনা করেন, তাহারা ছেলের অস্থখে নিজেদের কর্তব্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কেহ যেন চিকিৎসক ও খাদ্যীর উপর শিশুর ভার দিয়া মাছুকর্তব্য হইতে নিশ্চিন্ত না হইয়েন।

আয়ুর্বেদোক্ত জীবনীয়গণ ।

[ডাঃ শ্রীশরৎকুমার দত্ত এল, এম, এস]

মেদা ও মহামেদা ।

“মহামেদাভিঃ কন্দো মোরদাদৌ প্রজায়তে ।

মহামেদাবনৌ মেদা তাদিত্যুক্তং মুনীশরৈঃ ।

উক্তাকনিভঃ কন্দো লতা-জাতঃ স্থণা-ভুবঃ ।

মহামেদাভিধো জ্ঞেয়ো মেদা লক্ষণমুচ্যতে ।

উক্তকন্দোনমছেতো মেদোদাতুমিব শ্রবেৎ ।

যঃ স মেধিতি বিজ্ঞেয়া ভিজ্ঞাসা তৎ পরৈর্জনৈঃ

স্বল্পপর্ণা যণিচ্ছিত্বা মেদা মেদোভবাধবাবা ।

মহামেদা বহুচ্ছিত্বা জিহদন্তী দেবতা-মণিঃ ।

মেদাযুগং গুরুবাহু বৃদ্ধং স্তম্ভকফাবহম ।

বৃহৎ শীতলং পিত্ত-রক্ত বাতজর প্রপূং ।

গুণও আময়িক প্রয়োগ । মেদা ও মহামেদা

গুরু বাহু, স্তম্ভজনক, তনুহৃৎ-বর্ধক, কফকারক,

পুষ্টিকর, শীতল এবং রক্ত-পিত্ত ও বাতজর

বিনাশক ।

মেদা (Intestines) শব্দের অর্থ (Fat)

ও মহামেদা শব্দও প্রায় একার্থ বোধক ।

আমাদের শরীরে Intestines হইতে চর্নি

রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে । Intestines

এ যে সকল Villi আছে, তাহারা চর্নি

প্রথমতঃ মর্দিড (Emulsification) ও

পরে Saponification হইয়া Portal

System এ প্রবেশ করে ও তথা হইতে

রক্তে মিশ্রিত হয় । Intestinal glands

হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয় (Succus)

Entericus) আমরা খাদ্য অব্যের সহিত

যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করি, সেই রস তৎসমুদায় বিনষ্ট করে ।

মহামেদা (Liver) । আমাদের

শরীরে বহুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র ।

তাহারা অনেক প্রকার কার্য হইয়া থাকে ।

আমরা যে সমস্ত দ্রব্য আহার করি, তাহার

সারাংশ প্রথমতঃ রসরূপে শরীরে প্রবেশ

করে । সেই রস বহুতের ভিতর দিয়া

প্রবাহিত রক্তরূপে সংপিণ্ডে যায় । এই যন্ত্রই

রক্তের লাল কণিকা প্রস্তুতের সাহায্যকারী ।

এই যন্ত্র হইতে Urea প্রস্তুত হইয়া থাকে

এবং এই ureaই বাতজরের প্রধান কারণ ।

পাকশয়ে (Intestines) আমাদের ভুক্ত

দ্রব্যের উপরি যে ক্রিয়া আরম্ভ হয়, সেই ক্রিয়া

যকূতে শেষ হয় । সুতরাং Intestines ও

Liver উভয়েই অনেকটা এক প্রকার ক্রিয়া

সম্পাদন করে তাহা সহজেই অনুমিত হয় ।

পাকশয়ের রস (Succus Entericus)

যে রূপ অনেক বিবাক্ত দ্রব্য নষ্ট করে, পিত্ত

ও তজ্জপ অনেক দ্রব্যিত জিনিস নষ্ট করিয়া

থাকে ।

কাকোলী ও কীর কাকোলী ।

জায়তে কীরকালী মহামেদোন্তব স্থলে ।

যত্র ত্রাং কীর কাকলী কাকোলী তত্র জায়তে

গীবরীসদৃশঃ কন্দঃ স্কীরঃ প্রিয়গন্ধবান ।

সাপ্রোক্তা কীরকাকোলী কাকোলীলিঙ্গমুচ্যে

বধা ত্রাণ কীরকাকালী কাককাল্যপি তথা
ভবেৎ ।

এবা কিকিং ভবেৎ কৃষ্ণা ভেদোহং-

মুভয়োরপি ।

কাকালী বায়সোলী চ বীরা কামহিকা তথা ।

লা শুক্লা কীরকাকালী বয়হা কীরবলিকা ।

কথিতা কীরণীধীরা কীরশুক্লা পরম্বিনী ।

কাকালী যুগলং শীতং শুক্লং মধুরং শুক্লং ।

বুংহণং বাতদাহাষ পিত্তশোষ জরপাংহ ॥”

ত্রব্যগুণম্ ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ । ইহার শীত-
বীৰ্য, শুক্লজনক, মধুর রস, শুক্ল ও পুষ্টি-
কারক এবং বাত, দাহ, রক্তপিত্ত শোষ ও
জর নাশক ।

কীরকাকালী ছেদন করিলে এক প্রকার
আটা নির্গত হয় এবং ইহা এক প্রকার
মনোহর গন্ধবিশিষ্ট ।

কীরকাকালী (Pancreas) পাশ্চাত্য
চিকিৎসা শাস্ত্রে Pancreas ঔষধ ও খাদ্য
রূপে উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হইতেছে । ইহা
হইতে সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য Sweet bread
প্রস্তুত হয় । এই রসের অভাব মধুমেহ
(Diabetes) ব্যারামের কারণ বলিয়া
অনেক পণ্ডিত নির্দেশ করিয়াছেন এবং উক্ত
ব্যারামে ইহার রস (Trypsogen) ব্যবহারে
অনেক ক্ষুদ্র পাওয়া যায় ।

কাকালী (Spleen) ফিজিওলজী
পাঠে জানা যায় যে, Splenic Internal
Secretion Pancreatic Secretion এর
সহিত মিলিত হইয়া একত্রে লিভারে যায়
এবং এই Splenic Secretion Albu-
minoid জিনিসের বিধ হইতে শরীরকে রক্ষা

করে । ইহা রক্তের খেত কণিকা প্রভৃতির
সাহায্য করে । রক্তের এই খেত কণিকাগুলি
(white corpuscles) আমাদেরকে যে
অনেক ব্যারামের হাত হইতে নিস্তার করে—
ইহা ক্রম গত্য ।

ত্রব্যগুণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেদা ও
মহামেদা ক্ষেত্রে কাকালী ও কীর কাকালীর
উৎপত্তি । Spleen এবং Pancreas
উভয়েই মেদা ও মহামেদা (Intestines
ও Liver) ক্ষেত্রে প্রকৃতই উৎপত্তি হইয়াছে
কারণ Spleno-Pancreatic Duct
Portal System গিয়া মিলিত হইয়াছে ।

জীবন্তী ।

আয়ুর্বেদে জীবন্তী নামে কতকগুলি
বস্ত্ত বর্ণায় । জীবন্তী এক প্রকার শাক
বিশেষ । হরীতকী ও শুড়ুচী এই দুইটি
ত্রব্যের জীবন্তী আখ্যান দেখিতে পাওয়া
যায় । ত্রব্য গুণে ইহার নিম্নলিখিত বর্ণনা
আছে ।

“জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা ।
মল্লান্যামখেয়া চ পাকশ্রেষ্ঠা পরম্বিনী ।
জীবন্তী শীতলা স্বাদুঃ স্নিগ্ধা ঘোষজরাপহা ।
চক্ষুশ্চ গ্রাহিকা বল্যা লঘী ধাতুবিবর্ধিনী ।
বৃদ্ধা কফকরী শ্বতবর্ধিনী রক্ত-পিত্তহা ।
বাতং ক্ষয়ং জরংদাহং নেত্র রোগং জিহ্বাধিকম্ ।
রক্তদোষং ভূত বাধং পিত্তকৈব বিনাশয়েৎ ।
ফলং চাস্যা ধাতু-বৃদ্ধিকারকং মধুরং শুক্ল ॥”

ত্রব্যগুণম্

“গুণও আময়িক প্রয়োগ । ইহা শীতবীৰ্য,
মধুর রস মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, বসায়ন,
চক্ষুর হিতকর, গ্রাহী, বলকারক, লঘু,

ধাতুর্বর্ধক, সুখ্য, ককজনক, ও পারদবর্ধক
এক ইহা দ্বারা, পিত্ত, বাতরোগ, ক্রম, অন্ন,
দাহ, মেজরোগ, জিহোষ, রক্তদোষ, ভূতবাধা
ও পিত্ত দোষ নিবারিত হয় ।”

জীবন্তী (kidney) যেৰূপ জীবন্তী রক্তের
স্থিত জিনিস নষ্ট করে, তজ্জপ kidney
Extract মুছা ও Urwmiya প্রভৃতি রক্ত-
দুষ্টি জনিত ব্যাধির উপশম করে । শরীরের
স্থিত পদার্থ নির্গত করিবার জন্য মূত্রযন্ত্রের
অত্যধিক চালনা জনিত Chronic Brights
Disease প্রভৃতি যে সব ব্যাধির উৎপত্তি
হয়, ইহার ব্যবহারে সেই সকলের উপশম
হইয়া থাকে । ইহার (kidney) আবাদ
হুয়াচু, ইহাই জীবন্তী ।

যষ্টিমধু ।

“যষ্টিমধু তথা যষ্টিমধুকং ক্লীভকং তথা ।

অন্তঃ ক্লীভনকং তন্তু ভবেৎ তোয়ে মধুলিকা
যষ্টির্মিমা গুরুঃখাদী চক্ষুঃশা বলবর্ণকঃ ।

হুনিষ্ঠা শুক্লা কেত্ৰা স্বৰ্ণা পিত্তানিলাশজিৎ ।
ক্লণশোধবিবজ্জদি তুকাগ্নানিক্ষয়াপহা ।”

শোষদাহাকচিরী চ কাসানান্ত বিনাশয়েৎ ॥

যষ্টিমধু (Thymus gland) মনুজের
বাল্যজীবনে দ্রব্যগুণ Thymus gland
এর ক্রিয়া বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইয়া
থাকে । ইহা অস্থিসমূহে Phosphorus
প্রদান করিয়া তাহাদের পুষ্টিসাধন করে ।
ইহার অভাবে Rickets প্রভৃতি ব্যারামের
উৎপত্তি হয়, Thyroid gland এর কার্যের
অভাব উপস্থিত হইলে ইহা তাহার কার্য
অনেক অংশে পূরণ করে । Rickets
ব্যারামে শরীরের পুষ্টি হয় না যষ্টিমধুরও
করনীয়ক গুণ আছে ।

জীবনীয়গণের মধ্যে প্রথম আটটাকে
অষ্টবর্গ বলে ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।
যেৰূপ এই আটটির মধ্যে দুইটা জিনিসের
ক্রিয়া একরূপ, তজ্জপ প্রাণীশরীরস্থিত ঠীটা
জিনিসের মধ্যে Adrenal ও Pituitary
body, Thyroid ও ovary বা Testicle,
Spleen ও Pancreas, Intestines or
Liver ২২টা জিনিসের ক্রিয়া যে একরূপ
ইহা উল্লিখিত হইল । যেৰূপ জীবনীয়গণের
মধ্যে জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই দুইটির পৃথক
পৃথক বর্ণনা আছে, সেইরূপ প্রাণীশরীরস্থিত
জিনিসগুলির মধ্যে Kidney ও Thymus
এই দুইটির পৃথক পৃথক বর্ণনা দেখিতে
পাওয়া যায় ।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে,
জীবনীয়গণের ক্রিয়া প্রধানতঃ ক্রম ও রক্তদুষ্টি
নিবারক এবং অধিকাংশের ক্রিয়াই প্রায়
একরূপ, বর্ণনায় সামান্ততঃ প্রভেদ আছে ।
প্রাণীশরীরস্থিত পদার্থগুলিরও ক্রিয়া রক্তদুষ্টি
ও ক্রম নিবারক এবং উহাদের ক্রিয়ার বর্ণনায়
ও বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না । মনুজ
শরীর পঞ্চভূত হইতে সৃষ্ট হইয়াছে । ইহা
যে যে উপাদানে গঠিত, উদ্ভিদ জগতে সেই
সেই জিনিস থাকি অসম্ভব নহে । আর্ধ্য স্ব-
গণ প্রধানতঃ হিমালয় ও তরিকটবর্তী গহন
কাননে বাস করিতেন । তাঁহারা ঔষধ সম্বন্ধে
এত উন্নতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন
যে মনুষ্য শরীরের যে যে অংশ যে যে
উপাদানে নির্মিত, সেই সেই উপাদান তাঁহারা
উদ্ভিদ জগতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । আমরা
সেই সমস্ত মহামূল্য বস্তু হারাইয়া নিশ্চেষ্ট
আছি । সৌমলতাও এইরূপ একটা অমূল্য

দুগ্ধ ঔষধ । কিন্তু ছাণ্ডের বিষয় আজকাল মহাবিশ্বের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে ।
বাছারে অনেকেই সোমলতারিষ্ট প্রস্তুত ইহা দেশের শিকিত মহোদয়গণের উপর
করিতেছেন । আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে পূর্বা নির্ভর করিতেছে ।
বহাণ আনিতে হইলে পুনঃ আবাদগকে

প্রাচীন চিকিৎসকের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ।*

[কবিরাজ শ্রীহিন্দু ভূষণ সেনগুপ্ত, এচ, এম, বি]

(পূর্বাভ্যুত্থি)

অরে—

১৯। কটুকী, মুখা, যবতণ্ডুল, আকনাড়ি ও কটুকল ইহাদের কাথ পিত্তজরনাশক । এই ঔষধ আমরা বহুস্থলে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি ।

২০। গুলক, ক্ষেপাঁপড়া ও সেকালিকা পত্র—এই সমস্ত ত্রব্য একত্র খেঁতো করিয়া কলার পড়ে অড়াইয়া, তাহার উপর অল্প মাটির লেপ দিয়া, অগ্নিতে পুটদগ্ধ করিয়া শীতল হইলে তাহার রস করিয়া সেবনে বহুকাল জ্বাত জ্বর আরোগ্য হয় ।

২১। গুলক, হেলেকা, পটোলপত্র, ধানকুনি ও ক্ষেপাঁপড়া উপরি লিখিত প্রণালীতে সেবনে ছুরারোগ্য যে বিষম জ্বর তাহাও ৭৮ দিনে আরোগ্য হয় । এই ঔষধ দুইটা আমাদের বহু প্রীকিত । এই বোগ দুইটা বিষম জ্বরের অমোঘ ঔষধ ।

২২। ভূকরাজ মূলের সাতটা খণ্ড করিয়া, এক একটা খণ্ড এক টুকরা আদার সহিত সেবন বিষম জ্বর নষ্ট হয় ।

২৩। পিপুল, পিপুল মূল, চৈ, চিতামূল ও শুঠ ইহাদের কাথ—বাতশ্লেষ জরনাশক ।

২৪। মুখা, বাসক, গুলক, শুঠ, বালা, ক্ষেপাঁপড়া, হরীতকী, কণ্টকারী ও ছুরালতা ইহাদের কাথ বাতশ্লেষ জ্বর নষ্ট করিতে অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন ।

২৫। বেলছালের কাথ—বাতশ্লেষ জ্বর হিতকর ।

২৬। বাকসহাল, কণ্টকারী ও গুলক—ইহাদের কাথ মধুর সহিত সেবনে কফজর নষ্ট হয় । কাসেও ইহা সেবনে উপকার হয় ।

২৭। ক্ষেপাঁপড়ার কাথ পান করিলে পিত্ত জ্বর নষ্ট হয় । পিত্তজ্বরে আমরা দুই তোলা ক্ষেপাঁপড়া—অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন

* আমার নিজস্ব ইটালির বনাবনত কবিরাজ কবিরাজ বর্গার ঔষধের নিয়মানুসারে বহাণের পরীক্ষিত ঔষধাবলীর জর্ণ পুঁথি হইতে সংগৃহীত ।—লেখক ।

করাইতে উপদেশ দিয়া বেশ ফল পাইয়াছি ।

হিকায়—

২৮। কুলের আঁটার খাঁস, সৌবীরাঙ্গন, বৈচূর্ণ্য একত্রে মধুর সহিত লেহন করিলে হকা উপশমিত হয় ।

২৯। শুঁঠ ও হরীতকী বাটিয়া উক জলের সহিত পান করিলে হিকা নষ্ট হয় ।

৩০। ববকার ও মরিচ বাটিয়া উক জলের সহিত পান করাইলে হিকা প্রশমিত হয় ।

৩১। কাঁচা হরিজ্ঞার পত্র তামাকের জ্বার কলিকাতে সাজিয়া অগ্নি সংযোগে তামাকের জ্বার ধূম পান করিলে প্রবল হিকায় উপকার দর্শে ।

৩২। অর্জুনছালের কাথ পান করিলে হ্রস্বোগের শান্তি হয় । ছালের পরিমাণ দুই তোলা, জল অর্জুনের, শেষ অর্ধ পোয়া ।

৩৩। শালপাণি ও বেড়েলার কাথ কিকিং মিছরির সহিত সেবনে হ্রস্বোগের উপকার হয় । ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত ।

রক্তগুণে—

৩৪। দুইতোলা আমলকীর রস এক আনা মরিচ চূর্ণ সহ সেবনে রক্তগুণ ভাল হয় ।

বমন রোগে—

৩৫। খেতচন্দন, বেণার মূল, বালা, শুঁঠ ও বাসক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চাউল খোয়া জলের সহিত ও সিদ্ধির সহিত পান করিলে বমন নিবৃত্তি হয় ।

৩৬। হরীতকী চূর্ণ মধুর দ্বারা লেহন করিলে বমন নিবারিত হয় ।

ব্রহ্মভেদে—

৩৭। দারুচিনি, মৃগা, এলাইচ ও মনে ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া—কিকিং মধুর সহিত জিহ্বা দ্বারা লেহন করিলে ব্রহ্মভেদ নষ্ট হয় ।

৩৮। ত্র্যম্বকশাকের রস কিকিং মধুসহ এবং রচ, হরীতকী, বাসক, পিঙ্গলী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবনে ব্রহ্মভেদ বিনষ্ট হয় । সাত আট দিন সেবনে কঠোর পরিশ্রুত হইয়া থাকে । আমরা অনেক রোগীকে এই যোগ সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি ।

৩৯। কৃষ্ণ তিল বাটা ২ তোলা পরিমাণ, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনে অর্শে উপকার হয় ।

৪০। হরিজ্ঞা ও ঘোষালতা চূর্ণ সর্বপ তৈল দ্বারা লেপন করিলে গুদাকুর নষ্ট হয় ।

৪১। পিপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষ ফল এই সকল মনসা পাতার রস ও আকন্দের কীর দ্বারা গুদাকুরে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয় । এই ঔষধ আমরা ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল পাইয়াছি ।

রক্তপিত্তে—

৪২। বাসক পাতার রস অর্দ্ধছটাক কিকিং মধু সহ সেবনে রক্তপিত্ত নষ্ট হয় ।

৪৩। বাসক, কিসমিস ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া—চিনি ও মধু সহ পান করিলে রক্তপিত্ত নষ্ট হয় । ইহা আমরা কাসে, কৃমিসে ও রক্তপিত্তে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে—

৪৪। আমলকী যুতে ভাজিয়া উত্তমরূপে পেচন করিয়া মৃতকে লেপন করিলে

নাসিকা হইতে রক্ত আর বিনষ্ট হয়। ইহাও আমাদের বহু পরীক্ষিত ।

যক্ষ্মা—

৪৫। জিকটু (শুঠ, পিপ্পল, মরিচ,) চূর্ণ সমভাগে দুই আনা মাত্রায় লইয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় গ্লেপন করিলে যক্ষ্মা ভাল হয়। এই ঔষধ দীর্ঘ কাল ব্যবহার করিতে হয়।

৪৬। গুলক, ক্ষেপাঁপড়া, শুঠ, পলতা ও বেল ছাল ইহাদের কাথ সেবনে যক্ষ্মা রোগীর অর ভাল হয়।

কাসে—

৪৭। কণ্টকারীর কাথ, পিপ্পল, চূর্ণ সহ পান করিলে কাস নষ্ট হয়।

৪৮। পিপ্পল, পদ্মকাঠ, কিস্মিন, কুহতী ফল ইহাদের চূর্ণ স্বত ও মধুর সহিত সেবনে কাস নিবারিত হয়।

পাঁচড়ার—

৪৯। তিল উত্তমরূপে বাটিয়া পাঁচড়ার মুখে প্রলেপ দিলে অন্নধিনের মধ্যে পাঁচড়া ভাল হয়।

৫০। খল কুড়ির পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে অতি সন্ধ্য পাঁচড়া নষ্ট হয়।

চুলকণার—

৫১। চালমুগুরার তৈল ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া ৩৪ দিন গায়ে মর্দন করিলে চুলকণা ভাল হয়।

ক্রিমিরোগে—

৫২। নিমপাতার রস কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবনে ক্রিমি নষ্ট হয়।

৫৩। পলাশবীজ ১ তোলা, ১০ পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ১০ ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু সহ সেবনে ক্রিমি নষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

পরমায়ু প্রসঙ্গ

বা

মানুষ মরে কেন ?

[কবিরাজ শ্রীঅক্ষয় কুমার বিজ্ঞাবিনোদ, ধবন্তরি]

পূর্বোক্তবৃত্তি ।

আয়ুর্জিহ্বা উপায় ।

দীর্ঘ জীবন লাভ সময়ে বিজ্ঞ চাপকা
কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

সত্যোমাংসং নবান্নকং বালা জী কীর্ত্তোজনম্
স্বত মুকোদককৈব সতঃ প্রাণকরাণি যই ।

ইহার অর্থ এই—চাটকা মাংস। নূতন চাউলের অন্ন, তরুণী নারী, দুগ্ধ পান, দ্রুত, ভোজন এবং উৎকোচক ব্যবহার, এই ছয়টিতে সত্তাই আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মহাহুতব চরক লিখিয়াছেন:—

গোরগামিহু বিকৃতাবস্যাং ভৈলং নবোদনম্ ।
হেমন্তেভ্যস্তাত্তার মুষ্ণুকার্যন হীয়তে ॥

ইহার অর্থ এই:—ঐতকালে অধিক পরিমাণে গম্যদ্রব্য, শুড়, মিছার, বাতাসা, চিনি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য, নূতন চাউলের অন্ন, এবং উষ্ণ জল ব্যবহার করিলে কখনই আয়ু ক্ষয় হয় না।

তবেই আহার বিহারাদির নিয়ম পালনে আয়ুর বৃদ্ধি এবং আয়ু কৃতিকর আহার বিহারাদিতে আয়ুর ক্ষয়,—ইহা তো স্থান-স্থিত প্রতিপন্ন হইল।

পূর্বস্মোকে মনাবি চাপক্য দ্রুত ভোজনকে সত্তাঃ প্রাপকর বলিয়াছেন। বাস্তবিক দ্রুতের তুল্য পরমায়ু বর্দ্ধক খাদ্য আর জগতে নাই। এই জ্ঞান শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ করিয়াছেন, “ঋণং কৃত্বা দ্রুতং পিবেৎ।” অর্থাৎ, যদি ঋণ না থাকে, তবু ঋণ করিয়াও দ্রুত খাইবে। কারণ দ্রুত ভোজন দ্বারা পরমায়ু বৃদ্ধি হইলে দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।

দ্রুত অমৃত তুল্য উপকারী। উহা দেবগণেরও পরম আদরের সামগ্রী। দ্রুত ভিন্ন কোন দ্রব্য দেবতাদিগকে উৎসর্গ করা যায় না। হুহু শরীরের আহারকালে নিত্য দ্রুত, দ্রুত না খাইলে, সেই আহার আহারই নহে। এই জ্ঞান হুই চাপক্য বলিয়াছেন:—

বজ্র না থাকিলে অর্থাৎ উল্লম্ব অবস্থার অলঙ্কার পরিধান হাতজনক। দ্রুত বিহীন ভোজন নিফল। স্তনহীনা নারী কদাকার এবং বিজাহীন জীবন মকছুমিসদৃশ।

অতএব দেশীয়গণের খাদ্য দ্রব্য মধ্যে দ্রুত দ্রব্য সর্বোৎকৃষ্ট। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে হবির অশেষ প্রকার গুণ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। মহাত্মা চরক লিখিয়াছেন:—

দ্রুতিবুদ্ধ্যগ্নিক্রোধঃ ককমেনো বিবর্জনম্ ।

বাতপিত্তবিষোন্মাদ শোথালক্ষ্যোজরাপহম্ ।

সর্বস্নেহোত্তম শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ ।

সহস্রবীৰ্য্যং বিধিবদ্ দ্রুতং কর্মসহপ্রবুৎ ।

ইহার অর্থ এই—দ্রুত দ্রুতিশক্তির ও বুদ্ধির বৃদ্ধি কারক। নিজে গুরুপাক হইলেও বৃদ্ধি কর। অতিশয় শুষ্ক বর্দ্ধক, ওজঃ পদার্থের বৃদ্ধিকারী। ইহা কফ ও মেদকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। দ্রুত বায়ু ও পিত্ত নাশক। অধিকতর বিব, উন্মাদ, ক্ষয় ও অরোগের শাস্তিকারক। ইহাতে অলক্ষ্য দোষও নষ্ট হয়। সকল প্রকার স্নেহ দ্রব্যের মধ্যে দ্রুতই শ্রেষ্ঠ। ইহা শীতবীৰ্য্য, মধুর রস ও মধুর বিপাক। বিবিধ প্রকার দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত দ্রুত সহস্রবীৰ্য্য ও সহস্র কর্মকারক হইয়া থাকে।

তবেই দেখুন, দ্রুত কিরূপ আয়ুর্কর খাদ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ হেন পবিত্র খাদ্য আজকাল আমাদের দেশে কিরূপ অপবিত্র মূর্তি ধারণ করিয়া অত্যধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এবং ইহার প্রতিকার না হইবে, তাবৎ মানবের দীর্ঘ জীবনের পথ কষ্ট অশুচর্য্য আয়ুর্বেদের একটি প্রশস্ত উপায়। অশুচর্য্যের নামান্তর শুদ্ধ সংরক্ষণ।

পূর্বকালে জাশ্রম চতুষ্টয়ের ব্যবস্থা ছিল। তন্মধ্যে সর্ব প্রথম ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্রহ্মের সম্ভানগণ উপবাস হইয়া গুরু গৃহে বাস করিয়া স্বাধ্যায়নিরত থাকিতেন। তৎকালে তাঁহাদের মত, মাংস ভোজন, কর্পূর চন্দনাদি বিলম্বন, মালা ধারণ, স্ত্রী জাতির অঙ্গ স্পর্শন এবং প্রাণি হিংসা নিষিদ্ধ ছিল। উপনয়নের পর হইতে বিজ্ঞা সমাপ্তি পর্যন্ত যাবৎ চতুর্বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইত, তাবৎ তাঁহাদিগকে কঠোর নিয়মে আবদ্ধ থাকিতে হইত। ইহার ফলে দীর্ঘকাল তুফ্রবাতুকে অবিকৃত ও অবিচলিত রাখার তাঁহারা মনোহর কান্তি ও অপূর্ণ শ্রী ধারণ করিয়া দীর্ঘজীবী হইতেন এবং সংসারাত্মকে প্রবেশপূর্বক দারগ্রহণান্তে তত্পর্যুক্ত সম্ভান সন্ততিগণকেও হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘজীবী করিতেন। কিন্তু হায়! সে দিন এখন গত হইয়াছে। সে ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা আর নাই। এখন কোমার কাল হইতেই কনভ্যাসে তুফ্র বায় হয়। যৌবনের প্রারম্ভ কালে অসময়ে এখন অনেকে তুফ্রব্যয়ে স্বায় শরীরকে অন্তঃসার শূন্য করেন। যাহারা দীর্ঘজীবিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদিগকে সর্বোচ্চে এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

ব্রহ্মচর্যের আভাষ যৎকিঞ্চিৎ প্রকটিত হইল। এইবার দীর্ঘায়ু লাভ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাইতেছে। একটি কথা জানা আছে,—

ইহার অর্থ এই—সত্বসংরক্ষণ, গজা প্রভৃতি পুণ্য সলিলা নদীর জল পান এবং প্রভাতে ভ্রমণ, এই সকল দ্বারা মানব শত বর্ষ জীবী হইয়া থাকে। প্রত্যেক আয়ুর্দ্যমী

ব্যক্তির উপরোক্ত তিনটি বাক্যই দেখা সর্বদা শিরোধার্য্য করিয়া রাখা যে সর্বতোভাবে প্রয়োজন, তাহা আর সবিশেষ বলিবার আবশ্যক হয় না।

এ পর্যন্ত আমরা আহার বিহারাদি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে প্রভৃতির দ্বারা পরমায়ুর হ্রাস বৃদ্ধির সম্বন্ধে বাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা তো পাঠকগণ শ্রবণ করিলেন। অতঃপর উক্ত বিষয়ে আরও কিছু বলিয়া আমাদের মন্তব্যের উপসংহার করিব।

স্বাস প্রশ্বাস ও আয়ুর স্থায়িত্বের অন্ততম বিশিষ্ট কারণ। সাধারণতঃ অহোরাত্রের মধ্যে মহত্ত্বগণের ২১,৬০০ বার স্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা কম হইলে মানবের দীর্ঘায়ু এবং উহা অপেক্ষা অধিক হইলে মনুষ্যের অন্মায়ু হইবার কথা।

যোগ শাস্ত্রে লিখিত যাহা আছে—

ইহার অর্থ এই ;—

উঠিতে, বসিতে, খাইতে বেড়াইতে, ধ্যান করিতে, দেখিতে শুনিতে, সর্ব বিষয়েই স্বাস প্রশ্বাস সংযত রাখিতে পারিলেই মর্ত্যগণ সহস্রায়ু হইতে পারে।

যোগাভ্যাস দ্বারা যোগিগণ যে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া থাকেন, স্বাস সংযম তাহার প্রধান কারণ। যোগের প্রথম শিক্ষা প্রাণায়াম। প্রাণায়াম পাদের অর্থ—প্রাণের আয়াম। উহার দ্বারা প্রাণবায়ুকে স্থির করিয়া জীবিত কালের বৃদ্ধি সাধন করিতে পারা যায়, এই অর্থ ইহারই নাম প্রাণায়াম।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে ;—

অপান বায়ুর বিরোধ করাকে প্রাণায়াম বলে।

প্রাণবায়ু উর্দ্ধগমনশীল, এবং অপানবায়ু অধোগামী। বায়ুকে উপরে উঠিতে বা নীচে নামিতে না দেওল্লকেই, অর্থাৎ এক স্থানে স্থিত করাকেই প্রাণায়াম বলে।

প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে হইলে, শ্বাস বায়ুর নিরোধ করিতে হয়। বায়ু নির্বন্ধ হইলে প্রাণের স্বৈর্য্য সাধনাদি হইয়া থাকে। প্রাণ স্থির হইলে মনও স্থির হইয়া উঠে। তখন ধ্যেয় বস্তু সহজেই চিত্তপটে সমাকৃষ্ট হইতে থাকে। ভিন্নবিধ বোগ শিক্ষা করিতে হইলে, অগ্রেই প্রাণায়াম অভ্যাস করা আবশ্যক। দীর্ঘ কাল প্রাণায়াম সাধন করিতে পারিলে জরামৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা বাইতে পারে।

যোগশাস্ত্র বলেন, মানব শরীর আময়ুক্তিকায় কলস তুল্য। জীবন জলের স্তায় এবং যোগ অগ্নির স্বরূপ। সম্পূর্ণ আম কলস যেমন জলপূর্ণ হইয়া অচিরে লয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অগ্নি সংযোগ দ্বারা উহাকে দৃঢ় করিয়া লইলে, উহা যেমন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই জীবনযুক্ত কায়ও অল্পকণাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; যোগ সাধন দ্বারা উহাকে পরিপুষ্ট করিয়া লইলে উহার নশ্বরত্ব নষ্ট হয় সুতরাং বহুকাল বজায় থাকিতে পারে।

যোগাদি দ্বারা শ্বাসসংযোগের ফলে আয়ুর বৃদ্ধি সম্বন্ধে বৎসামাত্র লিখিত হইল, এই বার রাজিকালীন প্রবহমান শ্বাস প্রশ্বাস বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে।

শাস্ত্রে আছে,—“মহুস্ত স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, তাহার নিশ্বাস বায়ু স্বভা-

বতঃ নাসিকাগ্র ইহীতে দ্বাদশ অঙ্গুলি দূর পর্যন্ত আইসে। কিন্তু পরিশ্রমের ন্যূনতায় বা আধিক্যে উহা আরও অধিক দূর পর্যন্ত আসিয়া থাকে। যেমন শয়ন করিলে বোড়শাঙ্গুলি, ভোজনে বিংশতি পর্যন্ত, নিদ্রায় ত্রিংশৎ, মৈথুনে এবং ব্যায়ামে আরও অধিক দূর পর্যন্ত আসিয়া পৌছে। স্বাভাবিক দ্বাদশাঙ্গুলি অপেক্ষা কম হইলে, পরমায়ু বৃদ্ধি পায় এবং অধিক হইলে পরমায়ু ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

পূর্বোক্ত বাক্য দ্বারা বিশেষরূপে বুঝা যাইতেছে, যে, রতি ক্রিয়ায় এবং ব্যায়াম কার্যে পরিশ্রম সর্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। সুতরাং উক্ত উভয় কর্মই নিরতিশয় আয়ু ক্ষতিকারক। অত্যধিক শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ যে জীবিত কালের ধ্বংস সম্পাদক, তাহা নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারাও কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইতেছে।

নরা গজা বিশেষ শয়;

তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয়।

বাইশ বলদা তের ছাগলা

ধুঁকে মরে বরা পাগলা ॥

ইহার অর্থ এই—মহুস্ত এবং হস্তী এক শত কুড়ি বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ঘোটক প্রায় প্রায় বাইট বৎসর বাঁচে। বলদ অর্থাৎ মেঘ মহিষ প্রভৃতি অল্প কুড়ি, বাইশ বৎসর এবং ছাগল বার তের বৎসর জীবন ধারণ করে। কিন্তু শূকর সর্ষদাই ধুঁকিতে থাকে, এই নিমিত্ত অধিক কাল জীবিত থাকে না। পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়।

শশকগণও প্রায়ই শূকরের স্তায় স্বল্পায়ু।

যেহেতু উহার সর্বদাই ক্ষতগামী। এই নিমিত্ত উহাদের শ্বাস প্রশ্বাসও সমধিক বেগে নির্গত হইতে থাকে। এই কারণে উহারা সচরাচর ৭৮ বৎসরের মধ্যেই জীবন ত্যাগ করে।

বানর সকল সর্বদাই লম্পা বাষ্প করিয়া বেড়ায়। তজ্জন্ত উহাদের শ্বাস প্রশ্বাসও অধিক হয়। উহাদেরও জীবিতকাল দীর্ঘ হয় না।

কূর্মনিচয়ের শ্বাস প্রশ্বাস নিত্যন্ত অল্প। প্রতি মিনিটে ৪।৫ বারের অধিক নহে। উহাদের আয়ুষ্কাল অধিক, ইহারাই দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

মানবগণের মধ্যে বাহারা স্থূলকায়,

তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা সমধিক হইয়া থাকে। এই জন্ত গীন বণুঃ মানব প্রায়ই কীণায়ু।

একশ্রে পাঠকবর্গ অবিসংবাদিত ভাবে অবগত হইয়াছেন, যে অত্যধিক শ্বাস নির্গমনে অবশ্যই জীবিতকালের কীণতা সংঘটিত হয়। হুতরাং যতপি অদীর্ঘ জীবন লাভে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে যে সমৃদ্ধ করণীয় ব্যাপারে সমধিক শ্বাস সঞ্চালিত হয়, তাদৃশ কার্যে ক্লান্ত থাকাই সংপরামর্শ।

আমু কয়ের আর একটি বিশিষ্ট কারণ অতিশয় ক্লীষক। আমরা সে বিষয়ে পরে অতিমত পরিবাক্ত করিব।

কয়েকটি বনৌষধি ।

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন]

অনংনাস-আনারস, হিং—আনানস্ ।

আনারস পল্লীগ্রামে সর্বত্রই সহজ প্রাপ্য। ইহার পত্রের মূলভাগ (সাদা অংশ) কৃমি রোগে বিশেষ হিতকর। বালক অথবা বয়ঃ প্রাপ্ত সুকলের ক্রিমিতেই ইহা প্রযুক্ত।

‘আনারস পত্রের সাদা অংশ শিলায় কুটীত করিয়া রস নির্গত করিবে, তৎ সহ কিঞ্চিৎ মিছরি মিশ্রিত করিয়া প্রাতে সেবন করাইলে কৃমি নষ্ট হয়।

আনারসের মূল চূর্ণ মূত্র কারক ও ক্রিমি দোষ নাশক।

গর্ভবতীকে কখনও আনারস সেবন করাইবে না। আনারস গর্ভশ্রাবক। পল্লীগ্রামে প্রবীণা গৃহিণীগণ আনারসের এই গুণ অবগত আছেন, এতন্ত তাঁহারা গর্ভ-বতীকে আনারস সেবন করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন।

পক আনারস চুষের জলে ধোত করিয়া সেবন করিলে কৃমি ও বমন রোগে বিশেষ

উপকার হইয়া থাকে। হিকা রোগে আনারসের রস উপকারী, পক আনারস মুখ রোচক ও অগ্নি দীপক।

নিগুস্তী—, নিসিন্দা, হিং, ইঞ্চুর ।

নিসিন্দা বস্ত্রের সর্কত্বেই দৃষ্ট হয়। ইহার প্রধান গুণ কষ নাশক।

কর্ণ রোগে নিসিন্দা—কর্ণ মূল ফুলিলে কিম্বা কর্ণভাঙ্গরে বেদনা হইলে, কর্ণ মূলে নিসিন্দা পত্র বাসী হাঁকার জলে পেষণ করতঃ সামান্য উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিবে।

বাত বেদনার নিসিন্দা—১ তোলা নিসিন্দা পত্র ও অর্দ্ধ তোলা আদা, অর্দ্ধ তোলা সজিনার ছাল একত্রে পেষণ করিয়া সামান্য উত্তপ্ত করিবে। বেদনা স্থানে দিবসে ২৫ বার প্রলেপ দিলে বাতের বেদনার উপকার হয়। ইহা প্রত্যাক ফলগ্রন্থ।

রক্ত পিত্তে নিসিন্দা।—নিসিন্দা পত্র গব্য ঘূতে ভাজিয়া ভোজন করিলে রক্ত পিত্তের উপশম হয়।

কর্ণ পাকে নিসিন্দা।—নিসিন্দা পত্রের রস ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার ২১ ফোটা কর্ণভাঙ্গরে প্রদান করিলে কর্ণের পুষ্ণ আব নিবৃত্তি হয়।

গণ্ডমালায় নিসিন্দা।—নিসিন্দা বস্ত্রের মূলের ছাল জলে পেষণ করিয়া নস্ত টানিলে গণ্ড মালা বিনষ্ট হয়।

শিরোরোগে নিসিন্দা।—মাখা ধরায় কপালে নিসিন্দা পত্রের প্রলেপ দিলে মাখা ধরা নিবৃত্তি হয়।

আঘাতে নিসিন্দা।—আঘাত প্রাপ্ত ভ্রত দেহের কোন স্থান ফুলিলে নিসিন্দা পত্র বস্ত্র

খণ্ডে বাঁধিয়া উত্তপ্ত করিবে, পুনঃ পুনঃ উত্তপ্ত করতঃ ঐ পুটিল দ্বারা সেক দিলে ফুলা নিবৃত্তি হয়।

স্নুহী ; মনসা গাছ ; হিং—থুহর,

মনসা গাছ সর্কত্বেই পরিচিত, ইহাকে বাঙ্গলার কোন কোন স্থলে সোঁজির গাছ বলিয়া থাকে,—ইহা বহু জাতীয় আছে। অনেকে কণি মনসাকে মনসা বলিয়া ভ্রমে গতিত হন। মনসা গাছের পত্র চণ্ডা, ভাল গুলি স্বাগোল ও গাত্রে কণ্টক আছে। ইহার পত্র ও গাত্র কর্তন করিলে তরল আঠা বহির্গত হয়। মনসা গাছের আঠা এবং পত্র ঔষধে ব্যবহৃত হয়। মজ্জা ক্ষত রোগ নাশক, আটা তীক্ষ্ণ বিরোচক, পত্র বেদনা নিবারক।

ভ্রলোদরে স্নুহী ক্ষীর।—আতপ চাউল, মনসার আঠায় ভিজাইয়া রাখিয়া তদ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে, অত্যন্ত কাল মধ্যে উদর বোগ উপশমিত হয়। ইহাতে রোগের উপযুক্ত বিরোচনের কার্য্য করে। মনসার ক্ষীর (আঠা) দ্বারা প্রস্তুতীয় বিল্বমূল উদর রোগের বিখ্যাত ঔষধ।

২ বহি পরিমাণ মনসার আঠা একটা ময়দার টুলির মধ্যে পরিয়া জলের সহিত গিলিয়া খাইলে উত্তম বিরোচনের কার্য্য সাধিত হয়। মনসার আঠা কখনও অতি মাত্রায় ব্যবহার করিবেনা। অতি মাত্রায় ব্যবহার করিলে অত্যধিক বিরোচনে রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে।

উদর রোগে মনসার পাতা।—মনসার পাতা সাধারণ শাক প্রস্তুতের জায় রন্ধন

করিয়া সেবন করিলে ঔষধ রোগ উপশমিত হয় ।

অন্ন কালীন প্রবাহে মনসা পাতা ।—
অন্নোত্তম্য দাহ হইলে, তৎকালীন অন্ন
নিবৃত্তির অন্ন মনসা পাতা অতি প্রেষ্ঠ ফল-
প্রদ । কয়েকটা মনসা পাতা অগ্নি সত্তাপে
উত্তপ্ত করিয়া নিভড়াইয়া রস বাহির করিবে,
কিছু খনে চূর্ণ ঐ রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া
লইবে, তৎপর কতকগুলি লম্বা চুর্কা দ্বারা
একটা গুচ্ছ বান্ধিয়া ঐ চুর্কাগুচ্ছ মনসা পাতার
রসে ভিজাইয়া ঐ রস রোগীর সর্বাঙ্গে পুনঃ
পুনঃ ছিটাইয়া দিবে, ইহাতে প্রবল দাহ কণ-
কাল মধ্যে নিবৃত্ত হইবে । এক্ষণ দাহ
নিবারক ঔষধ অল্পই দৃষ্ট হয় ।

বেদনা নিবারণে মনসা পাতা ।—কোন
স্থান জ্বলিলে অথবা বেদনা হইলে মনসা
পাতা, সৈন্ধব লবণ ও ধূতুরা পাতা একত্রে
পেষণ করিয়া উত্তপ্ত করতঃ প্রলেপ দিলে
বেদনা ও জ্বলা নিবৃত্তি হয় ।

বস্ত্রশোকার মনসা পাতা ।—দাঁতে চর্কন
করিলে দন্ত পোকা পতিত হয় ।

সর্প দংশিত ব্যক্তিকে মনসার মূল সেবন
করাইলে বিষ নিবৃত্তি হয় ।

বাত গুণ্ডে মনসা আঠা ।—মনসার আঠার
তেউড়ী মূল চূর্ণ ভাবিত করিয়া মধু ও গব্য
ঘৃত সহযোগে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে
উৎকৃষ্ট বিরোচন হয় । রোগীর বল অল্পদায়ী
এই বিরোচন প্রয়োগ করিবে । অতি বিরো-
চনে রোগী নিস্তেজ হইয়া থাকে ।

মনসার আঠা অতি সতর্কতার সহিত
সংগ্রহ করা কর্তব্য । ইহা দেহের কোন স্থানে
লাগিলে অগ্নি দগ্ধের স্থায় ফোড়া পড়ে ।

মনসার মজ্জা গব্য ঘৃতে তীক্ষ্ণরূপে ভাজিয়া
লইবে, ঐ ভজিত মজ্জা সামান্য তুঁতে
ভস্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে
পেষণ করিবে । এই রূপে যে মলম প্রস্তুত
হইবে তাহা দূষিত ক্তাদি রোগের উৎকৃষ্ট
ঔষধ । গরমির দূষিত ক্ত পর্ষ্যন্ত ইহাতে
আরোগ্য হইয়া থাকে ।

পরিভাষা ।

ভিবরর বর্গীয় ত্রিকট দাস বিরচিত
“পরিভাষা সংগ্রহ” নামক পুস্তক খানি
কবিরাজ ত্রিমুক দীপেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত কবীন্দ্র
বিভাবিনোদ কর্তৃক অঙ্কবাচিত, সংশোধিত
ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংপ্রতি বাহির হইয়াছে ।
আমরা এই পুস্তক খানি অবলম্বন করিয়াই
আত্মকৌমোদ্য পরিভাষার কথা বলিব ।

আত্মকৌমোদ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশই পরিভাষা ।
পরিভাষা না জানিলে ঔষধ, তৈল ও ঘৃত-
দিয় পাকবিধি, ঔষধ সেবনের কাল ও মাত্রা
নির্ণয়, অঙ্গপান বিধি, ভাবনা বিধি, এ সকল

সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায় না । এই পরি-
ভাষা গ্রন্থ সম্বন্ধে সংগ্রহকার বলিয়াছেন,—

ধ্বান্তে পথি চরিকুনান যথা দীপঃ প্রদর্শকঃ ।

নানা শাস্ত্রজ্ঞ ভিষজ্ঞাং সংগ্রহোহৈহং

তথা ভবেৎ ।

অর্থাৎ যেক্ষণ অন্ধকারে ভ্রমণ কালে
প্রদীপ দ্বারা পথ প্রদর্শিত হয়, সেইরূপ নানা
শাস্ত্রজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই “পরিভাষা
সংগ্রহ” নামক গ্রন্থ আত্মকৌমোদ্য শাস্ত্রে প্রবেশের
পথ প্রদর্শক হইবে ।

এই গ্রন্থের পরিচয়ে সংগ্রহকারের আরও
পরিচয়—

অমৃত্যবাক্য লেশোক্ত সম্বন্ধার্থ প্রকাশিকাঃ ।
পরিভাষাঃ প্রবক্ষ্যন্তে দীপীকৃতঃ স্থানচিত্তাঃ ॥

অর্থাৎ অমৃত্যবাক্য স্থানে দীপ যেমন সকল বস্তুর প্রকাশক হয়, তদ্রূপ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যে সকল বিধি অব্যক্ত, অমৃত্যব বা ঐবাক্য অথবা সম্বেদ্যুক্ত, পরিভাষা তাহাদের প্রকাশক হইয়া থাকে ।

শুধু সংগ্রহকারের কথা নহে, প্রকৃত পক্ষে পরিভাষা যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ—পরিভাষায় জ্ঞান না থাকিলে ঔষধাদি প্রস্তুত যে করিতে পারা যায় না—ইহা স্থানচিত্ত । তবে বাহাদের আয়ুর্বেদীয় মূল গ্রন্থ গুলি ভাল করিয়া পড়া আছে, তাহাদের পক্ষে পরিভাষার বিষয় গুলি সেই সকল গ্রন্থেই শিক্ষা হইতে পারে । কারণ আয়ুর্বেদীয় সংহিতা গ্রন্থ গুলি হইতেই ইহা সংগৃহীত,—সংহিতাগুলির কথা ভিন্ন ইহাতে নূতন কথা অল্পই আছে ।

শ্রীকর্ষ দাসের “পরিভাষা সংগ্রহ” ভিন্ন গোবিন্দ দাসের একখানি “পরিভাষা প্রদীপ” বৈদ্য সমাজে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে । এই গ্রন্থে সংগ্রহকার বলিয়াছেন,—

পূর্বে মূর্নিভিরাতিষ্ঠা য়ে য়ে তন্নে কচিৎ
কচিৎ ।

পরিভাষা ময়া সা সা সমাহৃত্য বলিখ্যতে ॥

অর্থাৎ প্রাচীন মূনিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে যে সকল পরিভাষা বিক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, আমি সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি ।

শ্রীকর্ষ দাসও এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

প্রাক পরিভাষিক বটো মূনিভিঃ প্রণীতম্
যম্মাধবাদি লিখিতং হংবহ প্রপঞ্চম্ ।

সংক্ষিপ্ত্যতে নবক বৈজ্ঞানিকায় যম্মাৎ

শ্রীকর্ষদাস ভিষজা তদনুক্রমেণ ॥

অর্থাৎ পূর্বকালে আয়ুর্বেদাচার্য্য মূনিগণ কর্তৃক যে সকল আয়ুর্বেদীয় পরিভাষিক বাক্য রচিত হইয়াছে, এবং বাহা মাধবাদি গ্রন্থকারগণ কর্তৃক বহু বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহাদেরই সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম নবীন বৈজ্ঞানিকের হিতকল্পে শ্রীকর্ষদাস কর্তৃক বহু যত্ন সহকারে এই গ্রন্থে সম্মিলিত হইয়াছে ।

স্থচিকিৎসক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে শাস্ত্র জ্ঞান, ভ্রুয়োৎপন্ন, রোগনির্ণয় ও যথা শাস্ত্র ব্যবস্থা-বিধান যেরূপ প্রয়োজনীয়, যথা নিখুঁত ভাবে ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষাকরণও সেইরূপ বা ততোধিক প্রয়োজনীয় । পরিভাষায় সম্যক ব্যাংগ্য না হইলে দ্রব্য সকলের পরিমাণাদি, ঔষধাদির প্রস্তুতবিধি, তৈল দ্রব্যাদির পাক প্রণালী বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না—এক্স পরিভাষার শিক্ষা লাভ অবশ্যই প্রয়োজনীয় ।

শ্রীকর্ষদাসের “পরিভাষা সংগ্রহ” এবং গোবিন্দ দাসের “পরিভাষা প্রদীপ”—এই উভয় গ্রন্থই প্রায় এক ধরণে সংগৃহীত । দুই-খানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না । উভয় গ্রন্থেই প্রথমে “মানের” কথা । “মানের” কথা তো লিখিতেই হইবে, কারণ “ন মানেন বিনা যুক্তিঃ স্রব্যং দ্রব্যং দ্রব্যং কচিৎ ।”

অর্থাৎ পরিমাণ ব্যতীত কোনো দ্রব্যের প্রয়োগে ফল লাভ হয় না । কিন্তু এই “মান” পরিভাষায় উভয় গ্রন্থের সংগ্রহকারই যে পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন, বর্তমান সময়ে

বৈজ্ঞানিক সমাজে তাহার প্রচলন নাই। উভয় গ্রন্থেই স্বপ্ন ও চরকের “মান” লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃতের “মান”কে কালিক মান এবং চরকের “মান”কে মাগধ মান বলিয়া সংহিত্য গ্রন্থে উল্লিখিত। এই দুইটি ‘মানে’ অনেক প্রভেদ কালিক ‘মানে’ পাঁচ রতিতে মাধা এবং মাগধ “মানুে” দশ রতিতে এক মাধা। এখনকার দিনে কিন্তু এই দুইটির একটিও গ্রহণ না করিয়া ছয় রতিতে আনা এবং বার রতিতে মাধা গণনা করা হয়। স্বতরাং কালিক এবং মাগধ দুইটি “মানের”ই পরিবর্তিত ভাবে শিক্ষা প্রদানের জন্য নূতন “মানের” ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া কর্তব্য।

গোবিন্দদাসের “পরিভাষা প্রদীপে” একই বিষয় বলিতে গিয়া বহু স্থলে পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠের “পরিভাষা সংগ্রহে” সে দোষ বড় নাই। কিন্তু গোবিন্দদাসের “পরিভাষা প্রদীপ” যেরূপ চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া সাজান, শ্রীকণ্ঠের “পরিভাষা সংগ্রহ” সে ধরনের নহে। অমুক্ত, অব্যক্ত, লেশাক্ত, বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ করিয়া এই পরিভাষা সংগৃহীত। এক হিসাবে এই শ্রেণীবিভাগ উৎকৃষ্ট হইলেও গোবিন্দদাসের ঋণ বিভাগ শিক্ষা কল্পে সুগম হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া গোবিন্দদাসের “পরিভাষা প্রদীপে” লৌহ শোধনাদির কথা যাহা লিখিত আছে, শ্রীকণ্ঠের “পরিভাষা সংগ্রহে” তাহা লিখিত হয় নাই। শ্রীকণ্ঠ শুধু লৌহের পাক লক্ষণই বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শৌধন ও মারণ—যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন, একজন শিক্ষার্থী দিগের পক্ষে ইহা অসম্পূর্ণ হইয়াছে। স্নেহ পাক সিদ্ধির প্রসঙ্গে গোবিন্দ

দাস যেরূপ ক্ষতাদিতে যে সকল কারসাধ্য জল পাক করিতে হয় তাহার পরিচয়—
অগ্নিরবসরে তোয়ং কার সাধ্যং ক্ষতাদিহ।
কোনোদয়স্ত নিপত্তিনঃ হুহু সমাকৃতি ।

বলিয়া উহা বুঝাইয়া দিয়াছেন, শ্রীকণ্ঠ তাহা করেন নাই, স্বতরাং শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহাও বাদ পড়িয়াছে। তবে এ কথা বলিলে অগ্রায় হইবে না, দুইখানি পরিভাষা সংগ্রহই যে সময়ে সংগৃহীত হইয়াছে এখনকার যুগে তাহার কতকগুলি বিষয়ের সংস্কার করিয়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সেইজন্য বর্তমান যুগে এমন একখানি পরিভাষা সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছে, যাহা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ বোধ্য হয়। পঞ্চকর্ম বা বমন, বিরচন, নিরুহন, অগ্নিবাসন ধূমপান, কবল ও রক্ত মোক্ষন প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিভাষা সংগ্রহে সন্নিবেশ করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি না, কারণ চিকিৎসার সকল বিষয় শিক্ষা না করিলে এ সকল বিষয়ে প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে। একজন আমাদের মতে নূতন কোনও সংগ্রহকার পরিভাষা সংগ্রহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহার সংগ্রহ পুস্তকে ঐ বিষয়গুলির সংযোজনা না করিলেই ভাল হয়।

শ্রীকণ্ঠ দাসের “পরিভাষা সংগ্রহ” যাহা কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সংপ্রতি বাহির করিয়াছেন, তাহার কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট, বঙ্গভাবাদও উত্তম হইয়াছে কিন্তু ১ ফর্ম পুস্তকের মূল্য যাহা তিনি ১২ টাকা ধার্য করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনার তাহা বেশী হইয়াছে। ১ ফর্ম পুস্তকের মূল্য

১০. আনা করিলে সুস্বাদু হইত। যাহা লুপ্ত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কবিরাজ দীনেশচন্দ্র হুট ক ভিষকর ত্রিকট দাসের সংগৃহীত এই বৈভবসমাজে প্রকাশ্য পাও। ৯

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের কথা।

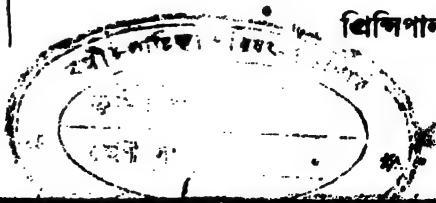
আয়ুর্বেদানুরাগী বক্তি মাঝেই তুমিয়া স্থখী হইবেন যে, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের উন্নতি করে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সংপ্রতি শ্রামবাজার পার্কের সম্মুখে প্রায় দেড় বিঘা জমি দান করিয়াছেন। এই জমির উপর অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের নূতন প্রাসাদ নির্মিত হইবে। বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও বোর্ডিং—সমস্তই এই জমীতে হইতে পারিবে। ইহার জন্য অন্ততঃ আট লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আমরা এই সদহুষ্ঠানের জন্য দেশের দানশীল-মহাত্মাগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যাহার যেমন শক্তি, তিনি তদনুসারে সাহায্য প্রদান করিতে পারেন। “দেশের লাঠি, একের বোঝা”—এই চলিত কথার অহুসরণ করিয়া যিনি যাহা দান করিবেন, আমরা তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব।

কলেজে ছাত্র সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছিল—কড়িয়া পুকুরের বাটীতে আর

ইহার স্থান সংকুলান হইতেছিলনা। এই জন্য সংপ্রতি এই বিদ্যালয় ১৭১২ শ্রামবাজার ত্রিভুরোত্তরিত প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। যে পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির প্রদত্ত নূতন জমীতে বাটী নির্মাণ কার্য সমাপ্ত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত এই নূতন বাটীতে বিদ্যালয় ও হাসপাতালের কার্য চলিবে।

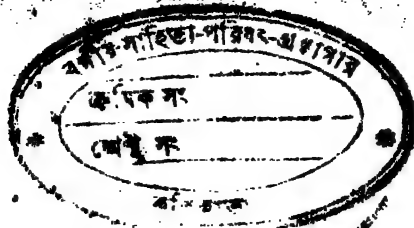
বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ক্ষেত্রপ অভ্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, বিদ্যালয় সংলগ্ন দাতব্য চিকিৎসালয়েও প্রত্যহ সেইরূপ রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে। আজ কাল প্রায় একশত রোগী ইহার শল্য ও কার্য বিভাগে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য এই বাটী পরিবর্তনে সাধারণের পক্ষে সকল দিকেই সুবিধা করা হইয়াছে।

কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরহ, এম-এ, এম-বি, প্রিন্সিপাল।



কবিরাজ শ্রীমুরেশ্বরকুমার দাশ ওপু কাব্যভার্থ কর্তৃক গোবিন্দন প্রেস হইতে মুদ্রিত

৩১৭১৩ঃ শ্রামবাজার ত্রিভুরোত্তর হইতে মুদ্রাকর কর্তৃক প্রকাশিত।



আয়ুর্বেদ

৭ম বর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সাল।

৩য় সংখ্যা।

আয়ুর্বেদে অ্যানাটমী।

[কবিরাজ শ্রী ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ, এম, বি,]

— :: —

চরকের বহুকাল পরে স্বকৃতের আবি-
র্ভাব কাল। চরক প্রণীত হইয়াছিল সত্য
ও জ্যেষ্ঠের সন্ধিক্ষণে। স্বকৃত রচিত
হইয়াছিল—এখন হইতে কিকিঞ্চদিক
আড়াই সহস্র বৎসর পূর্বে। চরকের উপদেষ্টা
দেবরাজ ইন্দ্র এবং স্বকৃতের উপদেষ্টা প্রত্যক
ভাবে ইন্দ্র না হইলেও তাঁহার প্রবর্তিত
চিকিৎসার মূল উপদেষ্টা ইন্দ্রকেই স্বীকার
করিতে হইবে। অতীত হইতে প্রজাপতি
মক, মক প্রজাপতি হইতে অশ্বিনীকুমার
দয় এবং অশ্বিনীকুমার দয় হইতে অমর নাথ
ইন্দ্র চিকিৎসা বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়া যেমন
মহর্ষি ভরদ্বাজকে এই বিজ্ঞা শিক্ষা দিয়া-
ছিলেন, সেইরূপ ধর্মভরিককেও ইহার শিক্ষা
দান করেন। ধর্মভরিক, দিবোত্তাসরূপে বারা-
ণসী ধামে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বা-
মিত্রের পুত্র স্বকৃত, উপধেনব, ঔরজ ও

পুন্ডলাবত প্রভৃতিকে এই বিজ্ঞার উপদেশ
প্রদান করেন। ইন্দ্র, ভরদ্বাজকে চিকিৎসার
যে অঙ্গের শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা কায়
চিকিৎসা প্রধান, সেই অঙ্গ চরক—কায়
চিকিৎসা প্রধান শ্রেষ্ঠসংহিতা এবং ধর্মভরিক
আয়ুর্বেদের আট অঙ্গেরই শিক্ষা লাভ করিয়া
স্বকৃত প্রভৃতিকে উহার উপদেশ প্রদান
করিলেও উহাতে শল্যতন্ত্রের উপদেশই
বিশদ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া উহা
শল্য প্রধান শ্রেষ্ঠ সংহিতা। বর্তমান সময়ে
আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক সমাজ হইতে শল্য
চিকিৎসা বিলুপ্ত হইলেও উহা যে আখ্যা
চিকিৎসার মধ্যে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া-
ছিল, তাহা যাহারা স্বকৃত সংহিতা অধ্যয়ন
করিয়াছেন, তাঁহারা ই অবগত আছেন।
স্বপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ওয়াইজ সাহেব তাঁহার
হিন্দু সিস্টেম অব মেডিসিন নামক গ্রন্থে

ভূমিকার উল্লেখ করিয়াছেন যে, রীতিমত শব্দের করিয়া আয়ুর্বেদের শারীর স্থান লিখিত। Commentary on the Hindn System of medicine By T. A. wise M. D. New Issue, Landon 1850 Page XVI. আমরা আজি স্বপ্ন-ভের সেই সকল উপদেশেরই সারাংশ পাঠক-দিগকে উপহার প্রদান করিব।

স্বপ্নভের চিকিৎসা আট ভাগে বিভক্ত—

১ম। শল্যতন্ত্র—ইহাতে কোনো কারণ বশতঃ শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বিবিধ তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, ধূলি, লৌহ, লোষ্ট্র, অস্থি, কেশ, নখ, আঘাতাদি হেতু দেহগত ভ্রমাস্থ, দ্রব্যাদি হইতে পুণ্যদি এবং বিকৃত ভাবে গর্তস্থ শিশু বহিকরণ জন্ত যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্ম-বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

২য়। শালাক্য তন্ত্র—জরদেশের অর্থাৎ কর্ণ ও ক্রমস সন্ধির উর্দ্ধগত কর্ণ, চক্ষু, মুখ, নাসিকাদির স্থান জাত রোগ সমূহের বিবরণ ও তন্নিবারণোপায় এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

৩য়। কায় চিকিৎসা—এই বিভাগে জ্বর, অভীসার, রক্তপিত্ত, শোথ, উন্মাদ, অপস্মার কূট, প্রমেহ প্রভৃতি সর্বাঙ্গগত রোগ সমূহের বিবরণ ও তাহার চিকিৎসা-বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

৪র্থ। ভূতবিজ্ঞা—এই প্রকরণে দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, পিতৃ, সর্প প্রভৃতি গ্রহ কর্তৃক বিকৃত চিত্ত প্রকৃতিস্থ করিবার জন্ত বলি, হোম, উপবাসাদি শাস্তি কর্ম সমূহের উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

৫ম। কৌমারভূতা—শিশুপালন, ধাত্মীর

স্তন্য সংশোধন, এবং দূষিত স্তন্য জনিত ও দুষ্ট গ্রহাবেশজনিত ব্যাধি সমূহ নিবারণের উপায় এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ। অগদতন্ত্র—সর্প, মাকড়সা, বৃশ্চিক, ইছুর প্রভৃতি সবিধ প্রাণিগণের দংশন জনিত বিষ নিবারণ এবং অস্ত্রাঘাত বিবিধ স্থাবর ও জঙ্গম বিষ পানু হেতু সত্ত্বাত ব্যাধি সমূহ প্রতীকারের বিধান বিবৃত হইয়াছে।

৭ম। রসায়ন তন্ত্র—এই বিভাগে মানব-গণের অধিক কাল চির যৌবন থাকিয়া স্বস্থ শরীরে অজর ও নীরোগ অবস্থায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

৮। বাজ্রা করণ তন্ত্র। অল্প শুক্র বৃদ্ধি, দূষিত বীৰ্য্য সংশোধন বিত্তক শুক্র সমৃদ্ধাবন, ক্ষৌণ শুক্র বর্ধন, এবং জী সংসর্গে শক্তি প্রাপ্তি বিষয়ক উপদেশ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত আটটি অঙ্গেরই উপদেশ স্বপ্নত সংহিতায় বিশদ ভাবে বর্ণিত হইলেও শল্যতন্ত্রের উপদেশ যেরূপ সুন্দর ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যে এখনকার উন্নত এ্যালোপাথিক শল্যতন্ত্রের নিকট কোনো অংশে কম নহে—ইহা খুব জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে চরমোন্নতি লাভ করিলেও স্বপ্নতের যুগে ইহা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। ঐহারা প্রণিধান পূর্বক স্বপ্নতের শারীর স্থান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা মহর্ষি স্বপ্নতকে একজন পাকা সার্জন না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না।

স্বপ্নত এশ্বনাটমী বা শারীর স্থানের পরিচয়—প্রথমে গর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বুঝাইতেছেন,—গর্তাশয়স্থ অর্থাৎ জরায়ু কোষস্থ

আত্মা, অষ্টবিধ প্রকৃতি এবং পঞ্চ ভূতাদি ষোড়শ বিকার মিশ্রীকৃত যে সূক্ষ্ম শোণিত তাহাই গর্ভ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গর্ভ—চেতনা দ্বারা অধিষ্ঠিত, বায়ু কর্তৃক বিভাগীকৃত, তেজঃ দ্বারা পরিপাচিত, জল কর্তৃক রস যুক্ত, পৃথিবী দ্বারা সংহত এবং আকাশ কর্তৃক বর্দ্ধিত হইয়া বর্ষন হস্ত, পদ, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ, নিত্য প্রকৃতি অঙ্গ সমূহ প্রকাশ পাইয়া তদ্বারা সংযুক্ত হয়, তখন উহা শরীর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শরীর—দুই হস্ত, দুই পদ, মধ্য ভাগ ও মস্তক—এই চয় ভাগে বিভক্ত। ইহার আবার সাতটি ত্বক, সাতটি কলা, সাতটি আশয়, সাতটি ধাতু, সাত শত শিরা, পাঁচ শত পেশী, নয় শত স্নায়ু, তিন শত অস্থি, দুই শত দশটি সন্ধি, এক শত সাতটি মর্ম্ম, চব্বিশটি ধমনী, তিনটি দোষ, তিনটি মল এবং নয়টি স্রোতস্বার দ্বারা আবৃত। ইহাদের পরিচয়ে ঋষি বলিয়াছেন,—প্রথমে যে ত্বক উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অবভাষিনী, এই ত্বক দ্বারা দেহের গৌরাদি সর্ব বর্ণ অবভাষিত এবং পঞ্চ ভূতাত্মিকা ছায়া ও প্রভা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ—একটি ধাত্তের অষ্টাদশ ভাগের এক ভাগ। এই ত্বক—সিদ্ধ (ছুলি রোগ) ও পদ্ম বন্টক রোগ উৎপত্তির স্থান।

দ্বিতীয় ত্বকের নাম লোহিতা। ইহার পরিমাণ, ধাত্তের ষোড়শ ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহাতে তিল রোগ, ছুলি বিশেষ ও ব্যাধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তৃতীয় ত্বকের নাম বেতা। ইহার পরিমাণ ষোড়শ ভাগের এক ভাগ। ইহা

চর্ম্মদল, অঙ্গগলিকা ও মশক রোগ উৎপত্তির স্থান।

চতুর্থ ত্বকের নাম তাম্রা। ইহার পরিমাণ ধাত্তের আট ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহাতে কিলাস ও কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়।

পঞ্চম ত্বকের নাম বেদিনী। ইহা ধাত্তের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কুষ্ঠ ও বীসর্প রোগ এই ত্বকে জন্মিয়া থাকে।

ষষ্ঠ ত্বকের নাম রোহিণী। ইহার পরিমাণ একটি ধাত্তের ত্রায়। গ্রন্থি, অপটী অর্কদ, স্নীপদ ও গলগণ্ড রোগ এই ত্বকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সপ্তম ত্বকের নাম মাংসধরা। ইহার পরিমাণ দুইটি ধাত্তের অনুরূপ। ভগন্দর, বিদ্রুধি ও অর্শোরোগ এই ত্বকে হইয়া থাকে।

অঞ্জলি কলার পরিচয়।—
প্রথমা মাংস ধরা কলা। এই কলাধিষ্ঠিত স্নায়ু, ধমনী ও স্রোত সমূহের বিস্তারে মাংসে সারা জন্মিয়া থাকে। দ্বিতীয়া কলার নাম রক্তধরা। এই কলাধিষ্ঠিত মাংসের মধ্যে, বিশেষতঃ যকৃত ও প্লীহাতে রক্ত অবস্থিতি করিয়া থাকে। তৃতীয়া কলার নাম মেদোধরা। যাবতীয় প্রাণীর উদরে ও স্তন্য অস্থি সমূহে মেদ অবস্থিত। বৃহৎ অস্থিতে যে মেদ অবস্থান করে, তাহার নাম মজ্জা। অর্থাৎ মেদ—স্থূল অস্থির মধ্যগত হইলে তাহার নাম মজ্জা এবং সেই মজ্জা রক্তযুক্ত হইয়া স্তন্য অস্থিতে সংলগ্ন হইলে তাহাকে মেদ বলে। চতুর্থী কলার নাম স্নেহোধরা কলা। প্রাণিগণের সকল সন্ধি স্থানেই ইহা অবস্থিত। যেমন

পকটে তৈল প্রদান করিলে চক্ষু সহজে প্রবর্তিত হয়, সেই প্রকার সন্ধিস্থান—কক্ষ বায়া সংশ্লিষ্ট থাকিলে সন্ধিস্থানের সেই কার্য্য লব্ধ সহজে নির্বাহিত হইয়া থাকে। পক্ষ্মী কলার নাম পুরীষ কলা। ইহা পকাশয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিতি পূর্বক কোষ্ঠ মধ্য হইতে মলকে বিভাগ করিয়া থাকে। এই কলা যকৃৎ, কোষ্ঠ ও অন্ন সমূহকে সমাপ্তর পূর্বক উত্তুকহ মলকে পৃথক করিয়া দেয়। যকী কলার নাম পিত্তধরা। আমরা বাহ্য কিছু ভোজন করি, ভক্ষণ করি, পান করি, তাহার সমস্তই এই কলার সাহায্যে পকাশয়ে আনীত হইয়া পিত্তভেজ দ্বারা পরিপাক করাইয়া বধাকালে জীর্ণ করাইয়া থাকে। লম্বুরী কলার নাম শুক্রধরা। ইহার অবস্থিতি হান প্রাণীদিগের সর্ক দেখে। ইহার সাহায্যে প্রকৃতি-পুরুষের সন্ধিলনে শুক্র প্রবর্তিত হইয়া থাকে।

আশ্মাশ্রু—সাত প্রকার আশ্রের নাম কবি বলিয়াছেন, বাতাসয় পিত্তাসয়, ককাশয়, রক্তাসয়, আম্বাসয়, পকাশয় ও মূত্রাসয়।

অম্ল—পুরুষ দিগের অম্লের পরিমাণ সার্ব তিন ব্যাস এবং নারী দিগের অম্লের পরিমাণ তিন ব্যাস।

শ্রোত অথবা **আবহেদ** **বিশ্রোত**—দুই বর্ষ, দুই চন্দ্র, নাসিকাধর, শুষ্ক দেশ ও মেট্র—পুরুষদিগের এই নয়টি ধার বা শ্রোত। স্ত্রীলোকদিগের ইহা ব্যতীত অনবধ ও রক্ত-বহ অধোভাগহ আর একটি ধার আছে।

কণ্ডুগ্রা—কণ্ডুরা ১৬টি, হস্ত, পদ, গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ প্রত্যেক স্থানে ৪টি করিয়া ইহার অবস্থিত। হস্ত ও পদ পদ কণ্ডুরা হইতে

নখ উৎপন্ন হয়। গ্রীবা ও হস্তসহিত কণ্ডুরা হইতে মেট্র জন্মিয়া থাকে। শ্রোণি ও পৃষ্ঠস্থিত অধোগত কণ্ডুরা হইতে নিতম্ব জন্মিয়া থাকে। গ্রীবাশ্রিত কণ্ডুরা হইতে মস্তক মণ্ডল, বক্ষোমণ্ডল ও হৃদ মণ্ডল এবং উর্দ্ধগত পাদাশ্রিত কণ্ডুরা হইতে উরু মণ্ডলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

জাংগল—জাল চারি প্রকার। মাংস জাল, শিরা জাল, স্নায়ু জাল ও অস্থিজাল। ইহার প্রস্রাবের সন্নিবন্ধ, প্রস্রাবের সংশ্লিষ্ট ও প্রস্রাবের ছিদ্রে মিলিত হইয়া প্রত্যেক সন্নিবন্ধে ও গুলফ দেশে এক একটি করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে।

কুর্চ—কুর্চ ছয়টি। ইহাদের মধ্যে হস্তে দুইটি, পদে দুইটি, গ্রীবা দেশে একটি ও মেটে একটি অবস্থিত।

মাংসস্রোত—মাংসস্রোত চারিটি। পৃষ্ঠ দেশের দুই ধারে পেশী বন্ধনাব্দ দুইটি এবং মেরুদেশের বাহিরে একটি ও অভ্যন্তর ভাগে একটি অবস্থিত।

সেন্সরী—সেন্সরী সাতটি। মস্তকে পাঁচটি, জিহ্বায় একটি এবং উপহৃদে একটি।

অস্থিসংখ্যাত—অস্থিসংখ্যাত চৌদ্দটি। গুলক, জাহ্ন ও বক্ষ্য দেশে তিনটি, এই প্রকার অপর সন্ধিতে তিনটি, বাহ্যবধে ছয়টি ও ত্রিক দেশে এবং মস্তকে এক একটি।

স্রীমন্ত—স্রীমন্ত চৌদ্দটি। ইহার অস্থি সংখ্যাতের স্থলেই অবস্থিত।

অস্থি—আয়ুর্বেদজ পণ্ডিতেরা অস্থির সংখ্যা নির্ণয়ে সর্ক সমেত তিনশত ছয়টি অস্থি বলিয়া থাকেন। কিন্তু শল্যবিদগণ ইহার সংখ্যা নির্ণয়ে তিনশত বলেন। মোটের উপর

ইহার আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। কপাল অস্থি, কচক অস্থি, নলক অস্থি, তরুণ অস্থি, বলয় অস্থি। জাহ্ন, নিতম্ব, বক্ষ, গণ্ড, তালু শব্দ ও মস্তকে কপাল অস্থির অবস্থিতি স্থান। দন্ত সমূহকে কচক অস্থি বলে। নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষু কোষস্থ অস্থি সমূহকে তরুণ অস্থি বলে। হস্ত, পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষ এই সকল স্থানে বলয় নামক অস্থি অবস্থান করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য অস্থি গুলির নাম নলকাস্থি।

সন্ধি—সন্ধি দুই প্রকার, এক প্রকার চেষ্টাশীল, ইহার হস্ত, পদ, হস্ত, কটিদেশ ও গ্রীবাদেশে অবস্থিত। ইহা ভিন্ন অপর সন্ধি গুলির নাম অচল সন্ধি। সন্ধি সমূহের সংখ্যা নির্ণয় করিলে দুইশত দশটি হইয়া থাকে। ইহাদের প্রকারভেদ করিলে এই সন্ধি আবার আটভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—কোর, উদুখল, সামুদ্র, প্রতর, তুর সেবনী, বায়সজুও, মণ্ডল এবং শঙ্খাবর্ত। অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুলফ, জাহ্ন ও কর্ণ—এই সকল স্থানে কোর নামক সন্ধি সকল অবস্থিতি করে। কক্ষদেশ, বক্ষন ও দন্ত দেশে উদুখল সন্ধির অবস্থিতি স্থান। স্বক্-দেশ, গুল, বোনি, নিতম্বদেশে সামুদ্র নামক সন্ধি অবস্থিতি করে। গ্রীবা ও পৃষ্ঠ দেশে প্রতর নামক সন্ধির অবস্থিতি স্থান। মস্তক, কটি ও কপালদেশের সন্ধির নাম তুর-সেবনী। হস্তর উভয় দিকের সন্ধির নাম বায়সজুও। কর্ণ, জহ্ন, নেত্র, রোম ও নাড়ী দেশের সন্ধি সমূহকে মণ্ডলসন্ধি বলে এবং কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও নেত্রগত শিরা সমূহের সন্ধি সকলের নাম শঙ্খাবর্ত। যে

সন্ধি গুলির পরিচয় প্রদত্ত হইল—ইহাদের সব গুলিই অস্থিসন্ধি; পেশী, স্নায়ু ও শিরা এই সকলের সন্ধির পরিচয় স্বতন্ত্র।

স্নায়ু। স্নায়ুর সংখ্যা নির্ণয়ে ইহার নয় শত। প্রকার ভেদে ইহার চারি প্রকার; যথা—প্রতানবতী, বৃত্ত, পৃথু ও শুবির। হস্ত, পদ ও সমস্ত সন্ধি স্থানে অবস্থিত যে সকল স্নায়ু তাহাদের নাম প্রতানবতী। যে সমস্ত স্নায়ু কণ্ঠের নামে অভিহিত, সেই সকল স্নায়ু বৃত্ত। যে সমস্ত স্নায়ু আমাশয় ও পকাশয়ের অন্তে অবস্থিত—তাহাদিগের নাম শুবির এবং যে সমুদয় স্নায়ু পার্শ্ব, বক্ষ, পৃষ্ঠ ও মস্তকে অবস্থিত—সেই সকলকে পৃথুল স্নায়ু বলিয়া থাকে।

পেশী। পেশীর সংখ্যা পাঁচ শত। পায়ের প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া ১৫টি, পায়ের অগ্রভাগে ১০টি, পায়ের উপরি কর্ণদেশে ১০টি, গুলফ ও পদতলে ১০টি, গুলফ ও জাহ্ন উভয়ের মধ্যস্থলে ২০টি, জাহ্নদেশে ৫টি, উরুদেশে ২০টি এবং বক্ষন দেশে ১০টি—সর্ব সম্মত এক সন্ধিতে ১০০টি। এইরূপ অপর সন্ধিতে ১০০টি এবং বাহ্যস্থায় ২০০টি, সর্ব সম্মত হস্ত ও পদে ৪০০ শত পেশী আছে। ইহা ভিন্ন গুলফদেশে ৩, মেটু দেশে ১, লিঙ্গের সেবনী দেশে ১, অণ্ডকোষে ২, দুই নিতম্ব ১০, বস্তির উপরিভাগে ২, উদরে ৫, নাভিতে ১, পৃষ্ঠের উপরিভাগে পাঁচ করিয়া ১০, পার্শ্ব দেশে ৬, বক্ষ দেশে ১০, স্বক্‌সন্ধির চতুর্দিকে ৭, জহ্ন ও আমা-শয়ে ২, বক্রত, শ্রীহা ও উণ্ডকে ৬, গ্রীবাদেশে ৪, হস্তস্থ ৮, কাকলকে ১, গলদেশে ১, তালুদেশে ২, জিহ্বাতে ১, ওষ্ঠস্থ ২,

নাসিকাগুটে ২, চক্ষুর্দ্বয়ে ২, গণ্ডস্থলে ৪, কর্ণযুগে ২, ললাটে ৪, এবং মস্তকে ১ সর্বসমেত ৫০০টি। জীলোকদিগের ইহা ভিন্ন আরও ২০টি অধিক পেশী আছে। তন্মধ্যে ত্বনদ্বয়ে ১০, অপত্য পথে ৪, গর্ভছিদ্রে ৩ এবং শুক্রার্ভবেণ প্রবেশ পথে ৩—মোট ২০টিপেশী অতিরিক্ত।

অস্থি ।—মর্ষ স্থান একশত সাতটি। উহাদিগের প্রকারভেদে উহারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা, মাংস মর্ষ, শিরা মর্ষ, স্নায়ু মর্ষ, অস্থি মর্ষ এবং সন্ধি মর্ষ। ইহাদিগের মধ্যে মাংস মর্ষ এগারটি, শিরা মর্ষ এক চত্বিশটি, স্নায়ু মর্ষ সাতাশটি, অস্থি মর্ষ আটটি সন্ধি মর্ষ কুড়িটি।

শিরঃ—শিরা সর্বসমেত সাত শত। ইহাদিগের সর্বলগুলিই—নাভিমূলে সংলগ্ন। প্রাণী সমূহের প্রাণ নাভিতে অর্থাৎ নাভির আবরক শিরাসমূহ অবস্থিত। এই শির-গুলির মধ্যে মূল শিরা গুলির সংখ্যা ৪০টি, তন্মধ্যে বায়ুবাহিনী ১০টি, পিত্ত বাহিনী ১০টি এবং রক্তবাহিনী ১০টি। ইহাদের মধ্যে আবার বায়ু বাহিনী ১৭৫টি, এই সকল শিরা বায়ুর স্থান—পক্কাশয়ে অবস্থিতি করে। পিত্ত বাহিনী ১৭৫টি, ইহারা পিত্তের স্থান পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিতি করে। কফ বাহিনী শিরা ১৭৫টি, ইহারা কফের স্থান অর্থাৎ আমাশয়ে অবস্থিতি করে এবং রক্ত বাহিনী শিরা ১৭৫টি, ইহারা রক্তাশয়ে বস্তু ও প্রীহাতে অবস্থিত।

শিরা সঙ্ক্ৰান্তের স্থাননির্ণয়—বাতবাহিনী শিরা বাহা ১৭৫টি বলা হইল,

তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক সন্ধিতে ও প্রত্যেক বাহতে ২৫টি করিয়া এক শতটি, শ্রোণিদেশস্থ গুহে ও মেটে আটটি, দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া চারিটি, পৃষ্টদেশে ছয়টি, উদরে ছয়টি এবং বক্ষ দেশে দশটি, সন্ধি উপরি ভাগে গ্রীবাদেশে চৌদ্দটি, দুই কর্ণে চারিটি, জিহ্বা দেশে নয়টি, নাসিকায় ছয়টি ও চক্ষুর্দ্বয়ে আটটি—মোট ১৭৫টি বাতবাহিনী নাড়ী জানিবে।

ধমনী—ধমনী ২৪ প্রকার, ইহারা নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে ১০টি উর্দ্ধগামিনী, ১০টি অধোগামিনী এবং চারিটি তির্ধাকগামিনী। উর্দ্ধগামিনী দশটি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রাণাস উচ্ছ্বাস, জন্ম (হাঁচি) ক্ষুৎ, হাস্ত, কথন ও রোদন প্রভৃতি ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া শরীরকে ধারণ করিয়া রাখে। এই দশটি ধমনী হৃদয় দেশে গমন পূর্বক প্রত্যেকে তিনটি করিয়া ত্রিশটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি করিয়া দশটি ধমনী বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, ও রস বহন করে। দুইটি করিয়া আটটি দ্বারা, শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহীত হয়। দুইটি দ্বারা বাক্য নিঃসরণ হয়। দুইটি দ্বারা অব্যক্ত শব্দ প্রকাশিত হয়। দুইটি দ্বারা নিদ্রা জন্মে। দুইটি দ্বারা আগরণ কার্য নির্বাহিত হয়। দুইটি দ্বারা অশ্রুজল প্রবাহিত হয়। জীলোকের ত্বনদ্বয়ে যে দুইটি ধমনীর সাহায্যে শুষ্ক বাহিত হয়, তাহাদিগকে ক্ষীর বাহিনী বলিয়া থাকে, এই দুইটি ধমনীই পুরুষের দেহে ত্বনদ্বয় হইতে শুষ্ক বহন করিয়া থাকে। অধোগামিনী ধমনীদিগের

মধ্যে দশটি .মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও .আর্ন্তব প্রকৃতিতে শরীরের অধোদেশে বহন করিয়া থাকে। ইহারা আমাশয় ও পকাশয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিতি পূর্বক প্রত্যেকে তিনটি করিয়া ত্রিশটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি করিয়া ধমনী বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত ও রসকে বহন করিতেছে। দুইটি অন্ন বহন করিতেছে। দুইটি অন্নদেশে সংশ্রিত হইয়া জল বহন করিতেছে। দুইটি শুক্র প্রকাশ ও বহন করিতেছে। এবং ইহারাই স্ত্রীজাতির কলেবরে আর্ন্তব বহন করিতেছে। কুল অস্ত্রে সংলগ্ন দুইটি ধমনীর দ্বারা নল নিঃসারিত হইতেছে। এই আটটি ধমনী ত্রিযাক গামিনী ধমনীগণের মধ্যে স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ষ অর্পণ করিয়া থাকে। ত্রিযাক গামিনী চারিটি ধমনীর প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর শত শত সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা রূপে স্বয়ং বিভক্ত হইয়া শারীরিক রস দেহের অভ্যন্তরে ও বাহির্ভাগে স্তম্ভপিত্ত করিয়া থাকে।

শ্রোত—শ্রোত বহু সংখ্যক। তন্মধ্যে দুইটি প্রাণবহ, সেই দুইটি শ্রোতের মূল—হৃদয় ও রস বাহিনী ধমনী সকল। দুইটি অন্ন-বহ, সেই দুইটির মূল আমাশয় ও অন্নবহা ধমনী সকল। দুইটি উদকবহ, সেই দুইটির মূল। তালু দুইটি রক্তবহ, তাহাদের মূল যকৃত, প্রাণ ও রক্তবহা ধমনী সকল। রক্তবহ শ্রোত দুইটি, তাহার মূল—হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনী সকল। দুইটি মাংসবহ, তাহাদের মূল—স্নায়ু, স্বক ও প্রকৃত বাহিনী ধমনী সকল। দুইটি মেদোবহ, তাহাদের মূল কটদেশ ও বৃকয। দুইটি মূত্রবাহী,

তাহাদের মূল বন্তি ও মেত্র। দুইটি পুরীষ বাহী, তাহাদের মূল পকাশয় ও শুক্ৰদেশ। দুইটি শুক্রবহ, তাহাদের মূল স্তনযুগ ও বৃকয। দুইটি আর্ন্তবহ, তাহাদের মূল গর্ভাশয় ও ধমনী সকল।

ডিসেকশন বা শব্দচ্ছেদ সঙ্ক্ষেপ—স্থত সংহিতায় এইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, যে দেহের কোনো এক বিষ কর্তৃক উপহত, বহু কালীন স্থায়ী ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত ও একশত বৎসরের অধিক বয়সের না হয়, সেই মৃতদেহ সংগ্রহ পূর্বক অন্ন অর্থাৎ নাড়ী ভূঁড়ি ও মল নিঃসারিত করিয়া মুগ্ধ, ছাল, শণ, কুশ প্রভৃতির কোনো একটির দ্বারা সেই দেহ উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া একটি বড় খাঁচায় পুরিয়া শ্রোত-হীন নদীতে নির্জনে রাখিয়া পচাইবে। সাতরাত্রি এইরূপ ভাবে পচাইয়া বেণার মূল, চুল, বাশের চটা, গাছের ছাল ও তুলি—ইহাদের যে কোনো একটির দ্বারা আন্তে আন্তে ত্রগাদি ঘর্ষণ পূর্বক বাহ ও আভ্যন্তরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি সকল বিশেষরূপে দর্শন পূর্বক পরীক্ষা করবে। যে ব্যক্তি দেহে ও শাস্ত্রে শারীরিক বিষয় গুলি ঐক্য করিয়া শিক্ষা করেন, তিনিই চিকিৎসা কার্যে বিশেষ পারদর্শী হইতে পারেন। মৃতদেহ ছেদন ও গুরুপদেশ দ্বারা সকল সন্দেহ মীমাংসা পূর্বক চিকিৎসা কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

আয়ুর্বেদে শারীর বিজ্ঞা বা অ্যানাটমীর পরিচয় আরও বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে, আমরা প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে অতি সংক্ষেপে তাহারই সারাংশ সকলন করিয়া

দিলাম মাত্র । বাঁহারা আয়ুর্বেদের অ্যানাটমী ডাক্তারি অ্যানাটমী অপেক্ষা আয়ুর্বেদের অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহা অ্যানাটমী কব উন্নত ছিল না, এখন চর্কার স্বীকার করিতে হইবে যে, এখনকার দিনের অভাবে উহা নুগ্ন হইয়াছে এইমাত্র ।

রোগ-বিজ্ঞান

[কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সানামধ্যারী]

—:—

বিশেষজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, খেড়ে ও নেংটা ইন্দুরেরা যক্ষাকাসের দ্বারা প্রায় আক্রান্ত হয় না । ইহাদের শ্বাবারের মধ্যে অসংখ্য যক্ষাজীবাণু মিশাইয়া দিলে বা দেহের ভিত্তর স্রুচের সাহায্যে যক্ষা-জীবাণু প্রবেশ করাইলে ইহাদের শরীরে যক্ষার লক্ষণ ফুটিবে না । তাই বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিলেন যে, পাখুরের ধুলার সঙ্গে যক্ষার জীবাণু মিশাইয়া দেহে প্রবেশ করাইবেন । এই পরীক্ষার ফল হইল আশ্চর্য । পাখুরে ধুলার সঙ্গে যক্ষার জীবাণু শরীরে প্রবেশ মাত্র ইন্দুরের শরীরে যক্ষার চরম লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল এবং প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই তাহারা প্রাণত্যাগ করিল ।

পাখুরে ধূলা প্রত্যেক সহরের রাজপথে ছড়ান থাকে, সেই জন্যই গ্রাম অপেক্ষা সহরেই যক্ষার প্রাদুর্ভাব বেশী ।

রোগ জীবাণুকে নির্মূল করা অসম্ভব ব্যাপার । আমরা প্রত্যহই নিঃশ্বাসের সঙ্গে রোগ-জীবাণু গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের রোগাক্রান্ত না হইবার কারণ এই যে, আমাদের জীবনীশক্তি যেখানে স্বাস্থ্যের

বিধি লজ্জিত না হয় সেই থানেই প্রবল থাকে, সেই জন্ত পূর্বোক্ত ধূলিকণারূপী রোগজীবাণুরা দেহে প্রবেশ করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না ।

সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রাইট ডিজিজেরও রোগজীবাণু আছে ; তাহারান্ত সর্কাসে ধূলা । অতএব মানবের স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে ধুলার চেয়ে বড় শত্রু খুব কমই আছে । আরও কত রোগের মূল কারণ যে ধূলা তাহা কে বলিতে পারে ?

প্রসিদ্ধ যক্ষা চিকিৎসক ও যক্ষারোগে Vegetabbs Prasin, ইজেক্সনের আবিষ্কার কর্তা ডাক্তার হারবি বহ প্রকার পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়াছেন যে কচ্ছপ ও ছাগের শরীরে যক্ষাজীবাণু প্রবেশ করাইলে সেই জীবাণুগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা ছাগ বা কচ্ছপের শরীরে রোগ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না । এই সত্য যে, ডাক্তার হারবি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে ; আদিম যুগের ঋষি সূত্রদায় ইহার সত্যতা অল্পধাবন করিয়াছিলেন, তাই যক্ষা রোগীর আহাৰাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন—

ছাগমাংসং পরচ্ছাগং ছাগং সপিঃসংসর্করম্
ছাগোপসেবাশয়নং ছাগমধ্যেতু যন্ত্রণ্যৎ ।

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধপান, শর্করা
সহিত ছাগদুগ্ধ পান, ছাগ সেবা ও ছাগ মধ্যে
শয়ন করিলে যক্ষ্মা রোগ আরোগ্য হয় ।
আরও ছাগদুগ্ধ, ছাগ বিষ্টার রস, ছাগমূত্র,
ছাগ দুগ্ধ ও ছাগ দধির দ্বারা প্রস্তুত “অজা-
পক্ষক দ্রুত” যক্ষ্মা রোগে মহোপকারী । ছাগের
জীবাণু নাশক শক্তি আছে তাহা তাহার
নির্ধারণ করিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।

শুক্র-শোণিত প্রভৃতি যাবতীয় ধাতুই
কতকগুলি অণুগোলক বা cell এর সমন্বয়ে
গঠিত হয় । এক বিন্দু রক্ত কণিকায় বহু
cell বা অণুগোলক বিद्यমান থাকে—তাহা
অল্পবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখা যায় । সেই
cell গুলি আবার যে প্রটোপ্লাজম, ক্রো-
ম্যাডম ও নিউক্লিয়াসের সমন্বয়ে গঠিত
হইয়া প্লাজমা নামক জলীয় পদার্থে cell
রূপে বিद्यমান আছে, তাহা পূর্বেই দেখান
হইয়াছে । সেই যন্ত্র অণুগোলক বা cell
এরও জীবন আছে তাহা যন্ত্রে সংহিতার
শারীর স্থানে ৩য় অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া
যায় । যথা:—

“সৌম্যং শুক্র মার্ভব ম্যুগ্ধেযামতরেষামপ্যজ
ভূতানাং সান্নিধ্য মন্ত্যমুনা বিশেষণ
পরম্পরোপকারাং পরম্পরানুগ্রহাং পরম্পরা-
নুগ্রহবেশাদ ।”

অর্থাৎ শুক্র সৌমণ্ড্র—বিশিষ্ট, রক্ত
অগ্নিগুণ বিশিষ্ট; তথাপি এই দুই দ্রব্যে
অন্তান্ত ভূতদিগের সান্নিধ্য আছে, তাহার
এই সকল দ্রব্যে অণুভাবে আছে এবং অণু-

অগ্রহারণ—২

ভাবে পরস্পর পোষিত ও পরস্পর সন্নিবিষ্ট
হয় ।

পুরুষের শুক্রস্থান যেমন অণ্ডকোষ,
স্ত্রীলোকেরও শুক্রস্থান সেইরূপ ডিম্বকোষ
(ovary) । তথা হইতে শুক্রবাহী নলী
(Phalopian tube) দিয়া স্ত্রী শুক্র
গর্ভাশয়ে আসিয়া পড়ে । তথায় শুক্র গত
কীট পুরুষের শুক্রগত কীটের সহিত
অণুপ্রবিষ্ট হয় । স্ত্রী-শুক্রকীটকে ovam
বলে ।

সকল ধাতুর মধ্যস্থিত অণুগোলক গুলির
যে প্রাণ আছে, তাহা পাশ্চাত্য অল্পবীক্ষণ
যন্ত্র দেখাইতে পারে নাই, কিন্তু মহর্ষি যন্ত্রে
তাহা কোন প্রাচীন যুগে দেখিয়া গিয়াছেন,
ইহাতেও সেই অতীতকালে যে অল্পবীক্ষণ
যন্ত্র ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ।

এই সকল ভূত যে দেবযোনি বিশেষ
নহে, জীবাণু মাত্র,—তাহা যন্ত্রে অস্তিত্ব
বলিয়াছেন যথা—

নতে মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি
নবা মনুষ্যানু কচিদা বিশন্তি ।
যে বা বিশন্তীতি বদন্তি মোহাৎ
তে ভূত বিজ্ঞা বিষয়াদপোহাঃ ॥
তেষাং গ্রহানাং পরিচারকা যে
কোটি-সহস্রাযুত পদ্ম সংখ্যাঃ ।

উত্তর তন্ত্রে ৬০ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোক ।

ভূত অর্থাৎ দেবযোনিগণ কখন মনুষ্যের
সহিত সংবিষ্ট হয় না, বা মনুষ্যে আবেশ
করে না । যে বৈজ্ঞানিক মুর্খাবশতঃ বলেন যে
ভূতগণ ঐরূপে সংবিষ্ট হয় অর্থাৎ মনুষ্যকে
ভূতে পায় বা আবেশ করে, সেই বৈজ্ঞানিক
ভূতবিজ্ঞানের অধিকার হইতে বাহির করিয়া

দেওয়া উচিত। মৃত অর্থাৎ দেববানী গণের কোটি-সহস্র অমৃত পদ্ম (অর্থাৎ অসংখ্য) পরিচারক আছে, এবং তাহারা ইহা মানব শরীরে আবেশ করে।” ভূতগণের এই পরিচারক গুলিই যে Bacteria (ব্যাক্টেরিয়া) এবং তাহা জীবাণু যুক্ত, তাহা ইহার দ্বারা ই প্রতাপন্ন হয়। স্বপ্নত বলিয়াছেন—

“কেচিভূতাভিম্বকোথংক্রবতে বিষমজ্বরম”

এই পাঠ দ্বারা বুঝা যায় যে, ভূতাভিম্বক হইতে বিষমজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ভূত অর্থে প্রাণী বা জীবাণু বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ ম্যালেরিয়া ও কালাজরে জীবাণু বর্তমান থাকে—তাহা রক্ত পরীক্ষা দ্বারা পরিদৃষ্ট হয়। আর এই জ্বর বিষমজ্বরেরই অন্তর্গত। পাশ্চাত্যেরা ম্যালেরিয়া ও কালাজরের জীবাণুকে পৃথক জাতি বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু ম্যালেরিয়ারই পুরাতন অবস্থা, কালাজরে পরিণত হয় দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার পার্থক্য সম্বন্ধে বলনা করিতে পারা যায় যে, যেমন বেঙ্গাচী লাঙ্গুল খসিয়া জল হইতে ভূমিতে উঠিলেই বেঙ হয়, সেইরূপ নবজ্বরই তিন সপ্তাহ অতীত হইলে জীর্ণ জরে পরিণত হয় ও জীর্ণ জ্বরই বিষমজ্বর প্রাপ্ত হইলে বিষমজ্বর বা ম্যালেরিয়ায় রূপান্তরিত হয় এবং ম্যালেরিয়াই পুরাতন অবস্থায় কালাজরে পরিণত হইয়া থাকে। জ্বরের প্রথম হইতেই জীবাণু সংস্কৃত থাকে, তবে ক্রমশঃ “ধাতুমল্লতমঃ প্রাপ্তঃ কুর্বন্তি বিষমজরান্” রসধাতু হইতে রক্তধাতু প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া কালাজরে পরিণত করে। এইরূপ মাত্র গ্রাম্য কুচিকিংসকের

কুচিকিংসাতেই ঘটয়া থাকে; নবজ্বরে কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগই তাহার প্রধান কারণ, যে হেতু আয়ুর্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

“অক্ষি কৃক্ষি ভবা রোগা প্রতিশ্যায় ত্রণ জরাঃ পকৈতে পঞ্চরাজেন প্রশম্য যান্তি লজ্জনানঃ”

নেত্রগত, উদরগত রোগ, প্রতিশ্যায়, ত্রণ ও জর পাঁচদিন লজ্জন প্রদানেই আরোগ্য হয়, এই লজ্জনের লক্ষণ কহিয়াছেন—

“অভূমিজং নিরাকারং পথ্যং বড়ুস বর্জিতং চরকেণ সমুদ্বিষ্টং লজ্জনং পরমং মহৎ ॥”

নবজ্বরে এইরূপ উপবাস দেওয়াই উচিত, ঔষধ প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তাই আত্রেয়—অগ্নিবেশকে “লালা এসেক হস্তাস হৃদয়া-ভক্ষ্যরোচকাঃ।”—প্রভৃতি নবজ্বরের লক্ষণ বলিয়া অবশেষে বলিতেছেন—

“আমজরস্যলিঙ্গানি ন দদ্যাৎ তত্র ভেষজং”

অগ্নিবেশ ও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি প্রস্তাব করিলেন “ভেষজং হ্যামদোষন্য” যদি আম দোষের পারিপাক জন্ম ঔষধ দেওয়া যায়?—আত্রেয় বলিলেন—“ভূয়োজ্জলয়তি জরম্” পুনরবার জ্বর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। অগ্নিবেশ বলিলেন “শোধনং শমনীয়মা?” শোধনায় বা শমনায় ঔষধ প্রদানে কি হয়? আত্রেয় বলিলেন—“কুর্বন্তি বিষম জরান্” সমস্ত, সমস্ত প্রভৃতি বিষম জরে পরিণত হইবে। জ্বরের লক্ষণে বলিয়াছেন “আসপ্ত রাজং তরুণ জরমাহর্মণিবানঃ, মধ্যং দ্বাদশ রাজতং পুরাণ মত উত্তমম্, ত্রিশপ্তাহং ব্যতীতেতু জরো য তত্বতাং গতদ্বীহারিবাৎ কুরুতে স জীর্ণ জর মুচ্যতে” এই সাতদিন পর্যন্ত তরুণ জ্বরে জ্বর কষায়াদি নিষেধ করিয়াছেন—

হুইনাইন প্রভৃতি জ্বর ঔষধ দেওয়া যাইতেই পারেনা। ঋষি বলিয়াছেন—

“কষায়ঃ যঃ প্রযুক্তীত নরাণাং তরণে জরে
স স্তপ্ত কৃষ্ণসর্পস্ত করাগ্রেণ পরায়ুশেৎ ॥”
তরুণ জরে কষায় প্রয়োগে স্তপ্ত কৃষ্ণ সর্পকে
করাগ্রে দ্বারা ধরিলে যে ফল হয়, সেই ফল
হইয়া থাকে। ঋষি বলিয়াছেন—

“যঃ কষায়ঃ কষায়ঃ স্রাত্তং বর্জ্যন্তরুণেজরে।
নতু কষায় মুদ্ভিশ্ত কষায় প্রতিষিধ্যতে।
বাহা কষায় রস বিশিষ্ট, তাহাই তরুণ জরে
বর্জনীয়, অতএব দেখা যায় যে, কৃচিকিৎসার

ফলেই নবজরে জীবাণু সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তাই
ক্রমশঃ কালাজরে পরিণত হয়, নচেৎ কাল
জরে পর্যাবসিত হইলেই যে, জীবাণুর আবেশ
হয় তাহা নহে। রায় বাহাদুর ডাঃ হরি নাথ
ঘোষ এম, ডি মহাশয় কলিকাতা মেডিক্যাল
ক্লাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মশক দংশনেও
কালাজর হইয়া থাকে। মশক দংশনে কিন্তু
ম্যালেরিয়া জর উৎপন্ন হয় ইহাই সর্ববাদী
সম্মত। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে,
ম্যালেরিয়া ও কালাজরে নিদান অভিন্ন।

(ক্রমশঃ)

কার্য চিকিৎসা ক্রমোপদেশ ।

তৃতীয় খণ্ড ।

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন]

(বাতব্যাদি)



সাধারণতঃ বায়ু কুপিত হইয়া বিকার
প্রাপ্ত হইলে তাহার সংজ্ঞা বাতব্যাদি
প্রদান করা যায়। শাস্ত্রে এই বাতব্যাদির
প্রকার ভেদ আশী প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছে।
শিরোগ্রহ, অন্ন কৃশতা, অত্যন্ত জ্বা, হৃৎগ্রহ,
জিহ্বাস্তম্ভ, গদগদস্ব, মিন্মিনস্ব, মুকস্ব,
বাচালতা, প্রলাপ, রসজ্ঞানভিজ্ঞতাবাধির্ধ্য
কর্ণনাদ, ‘‘স্পর্শজ্ঞত’’ অর্দ্রিত, যন্ত্রাস্তম্ভ
বাহুশোষ, অববাহক, বিষটী, উর্দ্ধবাত,
আন্নান, প্রত্যায়ান, বাতাঙ্গীলা, প্রতিষ্টিলা,

ভূগী, প্রতিভূগী, অগ্নিবৈষম্য, আটোপ,
পার্শ্বশূল, ত্রিকশূল, মুহমূর্জণ, মূত্রনিগ্রহ,
মলগাঢ়তা, মলের অপ্রবৃত্তি, গৃধ্রসী, কলায়
ভঙ্গতা, খঙ্গতা, পঙ্কতা, কোষ্ঠশীর্ষক, ধনী,
বাতকণ্টক, পাদহর্ষ, পাদদাহ, আক্ষেপ ও
দণ্ডক, কফপিত্তাহবন্ধ, আক্ষেপ, ও দণ্ডাপ-
তানক রোগ, অভিঘাত জন্ত আক্ষেপ,
অস্তর আয়াম, ও বহিরায়াম ভেদে দুই
প্রকার আয়াম, দহন্তম্ভ, কুজক, অপতন্মক,
অপতানক, পক্ষাঘাত, থিলাক, কন্দ, শুষ্ক,

ব্যথা, তৌর, ভেদ, ক্ষরণ, রোক্ষা, কার্ষ্য, কাক, শৈত্য, লোমহর্ষ, অঙ্গমর্দন, অঙ্গ বিক্ৰম, শিরা সঙ্কোচ, অঙ্গশোষ, ভীক্ৰম, মোহ, চলচিহ্নতা, নিদ্রানাশ, শ্বেদনাশ, বলহানি, ক্ষুধক্ষয়, রজোনাশ, গর্ভনাশ ও পরিভ্রম। ইহাদিগের মধ্যে যে কয়টি সাধারণতঃ হইয়া থাকে, তাহাদিগের নামোল্লেখ পূর্বক প্রতীকারোপায় বলা হইতেছে।

আক্ষেপ, অপতন্ত্রক, অপতানক। আক্ষেপের সাধারণ নাম খিচুনি। যে রোগে বায়ু—হৃদয়, মস্তক ও ললাট দেশের পীড়া জন্মাইয়া দেহকে ধ্বংসের স্থায় নত ও আক্ষেপযুক্ত করিয়া থাকে, তাহার নাম অপতন্ত্রক। এই অপতন্ত্রক রোগে রোগী মূচ্ছিত, নিম্নলিখিত চক্ষু ও সংজ্ঞাহীন হয়। কঠে শ্বাস পরিত্যাগ এবং পারাবতের স্থায় শব্দোচ্চারণও এই রোগে হইয়া থাকে। অপতানক রোগে যখন বায়ু হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখনই সংজ্ঞানাশ হইয়া এই রোগ প্রকাশিত হয় এবং বায়ু হৃদয়ে চলিয়া গেলেই রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে। এই রোগে দৃষ্টিশক্তির নাশ, সংজ্ঞা লোপ এবং কঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ নির্গত হইয়া থাকে।

দণ্ডাপতানক—রোগে কুপিত বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত ধমনীকে অবলম্বন পূর্বক দস্তের স্থায় শরীরকে শুষ্কিত করিয়া তাহার আকৃষ্টনাদি শক্তি নষ্ট করে।

ধনুঃশস্ত্র—ইহার চলিত নাম ধনুঃকাণ্ড। অন্তরায়াম ও বহিরায়াম ভেদে

এই ব্যাধি বিবিধ। এই রোগে অতি কুপিত বলবান বায়ু অকুলি, শুষ্ক অঠর, বক্ষঃস্থল, হৃদয় ও গলদেশের বায়ু সমূহকে আকর্ষণ করিলে রোগী ক্রোড়াভিমুখে নত হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থার নাম অন্তরায়াম। এই অবস্থায় রোগীর চক্ষুদ্বয় শুষ্ক হয়, চোশাল বন্ধ হইয়া যায়, পার্শ্বীয় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কক্ষ উদগীর্ণ হইতে থাকে। বহিরায়াম ধনুঃকাণ্ডে বায়ু পৃষ্ঠের দিকে বায়ু সমূহ আকর্ষণ করায় রোগী পৃষ্ঠের দিকে নত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় বক্ষঃস্থল, কটি ও উরু ভগ্নবৎ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় ধনুঃশস্ত্র অসাধ্য জানিবে। গর্ভপাত, অধিক রক্তশ্রাব এবং আঘাতাদির ফলেও এইরূপ অবস্থা ঘটিলে তাহাও অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে।

পক্ষাঘাত বা **প্রশাঙ্ক** **পাত**।—এই রোগ দুই প্রকার। কাহার ও বাম-দক্ষিণ বিভাগের, একভাগে কাহারও কটি দেশের উর্দ্ধ ও অধোভাগানুসারে এক ভাগে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগে কুপিত বায়ু কর্তৃক দেহের অর্দ্ধভাগ আক্রান্ত হওয়ার শিরা ও বায়ু সমূহ সঙ্কুচিত ও বিণ্ডক হইয়া যায় এবং সন্ধিবন্ধ সম্যক প্রকারে বিস্তারিত হয়। অজ্ঞাত যে ভাগে এইরূপ অবস্থা হয় সেই ভাগ অকর্মণ্য ও অচেতন প্রায় হইয়া উঠে।

অর্ধিত—এই রোগে বায়ু কুপিত হইয়া মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবা প্রদেশ বন্ধ করে এবং শিরঃ কণ্ঠ, বাক্য নিরোধ এবং নেত্রাদির বিকৃতি উৎপাদন করে। এই রোগ মুখের দুই পার্শ্বে জন্মিয়া থাকে, সেই

পাখের গ্রীবা, চিবুক ও হস্তে বেদন। হইয়া থাকে। এই রোগ যদি তিন বৎসর পর্যন্ত অচিকিৎসা রাখা যায়—তাহা অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে।

হস্তগ্রন্থি—কঠিন, দ্রব্য চর্চন বা কোনরূপ আঘাত প্রাপ্তির জন্য হস্তমূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া হস্তদ্বয় অর্থাৎ চোয়াল শিথিল করিয়া এই রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে মূখ বৃদ্ধিয়া থাকিলে ইহা করা যায় না।

অন্যগ্রন্থি—এই রোগে কুপিত বায়ু কফাক্রান্ত হইয়া মস্তা অর্থাৎ গ্রীবা দেশস্থ শিরা বয়বকে স্তম্ভিত করে, তজ্জন্য গ্রীবা ফিরাইতে পারা যায় না।

কিহ্বাস্তস্ত—এই রোগে কুপিত বায়ু বাগবাহিনী শিরায় অবস্থিত হইয়া, পান, ভোজন এবং বাক্যকথনের শক্তি লোপ করিয়া থাকে।

শিহোগ্রন্থি—এই রোগে গ্রীবদেশস্থ শিরা সমূহে কুপিত বায়ু অবস্থিত হইয়া শিরা সকল ক্লক, বেদনায়ুক্ত ও ক্লকবর্ণিত করিয়া থাকে। এই রোগে আক্রান্ত রোগী মস্তক চালনা করিতে পারে না। এ রোগ অসাধ্য।

পৃষ্ঠশীবা—এই রোগে প্রথম ক্লক (পাছা), তৎপরে বধাক্রমে কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জাহ্ন, জন্বা ও পাদদেশে ক্লকতা, বেদনা ও স্ফিবেধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

বিশ্রাচী—বাহ্য পশ্চাৎভাগ হইতে বেসকল বড় বড় শিরা অঙ্গুলিতল পর্যন্ত বিস্তৃত আছে, বায়ু কর্তৃক সেই শিরাগুলি দূষিত হইলে বাহ অকর্ণণ্য ও আকৃকন প্রসা-
রণাদি ক্রিয়ামুদ্র হইয়া থাকে। ইহারই নাম

বিশ্রাচী। ইহা একটা বা দুইটা বাহতেও হইতে পারে।

শ্রোণী—এই রোগে কুপিত বায়ু ও দূষিত রক্ত উভয়ে মিলিত হইয়া জাহ্নমধ্যে শৃগালের মস্তকের ন্যায় এক প্রকার শোথ উৎপন্ন করে।

শ্রোণী—কটি দেশস্থ কুপিত বায়ু যদি এক উর্ক জন্মার বড় শিরাকে আকর্ষণ করিয়া রাখে তাহা হইলে ঋগতা, দুই পায়ের জন্বা দেশস্থ শিরা আকর্ষণ করিলে পদ্ধতা এবং যে রোগে পা ফেলিবার সময়পা কাপিতে থাকে, তাহার নাম কলারংগ বলিয়া জানিবে।

শ্রোণী—অসম অর্থাৎ উচ্চ নিচ পাদ বিন্যাস এবং বায়ু প্রকোপের ফলে গুলকদেশে বেদনার উৎপত্তি এই রোগে হইয়া থাকে।

পাদদাহ, **পাদদর্শ**—অতিরিক্ত ভ্রমণের ফলে পিত্ত, রক্ত, ও বায়ু কুপিত হইয়া পাদদাহ রোগ জন্মাইয়া থাকে। পাদদহ স্পর্শ শক্তি হীন, বাহ্যবার রোমাঞ্চিত এবং কিন্ বিনি বেদনায়ুক্ত হইলে তাহাকে পাদদর্শ বলা যায়।

অহমেশা—ক্লক দেশস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া ক্লকের বন্ধন অরূপ স্লেম্মাকে গুল করিয়া এই রোগ জন্মাইয়া থাকে।

অবহা—ক্লকস্থিত কুপিত বায়ু শিরা সমূহকে সঙ্কুচিত করিলে তাহাকে অব-
বাহক বলে।

গদগদ ভাষী—কফ সংযুক্ত বায়ু পদ বাহিনী ধমনী সমূহকে দূষিত করিয়া

মিন্ মিনে, গদ গদ ভাবী এবং বোবা করিয়া থাকে।

তুলীওপ্রতি তুলী এই রোগে মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উদ্ভিত হইয়া শুষ্ক দেশ, লিঙ্গ বা যোনি দেশে বিদারণব্য বেদনা জন্মাইয়া থাকে। ঐরূপ বেদনা শুষ্ক দেশ, লিঙ্গ বা যোনি প্রদেশ হইতে উদ্ভিত হইয়া প্রবল বেগে পক্ষাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতুলী বলিয়া থাকে।

আগ্নান ও প্রত্যগ্নান—পক্ষাশয়ে বায়ু নিরুদ্ধ থাকিয়া উদরকে ক্ষীত, বেদনায়ুক্ত এবং গুড় গুড় শব্দ বিশিষ্ট করিলে তাহাকে আগ্নান এবং ঐ বেদনা পক্ষাশয় হইতে না হইয়া আমাশয় হইতে উদ্ভিত হইলে এবং উদর বা পার্শ্বদেশে ক্ষীতি না থাকিলে তাহাকে প্রত্যগ্নান কহিয়া থাকে।

অঙ্গীনা ও প্রত্যঙ্গীনা—নাভির অধোভাগে পানাস্থলের স্তায় কঠিন, উর্দ্ধ দিকে বিস্তৃত ও উন্নত এবং সচল বা অচল গ্রহি বিশেষ উৎপন্ন হইলে অঙ্গীনা ও উহা বক্রভাবে অবস্থিত থাকিলে তাহাকে প্রত্যঙ্গীনা কহিয়া থাকে। এই উভয় রোগেই মল, মূত্র ও বায়ু নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

বেপথু—সর্সাদ বিশেষতঃ মস্তক সর্সাদ কাপিতে থাকিলে তাহাকে বেপথু বলে।

প্রতী—পদ, জন্মা, উরু, ও করমূল মোচড়াইলে তাহাকে প্রতী বা খালধরা বলে।

এইবার বিবিধ বায়ু বিকারের চিকিৎসার কথা বলা বাইতেছে—

অপতর্পক ও অপতানক

ক্লোগে—চেতুনা সম্পাদন কৃত—মরিচ, লম্বিনাবীজ, বিড়ক ও কৃত্ত কৃত্ত তুলসী পত্র সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া নয়া গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে। হরীতকী, বচ, রান্না, সৈন্ধব লবণ, ধৈকল—এই সকল দ্রব্য সমভাগ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় আদার রসের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। দশমুলের কাথে পিপ্পল চূর্ণ এক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ভোজনের পূর্বে মরিচ চূর্ণের সহিত অন্ন দধি ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এই রোগে অপতর্পণ নিরূহবস্তি ও বমন প্রয়োগ কদাপি করিবে না।

পক্ষাশ্মাক ক্লোগে—মাষ কলাই, আলকুশী মূল, এরও মূল, ও বেড়েলা—ইহাদের কাথে হিং ও সৈন্ধব লবণ এক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। পিপ্পল মূল, চিতামূল, পিপ্পল, শুঠ, রান্না ও সৈন্ধব—ইহাদের কক্ক এবং মাষকলাইয়ের কাথের সহিত যথাবিধি তৈলপাক করিয়া মর্দন করাইবে। মাষ-কলাই, আলকুশী মূল, আতাইচ, এরও মূল, রান্না, শুলকা, ও সৈন্ধব—এই সকল দ্রব্যের কক্ক তৈলের চতুগুণ পরিমিত মাষকলাই ও বেড়েলার পৃথক পৃথক কাথের সহিত তৈল পাক করিয়া মর্দন করাইবে।

অর্দিত ক্লোগে—মুখ বিকৃত হইলে অর্থাৎ হাঁ করিয়া থাকিলে অকুষ্ঠদ্বয় দ্বারা হস্তদ্বান ও তর্জনীয় দ্বারা চিবুক ধরিয়া ছাপ দিয়া সংবৃত করিয়া দিবে। হস্ত শিথিল হইয়া পড়িলে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিবে। মুখ শুষ্ক হইয়া থাকিলে 'শ্বেদ প্রদান কর্তব্য।'

রসোন এই রোগে বিশেষ হিতকর। রসোন ছেঁচিয়া মাখনের সহিত এই রোগে সেবন করা কর্তব্য। বেড়েলা, মাষকলাই, আল-কুশুম্ব, গন্ধতণ, ও এরণ্ডমূল,—ইহাদের কাথ পান করিলে এবং ঐ কাথের নস্ত লইলে অর্দিত, পক্ষাঘাত ও বিবচী রোগ নষ্ট হয়। অর্দিত রোগে স্নেহ পান, নস্য, বাতন্ত্র দ্রব্য আহার এবং শিরো-বস্তি উপকারী। দশ-মূলীর কাথ বা ছোলঙ্গ লেবুর রস কিম্বা বেড়েলা অথবা পঞ্চমূলীর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান এই রোগে হিতকর। পিষ্ট মাংস ও ঘৃত ও নবনীতের সহিত ভোজন করিয়া অথবা দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত ভোজন করিয়া দশমূলীর রস পান করিলেও অর্দিত রোগ প্রশমিত হয়। এই রোগ পিত্তজন্ম হইলে শীতল দ্রব্য ও স্নেহ দ্রব্য ভক্ষণ প্রশস্ত। ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা বস্তিক্রিয়াও এ অবস্থায় উপকারী। কিন্তু এই রোগে যদি মুখ বক্র ও বাক্যোচ্চারণ শক্তি নষ্ট হইয়া থাকে, এবং দাহ হইতে থাকে, তাহা হইলে বায়ু পিত্ত-নাশক ক্রিয়া করিবে। যদি অর্দিত রোগ শোথসংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সর্কাপেকা বমনক্রিয়া এই রোগে সুপ্রশস্ত।

অন্যান্তান্ত রোগে—দশমূলীর
কাথ কিম্বা পঞ্চমূলীর কাথ পান এবং রন্ধ

ষেদ ও নস্য প্রয়োগ করিবে। এই রোগে তৈল বা ঘৃত গ্রীবা দেশে মর্দন করতঃ আকন্দ পত্র বা ভেরেণ্ডার পাতার দ্বারা উহা আবৃত করিয়া বায়ংবার ষেদ প্রদান করিবে। কুহুড়ার ডিম ভাজিয়া তাহার সহিত সৈন্ধব ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ গরম করিয়া গ্রীবা দেশে মর্দনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। অশ্বগন্ধা মূলের প্রলেপ এবং খাঁটী সরিষার তৈল মর্দন এই রোগে হিতকর।

গান্ধ গান্ধ ভাঙ্গী—রোগে—ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের কবলধারণ হিতকর। এই রোগে নিম্ন লিখিত তৈল সেবনের ব্যবস্থা করিও, বিশেষ উপকার পাইবে।

ঘৃত ১৪ সের—

কঙ্কার্ধ—সজিনার ছাল

বচ

সৈন্ধব—

ধাইফুল—

লোধ—

আকনাদি—

প্রত্যেক ৮—অর্দ্ধপোয়া। জল ১৬ সের।

ছাগদুগ্ধ ৪ সের। যথানিয়মে—পাক করিয়া

অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেব্য।

(ক্রমঃ)

কচুরী পানায় ম্যালেরিয়া ।

[শ্রী রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিঠাভূষণ, এম, আর, এ, এস]

—:—

কচুরীপানার অস্ত্র নাম কচুরী মান বা জর্মণী পানা ইহাদের অতি দ্রুত বংশ বৃদ্ধি হয়। একটা পুত্রে ক্ষুদ্র এক টুকরা কচুরী পানার পাতা ফেলিয়া দিলে দু'এক মাসের মধ্যে সে পুত্রে আর কিছু দেখা যায় না। এই পানা যেখানে থাকে। অস্ত্র ঘাস সেখানে জন্মিতে পারে না। ইহার ফুলের কেশর বাতাস সাহায্যে উড়িয়া যেখানে যায়। সেখানে পর্যন্ত এই ঘাস জন্মায়। পূর্ব বাঙ্গলায় ইহার এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, নদী, খাল, বিলে নোকা চলাচল বন্ধ হইয়াছে, শস্যও নষ্ট হইয়া বাইতেছে। গবর্ণমেন্ট ইহার ধ্বংস কারণ বহু চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইয়া আচাৰ্য ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর নায়কত্বে এক কমিটি গঠন করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত ফলাফল নির্দেশ হয় নাই। রোজে শুকাইয়া আগুণ দিয়া পোড়াইলেও ইহার ধ্বংস হয় না। পোড়াইয়া বেধা গিয়াছে, ইহার ভস্ম রাশি বায়ু আশ্রয়ে যেখানে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানেই ইহার চারা জন্মাইয়াছে। মানবের এমন শত্রু বিতায় আর হয় নাই। যেখানে কচুরী পানা হয়, সে জলাশয়ের মাছ-গুলি মরিয়া যায়, ইহার জল মাছবের অপেক্ষ হয়, জল কথঞ্চিৎ নীল ও কালো বর্ণ হয়। কোন ইংরেজ ইহার ফুলের সৌন্দর্য

দেখিয়া কয়েক বৎসর পূর্বে আপান হইতে, ইহা এদেশে আনিয়াছিলেন।

কচুরীপানা যেখানে জন্মায়, তাহার চতুর্দিকে জর হইতে থাকে, এই জরকে ম্যালেরিয়া বলিয়াই চিকিৎসকগণ নির্দেশ করিয়াছেন। বোধ হয় ইহার বাতাসে জর উৎপন্ন হয়, ইহার জল পান করিলেও জর হয়। সাধারণতঃ বর্ষাকালেই ইহাদের বংশ বৃদ্ধি অতি মাত্রায় হয়। এই সময়ই জর হইতে আরম্ভ হয়, কাভিক মাসে জরের প্রাদুর্ভাব প্রবল দেখা যায়। এই সময় জরগ্রস্ত ওষধ কিছু কিছু খাইলে এই জরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। পার্কভ্যানদী সমূহ পরীক্ষিত হইতেও কচুরী পানা বহন করিয়া স্রোতযোগে নিম্ন প্রদেশে আনিয়া ফেলে। কিরূপে পার্কভ্যা প্রদেশে কচুরী পানা গিয়া উপস্থিত হইল, তাহার তত্ত্ব মায়াংসাও এ পর্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই। ইহার ধ্বংস কিরূপে করা যায় তাহার মায়াংসাও এ পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। আমেরিকাতেও কচুরী পানা বিস্তৃত হইয়া বিধ্বস্ত করিতেছে, কিন্তু ধ্বংসের উপায় নিরাকরণ হয় নাই।

সকলেই কচুরী পানা পোড়াইয়া ইহার ধ্বংসের সহায়তা করুন। ইহার ভস্ম জমির

উৎকট সার। ইহার ধ্বংস করিলে স্থানীয় স্বাস্থ্য ভাল হইবে, মৎস্যবংশ ধাতিবে, ছাই দিয়া জমির সার হইবে। নৌকা চলাচলও হইতে পারিবে। দুই লোকেরা শত্রুতা করিয়া কোন কোন পুকুরে ইহার পাতা, ফুল বা গাছ ফেলিয়া দেয়, কিন্তু পুকুরের স্বামী ইহা দেখিবা মাত্রই অবিলম্বে ফেলিয়া না দিলে তাহার সর্বনাশ ঘটিবে। ইহা মানুষের প্রবল শত্রু। গো, মহিষাদি ইহা খায় না, যদি ইহা কোন কোন গো মহিষাদিকে কদাচিত খাইতে দেখা যায়—পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে সে সকল গবাদি দুর্বল হইয়া পড়ে ও তাহাদিগের দুগ্ধ কমিতে থাকে। যে সকল জমীতে

কচুরীপানা প্রবেশ করে, তাহা কল জম্মাইবার অযোগ্য হইয়া পড়ে। কোন কোন স্থানের লোক ইহার ফুল তেলে ভাজিয়া খায়, কিন্তু ইহা বেশী খাইলে শরীরে বেদনা হয় ও গা রিমরিম করে ও পরে জ্বর হয়। কচুরীপানা দুই তিন জাতীয় আছে, সকলের একই প্রকার ভাবে বংশ বৃদ্ধি হয় ও সকলগুলি এক প্রকারে সমভাবে অনিষ্টকারক। আমরা আশা করি আচর্য্য জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানবলে ইহার ধ্বংশের পথ নিরাকরণ করিয়া দিবেন। এখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার হাতেই এ বিষয়ের ভার দিয়াছেন।

ম্যালেরিয়া ।

[শ্রী—পাইকর—বীরভূম]

—:—

শরীরে সামদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ উপস্থিত হইলেই যে শরীরের স্বাভাবিক তাপ তাহাকে নিজের অধিকৃত দেহতাপজ্ঞা হইতে দুই ক'রিয়া দিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া অব নামে পরিচিত হয় তাহা আমরা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি। বলা বাহুল্য শারীরিক অবস্থিধ ক্রিয়া চিন্তা করিয়াই আমরা দেহের বেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ জ্বরের সময় জ্বরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রথমতঃ যে কারণে জ্বর হইয়াছে তাহার প্রতি অর্থাৎ

সাম দোষেরই প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাঁহার জানেন যে, চক্ষুতে ধূলিকণাদি পতিত হইলে যেমন চক্ষু হইতেই জল নিঃসৃত হইয়া তাহা বাঁচব কথিয়া দিবার চেষ্টা করে, তেমনি দেহে দোষ উপস্থিত হইলে দেহ হইতেই তাপ ক্ষুটয়া সেট দোষকে ত্যক্ত কথিবার চেষ্টা করে। অতএব যিনি সূচিকিৎসক, তিনি জ্বর রোগীর চিকিৎসা কার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া কখনই অবকে বাগা দেন না। পবিত্র তিনি কেবল জ্বরের কারণ সেই দোষেরই প্রণয়ন করে

উষাদি প্রয়োগ করিবেন। প্রবীন ও ভূয়ো-
দর্শী চিকিৎসকগণ জানেন,—

“আমাশরুদ্ধো হৃদ্যগ্নঃ সাত্বোমার্গান্ পিধাপয়ন।

বিদধাতি অরং দোষস্তান্নান্ভবনমাত্রেণ ॥

অর্থঃ—আমাশরুদ্ধঃ সামঃ দোষঃ অগ্নিঃ হৃদ্য
মার্গান্ পিধাপয়ন অরং বিদধাতি।

তস্যৈব লভ্যং আচর্যেৎ ॥

বলাহুবাদ—আমাশয়ে বায়ু, পিত্ত ও
কফের দোষ উপস্থিত হইলে উদরাগ্নি আক্রান্ত
হয় এবং তাহার ফলে সেই অগ্নি হীনবল
হওয়ার যে যে পথ দিয়া তাহার তাপ চলাচল
করতঃ সমস্ত শরীরকে শ্রুতপ্ত করে, সেট সেই
পথগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয়। উদরাগ্নি স্থানচ্যুত
হওয়ার ভুল্ল ভ্রমেরও পরিণাম হয় না।
অতএব অরের সময় উপবাস দেওয়া উচিত।
একশে প্রায় হইতে পারে যে, শরীরে সাম-
দোষ উপস্থিত হইলে উদরাগ্নি থাকে কোথায়?
উত্তরে বলা বাইতে পারে যে, এই অগ্নি হীন
বল হইয়া শরীর ত্যাগ করে না। তবে রাজা
স্বাস্থ্যচ্যুত হইলে তাহার যে দুর্বলতা ঘটে,
উদরাগ্নিরও তাদৃশ দুর্দৈবঃ ঘটিয়া থাকে।
কেবল প্রাণেই বাঁচিয়া থাকে মাত্র। মহাবীর
নেপোলিয়ান যখন সর্ব-জিবিচ্যুত হইয়া সেন্ট
হেলেনা দ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন
তাহার কোন বন্ধু তাহার অবস্থার সন্ধান
লইবার জন্য তাহাকে বিজ্ঞাসা করেন—How
do you live now? অর্থাৎ এখন কেমন
আছেন? তিনি তাহার উত্তরে বলেন—
I do not live now, I merely exist.
অর্থাৎ আমি এখন নাট বসেই ছিলাম, কেবল
প্রাণটী ধুক্ ধুক্ কাব্যেছে। বলাবাহুল্য
দোষের বর্তমানে জঠরাগ্নিরও এতদ্রূপ দুর্দৈব।

উপস্থিত নয়। তবে এই প্রসঙ্গে ইহা বলা
অবশ্যক যে, দৈহিক এই অগ্নি কখনও স্বদর্শ-
চ্যুত হয় না। অর্থাৎ সে সুযোগ পাইলেই
তাহার স্বভাব শত্রু সামদোষকে আক্রমণ
করিতে চাড়ে না। মহাবীর নেপোলিয়ানও
প্রথম প্রথম ২১ বার সুযোগ পাইয়া এইরূপ
আত্মপকাশ করিতে ক্ষুণ্ণ হন নাই।

ভুল্লভোগী মাত্রেই অবগত আছেন যে,
আমাদের শরীরে বায়ু, পিত্ত বা কফের কোন
দোষ উপস্থিত হইলেই আমাদের শরীরে ভার
বো ধরয়। এই দোষের মাত্রানুসারে শরীরের
এই ভারও নূন্যাদিক উপলব্ধি হয়। বলা বাহুল্য
এইরূপ উপলব্ধি কাল উপস্থিত হইলেই
জঠরাগ্নি আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং তাহার
ফলে সেই স্বভাব শত্রু দোষকে আক্রমণ করি-
বার ক্ষমতা কেবল সুযোগই অলুসন্ধান করে।
যে মুহূর্ত্তে সুযোগ পায়, সেই মুহূর্ত্তে দোষের
সহিত মলযুদ্ধ করিয়া তাহাকে জন্ম করিতে
আরম্ভ করে। একবার আক্রমণের ফলেই
যদি বোগের পবাজয় ঘটে, তাহা হইলেই অগ্নি-
রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হয় এবং তৎসহ
দোষেরও পরাজয় অর্থাৎ পরিণাম হইয়া শরীর
সারিতে থাকে। কিন্তু অনেক সময় দেখা
যায় অর ছাড়িয়া যায়, অগ্নি শরীরে ভারই
থাকে। ইহাতে এই ঘটনা ঘটে যে, অগ্নি
দোষকে হীনবল করে বাট, কিন্তু অস্বাভাবিক
পরিমাণে অগ্নি থাকিয়া যায়। কাজেই যে
পরিমাণে দোষ থাকিয়া যায়, সেই পরিমাণেই
তাপ পুনরায় বৃদ্ধি হইয়া তাহাকে নাশ করিতে
পারে। অগ্নি দোষ নাশ হইলে তাপের বৃদ্ধি
অর্থৎ অরও কমিয়া স্বাভাবিক তাপে পরি-
ণত হয়। বলা বাহুল্য, ইহারই নাম সর্বিয়াশ

অর। কিন্তু কোন কোন সময় দেখা যায় অর একেবারেই ছাড়ে না। তখন বুঝিতে হইবে যে, অরের আক্রমণে দোষ সম্যক পরাহৃত হয় না। চিকিৎসকগণ এই অরকেই অবি-
রাম অর অর্থাৎ রোমটেন্ট অর বলেন।
দোষের ক্ষয়ের মাত্রানুসারে এই অর ক্রমশঃ
কমিয়া থাকে।

অতএব দোষ ও তাপের যখন এইরূপ
সম্বন্ধ, তখন চিকিৎসার সময় যে কিরূপ উপায়
অবলম্বন করা আবশ্যিক—তাহা কোন
অচিকিৎসক কেন, যে কোন সাধারণ লোকই
সহজে বুঝিতে পারেন। মোটের উপর দেখা
যায়, অর নিবারণ করিতে হইলে বাহ্যতে
দোষের নিবারণ হয় প্রত্যেক বৃদ্ধিমান
লোকেরই সর্বাপ্রায়ে তাহা চিন্তা করা উচিত।
তবে ইহা স্থির যে, যাহারা ১ম শ্রেণীর বুদ্ধিমান
তাহারা পূর্ন হইতেই সতর্ক হইয়া দোষকেই
শরীরে প্রবেশ করিতে দেন না। কারণ
তাহারা জানেন—Prevention is better
than cure. অর্থাৎ রোগ দূর করা
অপেক্ষা রোগ হওয়ার মূল কারণ দূর করাই
বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মূলতঃ
এইরূপ উপদেশই দিয়া থাকেন। পল্লীগ্রাম
ও সহরের ম্যালেরিয়ার অবস্থা পর্যালোচনা
করিলে জানা যায় যে, সহর অপেক্ষা পল্লী-
গ্রামেই ইহার প্রকোপ বেশী। সূচিকৎসক
গণ বলেন, —প্রধানতঃ ইহার কাণ্ড দ্বিবিধ,
১ম কারণ সহরের লোক বেশী জানী বলিয়া
স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত নিয়ম পাণন করেন।
আর ২য় কারণ, পল্লী অপেক্ষা সহরে অধিকতর
অচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। অবশ্য এই দ্বিবিধ
হইতেই উপেক্ষা নহে। তবে আশা করি মনে

হয় যে, ২য় কারণটাই পল্লীগ্রামের মানসিক
ম্যালেরিয়ার প্রধান হেতু।

কলিকাতায় একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ তাঁহার
প্রণীত “অরতর ও কাঁটামুণ্ড” নামক গ্রন্থে
বলিয়াছেন —“অজ্ঞান রসের (দোষের) মাত্রা
যত অধিক হয়, অরও সেই অনুপাতে বেশী
হয়” এখন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিয়া
দেখুন যদি অসময়ে বা অসঙ্গতপারে (অস্বাভাবিক
উপায়ে) ঐ অরকে বাহ্যারা বন্ধ করিবার অস্ত্র
প্রবল যত্ন করিয়া থাকেন, তাহারা কি শিব
গাড়িতে ঘাইয়া বানর গড়িয়া বসেন না? আর
এই বানরের হুকুরে অধিকাংশ ব্যক্তি কম্পা-
বিত হইয়া স্বর্গ হইতে ও মনোরম জন্মভূমিকে
পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। এবং পল্লীগ্রামে
ঘাইতে শঙ্কাবোধ করেন। তাহারা বুঝিয়া
দেখেন না যে, পল্লীগ্রামে অশিক্ষিত ডাক্তারেরা
কোন ব্যক্তির অর হইবামাত্র ২১০ দিনেও মধ্যে
প্রথমে জ্বালাপ, পরেই ১০১৫ গ্রেণ কুইনাইন
দিয়া থাকেন। অজ্ঞান রসের আধিক্য বশতঃ
কুইনাইন সেবনের পরেও যদি অর আসিল
তবে পরদিনে ৪০ গ্রেণ কুইনাইন দিয়া
বসিলেন। কি জন্ত যে অর বন্ধ হইতেছেন,
তাহাও তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।
যে সময় চিকিৎসকেরা এই অর হাসনের
(অর্থাৎ অরকারক অজ্ঞান রস কম হইবার
পূর্বে) যে ঔষধ দ্বারা বন্ধ করিয়া থাকেন, সে
ঔষধের কার্য পরিণতি যে দোষের পক্ষে এবং
অনষ্টকর, সে কথা বলা বাহ্যে। হইবে।
বৈদ্য বর্তমান সময়ে একরূপ জানি সাধনে
চিকিৎসক বা রোগী কেহই সন্তুষ্ট হইবেনা।”

বলা বাহুল্য করিবার মহাশয় পল্লীগ্রামের
অর চিকিৎসার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,

তাহা সত্য বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ভয়ঙ্করো অগ্নি বিস্তার কালে এখন সকলেই ইহা নির্ধারণেছেন যে, অগ্নি হইলেই তাহা বন্ধ করিতে হইবে। কেন অগ্নি হইল, অকালে অগ্নি বন্ধ করিলে কোন ফল ফলিবে কিনা, অকালে অগ্নি বন্ধ করিলে পরিণাম কি?—ইত্যাদি কোন বিষয় চিন্তা না করিয়াই কেবল অগ্নি বন্ধ করিবার জন্য পল্লাবাসিগণ উৎকর্ষ ও উন্নয়ন হইয়া এক প্রকার মরাত্মক ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকে। একটি পরমা দলেই প্রত্যেক ডাকঘরে কুইনাইন মিলে, অপিত গবর্ণমেন্টও এখনও পল্লাতে পল্লাতে কুইনাইনের দানপাগর করিতেছেন। কাজেই অগ্নির কারণ ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া কেবল পুষ্টিলাভই করিতেছে এবং তৎপরে যে তাপবায়ু অগ্নির কারণ নষ্ট হয় তাহাও ক্ষয় হইতে ক্ষয় হইতেছে। কলে দেখা যায়, লোকে এই অগ্নিও অবগত নহে বলিয়া আপনাদের পক্ষে আপনাই কুঠারাবাত করিতেছে। বাহারি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাব-রাজের নাম শুনেই নাপকা কুড়ন করেন, বাহারি আমাদের সনাতন হনুগণের যুগ-যুগের ব্যাপী শাসন মানতে অনন্ত, আমরা উহাদিগের জন্য পণ্ডিত্য দার্শনিক চাকর্য্যক গ্রন্থক ইউনেস্কো মাইলস্ প্রণীত "Avenues to health" নামক সর্বজন সমাদৃত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:—"Disease is a blessing not only as a consequence to teach as our mistakes, but also an active agent as doing the work of nature, as helping to remove our mistakes. Fever is an

example. We call it illness, but it is really an effort of nature to burn up the poison within us. And may be some day all disease—may, even all disease germs—will be proved to have a like function, and to be fatal only when wrongly treated."

বন্ধাবাদ—"রোগ আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী; কারণ আমরা যখন ভ্রান্তি-বশে বা সংযমের অভাবে অত্যাচার করিয়া থাকি, সেই অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবার জন্যই রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অগ্নি ইহার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অগ্নির কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের শরীরস্থ দোষকে নষ্ট করিয়া দেহকে পুনরায় বিস্তৃত করিবার জন্য বেন প্রাকৃতি নিয়মেই উহা সম্বলিত হইয়া থাকে। *** এবং এই রোগ চিকিৎসিত হইলে (প্রথাৎ যে উদ্দেশ্যে রোগ হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যের বাধা অন্মাইলে) জীবন পর্য্যন্তও নাশ করে।"

আজকাল অকালে অগ্নি বন্ধ করিবার দৃষ্টি অতিমাত্রায় গভীর হইয়া উঠার দেশের যে কিরূপ অপকার হইতেছে—তাহা বুদ্ধিমান মাথায়ই চিন্তা করিয়া দেখিবেন। এখন অগ্নি হইলেই কুইনাইন বা তাহার সমন্বিত অস্ত্র কোন কথার ঔষধ ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য বৈজ্ঞানিক অগ্নির প্রথমাবস্থার অর্থাৎ সামদোষ থাকা কালীন কথার ঔষধ দিতে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়াছেন। কারণ কথার ঔষধ প্রয়োগের কালে অগ্নি মন্থপূত সর্পের জ্বর শক্তিহীন হয় এবং তাহার কালে অগ্নির

কারণ যে আম দোষ জাহা গুটিগাত্ত করে
বটে, কিন্তু তাহার কলে, পুনঃ পুনঃ জর
হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে বৈজ্ঞানিক
কবার ঔষধ কুইনাইন প্রভৃতির প্রয়োগ যে
একবারে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা নহে।
তাহারা বলেন যে, নবজ্বর যখন নিরামজরে
পরিণত হয় অর্থাৎ যখন দামদোষ পরিপাক
হইয়া যায়, তখন কবার ঔষধ ব্যবহার করিলে
ক্ষয়গই প্রসূত হয়। এই উক্তির সমর্থন করিয়া
জুক্ত বলেন,—

“মুদো জর লজ্জা দেহে প্রচলেনু মলেনু চ।

পকং দোষং বিজ্ঞানীয়াজ্জরে দেহং

তদৌষধম্ ॥”

নিরাম জরের লক্ষণ প্রসঙ্গে চরক
বলেন :—

“কুংকামতা লঘুত্বক গাত্রাণং জরমাদিবম্ ।

দোষপ্রভৃতিবটাহো নিরামজর লক্ষণম্ ॥”

এরূপ মূল্যবান বচন উপেক্ষা করিয়াও
যাহারা কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ নব-
জরে ব্যবহার করিবার বা করাইবার
পক্ষপাতী, তাহাদিগকে একবার মনোযোগ-

সহকারে গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত ১৯১২ সনের
স্বাস্থ্য বিবরণী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।
তৎপাঠে জানা যায় বাঙ্গালার প্রত্যেক
শাসনসমূহে অজস্র কুইনাইন দান করিয়া
তাহার যে ফল হইয়াছে তাহাতে মহামতি
গবর্ণর বাগাহর সন্দেহ হইতে পারেন নাই।
বলা বাহুল্য, এখন যাহারা চিকিৎসা
রাজ্যে রাজা তাহারাই উক্ত বিবরণী লিখিত
করিয়া থাকেন। এই বিবরণী পাঠান্তেই
গবর্ণর বাগাহর নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ
করিয়াছেন,—

The Governor in Council is
also disappointed to find that
despite the employment of Sub-
Assistant Surgeons in the
distribution of quinine in the
District of Nadia and Murshidabad
there has been no diminution in
fever mortality but the reverse.”
The Government Resolution on
the Sanitary Reports for the year
1912.

বাবুমহলে হাটফেল ।

“হিতং মনোহারি চ হৃদ্রতং বচঃ ।”

[শ্রীকীরোরদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,]

—:us:—

হেলে বেলায় আশাদের নাম থাকে—
নদী, মাখন, মিছরী ইত্যাদি ; কারণ কালী,

কৃষ্ণ, শিব, রাম প্রভৃতি ঠাকুরদের নাম এখন
নিত্য পূজা ও সেকলে বলিয়া পিতামাতার

পছন্দ হয় না। বাংলাকালে বদিও গায়ে একটু স্নোর থাকে, অনায়াসে দুই মাইল পথ হাঁটিয়া যাই, পাঁচ সের স্রাব শ্বস্তুে থাকার হইতে গৃহে আনি, এক খাল ভাত বাতান খাইয়া হজম করিতে পারি; কিন্তু বড় হইয়া আপিসে কেরানী গিরি বা অগ্রবিধ চাকুরী করিয়া মাসিক কিছু কিছু নগদ টাকার মুখ দেখিতে আবস্ত কালেই আমাদের রটা বেশ ফরসা হয়, দেহে একটু জোয়ার আসে এবং নামের গায়ে বাঙ্গালীর বড় সাধের ‘বাবু’ উপাধি সংযুক্ত হয়। তখন সম্ভব হই—নবী বাবু, মাধন বাবু, মিছরী বাবু ইত্যাদি। যেই বাবু, অমনি কাবু! কি আশ্চর্য! আর ওখন মোটা, শক্ত, ভারী, ঘন, কাল, পুরু জিনিষ পছন্দ হয় না। মিহি পুষ্প চালের ভাত, সোণা মুগের দাল ক্ষুদ্র মাছের ছোল পাতলা রুটি, হৃদ লঘু জল খাবার, ধবধবে ময়দা, সাদা চিনি, হাওয়ার ধূতি, রেশমী চাদর, কিন কিনে কামিজ, হালকা ছাতা শোলা টুপী, সরু ছড়ি, জড়ির জুতা, নরম বিছানা, হালকা আমোদ, হালকা উপভাস, গল্প সাহিত্য প্রভৃতি দুর্বল বাবু ভাল লাগে। কেবল মিহি, কেবল সরু, কেবল সাদা, কেবল পাতলা, কেবল নরম, কেবল হালকা, লঘু!

কিন্তু হৃৎকের বিষয়, এত লঘু ও নরম থাকিয়া পরাতেও আমাদের মেজাজটা হয় গরম। বিশেষতঃ যাহাই বলুন, সাধারণ অস্তিত্ব জ্ঞতা ও বহুদর্শিতা হইতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস:—দারিদ্র্যপীড়িত গরম দেশে ঔরতা বিকাশিনী গরম শিকা হওয়ার, ঠাণ্ডা কোরল দর্শনীতি পূর্ণ পবিত্র উপদেশ না পাওয়ার,

শবে, মাঠে, ঘাটে, রেলগাড়ী, ইমারে সদা সর্বত্র গরম চা, কাফি, কোকো, পাউরুট, বিস্কুট, পেরাজবড়া, আলুর চপ প্রভৃতি ভারতের প্রকৃতি বরুক ভেজান অখাদ্য—কুখাদ্য খাওয়ার, প্রায় অষ্ট প্রহর পান, বিড়ি, তামাক, গুত, সিগারেট, জরদার আঁচ করার, নাকে নুখে চোখে চারটি অর্ধসিদ্ধ ডাল ভাত ওজিয়া ভরাপেটে হুপুর বোড়ে আশ্বিনের পোষাকে ঘর্ষাক্ত কলেবরে দ্রুত পদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কার্যালয়ে যাওয়ার, সামান্য অর্থের জন্ত স্বাধীনতার বিন্যয়ে পরের দাসত্ব করিয়া, শত লাঞ্ছনা গজনার ভিতর দিয়া ভালফাসানে স্ত্রীপুত্র বস্ত্রাদির ভরণ পোষণের আয়ুষ্কর করি হুশিয়ার এবং সারাবিনের অনিয়মে উত্তপ্ত দেহে অত্যধিক রতি বিলাস করার আমাদের শরীর মেজাজ ঠাণ্ডা হইতে পার না,—কামাবেশ হাপরের ভার দেহ মন সর্বদাই গরম আগুন হইয়া থাকে। অবশ্য এ মস্তব্য গুলি সাধারণতঃ গরীব ও মধ্যবিত্ত মনীষীরা গৃহস্থ বিষয়েই বিশেষ প্রয়োজ্য।

সহরে বাবুদিগের খোরাক দেখিলে হাত সংবরণ করা যায় না। মুগকে রঘুনাথ বা আশানন্দ ঢেঁকির কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু আধুনিক সময়েও যে পরিমাণ আচার করা উচিত, তাহাই বা করিতে দেখি কই? বাবুর বাড়ীতে খাইতে বসিয়া সম্মুখে থাণ্ডার চারিটা ধবধবে বাংলায় চালের ভাত দেখিলে মনে হয়—এ নমটুকু কোথায় দিব, মুখবিগ্নে না নাসিকারক্রে? পল্লীগ্রামে প্রথম প্রথম জামাই-বউর বাড়ী আসিলে ছোট গন্ধকীরা এই সুস্থির অন্ন বাজনা দিয়া নুতন জামাতাকে ব্যস্ত করিয়া থাকে। কতকগুলি

বেশী খাওয়াও খাবার সহজে কার্যকর হইলে সম্পূর্ণ বর্হিত, ৩ । এজন্য সহজে পাড়ারগারে তত্ত্বলোকের বড়ই মুক্তি হয়; লোকলজ্জা পুনর্বার সহিতেও পারেন না, আবার ক্ষুধা মীত না হইলে পেটও জ্বলিতে থাকে । ছুই-ই বালাই । উঃ ! কি কঠোর বাহু নিয়মানু-শাসিত কেতা-দ্রবত্ব ক্লান্তসার শূন্য নাগরিক সভ্যতা । পল্লীর কৃষকদের খাওয়া দেখিলে বাবুরা হয়ত গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া বান ।

অবাক হইবারই ত কথা । রহনের খোঁসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে যেমন অতি নিভৃত অন্তরে একটু শাস পাওয়া যায়, তেমনি সহ-রের নবাবিকৃত, গলি গলি কেরিওয়ালাদের কাছে গরম গরম প্রাপ্তবা, পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য বস্তু নিচয়ের মধ্যে অন্ততম ‘অবাক জলপানে’র ঠোকা খুলিতে খুলিতে যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করা যায়, তখন সহজে পরমা রোজগারের কিকির দেখিয়া সভ্যসভ্যই অবাক হইতে হয় । পাড়ারগারে মাকাতার আমলের চালছোলামটর তাকা সহজে গিয়া বুঝে ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়া শত ভাষা কাগজের আবরণের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া বামুলী নাম বদলাইয়া অবাক জলপান হইয়াছেন । বলিহারি আবিষ্কারকের মাথা । তাঁহার চাকুরীর ভ্রমণ প্রাশংসা না করিয়া থাকা যায় না ।

বাহ্য হউক বাহ্যেরা ‘অবাক জলপানে’ কাঠপুতলিকাবৎ নিষ্কাক ও নিস্পন্দ হইয়া থাকেন, তাঁহার প্রাণাত্মকদের শুভমুড় জল-খাবার দেখিয়া যে মুক্তি হইয়া বাতাহত বদলীর জায় কুতলপারী করেন না, ইহাই তাঁহাদের পরম সৌভাগ্য । বস্তুতঃ এক

একজন কৃষক যে পরিমিত শুভমুড়ি খায় তাহা বোধ হয় চাষিজন সহজে বাবু একবারে চিনাইয়া শেষ করিতে পারেন না । আমন খানের ভাত ? ছন্দ কবে না কেন ? এই প্রশ্নব উত্তরে তাহার বলে—“মশাই, ডপুর রোদে মাঠে লাগুন ঠেলা কাজ যদি করিতেন, তাহা হইলে জানিতেন, কৃষক কি বস্তু । ‘পেটে যেন রাকস ঢুকিয়াছে’ এই চলিত কথা আমা-দের প্রতিই ঠিক বাটে । ‘আমন খানের ভাত খাইলে ছুইবার প্রস্তাবের পরই আবার কৃষার উদ্বেক হয় । আমরা গরীব শ্রমজীবী, এত ঘন ঘন খাবার পাট কোথা ? কাজেই মোটা মোটা আউশ চালের ভাত একটু খাইয়া মহাজনী নৌকা বোঝাই করিয়া ডপ’চ ঘণ্টার ভ্রম নিশ্চিত হইয়া ক্ষেতে-খামারে ভূতের মত পরিশ্রম করি” । কঠোর অঙ্গ চালনার শ্রমিক পাথর হস্ত করিয়া ফেলে, ‘আব মাংসেশ্বরী’র সমুচিত সঞ্চালন অভাবে আমবা একটু বেশী জলপানও প’রপাক করিতে পারি না । ইহা কি আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় ? ইহা কি দেশের মঙ্গলকামী বিচক্ষণ ব্যক্তি মনেরই ভাবিবার কথা নয় ? বৈষ্ণব লবু আহার দেখি-তেছি, তাহাতে মনে হয়, আমরা ক্রমশঃ আরও সুস্থ বায়ুভুক হইয়া ভূতের জায় বৎ-যেরে কিরকংশ কাটাইব না কি ? ‘নবাবলের লবুগুরু জানি নাই’—প্রাচীনদিগের এই উক্তির আংশিক সত্যতা স্বীকার করিতে পারি ; আমাদের গুরু নাই, গৌসাই নাই, গুরুজ্ঞান নাই, গুরুভক্তি নাই, গুরুপূজা হত পদে মতি নাই, আমাদের প্রকৃত শিক্ষা নাই, শিক্ষা নাই, ধর্ম্ম আস্থা নাই, পরকালে বিশ্বাস নাই, তাই আমরা কর্ণহীন অর্পণপোতের জায় জীবন-

মোটে ইহুততঃ জঁসিরা বেচাইতেছি
—এ সব দোবারোপ বিনা আপত্তিতে শিরো-
ধাৰ্য্য। কিন্তু লম্বুবেদ আমাদের বিলক্ষণ
আছে। গতকর কাচেও আমরা বেঁসি না,
কিন্তু লম্বু আমাদের বড় প্রিয়। আমাদের
লম্বুচিহ্ন, লম্বুবিশ, লম্বুপাখা, লম্বুবারাম,
লম্বুসাহিতা, লম্বুগাকরণ, লম্বু ইতিহাস, লম্বু
আমোদ প্রভৃতি সবই লম্বু। কেবল ছুট একটি
গুরুত্বম বাত্বিকম দাঁধিতে পাই, সেটা
আমাদের সন্মতিকার অভ্যন্তর প্রত্নত্বের মধ্যে
মধ্যে গুরুত্বজন ও গুরুবিকার বা অত্যধিক
ইন্দ্রিয় পরামর্শতা।

পূর্বে বক্ত আচারে অল্পমাত্র হটত, এখন
অজ্ঞাতাবে বহুমাত্র—ঠিক বিপরীত। অত্যধিক
মানসিক ব্যায়াম, দায়বিক অবসাদ, রাশি
জাগরণ, কৃত্যাজন ও অপরিণিত ইন্দ্রিয় সেবার
চাকুরী জীবনদিগের মধ্যে বিশেষতঃ বাহারী
কেবল এক স্থানে বসিয়া কঠিন মস্তিষ্ক চালনা
কবেন, অথচ সেট অল্পপাতে বুদ্ধশাস্ত্রে
অজ্ঞচালনা ও পরিমিত বিদ্বৎ পান ভোজন
করেন না, তাঁহাদিগের যৌবনের শেষভাগে
রক্তের হোর একটু কমিলেই এই মারাত্মক
ব্যাধি দেখা দেয়। তিন হটতে পঞ্চাশ বৎসর
বয়সের মধ্যে যে কত বিচলক, উকীল,
বোকাব, ডাক্তার, বালক শিক্ষক, অধ্যাপক
কোরাণী, পোষ্টমাস্টার, রজালরের অভিনেতা,
স্ববক্তা, রায় সাহেব, রায়বাজির প্রভৃতি
দেশের মুখোজ্জলকর হুসন্তান এই ভীষণ
রোগে আক্রান্ত হইয়া অকাল মৃত্যুর ক্রান্ত
গ্রাসে পতিত হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা কে
নির্ণয় করিবে? গ্রীষ্ম মণ্ডলে ঠিক দুপুর বেলা
ভয়াপেটে আগিদের পোষাকে চোরে বসিয়া

কলম চালান যে কি কষ্টকর তাহা ভুক্ত
ভোগীই জানেন। বাহিরের লোকে মনে
করে—বেশ বৈজ্ঞাতিক পাখার নীচে বসিয়া
পান চিবাটতে চিবাটতে বিড়ি চুকটের ধূম
টানিতে টানিতে, লেখাপড়ার কাজ করায়
এমন কি কতি হয়? বাখার ব্যাধী তির অপরে
কি বুঝিবে। চাকুরে বাবুর চাকুর উপর
অনেক সময় জোবে দিকলী বাজনের হাওয়া
লাগায় মাথার চাঁদি গরম হইয়া উঠে। তখন
স্বথ অপেক্ষা স্বস্ত ভাল লাগে। ফল কথা,
বৃত্তবোগ শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করিয়া যে
কি অনিষ্ট করিতেছে তাহা চিকিৎসক মাজেই
অবগত আছেন।

বাবুর ব্যায়াম যেন আজর আভরণ।
‘বাবু’ বলিলেই যেন কতকগুলি রোগের
ডিপো বুঝিতে হইবে। একটু অর্শ, একটু
বহুমাত্র, একটু অস্ত্রবৃদ্ধি, একটু কুরণ, একটু
মেহ ও মেহাশ্রিত অর, একটু বাত, একটু
কাশ, একটু দৃষ্টিপ্রতি হীনতা প্রভৃতি
রোগ বাবুর দেহকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার
শরীরটিকে ব্যাধিমন্দির করিয়া তুলিয়াছে।
বাবুর রাগ প্রতিবেদক শক্তিও দিন দিন
কমিতেছে, তিনি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্বল
চিররোগী হইয়া পড়িতেছেন। যেমন কতক
গুলি ভূত ব্যক্তি বিশেষে অধিকার করিতে
ভালবাসে সেইরূপ পৃথিবীর বাবুতীর ব্যাধি,
নবীর পুতুল গাঙ্গালী বাবুর কুহমপেলব রমণী
মোহন দেহটিকে বড়ই পছন্দ করে।

শ্রমবিসম্ব বড় লোকের ব্যায়াম শ্রমবীজ
গরীমলোকের মধ্য বড় বেশী দেখা যায় না।
ইহা ভগবানের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে,
যেহেতু কাদালের ঘোড়া রোগ হইলে সে

বেচারী' আর বাঁচে কিসে? 'বাহারা মাঠে
লালল ঠেলিয়া কাঁঠ কাটিয়া, রুসাত টানিয়া,
বোঝা বহিয়া, ইট গাঁথিয়া, লোচ পিঙ্গল
পিটাইয়া, কাদা ছানিয়া, নোকা বাচিয়া,
মাছ ধরিয়া, কাপড় কাচিয়া জীবিকা নির্বাহ
করে, তাহার বুক জালা, পেট ফাঁপা,
অল্লোদগার ও বদহজমের ভোগ্যাক্ষা রাখে না।
তাহারা রসের নাগর বাঁ ভাবের সাগর নয়;
তাহারা মোটামুটি—সোজা হুজি—সুস্থ সবল
লোক,—গায়ের জোরে দক্ষিণহস্তের ব্যাপার
বোগাড় করিয়া জীবনসংগ্রামে দাঁড়াইয়া
আছে; তাহার কথার বাণিজ্যে হাজার হাজার
প্রোতার চিত্তাকর্ষণ পূর্বক মস্ত মুন্দের জায়
সুস্থিত করিয়া রাখিতে জানে না; তাহার
গাড়ী গাড়ী কবিতা গিথিয়া ভাবের বহুর
ছলিয়া প্রাবিত করিতে শিখে নাই;
তাহাদিগের কাব্যসাগরে সুদক্ষ ডুবুরী
নামাইয়া কবির অন্তলম্পর্শ নিগূঢ় মনের
ভাব বুঝিতে হয় না। তবে কন্দী হিসাবে
তাহারাও বড় কম নয়। ঝড়তুফান, বৃষ্টি
বাদল, শীতগ্রীষ্ম, বৃণা-বিজ্ঞপ প্রভৃতি সর্ব-
প্রকার হুংখ ক্লেশের পসরা মাথায় লইয়া এই
অসভ্য চাষারাই, অসভ্য দার্শনিক, কবি,
সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের
অশনবসনাদি সুখসমৃদ্ধির মাল মশলা
বোগাইতেছে। ইহার মধ্যে রোগের ধার
ধারেনা। দরিদ্র শ্রমিকদিগের পাক বস্ত্র
ঘটিত অজীর্ণ অন্নপিত্ত কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি
ব্যারাম খুব কম। তাহার প্রায়ই মবে
কৌজদারী অস্থখে, কারণ তাহাদের শিক্ষা,
সংযম ও বিচার শক্তি নাই। গ্রামে হয়ত
ইনফ্লুয়েন্স রোগ দেখা দিয়াছে, তথাপি

ক্রক্ষেপ নাই। ঠাণ্ডা গলার বাঁচি ফুলিয়া
উঠিয়াছে, কোন খেয়াল নাই। পূর্ববৎ
ঘরের বাহিরে গুইয়া থাকে। পাড়ার কলেরা
আসিয়াছে, তবুও ভয় নাই। একাও একটা
ইলিস মাছ খাইয়া সেই রাজিতেই ওলাদেবীর
অঙ্ক আরোহণ করে; কিম্বা অস্থানে কুস্থানে
গমন করতঃ কুঁচকি, বাঘি, মেহ, উপদংশ
প্রভৃতি কুংসিং ও ছরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

ভগবান এখনও এত নিষ্ঠুর হন নাই—
নড়ার উপর খাড়ার ঘা দিয়া কি পোকুধ হইবে?
পল্লীগ্রাম ত মৃতপ্রায়, কাটা ঘারে লবণ নিক্ষেপ
করিয়া কি লাভ হইবে? পাড়ারগারে বিস্তার
গরীব লোক দেওয়ানী-ম্যালেরিয়ার জর্জরিত
হইয়া তিল তিল করিয়া প্রাতি নির্যত মরিতেছে,
ইহাদের রোগ প্রতিষেধক শক্তি বখেই আছে,
সেজন্য ম্যালেরিয়া সহজে তাহাদিগকে পাড়িয়া
উঠে না। এ যেন রাম-তাড়কার বুদ্ধ—
কেহ কাহাকেও সুবিধামত বাগে পাইতেছে
না। কিন্তু একবার জর ভাল করিয়া সাপটিয়া
ধরিলেই ইহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে;
কারণ ইহাদের শিক্ষা নাই, নিয়ম পালন নাই;
সুপথ্য নাই, গরম কাপড় চোপড় নাই আর
সর্বোপরি ভীষণ দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যই
আমাদের মাথা খাইয়াছে। যেখানে হুংখ-
দৈন্ত অস্তাব, সেইখানেই রোগ, শোক, কলহ
ও অকাল মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী করাল মূর্তি
বতদিন অস্থ ও সবল দেহে গতর খাটাইয়া
জীবন যাপন করে, ততদিন তাহাদের মাথাটা
পর্যন্ত ধরেনা। খেও খুঁটি পর্ত্তঃ। কিন্তু
খুঁটি একটু হেলিলেই সর্বনাশ। গতর পড়িয়া
গেলেই আর তাহার উঠিতে পারেনা; কারণ
তাহারা যে বড় গরীব, এক আধ মাস খিছানার

পড়িয়া থাকিলে খাইবে কি ? তাহারা একে কাদাল, তাহার উপর অমিতব্যয়ী—ভবিষ্যতে ভবিষ্যতের জন্ত কিছুই সংগ্রহ করিতে জানে না ! যে দেহ খাটাইয়া রোগগার করিবে, সেই দেহ রোগাক্রান্ত হইলেই তাহাদের বাচা দ্রব্যট। তাহাদের পুঁজি মূলধন মাত্র শরীর, সুতরাং শরীর শযাগত হইলেই তাহাদের দফারফা হইল ।

অজীর্ণ, অল্পপিত্ত রহিত প্রভৃতি রোগ যে সন্ততিপরিচালকের মধ্য প্রবল ভাবে চলিতেছে একথা কোনমতেই অস্বীকার্য্য নহে । মগজের খাটুনি ঐহাদিগের ব্যবসায়, কারিকশ্রমের প্রতি তাহাদের প্রবৃত্তিও হয়না, বেকী অবসরও পান না । বাগারী সুক্কাবায়ুতে জরপদে ভ্রমণ বা স্বত্তে কিছু ২ গৃহকর্ম সম্পাদনকে মান-হানিকর অতি নীচ ও অবজ্ঞাজনক বলিয়া ঘৃণা করেন । তাহাদের মধ্যেই মেদ, মূত্র, মেহাদি রোগের প্রাবল্য । তাহাদিগের মাথা ও মাংস আছে—হৃদয় ও স্বাস্থ্য নাই । তাহাদের মাথার প্রশংসা অবশ্যই করিতে হয় । তাহারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সর্ব বিধে সকল দেশের ছাত্রকে হারাইয়া প্রথমস্থান অধিকার করিতে পারেন ; তাহারা ঘরে বসিয়া অতিক্রান্ত প্রব্লেম-মীমাংসা বা সামল্যমোক্ষদ্বার চাল বলিয়া দিতে পারেন ; কেবল মধ্যে মধ্যে খা-হালুয়া-পান-তামাকু-বিড়ি-চুস্কট সেবন করিয়া স্বর্ষোদয় হইতে স্বর্ধ্যস্ত পর্যন্ত প্রায় সমস্তদিনই তাস পাশাদাবা খেলার অতিবাহিত করিতে পারেন ; রেলপথের জটিলসময় ও শুক তালিকা অনারাসে স্তম্ভাক্রমে প্রস্তুত করিতে পারেন ; গণপতির জার কলম চালাইয়া দিত্তাদিত্তা কাগজে সুদীর্ঘ রায় লিখিতে পারেন ; বিগত পঁচিশ বৎসরের

সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব, আবশ্যক হইলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পুরাতন কাগজপত্র সেরেস্তা হাতড়াইয়া অতি পরিপাটি এক বিবরণী দাখিল করিতে পারেন । কিন্তু হুংখের বিষয়, তাহাদের নিজের দেহ-নিজের নয় ; গৃহচিকিৎসকের উপর প্রাণ সঁপিয়া পড়িয়া আছেন । একটু আমড়াপোস্ত খাইবার বাসনা হইলেও ডাক্তার বাবুর উপদেশ চাই—কি জানি যদি অন্তঃস্থ হয় । দেহ যদি স্বাস্থ্যে থাকিত, তাহা হইলে বাটার বাহিরে যাইতে হইলেই কি কোন-না কোন যানেব প্রয়োজন হইত ? তাহারা পরের পায়ে হাঁটেন, পরের মুখে খান ! জুড়িগাড়ীতে হঠকোশ বেড়াইয়া হাওয়া খাইয়া আসিলেন, কিন্তু অভ্যচালনা হইল তাহার—তাঁহার, না তাঁহার ঘোটকের ? সাধের আমবাগানে গাছের গায়ে টিকিট ঝুঁটিয়া কেতাবে কলের রং, আকার আশ্বাদ প্রভৃতি লিখিয়া রাখিয়াছেন (কারণ কারদার জুটি হইলে ত চলিবেনা) কিন্তু বাবু আর করটা আমের সুতার পান ? ল্যাংড়া বোঝাই খাইতেছে তাঁহার সোভাগ্যশালী-ছটপুট আমলা চাকর ।

সুখে মানুষকে সুকুমার জড়ভরত করিয়া ফেলে ; হুংখে লোক বলবান্ সাহসী, শ্রমশীল ও ক্লেশসহিষ্ণু হয় । হুংখের হাপরে ফেলিয়া ভগবান্ মানুষকে উত্তমরূপে গোড়াইয়া পিটাইয়া জীবনসংগ্রামের উপযোগী করিয়া দেন । পর্ত্তসমাকীর্ণ শীতপ্রধান দেশের মানুষ কেমন দৃঢ়কার উত্তমশীলও কর্মঠ ; আর সমতলবাসী মুহুমন্দলরানিলসেবী আরামপ্রিয় বিলাসী ভাবপ্রবণ নরনারীর দেহও যেমন নবনীতকোমল শিথিল মাংসপিণ্ড, জনও

তেননি ভীষণাপূর্বক যের জার ফীল হুস্বা ও দাচ্যরী। বহুসংখ্যক সুত্রোগীর অবস্থা হইতে দেখা যায় যে, তাঁহারা দারিদ্র্যভ্রমের সময়ে বেশ শক্তসামর্থ ছিলেন; অন্যদিকে দুই কোশ পথ চলিতে পারিতেন; পরিপাকশক্তি প্রবল ছিল—এক খাল ভাত ব্যঞ্জন খাইয়া হজম করিতে পারিতেন; দেহ তখন মাংসমেদ-বহুল স্থল ছিলনা, কাজে যখন তখন স্বাধীন ও ব্যবহার্য ছিল। কিন্তু অত্যধিক মাথার খাটুনি, অমিতাচার ও শারীরিক ব্যায়ামের অভাবের ফলে দেহ যেন বন্ধারজলে অগ্নে ২ কাঁপিয়া উঠিল। যিনি যৌবনকালে কেমন দৃষ্টপুটে বলিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও খেঁচুর বুদ্ধির সঙ্গে ২ দেহও যেন হঠাৎ বসায় হুল হইয়া পড়িল। সুখের দশা যেই হইল, অমান অজ্ঞান, অস্মাৎ, অশ, কুরন্ত, বহুমুদ, বাত, প্রভৃতি রোগের একটি না একটা দেখা দিল। আর্থিক উন্নতির সাহিত্য ধনের নিত্য সহচর মাংস, মেদ ও জড়তা আসিয়া উপস্থিত। আর গাড়া না হইলে একপোয়া পথও চলিতে পারেননা; দেহের ভারে সর্বদাই হাঁপাইতেছেন। বাড় ২ ওষধ চলিতেছে। এককথায়, তান এখন সম্পূর্ণ পরাধীন-পৌপথেদুরে সেবাদাস হইয়া পড়িয়াছেন। আহায়ে ক্রটি নাই, অথচ মাংসমেদ কমেনা। জলাশয়ে স্নান করিতে গিয়া হয়ত দেহের খাঁজের মধ্যে একটা পদার্থ প্রবেশ করিয়াছে; বাবুর তখন কোন খেয়ালই হয় নাই। পূর্ববৎ কাজ কর্ম করেন বটে, কিন্তু শরীরের সেই দিকে কেমন কোন একটু অবজ্ঞা বোধ হয় ও নাকে অল্পকণ একটা দুর্গন্ধ আসিয়া লাগে। ক্রমে যন্ত্রণার অস্থির

হইলে একজন বক্তৃতাচারী ভিজিটের নামজাদা ডাক্তার আসিয়া নানাবিধ যন্ত্রদ্বারা সর্জনসরীর পূর্বাঙ্গপূর্বক শেষে শিফালক সুতীক্ষ্ম বুদ্ধিবলে গায়ে হাতদিয়া টিপিতে ২ মাংসের খাঁজ হইতে একটা প্রকাণ্ড পচা গল্লাচিহ্নি মাছ বাহির করিয়া বাবুর জীবন রক্ষা করিলেন; লোকে ও চারিদিকে ‘ধস্ত ধস্ত’ রবে ডাক্তার বাবুর সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। হা ভগবন! তোমার কি অবিচার!! কেহ একটু মাংসের জন্ত লালায়িত—কত অর্থব্যয় করতঃ সাগসা খাইতেছে; আবার কেহ মাংসের বোঝায় অস্থির, ব্যতিব্যস্ত—কিসে চর্কি কমে এইজন্ত মহা ব্যাকুল। এট সব স্থলকায় পরবশ মৈনাক পাহাড়ের জার বিরাট বাবুদিগের দুর্দশা দেখিয়া কি বলিতে ইচ্ছা হয় না—এটা সুখ, না দুঃখ? যে সুখে জীবন অসহনীয় করিয়া তুলে; যে সুখে নিজের দেহভার বহিতে বহিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়; যে সুখে মানব, স্বাচ্ছন্দ্য হারাইয়া এরূপ প্রমত্ত, পরাধীন, ঔষধ—মাদুলীগত প্রাণ হইয়া পড়ে, সেটা সুখ না দুঃখের পরাকাষ্ঠা? তাই মনে হয় “আগে, জেনে ছিল ভাল ভাল দড়ি বুন, কি কাল করিল সে যে এড়ে গোকাকনে॥” আর একটা উদাহরণ বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সজীব ক্ষুধার চটুল ছাগ শক্ত ও গোবৎসগণ কেমন আনন্দে নেচে কুঁদ বেড়ায়। বীজ পাটা গুলিও সারাদিন চতুর্দিকে চলাফেরা করে। কিন্তু শ্রমহীন খাদ্যের প্রতি একটু লক্ষ্য করিবেন কি দুর্দৈবহ যাতনায় উহারা জীবন ধারণ করিতেছে। মদের ভারে বেশী নড়াচড়া করিতে ভালবাসেনা। প্রাতঃকালে ছাড়িয়া দিলে

বাটার বাহিরে আসিয়া দুই চারিটা পা তার মুখ দিয়াই ক্লান্ত দেহে ছায়ায় বা চাঁদনি রোয়াক বারান্দা উঠানের এক কোণে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছে। একপাশে মধ্যম বাহারী অভ্যস্ত মেস—বসা বহল স্থল হইয়া ক্রমশঃ অলস ও অকর্ষণ্য হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে সেই অস্ত্র বোধ হয় চলিত ভাষায় মেদা লোক বলে।

স্বাস্থ্য কেবল মাংসের বস্তা নয়—বল, বিক্রম, তেজ ও উগ্রম। সন্ন্যাসীকুলভিত্তিক শিবাজী কি খুব লক্ষ্যমণ্ডিত ছিলেন? অক্লান্ত কর্মী আওরঙ্গজেব শুধু মাংসপাণ্ড হইলে কি শেষ জীবন রণক্ষেত্রে শিবিরে শিবিরে অতিবাহিত করিতে পারিতেন? আত্মসংযম ও নিত্যচারে তাঁহার দেহকে সুশিক্ষিত বোটকের জার বাধ্য ও আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনঃশুদ্ধির বশেন বাহা বলিবে, যেদিকে বাইবার লক্ষ্য ইঙ্গিত করিবে, দেহবাজী বিকস্মিত বা কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সং আচ্ছাদিত প্রতিপালন করিবে; ইহাই স্বাস্থ্য—ইহাই মানসিক ও দৈহিক বল-বীৰ্য্য। নিজের দেহকে যদি শাসন করিতে

না পারে, তাহা হইলে মানক কেমন করিয়া রাজ্যশাসন করিবে। এই কথাই প্রতিধ্বনি করিয়া একদা রুস সম্রাট পিটার দি গ্রেট বলিয়াছিলেন—I wish to reform my empire, 'and I cannot reform myself. মহাত্মা শিবাজীর জীবনে এমন অনেকদিন কাটিয়াছে—যখন তাঁহাকে কেবল শুধু চণক ভক্ষণ করিয়া বিজন কাননে উবর মরুভূমে ও দুর্গম গিরিগাত্রে অহোরাত্র ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। রাজপুত্র কেশরী মহাবীর রাণাশ্রুতাপ যদি ননোগোপাল বা মিছরীবাবুর জায় সুকুমার হইতেন, তাহা হইলে কি প্রবলপরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিতেন? নিজের দেহ 'বাহাদের নিজের বশীভূত নয়', তাহাদের উচ্চাভিলাষের ভিত্তি কোথায় জানি না। পল্লী উদ্ধার বল, দেশ উদ্ধার বল, জাতীয় উন্নতি বল, সকল প্রকার উন্নতি উৎকর্ষের মূল—আত্মোৎকর্ষ, আত্মোন্নতি আত্মোদ্ধার।

(ক্রমশঃ)

রাবণকৃত নাড়ীপরীক্ষা।

[কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্বপ্রকাশের পর)

—:o:—

(বঙ্গভূবাদ)

শ্রদ্ধা সসবতী প্রোক্তা রসোন্মুখ্যবিধারিনী।

ভাবিরোগ প্রবোধায় স্বস্থে নাড়ীপরীক্ষণম্ ॥৩০॥

রসহ অরহায় নাড়ী যদি রসযুক্তা ও শুদ্ধা
বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহাতে সুখী হইবার
সম্ভাবনা আছে-জানিবে। ভাবিরোগ পরীক্ষার

জন্ম স্বয়ং অবস্থার নাড়ী পরীক্ষা করিবে । ৩০

ভারপ্রদাহমূর্ছাভরণে কবিশ্চিকাতবানাড়ী ।

সং মূর্ছিতাপি গাঢ়ং পুনরপি সা জীবিতঃ

ভজতে ॥৩১॥

ভারবহন, অগ্নিদাহ, মূর্ছা, ভয়, শোক অথবা বিস্মৃতিকা রোধে বিশেষরূপে সংমূর্ছিত নাড়ীও পুনরায় জীবিত অবস্থাকে ভজনা করিয়া থাকে অর্থাৎ ভারবহনাদি দ্বারা শরীর প্রান্ত ও ক্রান্ত হইলে নাড়ী অবসন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবনের কিছু মাত্র হানি হয় না । তত্ত্ব অবস্থা জনিত শারীরিক বিকৃতি কাটিয়া গেলেই আবার নাড়ীও দেহ সুস্থ হইয়া থাকে । এবং বিস্মৃতিকা রোগে নাড়ী অবসন্ন হইয়াও যদি উহা স্থান ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাদৃশ রোগীরও পরি-বর্তনের আশা করা যায় । ৩১

মেহেহর্শসি মলাজ্ঞপে শীঘ্রং কৃষ্ণানন্তেধরা ॥৩২॥

মেহরোগে, অর্শোরোগে ও অজীর্ণ জন্ম মলভেদে নাড়ী শীঘ্র গীর্ণ স্পন্দিত হয় । ৩২

জ্বর্যঃ বাতবহাঃনাড়ীঃ গর্ভেপসহ লক্ষয়েৎ ।

সেব পিত্তবহা দ্বন্দ্বী নষ্টগর্ভা বদেষ্টেতাশ্চ ॥৩৩॥

গর্ভিণীর নাড়ী বাতবহা (বায়ুর জন্ম চাকল্যযুক্ত) ও (ভার ভার) বোধ হয় । সেই নাড়ী যদি পিত্তবহা ও লঘু বলিয়া মনে হয় । তবে তাহার গর্ভ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানিবে । ৩৩

পিত্তবায়োস্তত্রবাচ্য। লঘুনা গৌরবেণ চ ।

আগ্নিকবিভাগশ্চ দিনমাসাদিকংবুধৈঃ ॥৩৪॥

পণ্ডিতগণ পিত্ত ও বায়ুর গৌরব ও লঘুতা দেখিয়া দোষের আমল ও গকের বিভাগ এবং রোগের দিন এবং মাসাদি বলিয়া দিবেন । ৩৪

দোশীড়া বক্রিমধ্যেচ গ্রহায়ে ত্রসনেচ ।

ব্যায়ামেহট্টাট্টহাসে চ নৈতিশ্রুততঃ ধরা ॥৩৫॥

বাহুর পীড়া বা বক্রতাঘারা এবং গ্রহাণ, ভ্রাস, ব্যায়াম ও অট্টহাস্য প্রভৃতি দ্বারা নাড়ীর

গতি সম্যক প্রকারে ক্ষুদ্রিত হয় না । ৩৫

গম্ভীরা বা ভবেমাড়ী সা ভবেন্নাংসবাহিনী ॥৩৬॥

যে নাড়ীর গম্ভীর ভাবে বহিয়া যায়

তাহাকে মাংসবাহিনী বলিয়া থাকে । ৩৬

দীর্ঘা, কৃশা বাতগতিবিবমা বেপতে ধরা ।

জীবন্তী বাহসমৈশ্চিহ্নৈর্বাকুলাহজীর্ণসকরা ॥৩৭॥

নাড়ী যদি দীর্ঘাকৃশা ও বায়ুর গতি

সম্পন্ন হইয়া বিবম ভাবে কম্পিত হইতে থাকে

অথবা বহাদান অজীর্ণ রোগ ভোগ করিয়া

কাতর নাড়ী অসম চিহ্ন সকলের দ্বারা কম্পিত

হইতে থাকে তবে তাহাকে প্রাণহারিণী

বলিয়া জানিবে । ৩৭

শীতান্বিতস্ত গাত্রস্ত চিরাত্মস্বস্থ মম্বরা ।

শরানন্ত বলোপেতা নাড়ী শ্রুতভূত্বহা ॥৩৮॥

সমস্ত গাত্র শীতল হইয়াছে এরূপ ব্যক্তির

নাড়ী যদি বহুক্ষণ পরে স্থান ও অতি দীর

ভাবে বহিতে থাকে এবং (উত্থান শক্তি রহিত)

শয্যাগত রোগীর নাড়ী যদি বলবতী হয়, তাহা

হইলে নাড়ীর উত্তরবিধ অবস্থাকেই প্রাণ-

বাতিনী বলিয়া জানিবে । ৩৮

কিঞ্চিদাভ্যুগতিকা স্বহা নির্বহতে ঐবম্ ।

হৃদ্রূপা ফুটা শীতা স্বস্থানস্থে কফে তথা ॥৩৯॥

কফ স্বস্থান গত হইলে, নাড়ীর গতি জ্বৎ বক্র হইলে স্বস্থভাবেই বহিরা থাকে । এবং নাড়ীর তার হৃদ্রূপ হইলেও পরিস্ফুট এবং শীতল হইয়া থাকে ॥৩৯॥

পিতে স্বস্থানগে তৎপ্রবলা সরলা চলা ।

অনুজ্বাতি কোপেন চণ্ড পিত্তপ্রকোপতঃ ॥৪০॥

পিত্ত স্বস্থান গত হইলে নাড়ীর গতি প্রবল সরল ও চঞ্চল হইবে । (তাৎপৰ্য্য অবস্থায়, বায়ুর কোপ হইলে নাড়ীর গতি বক্র এবং পিত্তের প্রকোপে নাড়ীর গতি প্রথর হয় ॥৪০॥

সরলা শ্লেষ্মকোপেন নাড়ী দৌৰ্বেঃ পৃথক্ স্বতা ।

কফে হীনেন্দ্রিয়ং বাতগতিং বহাতনাড়িকা ॥৪১॥

শ্লেষ্ম প্রকোপে নাড়ী সরল হয় । দৌৰ্বে সকলের দ্বারাই নাড়ী পৃথকরূপে অনুভূত হইয়া থাকে । (যেমন বাতকোপে নাড়ী কুটীলা, পিত্তকোপে প্রথরা এবং শ্লেষ্মকোপে সরলা) — ইত্যাদি) নাড়ীতে কফের হীনতা ঘটিলে নাড়ী আধিক পরিমাণে বায়ুর গতি প্রাপ্ত হইয়া বহিতে থাকে ॥৪১॥

হীনে বাতে কফে চাতিশ্লেষ্মে পিতে চিরাৎফুটা ।

দৌম্যা হৃদ্রূপা স্থিরাশ্লীনা নাড়ী সহজবাতজা ॥৪২॥

বক্রাচ শেষচপলা কঠিনা বাতপিত্তজা ।

স্থলা চ চঞ্চলা শীতা মন্দাস্তাঃ শ্লেষ্মবাতজা ॥৪৩॥

হৃদ্রূপা শীতা স্থিরা নাড়ী পিত্তশ্লেষ্ম সমুত্তবা ।

পিত্তাধিক্যে চ চপলা কটুকাদেচ ভক্ষণাৎ ॥৪৪॥

বায়ুর ও কফের হীনতা ঘটিলে এবং পিত্ত

অতি দ্রুত হইলে নাড়ীর গতি শান্ত, হৃদ্রূপ, চাঞ্চল্য শূন্য ও মন্দ মন্দ ভাবে বহিতে থাকে এবং কখন কখন পরিস্ফুট হইয়া থাকে । বায়ু সহজ অবস্থায় থাকিলে নাড়ী বক্রা এবং বায়ুও পিত্তে নাড়ী জ্বৎ চঞ্চল ও কঠিন হইয়া থাকে । শ্লেষ্ম ও বায়ুতে নাড়ীর স্থল চঞ্চল শীতল এবং বেগশালী হয় । পিত্ত ও শ্লেষ্মাতে নাড়ীর হৃদ্রূপ শীতল ও বেগবতী হয় । পিত্তের আধিক্যে এবং কটুকাদি ভোজনে নাড়ী চঞ্চল হইয়া থাকে ॥৪২--৪৪॥

নিরন্তরং ধ্বং হৃদ্রূপমশ্রুতি বাতলম্ ।

রুক্ষাজাতোণ্ড পিত্ত নাড়ী ত্রাৎ

পিত্তসান্নিভা ॥৪৫॥

যে ব্যক্তি নিরন্তর রুক্ষ ও হৃদ্রূপ বাতবৃদ্ধি-কর খাদ্যাদি ভোজন করে তাহার নাড়ী ও রুক্ষ এবং বাত প্রধান ও পিত্ত সান্নিভ হইয়া থাকে ॥৪৫॥

নাড়ীতত্ত্ব সমা মন্দা শীতলা সৰ্ব্ব দৌৰ্বেজা ।

বিরংগোকাঙ্কিতরতে বতস্তাপি চ বাতবৎ ॥৪৬॥

সৰ্ব্বদৌৰ্বে নাড়ী তত্ত্ব সূক্ষ্ম মন্দ বেগও শীতল হইয়া থাকে, যেমন অবস্থায় তাহার পূর্বে ও পরে নাড়ীতে বায়ুর গতি লক্ষিত হয় ॥৪৬॥

রুক্ষবেগত বালস্ত শল্যাবিকৃত পিত্তবৎ ।

নিজ্রালোমে হ্রস্বস্তাপি কক্ষবর্জ্যপুণ্ডরোঃ ॥৪৭॥

মলমূত্রাদির বেগরোধকারী, শালকের, শল্যাবিকৃতির এবং তৃষ্ণ ও তৃণবিকৃতির নাড়ীর গতি পিত্তের জ্বর এবং নিজ্রালীন ও স্থল দেহী ব্যক্তির নাড়ীর গতি কক্ষের তুল্য হইয়া থাকে ॥৪৭॥

সমান্বিত। হৃদ্যস্পন্দ। মলাজীর্ণ প্রকীর্তিত।
বিষম। কঠিন। স্থলা মলশেবাৎ প্রকীর্তিত। ১৪৮॥

মলের অজীর্ণতাবশতঃ নাড়ীর গতি সমা
স্থ। ও ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে থাকে এবং
মল শেবে নাড়ী বিষম, কঠিন ও স্থল হইয়া
থাকে ১৪৮।

রক্তাদজীর্ণাঘমনাধিরেক। বীজক্লান্তক্লান্তহুতে
নিবন্ধাৎ ।

সংযুক্ত নাড়ীক্লান্তরাগ্নিমান্দ্যারাড়ীবহেতু
চলাচ জ্ঞপ্তোঃ ১৪৯॥

রক্ত ক্ষয়, অজীর্ণ, বমন, বিবেচন, বীর্ণাক্ষর
রক্তশাব, নিবন্ধন এবং মুচ্ছাদি ও জঠরাগ্নিব
মন্দতা বশতঃ রোগীর নাড়ী -তদু সদৃশ ক্ষীণও
চঞ্চল হইয়া থাকে ১৪৯

নিরামা হৃদ্যগা জ্ঞেয়া ককেনাপরিপূরিতা ।
নাড়ীতত্ত্বসমা মন্দা শীতলা সর্বদোষনা ১৫০॥

নিরাম অর্থাৎ রোগের তরুণ অবস্থায়
অতীত হইলে নাড়ী স্থল ও ককের দ্বারা
অপরিপূরিত বলিয়া মনে হয়। এবং সর্বদোষে
নাড়ী তত্ত্ব সদৃশ ক্ষীণ মন্দবেগ ও শীতল হইয়া
থাকে ১৫০॥

মন্দং মন্দং মিতাহারে, কফপিত্তসম্বিতা ।
বহুদাহকরে রক্তে প্রাবয়ন্তী বিশেষতঃ ১৫১॥

পরিমিত আহার করিলে কফ পিত্ত
সম্বিতা নাড়ী ধীর ভাবে বহিতে থাকে ।

শরীরে রক্তাধিক্য বশতঃ যদি দান্ত
উপস্থিত হয় তাহা হইলে নাড়ী বিশেষ রূপে
উজ্জলিত ভাবে বহিতে থাকে ১৫১

মধ্যে করে বহুনাড়ী যদি দীর্ঘা পুনর্জতা ।
তদা নুনং মনুষ্যস্ত কথিরা পুরিতা মলাঃ ১৫২॥

করের মধ্যভাগে অর্থাৎ নাড়ী দেখিবার
সময় মধ্যাকুলিতে যদি নাড়ী দীর্ঘ এবং দ্রুত
ভাবে বহিতেছে বলিয়া মনে হয়, তবে
মনুষ্যের বায়ু, পিত্ত ও কফ কথির দ্বারা
পরিপূরিত বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ বাত
পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ যদি বক্তাকে আশ্রয়
করে তাহা হইলে নাড়ীর গতি বিচ্ছেদ বিরহিত
ও প্রবল হইয়া থাকে ১৫২॥

বক্তা চ চপলা শীতস্পর্শা বাতজ্বরে ভবেৎ ।
দ্রুতা চ সরলা দীর্ঘা শীঘ্রা পিত্তজ্বরে ভবেৎ ১৫৩

বায়ুর জ্ঞ জ্বরে নাড়ী বক্তা, চপলা ও
শীত স্পর্শা এবং পিত্ত জ্ঞ জ্বরে নাড়ী দ্রুতা
সরলা দীর্ঘা ও শীঘ্রা হইয়া থাকে ১৫৩

মন্দা চ হৃদ্যিরা শীতা পিচ্ছলা শ্লেষ্মকে ভবেৎ ।
মৃণাল সরলা দীর্ঘা নাড়ী পিত্তজ্বরে বহেৎ ১৫৪॥

শ্লেষ্ম জ্ঞ জ্বরে—নাড়ী ধীর হৃদ্যিরা শীতল
পিচ্ছল হইয়া থাকে এবং পিত্ত জ্বরে নাড়ী
মৃণালের জায় সরল ও দীর্ঘ হইয়া বহিতে
থাকে ১৫৪

শীঘ্রমাবহতে মন্দং মলাজীর্ণাৎ প্রকীর্তিতা ।
স্থলা চ কঠিনা শীঘ্রং স্পন্দতেহতীব শাস্তয়ে ১৫৫॥

মলের অজীর্ণতাবশতঃ নাড়ী মন্দ অথচ
শীঘ্র বহিতে থাকে। এবং অত্যন্ত শাস্তির
(৭) জ্ঞ নাড়ী স্থল, কঠিন ও শীঘ্র স্পন্দিত
হইতে থাকে ১৫৫

পুরা মন্মা চ শনকৈশ্চক্ৰতাং বাতি নাড়ীক।

অন্নং শৈত্যং বেগধোক্ষা সংভবং ব্রহ্মতি

দ্রুতম্ ॥৫৬॥

প্রথমে শান্ত নাড়ীর গতি যদি ক্রমশঃ বেগবতী হইতে থাকে তাহা হইলে শীতজ্বর শীতজ্বর অথবা কম্পজ্বর হইবে বলিয়া জানিবে ॥৫৬

হৃদমৈকাহিকাদীনং বাধীনং জননী মতা।

ভূতগ্রহে শিরাহলক্ষ্য্য ভাবিত্তে কাহিকৈশ্চক্রে ॥৫৭

ঐক্লম নাড়ী ঐকাহিক ব্যাধির জননী বলিয়া কথিত হয়, ভূতাবেশ জন্ত ঐকাহিক জ্বরে নাড়ীর গতি বড়ই অস্পষ্টা লক্ষিত হয় ॥৫৭ কদাচিন্মন্দগমনা কদাচিৎবেগবাহিনা।

দ্বিদোষকোপতো জ্বর্য হস্তি চ স্থানবিচ্যুতা ॥৫৮

কদাচিৎ মন্দ গমনা কদাচিৎ বেগ বাহিনী নাড়ী দ্বিদোষের প্রকোপ জন্ত হইয়া থাকে। তাদৃশ নাড়ী যদি স্থান চ্যুত হয় তবে রোগীর জীবনের আশা নাই ॥৫৮

রক্তপিত্তে বহেরাজী মন্মাচ কঠিনা ঋজুঃ ॥

কাসপ্লেন্ডে স্থিরা মন্মা ঋসে তীব্রগতির্ভবেৎ ॥৫৯॥

রক্ত পিত্তের নাড়ী (শিথিল) কঠিন ও সরল ভাবে বহিতে থাকে এবং প্লেন্ড জন্ত কাশে নাড়ী স্থির ও মন্দ এবং ঋসে নাড়ীর গতি তীব্র হইয়া থাকে ॥৫৯

নাড়ী নাগগতি শৈব রোগগজে প্রকীর্ণিতা।

মদাত্যয়ে চ মন্মা স্যাৎকঠিনা পরিতো

জড়া ॥৬০॥

রোগরাজ অর্থাৎ রাজবন্দ্যার নাড়ীর সর্পের জায় গতি হইয়া থাকে ॥৬০॥

অর্শোরোগে স্থিরা মন্মা কঠিষজ্জা কচদৃষ্ণুঃ

অতিসারে তু মন্মা স্যাৎ হিমকালে

জলোকাবৎ ॥৬১

অর্শোরোগে নাড়ীর গতি স্থির ও মন্দ, এবং কখন বক্র ও কখন সরল হইয়া থাকে। অতিসারে নাড়ীর মন্দ গতি এবং শীতকালে নাড়ী জলোকা বৎ হইয়া থাকে ॥৬১

মাংসবৃদ্ধা তু সা ধন্তে অরাতীসাংস্যাংগতিম্।

মৃতদর্শসমা নাড়ী—গ্রহণীরোগ মাতি

শেৎ ॥৬২

মাংস বৃদ্ধিতে নাড়ী জ্বর অতিসারের জায় গতি প্রাপ্ত হয়। এবং মৃত প্রাণ সর্পের জায় গতি বিশিষ্টা নাড়ী দেখিয়া গ্রহণী রোগ নির্দেশ করিবে ॥৬২॥

মৃত্রাঘাতে মুহুর্ভেদক্ষুরণে সংপ্লুতা ভবেৎ।

প্রমেহে চ জড়া মন্মা মুহু রাপ্যায়তে শিরা ॥৬৩

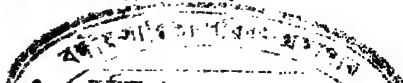
মৃত্রাঘাতে নাড়ী মুহুর্মুহঃ ভিন্ন ও ক্ষুরিত এবং সংপ্লুত হইয়া থাকে। প্রমেহে নাড়ী জড়তা সম্পন্ন। মূত্র ও মুহুঃ আপ্যায়িত হইতে থাকে ॥৬৩

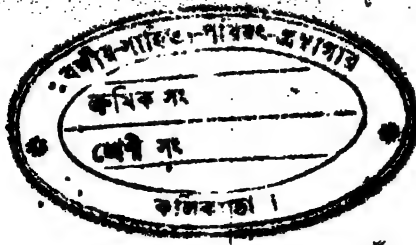
পাণুরোগে চলা তীভ্রা দৃষ্টা দৃষ্টবিহারিনী।

কুঠে তু কঠিনা নাড়ী স্থিরম্যাদ প্রবৃত্তিকা ॥৬৪

পাণুরোগে নাড়ী • চকল তীব্রগতি ও তখনই স্পষ্ট আবার তখনই অস্পষ্ট ভাবে বহিতে থাকে এবং কুঠরোগে নাড়ী কঠিন স্থির ও অপ্রবৃত্তিকা অর্থাৎ অপ্রসন্ন ভাবে বহিতে থাকে ॥৬৪।

কবিরাজ শ্রীমদ্রেজকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ১৭১১নং শ্রামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্তৃক প্রকাশিত।





আয়ুর্বেদ

৭ম বর্ষ

পৌষ, ১৩২৯ সাল।

৪র্থ সংখ্যা।

আয়ুর্বেদের পুরাতত্ত্ব।

—:o:—

আয়ুর্বেদশাস্ত্র শরীর মাত্রেরই প্রয়োজনীয় এইজন্ত প্রাচীনকালেও যে সকল জাতি অতীব অসভ্যাবস্থার ছিল, তাহারাও তৎকালে এইশাস্ত্র কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইত। বাহার শরীর আছে, তিনিই ইহার জ্ঞান কখন না কখন ব্যাকুল হইরাছেন। ইতিহাসালোকবত্তী হস্তে করিলা কালের অন্ধকার পথে যে পর্য্যন্ত গমন করা যায়, তন্মধ্যে ভারতের বেদই প্রাচীনতম। এতদ পেকা দ্রুৎগত কালে কি ছিল, তাহা তাহার কিছু পরিচয় দেয় না। আমরা আদৌ প্রাচীনতম আয়ুর্বেদের কয়েকটি প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া দেখাইব যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি আর্য্যগণ, ঋগ্বেদের সময়ই এই আয়ুর্বিজ্ঞান উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

উপাসনাবৃত্তি যেমন মনুষ্যের প্রকৃতিগত, মনুষ্য ইহা একেবারে ছাড়িতে পারে নাই,

বোধ হয় পারিবেও না, রোগোৎপত্তিও তজ্জন মানব প্রকৃতির আদি বিকারজনিত। একজন্মই বেদ-কবি বলিয়াছেন, বেদ নিত্য ও আদি পুরুষ ব্রহ্মার কীর্তিত। আবার তাদৃশ হেতু নিবন্ধনই আর্য্যগণ ব্রহ্মাকেই আয়ুর্বেদের আদি বত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন।

গ্রাণাদি হিন্দু শাস্ত্রে এরূপ প্রথিত আছে যে, সভ্যযুগে লোক সকল নিরোগী ছিল। ত্রেতার প্রারম্ভে ও সত্যের শেষভাগে রোগ সন্মাত হয়। অনেক নব্য শিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমानी, হয় তো প্রোক্ত পৌরাণিক বাক্য শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত ও একেবারে অন্তঃসার শূন্য বলিয়া উপহাস করিবেন, কিন্তু একটুকু প্রীতির সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে, তিনি নিশ্চয়ই উহার সারবত্তা অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা ব্রমেও একথা বলিব না যে, সেইকালে সমস্ত মনুষ্য একেবারে সুস্থ

ছিল, কখনি কাহাকেও স্বাস্থ্যভঙ্গ এনিত ক্রেশ পাইতে হয় নাই, বরং ইহাই দেখাইব যে, অতীত প্রাচীন ভারত সমাজেও রোগ, শোক বর্তমান ছিল, কিন্তু কথা এই যে, সত্যে নিরাশ্রয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পৌরাণিক বাক্য একেবারে তাৎপর্য্য বিহীন নহে। যখন মানব সমাজ শিশু, যখন পল্লীগ্রামে প্রতিবর্গ ক্রোশে বিসহস্র লোকও ছিলনা, যখন মানবজাতি প্রাচীন বলিয়া জগতে পরিচিত হয় নাই, বাল্য বিবাহ, মৃত্যুপাণি ও অপরাপের সভ্যতাসূচক বিলাস সামগ্রী যখন ভারতক্ষেত্রে দুর্লভতার বীজ বপন করে নাই, যখন ঢাকার আত হুস্র কার্পাস বস্ত্র বিনিময়ে দুচুতর বকল, বাহুশোভন ছত্র-বিনিময়ে বুদ্ধছায়া সেবন করিয়া আর্থ্য স্ববি ক্লাস্ত হইরেন নাই, সেই সময়ে নিশ্চয়ই বর্তমান বিংশ শতাব্দীর বহুবিধ রোগের অস্তিত্ব ছিল না, অতি সাধারণ রকমের কোনো কোনো পীড়া ব্যতীত প্রায়ই রোগ-প্রাচুর্য্য ছিল না। এ স্থলে ‘নিরোগ’—এই পদটি রোগহীনত্ব সূচক নহে, নঞর অর্থই অর্থই এ স্থলে প্রযুক্ত।

মানব সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন সুখও আসিয়াছে, অনেক দুঃখও আসিয়াছে। যে দেশ যত জনাকীর্ণ হইয়াছে, সাধারণতঃ সেই দেশই তত পীড়ার আগার অলিয়াছে।

ঋগ্বেদের পূর্বে ও তৎসম কালে যে অল্পে অল্পে আয়ুর্বেদ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছিল, বেদের বহুবিধ প্রার্থনা তাহার পরিচয় দিতেছে। এইকালে আয়ুর্বেদ একটি শাস্ত্র রূপে পরিণত হইয়াছিল এমনত বোধ হয় না। বাহা হউক ইহাই আয়ুর্বেদের তিত্ত্বত্ব।

আমরা এই স্থানকে বেদাযুর্বেদ বা দেবাযুর্বেদ নামে অভিহিত করিলাম। এই কালের আমি শুক ব্রহ্মা, শেব শুক ইন্দ্র। ইন্দ্র হইতে ভরদ্বাজ ও ধমন্তরি আয়ুর্বেদ লাভ করেন, ইহারাই দ্বিতীয় কালের প্রবর্তক। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব প্রধানতঃ চিকিৎসক ছিলেন বলিয়া ইহার নাম ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাযুর্বেদ বা মিশ্রাযুর্বেদ। মিশ্রাযুর্বেদই কালক্রমে বৈদ্যাযুর্বেদ রূপে পরিণত হয় শেষকাল বা সর্কায়ুর্বেদ—মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়। আমরা নিয়ে এই চারিটি বিভাগের বিবরণ প্রকটিত করিতেছি।

দেবাযুর্বেদ ।

সমগ্র আয়ুর্বেদবিদ পণ্ডিতই ব্রহ্মাকে আয়ুর্বেদের আদি শুক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একরূপ শিবুত আছে যে, তিনি লক্ষ লোকে সমস্ত আয়ুর্বেদ প্রণয়ন করেন ও সহস্র অধ্যায়ে বিভাগ করিয়া ইহাকে অথর্ব-বেদের উপাঙ্গ রূপে নিবেশিত করেন। কালান্তরে যখন মানবগণ অমায় ও অন্নমেধ হইয়া উঠিল, তখন তাহার তদধারনে অক্ষম বিবেচনার পিতামহ সমগ্র আয়ুর্বেদতত্ত্ব আট ভাগে প্রণয়ন করিলেন। ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ প্রজাপতি হইতে অশ্বিনী কুমারদ্বয় অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুর্বেদ লাভ করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অপর নাম সনৎকুমার। ইহারাই স্বর্গবৈদ্য ছিলেন। ধমন্তরি ও ভরদ্বাজ—ইন্দ্র হইতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে ‘শারীর বিজ্ঞানের শোদি প্রচারক হইলেন। আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে পাঠ্যেন শুক পরম্পরা পর্য্যন্ত, যর্বে

আয়ুর্বেদ প্রচারিত থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে দৃষ্ট হইবে যে, ঐশ্বর্য কালে ইহারাই বৈদ্যা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে, দীর্ঘ বৈদিককালে যে সকল ভেদজন্তু বেদকোবিদের বক্তব্যবর্ণনাতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাই অল্পে অল্পে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। তাহাই এক অত্যাশঙ্ক্য শাস্ত্ররূপে পরিণত হয়। বেদ-কবি মেধাভিধি বলিয়াছেন, “জলেতেই অমৃত, জলেতেই সমস্ত রোগ নাশক ওষধি বর্তমান।” “হে (+) সোম তুমিই আমাদের প্রশংসার পাত্র, তুমিই ওষধি তরুর প্রভূ।” এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জলের অসাধারণ রোগনিবারিণী শক্তি অতি প্রাচীনকালেই ভাবত সমাজে বিদিত ছিল।

পুনশ্চ, স্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্তোত্রে সোম-কন্দের নিকট রোগ দূতকরণার্থ প্রার্থনা বিদ্যমান দেখা যায়। সোমকন্দের যে শুদ্ধ বলকর ও মাদক এমনতর নহে, ইহা যে বহুবিধ জরাজীর্ণপাতারক, তাহাও সেই পুরাকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কেহ এক্ষণ মনে করিবেন না যে, এই প্রার্থনা সোমদেবের নিকট, কারণ পরবর্তী স্তোত্রেই “হে সোম, তুমি অস্ত্র তরুর সহিত বহু আবর্জনে পরিবর্জিত হও”—এক্সণ বাক্যে সোম পদ কদাপি চক্ষু নাশাস্তর নহে। সোমকে আয়ুর্বেদবিদ পণ্ডিতগণ হান-ক্রিয়াদি ভেদে চতুর্বিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।*

† অগ্নি-বস্ত্রবস্ত্রবস্ত্র, ভেদবস্ত্রবস্ত্র প্রশস্তরে ।
ওষধি সংহিতা ।

* এক এক ভগবান সোম: হান ক্রিয়া ভেদে চতুর্বিংশতিভাষিততে । যথা অগ্নিবান্ তুষ্ণবান্ধবান্ চক্ষুসান্ রসতঃ ।

তাহারাও ইহার অসাধারণ জগৎপহারিণী শক্তি দেখিয়া ইহাকে ওষধিপতি বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। পুনরপি ২০শ স্তোত্রে “সোম আমাকে বলিয়াছেন যে, জলেতেই সমস্ত ওষধি.....হে জল, তুমি আমাদের শরীরের নিমিত্ত রোগ নিবারক তেজের স্রষ্টা কর । ২১শ স্তোত্র । এতদ্বারা অস্বাস্থ্য হয় যে, তৎকালে অধিকাংশ ভেদজই জলত ছিল, জল যে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইলে যে, বেদ-কবিগণ সোমলতার অধিষ্ঠানভূত দেবেরও কল্পনা করিয়াছেন, কারণ অনেক স্তোত্রে সোমদেবের প্রার্থনাও বিদ্যমান আছে। আয়ুর্বেদবিদ পণ্ডিতগণ আখিন-কদ্রাদির জ্ঞান সোমকে কদাপি চিকিৎসক বলিয়া বর্ণন করেন নাই, শুদ্ধ ওষধিপতি বলিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। একে স্থানে স্থানে স্বাস্থ্য ও বল লাভের নিমিত্ত কদ্র দেবের প্রার্থনা বর্তমান দেখা যায় পরবর্তী গ্রন্থাদিতে “স্বয়ং কদ্রোণ ভাষিতম” বলিয়া অনেক তৈল-বটিকার প্রশংসা ধ্বনিও বিদ্যমান আছে। অস্ত্রতর বেদকবিগণ সোম বলিয়াছেন, —“হে কদ্র, তোমার প্রদত্ত স্বাস্থ্যরক্ষক ঔষধিদ্বারা যেন আমরা শত শত শত বাসিরা থাকি। ওষধি তরুদ্বারা তুমি আমাদের সন্তানগণকে বলান্বিত কর। কারণ শুনিতে পাই, তুমিই চিকিৎসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।” এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, আত্মের ধ্বংস, মৃত্যু এমন কি বাগভট পর্যন্ত ইহাদিগকে আখিন, ইন্দ্রাদির জ্ঞান বৈদ্যা শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। কিন্তু রসেন্দ্রসারসংগ্রহাদি অনেক আধুনিক গ্রন্থে ইহার ভূমি ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণ

অমুখিত হয় যে, তত্ত্বকারকগণ পূর্বাচাৰ্য্যগণের এই ব্রাহ্মসন্ধান পাইয়া বেদোন্নিখিত কৃত্ত দেবকে আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ী ও মহাদেবকে পরম বৈদ্য বলিয়া আশ্রয়াদিগের আরাধ্য দেব রূপে তাঁহার সাহায্য কীর্তন করিয়াছেন।

সুপ্তিগণ যে অতি প্রাচীনকাল হইতে এতদ্ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইতেন, একেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। বাস্তব, যে প্রাণালীতে ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান গণপন্নব কল পুষ্পাদিতে স্তম্ভোত্তত হইয়া একটী প্রকাণ্ড কৃষ্ণে পরিণত হইয়াছে, তাহার মূলমন্ত্র— আহার উর্ধ্বতা বিধায়ক সার বীজাদি ঞ্চকের সন্মুখেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল! ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত গণ স্বাভিপ্রান্ত গণনামুসারে ঞ্চকের কাল ক্রীঃ জন্মের পূর্বে ২০০০বৎসরের অনূন বলেন। স্তম্ভরাং আয়ুর্বেদের দুই একটি গণিত পত্র আজও যে প্রাপ্ত হইতেছি, অন্ততঃ চারি সহস্র বৎসর পূর্বে তাহার বীজ বপন সম্পন্ন হইয়াছিল। রোগ নাশেরই সাধারণতঃ জন্মের উপকারীতা, বহুবিধ জলজ পদার্থের রোগাপ-হারিশীলতা, উর্ধ্বজ্ঞগত রোগ চিকিৎসা, বিশেষতঃ চক্ষু রোগাপনয়ন ও রাজার আয়ু-র্বেদ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে তত্ত্বাবধানের আবশ্যকতা, সেই পুরাকালেই আশ্রয়নবী-দিগের নির্মল জ্ঞানপোচর হইয়াছিল। তখন জাতিভেদও হয় নাই, ব্যবসায়-ভেদও হয় নাই। একই ব্যক্তির সন্তান স্ব স্ব ক্রটি অমু-সারে উপকীৰ্ত্তিকার উপায় অবলম্বন করিতেন। জনৈক বেদকবি এই বলিয়া আশ্রয় পরিচর দিয়াছেন,—আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা তত্ব প্রস্তুতকারিণী এবং আমি কবি।” ভারতে ব্রাহ্মণ সন্তান কেবল বাজনাধ্যায়নাদি

ব্যতীত ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে পারি-বেন না, তৎকালে এমন কোনো সামাজিক অমুশালন ছিল না। কে কি ব্যবসায় অব-লম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিল, সমাজ তদমুসন্ধানে কাঁহাকে প্রশংসা বা নিন্দা করি-বার অস্ত তখন আকুলিত হইত না।

ব্রাহ্মণবৈজ্ঞানিক আয়ুর্বেদ বা মিশ্রায়ুর্বেদ।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সত্যের শেষ ভাগে ত্রেতার প্রারম্ভে রোগোৎপত্তি হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, যে, সত্যের অনারম্ভ, রোগহীনত্ব বোধক নহে, রোগের বিরলত্ব ব্যক্তক, এখানেও রোগোৎপত্তি রোগবাহুল্য বোধক জ্ঞান করিতে হইবে। এই সময়েই ভগবান ধন্বন্তরি জন্ম গ্রহণ করেন। ধন্বন্তরির জন্ম বিবরণ পৌরাণিক কল্পনামিশ্রিত হইলেও উহার কালানির্দেশ কবিত্রিভিা ও সমুদায়ে ঐতিহ্য হাসিকতার সারবস্থা বিলক্ষণ বিস্তমান আছে। আখ্যাত্মিতে ধন্বন্তরিই আদি বৈদ্য।

ইহা সহজেই অমুখিত হইতে পারে যে, যে কালে সমস্ত গ্রাম, নগর, উপনগর নানা-বিধ মহামারীতে ব্যতিব্যস্ত, নিকৃষ্ট আতুর অসহ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে মুক্ত হইবার কোনো পস্থা না দেখিয়া একেবারে হতাশ, সেই সম-য়েই অতি কুশল করুণাপরায়ণ বৈজ্ঞান্য, সমস্ত প্রাণীর ভয়ানক পীড়া নিবারণের অমোঘ প্রায় উপায় লাভ, ভারত ক্ষেত্রের ধর্মশীল মনুষ্যসদয়ে দয়ার নিধান অঙ্গলময় চৈত্ব্যের বিশেষ করুণা বলিয়া প্রতীত হওয়া বিশ্বাসের বিষয় নহে।^১ ভারতবাসী এইজন্তই ধন্বন্তরিকে অবোদিসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন। ধন্ব-ন্তরির অমারবী প্রতিভাই তাঁহাকে নানারূপ

হুণী বলিয়া তারদের পুজোপহার প্রদান করিয়াছিল। একই ব্যক্তির দ্বারা এক সময়ে বহুস্থানব্যাপক মারী নিবারণ অসম্ভব, সুতরাং বাধ্য হইয়াই শীত শীত অনেক আর্ঘ্য পুঁজি আয়ুর্কের শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তদ্যবহার অবলম্বন করিয়া বহু লোকের বিপদ শান্তি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কজির বিজ্ঞ নামেই আয়ুর্কের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন। কিন্তু কালান্বয়ে ধনস্তুতির সন্তান পরম্পরা বংশবাহুল্য হওয়াতে ও ব্যবহার জীবনের অশুশাসন ভয়ে ব্রাহ্মণ কজিরাদি তদ্যবসায় পরিত্যাগ করেন। বাহাহউক এই সময়ের প্রথম ভাগ ব্রাহ্মণাদি বিজ্ঞগণ ও পরভাগে বিজ্ঞাতিগণের মধ্যে কেবল বৈদ্যগণ তদ্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া ইহাকে বিশ্রী কাল নামে অভিহিত করা গেল।

ধনস্তুতি অমৃতচার্য্য।

হন, গাড়ুর ও মার্কণ্ডের পুরাণানুসারে ভগবান্ ধনস্তুতি ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে সমুদ্ভূত হইলেন। এইরূপ প্রথিত আছে যে, মহর্ষি গালব সমিৎ কুশাহরণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এক জনোপাঙ্গে উপস্থিত হইলেন। অন্ধপ্রান্ত, মুনি তৃষ্ণাতুর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, বন বহির্ভাগে একটি কত্মা জলপূর্ণ কুন্ত ককে করিয়া গৃহে

বাইতেছে। মুনিবর তদ্বর্ণনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন,—“হে কন্যে! আমি নিতান্ত তৃষ্ণাতুর, জলদান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর।” ব্রাহ্মণ-ভক্তি পরায়ণা কত্মা জলকুন্ত প্রদান করিলে মহর্ষি গালব দান করিয়া বখেঁটে জলপান করিলেন এবং অতি পরিতোষ লাভ করিয়া বলিলেন,—“হে কন্তে! আমার পরিতোষ হেতু তোমার সং পুত্র লাভ হউক।” কত্মা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন,—“ভগবন! আমার যে বিবাহ হয় নাই।” গালব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, কত্মা লিলেন,—“আমার নাম বীরভদ্রা, আমি বৈশ্যকত্মা।” মুনিবর তচ্ছবনে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মুনি সমাজে সমস্ত বৃন্তস্ত বর্ণন করিলেন। সকলে হর্ষিত হইয়া বলিলেন,—“মুনিবর! আপনি বড় মঙ্গল করিয়াছেন, এই বীরভদ্রর গর্ভে ধনস্তুতি জন্মগ্রহণ করিবেন।” এই বলিয়া সকলে কুশপুতলিকা নিৰ্ম্মাণ করতঃ বীরভদ্রার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন ও বেদমন্ত্র জপ করিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। অমনি অতি সৌম্যকৃতি কাঞ্চনরাশি গৌরবীর বালক বীরভদ্রার ক্রোড়দেশে আলোকিত করিল। মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে বেদ হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম বৈদ্য রাখিলেন এবং জননী ক্রোড়ে স্থিত বলিয়া ইনি অম্বষ্ঠনামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনিই বৈদ্যবংশের মূল সংস্থাপক।

কায় চিকিৎসাক্রমোপদেশ ।

বাতব্যাধি ।

(পূর্নাস্থতি)

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন ওপু কবিরঞ্জন]

—:—

কস্যাপকাসসেহ নামক ঔষধ
টিও বাতব্যাধির গদগদ ভাবী অবস্থার
হিতকর ।

ইহার উপাদান

হরিদ্রা,—

বচ,

কুড়

পিপ্পল

তুঁঠ

কক্কীরা

বলবানী

বটমধু

সৈন্ধব

সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমান । দ্বত মিশাইরা
ভক্ষণ করিতে হয় । শাস্ত্রকার এই ঔষধের
ওষণ পরিচয়ে বলিয়াছেন ।

একবিংশতি রাত্রেণ ভবেচ্ছুতিভিরো নরঃ ।

মেঘ হ্রস্বতি নির্ধোযো মত্ত কোকিল নিবনঃ ।

অর্থাৎ ইহা এক বিংশতি দিবস সেবন
করিলে ঐতিধর হওরা বার এবং মেঘ হ্রস্বতির
স্তার শব্দ অথচ কোকিলের স্তার হ্রস্বধর ধ্বনি
সম্বিত বাক্যোচ্চারণ শক্তি অগ্নিয়া থাকে ।

বিশ্বচী ও অবাছক রোগে—
দশমূল, বেড়োলা ও মাষকলাই—ইহাদের কাথে
তৈল ও দ্বত প্রক্ষেপ দিয়া রাত্রিকালীন
ভোজনের পর তাহার নস্ত লইবে ।

বাছশোষ রোগে—শাল
পানির সহিত হৃৎ সিদ্ধ করিয়া সেই হৃৎ পান
করিতে দিবে ।

গৃধ্রমী রোগে—মুহু অগ্নিতে
নিসিন্দার কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে ।
এরওমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী
ইহাদের কাথ, সচল লবণের সহিত পান করিলে
গৃধ্রমী জ্বর ও বস্তিদেহের স্থায়ী বেদনা
প্রশমিত হয় ।

শঙ্কুতা রোগে—দশমূল, বেড়োলা
রাত্রা গুলক ও তুঁঠ ইহাদের কাথের সহিত
এরও তৈল পান হিতকর । খণ্ডতা ও গৃধ্রমী
রোগেও ইহা উপকারী ।

আপ্ত্যান রোগে—পিপ্পল চূর্ণ
২ তোলা তেউড়ীর মূলচূর্ণ ৮ তোলা ও চিনি
৮ তোলা, একত্র মিশাইরা অর্দ্ধ তোলা মাত্রার
মধুর সহিত সেবন করাইবে । দেবদারু,
কুড়, শুলকা, হিং ও সৈন্ধব লবণ একত্র

কাঁজির সহিত বাঁটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে শূল ও অস্থান রোগ প্রকাশিত হয় ।

প্রত্যাহ্বান রোগে—বমন ও লম্বন এবং অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

শিরোরোগে—দশমূল্যের কাথ ও টাঁবা লেবুর রস দ্বারা তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দন করিবে ।

অস্ত্রীসারোগে—শুষ্ক রোগের স্ত্রীর চিকিৎসা করিবে ।

তুণী ও প্রাতিতুণী রোগে—স্নেহ পিচকারী দেওয়া উপকারী । হিং ও যবন্ধার মিশ্রিত উষ্ণ দ্রব্য পান এই রোগে হিতকর ।

শ্রম্মী রোগে—কুড়, সৈন্ধব লবণ ও তক্র মিশ্রিত করিয়া ও গরম করিয়া মর্দন করিবে ।

বাতকণ্টক রোগে—জৌক দ্বারা রক্ত শোষণ, এরণ্ড তৈল পান এবং উত্তপ্ত হুচী দ্বারা গীড়িত স্থান দধি করা কর্তব্য ।

ক্লোন্ত্রকশীর্ষ ও পাদদাহ রোগে—বাত রক্ত রোগের স্ত্রীর চিকিৎসা করিবে । মসুর কলাই পেষণ করিয়া জলে দিচ্চ করিয়া প্রলেপ দিলে এরূপ অবস্থার উপকার হয় । পদক্ষেপে মবনীত মাখাইয়া অগ্নির উত্তাপ দেওয়া হিতকর ।

পাদদাহ রোগে—কুড় প্রসারনী তৈলের মর্দন উপকারী ।

* সকল প্রকার বাতব্যাধিতেই তৈল মর্দন করা প্রধান চিকিৎসা । কোঠে বায়ুর পকে নারায়ণ তৈল, বিষ্ণু তৈল, বৃহৎ বিষ্ণু তৈল,

মধ্যম নারায়ণ তৈলের অভ্যাস হিতকর । নিম্নে ঐ তৈলগুলির উপাদান বলা যাইতেছে—

নারায়ণ তৈল ।

বিষ্ণুরিসহ শ্যোনাক পাটলা পারিত্যকম্ ।

প্রসারণ্যখগন্ধাচ বৃহতী কণ্টকারিকা ॥

বলা চাতিবলা চৈব খদংষ্ট্রা স পুনর্নবা ।

এবাং দশপলান্ ভাগাংশতু দ্রোণেহস্তসঃ

পচেৎ ॥

পাদ শেখঃ পরিত্য্য তৈল পাত্ৰং প্রদাপয়েৎ ॥

শতপুশ্পা দেবদারু মাংসী শৈলৈরকং বচা ॥

চন্দনং তগরং কুষ্ঠ মেলা পণা চতুর্ভবম্ ।

রান্না তুরগ গন্ধা চ সৈন্ধবং স পুনর্নবম্ ॥

এবাং ষিপলিকান ভাগান্ পেষয়িত্বা

বিনিক্ষিপেৎ ॥

শতাবরী রসকৈব তৈল তুল্যাং প্রদাপয়েৎ ॥

আজং বা বাদি বা গব্য ক্ষীরং দত্তা চতুর্ভবম্ ।

পানে বস্তৌ তথাভ্যক্তে ভোজ্যে চৈব

প্রশস্ততে ॥

ভিল তৈল ১৬ সের । কাথার্ধ—বিষ্ণু-

হাল, গণিয়ারি হাল, পোনা হাল, পাকল

হাল, পালিখা মাঝারের হাল, গন্ধ ভাঙ্গলে,

অখগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়োলা,

গোরকচাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্নবা—

প্রত্যেকের ৮০ তোলা, জল ২৫৬ সের, শেখ

৩৪ সের । শত মূলীর রস ১৬ সের এবং গব্য

বা ছাগ ছদ্ম ৩৪ সের । ককার্ধ তুলকা,

দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন,

তগরপাছকা, কুড়, ছোট এলাইচ, শালপাণি,

চাকুলে, মুগানি, মাঝানি, রান্না, অখগন্ধা,

সৈন্ধব ও পুনর্নবা মূল—ইহাদের প্রত্যেকটি

১০ তোলা। এই তৈল পানে, বর্ধনে এবং
বন্তি প্রয়োগে বিবিধ ব্যক্তি রোগ বিনষ্ট হয়।

বিষ্ণু তৈলম্।

শাল পর্ণী পুষ্কর্ণী বলা চ বহু পুষ্কিকা।
এরশস্য চ মুলানি বৃহত্যোঃ পুষ্কিকস্য চ ॥
গবেবধুকস্য মুলানি তথা সহচরস্য চ।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈঃ স্তৈল গ্রহঃ

বিপাচয়েৎ ॥

আজং বা যদি বা গব্যঃকীরং দদ্যাচ্চতুশ্চর্ণম্।
তিল তৈল ৮ সের। গব্য বা ছাগ দুগ্ধ
১৬ সের। কদার্ব—শালপাণি, চাকুলে,
বেড়েলা, শতমূলী, এরশ মূল, বৃহতী মূল,
কণ্টকারী মূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলের
মূল, ও ঝাঁটিমূল—ইহাদের প্রত্যেকটি আট
তোলা। বধা নিরমে পাক করিবে।

বৃহদ্বিষ্ণু তৈলম্।

জলধর মধুগন্ধা জীবকর্ষভকৌ শঠী।
কাকোলী ক্ষীর কাকোলী জীবন্তী মধু
যষ্টিকা ॥
মধুরিকা দেবদারু পদ্মকাষ্ঠক শৈলজম্।
শাংসী চৈলা যতং কুঠং বচা চন্দন কুসুমম ॥
মজ্জিষ্ঠা মৃগনাভিষ্ঠ খেতচন্দন রেণুকম্।
পার্শ্বণী কুন্দখোটিষ্ঠ গ্রহ্মতঞ্চ নবী তথা ॥
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈঃ স্তৈলস্তাপি তথাক্রম্।
শাবরীরস সমং দুগ্ধকাপি সমং পচেৎ।

তিল তৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস ৬
সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কদার্ব—মুখা, অখগন্ধা,
জীবক, গুহতক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী,
জীবন্তী, যষ্টিমধু, মোরি, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ,
শৈলজ, জটামাংসী, এলাইচ, দারুচিনি, কুড়,
বচ, কুষ্ঠচন্দন, কুসুম, মজ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি,

খেত চন্দন, য়েগুকা, শালপাণি, চাকুলে,
মৃগানি, শাবানি, কুন্দখোটি, ও নবী—
ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা। জল ৩৪ সের।

মধ্যম নারায়ণ তৈলম্।

বিবাক্ষগন্ধা বৃহতীখদংষ্ট্রা ভ্রোণাক ব্যাটালক
পারিতন্ত্রম্।
ক্ষুদ্রা কঠিষ্ঠাতি বলাগ্নি মৃগং মুলানি চৈবাং
গরনীমূলানাম্।
মূলং বিদধ্যামধ পাটলীনাং গ্রহং সপাং
বিধিনোক্তানাম্।
ম্রোণৈরপামষ্টভিরেব পক্তা পাদাবশেষেণ
রসেন ভেন।
তৈলাঢ়কাভ্যাং সমম্বেব দুগ্ধ মাজং নিদধ্যা
দধবাপি গব্যম্।
একত্র সম্যগ্ বিপচেৎ স্তুভ্জিন দ্যাত্রসকৈব
শতাবরীণাম্।

তৈলেন তুলাং পুনরেব তত্র রাশাখগন্ধা
মিষিদারু কুঠম্।
পর্ণীচতুষ্কণ্ডক কেশরাণি এলাত যষ্টি তগরাক
পত্রম্।
ভৃঙ্গাষ্টবর্গাষু বচা পলাশং যৌগেয় বৃক্ষীরক
চোরকাখ্যম্।
এতৈঃ সমন্তৈঃ দ্বিগল প্রমোণৈরালোক্ত্য সর্কং
বিধিনাবিপকম্।
কপূর কান্দীর মৃগাণ্ডজানিষ্ট চূর্ণীকৃতানাং
দ্বিগল প্রমাপম্।
প্রবেদ দৌর্গন্ধ্য নিবারণায় দদ্যাৎ স্তগন্ধায়
বৃষতি কেচিং ॥

তিলতৈল ৩২ সের। কদার্ব—বিব,
অখগন্ধা, বৃহতী, গোন্ধুর, শোনা, বেড়েলা,
পালিধা, কণ্টকারী, পুশ্পবা, মোরক্ষ চাকুলে,

গণিয়ারি, গন্ধতীহুলে ও পারুল—ইহাদের প্রত্যেকটি ২৫০ সের, নাকার্ব জল ৫১২ সের ; শেষ ১২৮ সের । গব্য বা ছাগদুগ্ধ ৩২ সের । শতমূলীর রস ৩২ সের । কন্ধার্থ—রান্না, অখগন্ধা, মোরি, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, অশুর, নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, ষষ্টিমধু, তগরপাহুকা, মুখা, তেজপত্র, ভূমরাজ, জীবক, ঋষতক, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, ঋক্টি, বৃক্টি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গের্ঠেলা, খেত পুনর্ণবা ও চোরপুন্দ্রী—ইহাদের প্রত্যেকটি ১৬তোলা । গন্ধ দ্রব্য কপূর, কুসুম ও মুগনাতি । প্রত্যেক ৮ তোলা ।

কোষ্ঠগত বাতরোগে তৈলের অভাব ভিন্ন মিশ্রলিখিত ব্যবহার ঔষধগুলি সেবন করা হিতকর ।

প্রাতে—চতুর্মুখ অহুপান ত্রিফলা ও মিহিরি জল কিম্বা শতমূলীর রস কিম্বা হেলেকার রস ও মধু ।

বেলা ৩টার—বজ্রকার এক আনা মাত্রায়, মোরির জলসহ । ২ বেলা আহারাঞ্চে—বৃহৎ অগ্নিকুমার—গরম জল সহ । বৃহৎ অগ্নিকুমারের পরিবর্তে বিট লবণের গুঁড়া এই আনা মাত্রায় মূখে ফেলিয়া জল পান করিলেও উপকার দর্শিরা থাকে ।

উপরোক্ত ঔষধগুলির প্রস্তুতবিধি বলা বাইতেছে—

চতুর্মুখ রস ।

সগন্ধক লৌহাত্রয় সমং সুতাঙ্কি হেম চ ।

সুদীর্ঘ ধাতুতে দিল্লী কক্ক শরস মর্দিতম্ ॥

১—লৌহ ।

এরও পত্রৈবাবেষ্টা খাত্তরশৌ দিনত্রয়ম্ ।

সংস্থাপ্য চ তদ্বৃদ্ধতা সর্বরোগেষু বোজয়েৎ ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, প্রত্যেক এক তোলা এবং স্বর্ণ ১০ চারি আনা । যুতকুমারীর রসে বাটিয়া এরও পত্র দ্বারা বেটন করিয়া খাত্তরশির মধ্যে তিন দিন রাখিবে । ২২২ বটী ।

বজ্রকার ।

কটকিরিচ চাণিগুণ সোরা—অগ্নি উত্তাপে এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয় । ইহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে ।

বৃহৎ অগ্নিকুমার ।

হরীতকী, যমানী, সৈন্ধব—প্রত্যেক ১ভাগ বহেড়া ২ভাগ—জলসহ মর্দন, দুই আনা বটী ।

কোষ্ঠগত বায়ু, বিকারে কোষ্ঠতন্ত্রির জন্ম অভয়ায্য মোদক নামক ঔষধটি সপ্তাহে তিন দিন করিয়াও সেবন করান বাইতে পারে । ইহার উপাদান—

হরীতকী, পিপ্পলমূল, মরিচ, শুঠ, দারুচিনি, তেজপত্র, পিপ্পল, মুখা, বিড়ক, আমলকী, প্রত্যেকটি ২ তোলা । দস্তীমূল ৬তোলা, চিনি ১২ তোলা, তেউড়ীমূল ১৬ তোলা । মধু দ্বারা মর্দন করিয়া মোদক করিবে । মাত্রা ১০ তোলা । রাত্রি আহারের পরে নীতল জল সহ সেব্য ।

আমাশয়গত বায়ুর বিকারে—

প্রাতে রসোনপিণ্ড মাত্রা ১০ তোলা, অহুপান এরও মূলের কাথ ।

বেলা ৩টার বাতগজাহুণ—বেড়েলার কাথ ও মধু ।

সন্ধ্যায়—মহালক্ষ্মীবিলাস—পানের রস
ও মধু এইরূপ ব্যবস্থা হিতকর । শুগ্গুন্দু
মিষ্ট উষধও এইরূপ অবহার উপকারী ।
উহার মধ্যে আদিত্যপাক শুগ্গুন্দু, ত্রয়ো
দশাঙ্গ শুগ্গুন্দুর ব্যবস্থা করিতে পারা যায় ।
এ দুইটি ঔষধের একটি প্রয়োগ করিলে
রসোনপিণ্ড দিবার আর প্রয়োজন নাই ।

মর্দনের জন্য রসোনতৈল, সৈন্ধবাদ্য
তৈল, এবং মূলকাদ্য তৈল প্রশস্ত ।

নিম্নে এই আশাশ্রয়গত বায়ু বিকারের
মূলক ঔষধেরই উপাদান বলা বাইতেছে ।

রসোন পিণ্ড ।

পলমর্দ পলকৈব রসোনস্য শ্রুত্বিতম্ ।

হিঙ্গুজীরক সিদ্ধুথ সৌবর্জল কটু ত্রিকৈঃ ॥

চূর্ণিতৈর্মারিকোন্নানৈরবচূর্ণ্য বিলোড়িতম্ ।

রসুন ১২ তোলা শেষণ করিয়া তাহার
সহিত হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, মটল লবণ,
ভুট, পিণ্ডুল, মরিচ—ইহাদের প্রত্যেকের
চূর্ণ ১০ ছই আনা মিলাইয়া লইবে ।
রাশা ১০ তোলা ।

বৃহৎ বাতগজাক্ষুশ ।

পারদ, অত্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক,
শর্প, ভুট, বালা, ধনে, কটফল, হরীতকী,
বিষ, কাকড়াশুদী, পিণ্ডুল, মরিচ, সোহাগা—
প্রত্যেক সমভাগ । মূত্রী ও নিসিন্দা পাতার
রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী ।
অল্পপান আহার রস ; নিসিন্দা পাতা ও
আহার রস এবং মধু ।

মহালক্ষ্মী বিলাসো রসঃ ।

পলং বজ্রাক চূর্ণ্য তদর্ধং গন্ধকং ভবেৎ ।

তদর্ধং বক তন্মাপি তদর্ধং পারদং তথা ॥

তৎসমং হরিতালক তদর্ধং তাম্র তদ্বকম্ ।

রস সাম্যক কপূরং ভাতী কোবকমে তথা ।

বৃহদারক বীজক বীজং শর্প কলশ্য চ ।

প্রত্যেকং কার্ষিকং ভাগং যুতশর্পক শাণকম্ ॥

নিশ্চিন্তা বটিকা কার্য্য্য বিগুজা কল মানতঃ ।

অত্র ৮ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বক
২ তোলা, পারদ ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা,
তাম্র অর্ধ তোলা, কপূর, জৈত্রী ও জায় কল—
প্রত্যেক ১ তোলা, বৃহদারবীজ ও যুতুরা
বীজচূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা এবং শর্প অর্ধ
তোলা । সমস্ত দ্রব্য একত্র পানের রসে
মর্দন পূর্বক ২ রতি বটী ।

আদিত্যপাক শুগ্গুন্দু ।

এিঞ্চলা ও পিণ্ডুল—প্রত্যেক দ্রব্য ১ পল ।

দাকচিনি, এলাইচ—প্রত্যেক ২ তোলা, শুগ্গুন্দু
৫ পল । দশমূলের কাষে ৭ বার ভাবনা দিয়া
১০ ছই আনা মাত্রার বটী । অল্পপান গরম
জল ।

ত্রয়োদশাঙ্গ শুগ্গুন্দু ।

আতাপগন্ধা হবুশা শুড়্‌চী

শতাবরী গোকুর বৃহদারকম্ ।

রাশা শতাব্রা সপটী যমানী

সনাগরা চেতি সমৈশ্চ চূর্ণম্ ॥

তুল্যং ভবেৎ কোশিক মত্র-

মধ্যে দেয়ং তথা সর্পিরাধর্ষ ভাগম্ ।

বাবলার ছাল, অখগন্ধা, হবুশ (অতাবে
ধনে), শুলক, শতমূলী, গোকুর, বিড়ড়ক,
রাশা, শুলক, মটী, যমানী ও ভুট ইহাদের
প্রত্যেকটির চূর্ণ ১ তোলা, শোণিত শুগ্গুন্দু

১২ তোলা এবং হুঁত ৬ তোলা। এই সকল
জব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা
।০ আনা হইতে ২০ তোলা। অল্পপান করা,
মাংসাদির ব্যবহার, হুঁত বা উষ্ণ জল।

রসোন তৈল।

তৈল ১৪ সের। ১০ রসোন ১১ সের।
কাঁথার্ব—রসোন ১৮ সের। জল ৬৪ সের।
শেব ১৬ সের। পাকার্ব জল ১৬ সের।

সৈন্ধবাত্ত তৈল।

সৈন্ধব প্রেরণী রান্না শতপুন্না বমানিকা।
বাজিকা মরিচং কুঁঠং ওষ্ঠী সৌবচ'লং বিড়ম্ব।
বচাজমোলা মধুকং জীরকং পোকরং কণা।
এতান্যর্ক পলাংশানি প্লব্ধ পিষ্টানি কারয়েৎ।
প্রায়শ্চেষ্ট তৈলন্ত প্রস্থাতু শত পুন্নাভম্ব।
কাঙ্কিকং দ্বিগুণং লব্ধা ভবা মস্ত শনৈঃ পচেৎ॥

এবং তৈল ১৪ সের। কাঁথার্ব—সৈন্ধব,
গজপিপুল, রান্না, শুলকা বমানী, সাক্ষিমাটি,
মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচল লবণ, বিটলবণ, বচ,
বনবমানী, বটিমধু, জীরা, কুড়, ও পিপুল—
প্রত্যেক ৪ তোলা। শুলকার কাঁথ ১৪ সের,
কাঁজি ১৮ সের, দধির মাত্র ১৮ সের।

মূলকান্ত তৈল।

তৈল ১৪ সের। মূলকের বরস বা শুক
মূলার কাঁথ ১৪ সের। হুঁত ১৪ সের। দধি
১৪ সের, কাঁজি ১৪ সের। কাঁথার্ব—
বেড়েলার মূল, সৈন্ধব, চিতামূল, পিপুল,
আতাইচ, রান্না, চই, অগুরু, চিতামূল,
ভেলা, বচ, কুড়, পোকর, শুঁঠ, কুড়, শঠী,
বেলগুঁঠ, শুলকা, তগরপাছকা, দেবদারু—
মিলিত ১১ সের।

পকাশরগত বায়ুর বিকারে—

প্রাতে—বৃহৎ বাতচিক্তামনি

অথবা—চিত্তামনি চতুর্ভুধ

অথবা—বৃহৎ চিত্তামনি

ত্রিকলা ও মিছরির জল অথবা শতমূলীর

রস ও মধু। মধ্যাহ্নে আহারের পর হিজ্জাদি

চূর্ণ—জলসহ এবং বৈকালে বজ্রকার এক

আনার মাত্রায় মোরি ভিজান জল সহ সেবন

হিতকর। এইরূপ অবস্থার স্তম্ভিত সংহিতায়

কাণ্ড লবণ ও পত্র লবণ সেবনের বিধি

আছে। যদি এই দুইটা ঔষধের একটি

ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে হিজ্জাদি চূর্ণ

ব্যবহারের আর আবশ্যক নাই। নারায়ণ

তৈল, বৃহৎ বিষ্ণু তৈলের অভ্যঙ্গ এইরূপ

অবস্থার উপকারী।

(ক্রমশঃ)

বাঙালীর ধর্মের কারণ।

[ত্রিচূড়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে, “নির্লেশ হ’বার আগে মরে পৌজ”। এই প্রবাদ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, বাঙালী জাতির নির্লেশ হইবার আর বিলম্ব নাই। কারণ এ জাতির পৌজ পর্যায়ের ‘শিশুই’ অধিক সংখ্যার মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে—বাঙালীর বংশ ধারা বজায় রাখিতে হইলে এই শিশু মৃত্যু বন্ধ করিবার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। আমার বোধ হয় অজ্ঞাত বহু এরোজনীর কার্যের মধ্যে এই কার্যই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। কারণ যত কিছু বা’ হৃৎ-স্পন্দনের মত অব্যক্ত, সে সকলই জাতির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। কথায় বলে—“মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।” যদি জাতির অস্তিত্বই লোপ পায়—যদি বাঙালী হইতে বাঙালীর বংশধারা একেবারে মুহুরী হইয়া যায়, তাহা হইলে বাহিত সুখ-সম্পদ ভোগ করিবে কে? আগে বাঁচিবার চেষ্টা, পরে ভোগস্থলের অজ্ঞাত কথা। বাঁচিতে হইলেই—জাতিকে রক্ষা করিতে হইলেই আগে—শিশুরক্ষার যত্ন লইতে হইবে।

শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, তাহা দিগকে নিরোগ-শরীরে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অনেক কথাই প্রচার করা হইতেছে। এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে আঁতুড়ঘরের

দোষাদিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। হিন্দুর বাহা কিছু পুরাতন, সে সকলই নিন্দনীয়; তাই অজ্ঞাত বহুজাতির মধ্যে এও একটা নিন্দার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। তথাকথিত শিশুর অশ্রু-স্বরূপ হিন্দুর আঁতুড় ঘরের ব্যবহার মধ্যে কিছু দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু তবু বেন মনে হয়, এ অসুচীন আশা-প্রদ হইলেও, অসম্পূর্ণ ও অজ্ঞান। কেন এরূপ মনে হয়, সংক্ষেপে তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

এই আঁতুড় ঘর পূর্বেও এখনকার মতই ছিল; কারণ বর্তমানত’ পুঁতনেই অজ্ঞকরণ। পুঁতনের আদর্শ লটাই ত বর্তমান। সুতরাং বর্তমান আঁতুড় ঘরের অজ্ঞকরণ আঁতুড় ঘরে ন্যায় গ্রহণ করিয়াও সকালে ত এত শিশুমৃত্যু ছিল না। এখনও দেখি বঙ্গের পল্লীগ্রামে মধ্য বিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও পুঁতন প্রথা আঁতুড় ঘরই বর্তমান। সে সকল স্থানে শিক্ষিতা ধাত্রী ও শিক্ষিত ডাক্তারের মিতান্তই অভাব; কিন্তু তৎক্ষণি কলিকাতা অপেক্ষা ঐ সকল স্থানে শিশু মৃত্যুর হার অল্প। কেন এরূপ হয় ইহা কি চিন্তার বিষয় নহে? এক প্রকার আঁতুড়েই জন্মগ্রহণ করিয়া কোন কোন স্থানে শিশু মরে না, আবার কোন কোন স্থানে আরই মরে, সুতরাং আমরা শিশু মৃত্যুর কারণ বলিয়া কেবল আঁতুড় ঘরকেই দোষী করিতে পারি না। যদি কেবল আঁতুড়ঘরের দোষই এই হৃৎটনা

বাঁচত, তাহা দুইমে কল কর্তাই সমান দেখি-
তাম। কিন্তু তা' বধন দেখি না, তখন বৃদ্ধিতে
হইবে এই আঁতুড় ব্যতীত আরও কিছু আছে,
বাহাতে শিশু দুইটি হইবার পূর্ব হইতেই
রোগগ্রস্ত শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং
অল্প কারণেই রোগ হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই
মরে।

অবশ্য আমরাও যে আঁতুড় ঘরের উন্নতি
চাইনা তা' নয়। আমরা উন্নতি চাই, কিন্তু
পুরাতনের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া, পুরাতনকে
একেবারে বন্ধ করিয়া নহে। পুরাতন আচার
ব্যবহার এ জাতির বৈশিষ্ট্য মজ্জাগত, তাহাতে
এই চিরাচরিত দেশীয় প্রথাটাকে একেবারেই
যে সকলে বর্জন করিবে তাহাও বোধ হয় না।
আজকাল দেখিতে পাঠি, দেশীয় পুরুষগণ
উচ্চৈশ্বর্য সাধন করিতে পারিলেই এক প্রেণীর
সংস্কারকদলের যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
অত্যন্ত বিষয়ের ভায় এই শিশুপালন সম্বন্ধেও
আমরা এইরূপ অনেক কথা শুনিরাছি। কিন্তু
সে সকলের সবিশেষ আলোচনা এখানে আর
করিব না। তবে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে
পারি যে, যে প্রথাকে আমরা শিশুপালনের
পক্ষে অতুণযোগ্য বলিয়া প্রবণ করিতেছি,
বাস্তবিক কিন্তু সেই প্রথার প্রতিপালিত শিশু
এ দেশের শীতাতপ সন্তু করিবার শরীর লইয়া
বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার
বাজা নির্বাহ করিত। এখনকার মত শীত-
প্রধান দেশের আদর্শ প্রথার প্রতিপালিত
শিশু, ঠিক এদেশের উপযোগী শরীর পায় না;
সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রায় অকর্মণ্য
হইয়া পড়ে। সেকালের প্রথার প্রতি-
পালিত অনেককেই জানি বাহারা একালের

প্রথার প্রতিপালিত থোকা বাবুদের তুলনায়
অল্পত মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।

এই সকল দেখিয়াই আমরা বিশ্বাস করি-
না যে, কেবল মাত্র আঁতুড় ঘরের দোষেই
বা শিশুপালনের পূর্ব প্রথার জন্তই শিশুমৃত্যুর
হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। আমাদের
বিশ্বাস, এই শিশুমৃত্যুর মূলে আরও কোন
প্রবল ও গূঢ় কারণ বর্তমান আছে। সে
কারণ কি ?

বিশেষ লক্ষ্য করিলে বৃদ্ধিতে বিলম্ব হয়
না যে, বালকজনমীর শারীরিক অপূর্ণতা ও
দৌর্বল্য বশতঃই শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধিত
হইতেছে। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ-
গণের যে শারীরিক বর্ণনা প্রাপ্ত হই এবং
বৃদ্ধিগণের বৈশিষ্ট্য শ্রম সহিষ্ণু শরীর দেখিয়া,
তাহার তুলনায় এখনকার চশমা আঁটা-টেরি-
কাটা বাবুদের শারীরিক পার্থক্য যে কত
তাঁহা বোধ হয় বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না !
আমাদের পূর্বপুরুষগণের কথা এখনকার
কালে উপকথার মতই গালগল্প হইয়া পড়িয়াছে।
সেকালে তাঁহাদের অটুট স্বাস্থ্য ছিল, সুপুষ্ট
শরীর ছিল, সুতরাং তাঁহারা দীর্ঘায়ু হইয়া
সংসার সুখ উপভোগ করিতেন। আর এখন
তাঁহাদেরই বংশের কীর্ণপ্রাণ থোকাবাবুদের
দেখিলে মনে হয় কি এই সকল দুর্বলদেহ
মানবগুলি সেই বলিষ্ঠ বংশে জন্ম গ্রহণ
করিয়াছে ?

এই দৌর্বল্যের প্রমাণ ত সেদিনও প্রকাশ
হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বাহারা
বর্ধমানে হাঁটিয়া যাইতে পারিলেন না,
তাঁহাদেরই পূর্ব পুরুষগণ নিশ্চয়ই বণ্টার ২
মাইল পথ হাঁটিয়া বর্ধমান কেন, সুদূর কাশী-

ব্রহ্মাবনাদি তীর্থ করিয়া আসিতেন। তাহারা কিন্তু তথাকথিত উন্নত প্রণালীর জাতুর ঘরে ভ্রমগ্রহণ করেন নাই, সকালে উঠিয়া সর্বাঙ্গের চাতের মোতাজেও অভ্যস্ত হইয়া পড়েন নাই।

এই যে আমাদের জাতীয় দৌর্বল্য—এই যে আমাদের দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের পরিবর্তন ইহা এক দিনেও হয় নাই, এক কারণেও হয় নাই। নানাকারণে দিনে দিনে তিল তিল করিয়া এই ক্ষয় চলিয়া আসিতেছে। বেকার ভাবে এই ক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আর ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না। এখন ইহার উপর দৃষ্টিদানের অবসর উপস্থিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন অন্য যে ক্ষতি তাহার কথা আমি আর আলোচনা করিব না। কারণ এখন অনেকেরই “ম্যালেরিয়া” রোগের আশ্রয় দেখা বাইতেছে, এবং জন নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং আমি আর একটা দিক দেখিবার জন্য সকলকে অগ্রগোষ করিতেছি। ভরসা করি এ বিষয় সকলেই একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আমাদের বিবেচনার বাণ্যে ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই বেশের এই বর্তমান দুর্দশার মূল কারণ। বালচাপলা বশতঃই শরীর অপূর্ণ ও

জীবনী শক্তি ক্ষীণ হইয়া থাকে। সেই অপূর্ণ শরীর ও ক্ষীণ শক্তির সম্মান যথোপযুক্ত পরিপূষ্টি লাভ করিতে পারে না। সদাশোবে সেও আবার বাণ্যে অমিতাচারী হইয়া শরীর ও শক্তির অপচয় করিতে অভ্যস্ত হয়। এই সকল পুরুষের প্রজনন শক্তি কমিয়া যায়। তাই ঐ সকল পিতার পুত্রেরা অল্প অনিয়মেই রোগগ্রস্ত হয়, অথবা জাঁতুড়েই মরে। যেটি বাঁচে সে রুগ ও দুর্বল হইয়া কোন রকমে জীবনের ক’টামিন কাটাইয়া দেয় মাত্র। চুঃখের বিষয় বাসকর্ম্মের মত আজকালকার সত্তা গল্প উপকৃত্যসের পাঠিকা বালিকারাও সংযমহীন হইয়া পড়িতেছে। বেশের লোকেও তাহাদিগের সম্মুখে অসংযমের মনোজ্ঞানপ্রদীপ্তি আনিয়া দিতেছে। এই অসংযম ও চপল বৃত্তির জন্য তাবী জননীরা নানারূপ ব্যাধি ওষ্ট শরীর লইয়া সংসারে শ্রবিত হইতেছেন। সর্কনাশ এইখানেই। এসকল বিষয় তুলিতেও লজ্জা করে, শুনাতেও লজ্জা করে। কিন্তু আর লজ্জা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এখন কুৎসংকথা তুলিতেও হইবে, শুনাতেও হইবে। আর আজকালকার নব্য অসংযমী আর্টিষ্ট সাহিত্যিক ও ছবিওয়ালা মাগিকের সম্প্রদায় ও স্ববাধিকারিগণকে সতর্ক করিতেই হইবে। নতুবা এজাতের ধ্বংস অনিবার্য্য।



হোমে আয়ুর্বেদ ।

[শ্রীরামদহায় কাব্যতীর্থ-বেদান্তবাগীশ]

শ্রীভগবানের বা দেবতাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিসুখে প্রদত্ত যজ্ঞাহতি বা যজ্ঞ সত্ত্বত গমিষ ষিগ্জাদির আহতির নামই হোম । অগ্নিসুখেই দেবতার। ভোজন করেন ; অগ্নিসুখে মঙ্গল সহকারে প্রদত্ত আহতিই হবিঃ । এই হবিই দেবতাদের প্রিয় খাদ্য । এই হবিই অমৃত । এই হবিতোজন রূপ অমৃত পামেই দেবতা-শরীর বদ্ধিত । ইহা দ্বারাই দেবতার। ঐশালী । দেবতার। বলশালী না হইলেই অহর-গণের প্রোহর্ভাব কলে সৃষ্টির ক্ষতি । উপনিষৎ ও পুরাণাদ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া সম্বরণ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, এই হবি ব্যতীত দেবতাদের অত্র অমৃত নাই ।

উপনিষদে দেবতা ঐরাব্রহ্মণ্য । “ঐরাব্রহ্মণ্যেব দেবতাঃ” । অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবী, মন, বুদ্ধি, প্রাণ প্রভৃতিই দেবতা । প্রত্যক্ষ দৃষ্ট দেবতার। এই অগ্নিতে দত্ত আহতি না পাইলে দুর্কল ও শক্তিহীন হইয়া পড়েন । কুসিকন্দ, অগ্ন্যুৎপাৎ, ধুমকেতু, জগদ্রাঘন, ও অনাশ্রুটি এই সকলই অগ্নর । লোক রক্ষার্থে সৃষ্ট লোকগণ দেবতার। বাহাতে শক্তিশালী থাকেন, অগ্নরদের প্রোহর্ভাব না ঘটে, তাহার জন্য যতঃ প্ররতঃ বহু করা সকল মানবেরই অবশ্য কর্তব্য । এই হোমই দেব বজ্র । “হোম দৈবো” ।

এই হোম ত্রাঙ্কণের অবশ্যাস্থ্যের ধর্ম । টানিষদধ্যায়ীই হউন বা বৈদিকই হউন, সকলকার পক্ষেই হোম অবশ্যাস্থ্যের । “ত্রিষ্টম্ভিকৈত অগ্নি” “পঞ্চাগ্নি” উপনিষদের কথা । “অগ্নিহোত্রী” “আহিতাগ্নি” “সাগ্নিক গৃহস্থ” এই সকল শব্দাবলি দ্রষ্টব্য । আমাদের গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এবং বিহার (কুণ্ডিকা) প্রভৃতি সংস্কারে বৈদিক হোমরূপ দৈববজ্র অবশ্যাস্থ্যের । প্রাক, ব্রতপ্রতিষ্ঠা, গৃহপ্রবেশ, পুঙ্করিণী প্রতিষ্ঠা, বিয়াপারেও এই দৈববজ্রের নিয়ম । তান্ত্রিক দীক্ষা-পুরস্কারাদিতে তান্ত্রিক হোমের ব্যবস্থা । শাস্ত্রবৃত্তারন প্রভৃতি বহু স্তত কার্যেই হোম অবশ্য কর্তব্য ।

এই অবশ্যাস্থ্যের হোমরূপ কার্যে ব্যবস্থা করিয়া আমাদের স্তম্ভদণী শাস্ত্রকারগণ কি প্রকারে আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য সাধিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিষয়ে সন্তোষ হইতে হয় । “বিধিনিবেশে আয়ুর্বেদ” “সংস্কারতত্ত্বে আয়ুর্বেদ” “হোমে আয়ুর্বেদ” সকল ধর্মকাণ্ডেই আয়ুর্বেদ । বাবতীর খুঁটি নাটী পালনেও আয়ুর্বেদ ।

হোমে আয়ুর্বেদের এক অপূর্ণ ব্যাপার । হোমের মধ্য দিয়া এক অপূর্ণ নিয়মে আয়ু-

কর্মেদের মহোৎসব সাধিত হইয়া গিয়াছে। তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাইব।

প্রথমতঃ হোমের অগ্নি শিখা যে স্থান স্পর্শ করে, সেই স্থান মালিন্তশূত্র, নিষ্কলুষ সঙ্কলনময় ও পুণ্যমিত্ত হইয়া উঠে। আহুত অগ্নির স্পর্শকি ধূমে দূষিত ও কলুষিত বাতাস নিমেষেই নষ্ট হইয়া যায়। হোমীয় ঘৃত গন্ধে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, অজীর্ণ নষ্ট হয়, সঙ্কলন বর্ধিত হইতে দেখা যায়, তমোগুণ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হোমের তন্ত্র ললাটে লেপন করিলে শিরোগুণন আরোগ্য হয়, কাজলরূপে ব্যবহার করিলে চক্ষুরোগ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। সন্ধিস্থলে লেপন করিলে বাতব্যাধির ভয় দূর হয়। হোমের ভস্মে তিলক পরিয়া যে কি শোভা হয়—তাহা প্রত্যক্ষদর্শী অবগত আছেন। এক্ষণে বিশুদ্ধ গব্যদ্ব্যুতের দুগ্ধাপ্যতা এবং মহাব্যক্তির ফলে নিঃশ্রম হোম সাধারণের পক্ষে কষ্টকর এবং কঠিনসাধ্য হইয়াছে। অতীতকালে যখন গব্যদ্ব্যুত সুলভ ছিল, জীবিকানির্বাহ অতি সহজ ছিল—সে সময়ে নিত্যহোম সকলকার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত।

দেশের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বড় রকমের বজ্র অশুভিত হইত, তাহার নামই নৈমিত্তিক বজ্র। এই বজ্রে কত ব্যক্তিকেই বৃহৎ হোম-কুস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লেলিহান অগ্নিতে রাজ্যদিন আহুতি দিতেম। রাশি রাশি ব্রতাহুতি হইত, বিষপত্র সমিধাদি ভারে ভারে সংগৃহীত হইত। সেই বজ্রের অগ্নি যখন লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া উঠে প্রস্তুত হইত—সে এক অপূর্ব শোভা।

এই বজ্রের তপ্ত হোমশিখা উর্ধ্বে উষিত

হইয়া উপরিবর্ত্ত মেঘগুলির তীর্ষ বিধান করে, বিশৃঙ্খল এবং বিচ্ছিন্ন মেঘগুলিকে জমাট বাধিয়া দিয়া একটি বৃত্ত অবিচ্ছিন্ন বৃহৎ মেঘে পরিণত করে। আর মেঘগুলির তলদেশে এমন একটি তাপময় ঢাপ দেয়, যাহার কলে মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত অবশ্যজ্ঞাবী হইয়া পড়ে। ইচ্ছামত বৃষ্টিপাত করণ দেশের মধ্যে যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা এই অনাবৃষ্টি অতি-বৃষ্টি পীড়িত ইতিশক্তিষ্ট নয়নারী সকলেই অবগত আছেন। আর এই ইচ্ছামত বৃষ্টিপাত যজ্ঞের অধীন। সম্প্রতি যজ্ঞের কলে বৃষ্টিপাত হইয়াছে—ইহার নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে। অথৌ প্রাপ্তাহুতি সম্যক আদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যজ্ঞায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেয়ন্ত ততঃ প্রজাঃ।

যজ্ঞীয় ধূমের শক্তি অসীম। ইহা দূষিত ও কলুষিত বাতাস এবং রোগের বীজা ত নষ্ট করেই; তন্নিম্ন এই ধূম তরলতায় পতিত হইয়া তাহাদিগকে পত্রপল্লবে ভূষিত করে, অপর্যাপ্ত ফল ও পুষ্পের ভারে অবনত রাখে। এই ধূমের স্পর্শে পত্ররাশি নিমেষের মধ্যে অধিকতর শ্রাবল এবং চিঞ্চল হইয়া উঠে। এই ধূমের কলে ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। ভূমি “অকুপ্তে পচ্যাহব শস্যসম্পদ” সম্পৎশালিনী হইয়া উঠে।

এই যজ্ঞরাশির উর্ধ্বে প্রস্তুত শিখাই বজ্রমানকে স্বর্গমার্গ দেখাইয়া দেয়। আত্মা ঐ জ্যোতির্ময় শিখায় অবলম্বন করিয়া সেই শান্তিময় স্থানে বাইতে সমর্থ হয়।

হোমের দ্বারা যেমন ঐহিক লাভ, তজ্জন পরলোকেরও উন্নতি। শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের, আশ্রয়ের যেমন ঋদ্ধি বৃদ্ধি, আত্মারও ইহা সেইরূপই উপকারক।

বিষকাঠের অগ্নিতে সমস্ত বিষপত্র নিক্ষেপ করিয়া হোম করিতে অনেকেই দেখিয়াছেন। সেই স্রমধুর গন্ধে সেই গৃহ এবং গৃহের নিকটবর্তী স্থান সমূহ কি সুন্দর গন্ধে ভরপুর হয় তাহাও অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। গৃহের দোষ কাটাইতে এমন রসায়ন আর নাই। এমন কি হোমের শেষে পূর্ণহতিক্রমে দধ্ব বা অর্দদধ্ব রক্তা ভোজন যে গর্ভ দোষের নিবারক—ইহা সাধারণ্যে প্রসিদ্ধই আছে।

যাহারা অভ্যর্থ ব্যাধি কুখ্যামান্য প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেছেন—তাহারা যদি কিছু দিন নিরামিত ভাবে বিষপত্রে হোম অভ্যাস করেন, তবে তাঁহারা রোগ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবেন। সাবধান, হোম করার সময় মন্তকে উত্তরীয়টি উষ্ণরূপে বাধা চাইই চাই। ইহা কেবল যে শাস্ত্রেরই নিয়ম তাহা নহে, পরস্ত বড়ই উপকারক।

শিষ্যাগণের অর্বেক সময়ে আমাকে সহজে রন্ধন করিতে হয় এবং সময়ে সময়ে সমস্ত বিষপত্র দ্বারা হোমও করিতে হয়। হোম করিয়া বধেই সুখ ও স্বস্তি হয়—অগ্নির তাপে মন্তকে কোনরূপ কষ্টও হয় না। কিন্তু রন্ধন-কালে অগ্নি তাপে কষ্ট হয়, সময়ে সময়ে মাথা গরম হইয়াও উঠে। হোমায়িত্তে যে যে কামনা করিয়া আছতি দিবে, সে সেই ফল প্রাপ্ত হইবে—ইহাই আমাদের শাস্ত্র-বিশ্বাস। যাহারা ঐহিক সুখ প্ররাসী, স্বাস্থ্য-কামী তাহারা ঐ সুখ ও স্বাস্থ্যের অনুরোধেই হোম করিতে পারেন—তাহাতেও তাঁহাদের উপকার হইবে।

তাই বলিতেছি—আমাদের শাস্ত্রীর বিধি নিষেধে আয়ুর্বেদ, সংস্কার ওষে আয়ুর্বেদ, হোমে আয়ুর্বেদ, সকল খুটিনাটি পালনে আয়ুর্বেদ।

সুশ্রুতের সার্জারি।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত এইচ, এম, বি]

যাহারা সুশ্রুত সংহিতা ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মহর্ষি সুশ্রুতকে একজন পাকা সার্জন না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভারতবাসীর হৃদ্যাগ্রে ক্রমে সুশ্রুতের অত্র চিকিৎসা এখন, দেশীয় চিকিৎসকাদিগের মধ্যে হইতে লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন একদিন ছিল, যে দিন ভারতবাসীর

চিকিৎসকাদিগের নিকট হইতেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদগণকে মহর্ষি সুশ্রুত প্রবর্তিত অত্র চিকিৎসাকেই মূল ভিত্তি করিয়া অত্র চিকিৎসা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। এখনকার দিনে ডাক্তারি ও কবিরাজী—দুইটি নাম পৃথক ভাবে প্রচলিত হইলেও বিখ্যাত ব্রহ্মার মুখ হইতেই চিকিৎসা বিদ্যা নিঃসৃত হইয়াছিল।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র—সাম, ধর্ষ, বহু ও অধর্ষ—
এই বেদ চতুষ্টয়েরই অন্তর্ভুক্ত। অনাদি পুরুষ
ব্রহ্মা—প্রাণী সমূহের সৃষ্টির প্রারম্ভেই বেদের
সৃষ্টি করেন, আয়ুর্বেদও সেই সময়ে তাঁহারই
সৃষ্টি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদেরা তাহারই
শিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমোন্নতির সাহায্যে অধুনা
লোক সমাজে অদ্ভুত ব্যাপার দর্শাইতে সমর্থ
হইয়াছেন। সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসা
ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা মূলতঃ যে একই
চিকিৎসা—একথা বলিলে অসঙ্গত হইবে
না।

ডাক্তারিতেও অল্প চিকিৎসার বৈরূপ ভিন্ন
ভিন্ন যন্ত্রের আবশ্যক। আয়ুর্বেদেও যে
সেইরূপ—সুশ্রুত সংহিতাই তাহার প্রমাণ
দিতেছে। আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত যন্ত্র ও
যন্ত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। নিম্নে
আমরা তাহারই পরিচয় দিতেছি—

অস্ত্র। আয়ুর্বেদে যন্ত্র সর্ব সমেত
একশত একটি ইহারা মূলতঃ ছয় ভাগে
বিভক্ত, যথা, ১। স্বস্তিক যন্ত্র। ২। সন্দেশ
যন্ত্র। ৩। তাল-যন্ত্র। নাড়ী যন্ত্র। ৪। শলাকা
যন্ত্র। উপযন্ত্র। এই ছয় প্রকার যন্ত্রের মধ্যে
স্বস্তিক যন্ত্র চব্বিশ প্রকার, এই যন্ত্র অষ্টাদশ
অঙ্গুলি দীর্ঘ করিতে হয়। এই চব্বিশ
প্রকার স্বস্তিক যন্ত্রের নাম—সিংহ মুখ যন্ত্র,
বান্দ মুখ যন্ত্র, ভরঙ্গমুখযন্ত্র, বৃক মুখ যন্ত্র,
ভল্লুক মুখ যন্ত্র, বীণী মুখ যন্ত্র, বিড়াল মুখ যন্ত্র,
মৃগ মুখ যন্ত্র, এক্সারক (হরিণের ভায় পশু
বিশেষ) মুখ যন্ত্র, কাক মুখ যন্ত্র, কক মুখ যন্ত্র,
কুরুর (কুরো, কুরুল পক্ষী) মুখ যন্ত্র, চাস (নীল-
কণ্ঠ পক্ষী) মুখ যন্ত্র, তাস (শিক্রে পাখী) মুখ
যন্ত্র, শশপাতী (শরাল পাখী) মুখ যন্ত্র, উলুক

(হতুম পেচা) মুখ যন্ত্র, চিল্লি (চিল) মুখ
যন্ত্র, শ্রোন (বাক পাখী) মুখ যন্ত্র, গৃধ মুখ
যন্ত্র, ক্রৌঞ্চ মুখ যন্ত্র, ভূমিরাজ মুখ যন্ত্র,
অঞ্জলি (পক্ষী বিশেষ) মুখ যন্ত্র, কর্ণাবভ্রজন
(পক্ষী বিশেষ) মুখ যন্ত্র ও নন্দী মুখ যন্ত্র।

সন্দেশ যন্ত্র। ইহা দুই প্রকার।
এক প্রকার, কর্ণকারের সাঁড়ানীর মত এবং
তাঁহাতে খিল থাকে, ইহাকে সনিগ্রহ সন্দেশ
যন্ত্র বলে। অল্প প্রকার খিল বিহীন,
ক্ষৌরকারের সন্ন্যাস অঙ্গুরূপ, ইহাকে অনিগ্রহ
সন্দেশ যন্ত্র বলে। এই সন্দেশ যন্ত্র দৈর্ঘ্যে
১৬ অঙ্গুলি। এই যন্ত্র দ্বারা চর্ম, মাংস, শিরা
ও ন্নায়ুতে সংবিদ্ধ কণ্টকাদি বাহির করিতে
হয়।

শ্রোল যন্ত্র। ইহাও দুই প্রকার,
একটি মৎস্য তালের ভায় অর্থাৎ শব্দের ভায়
পাতলা ও বক্র, এক মুখ বিশিষ্ট এবং অপরটি
দুই মুখ বিশিষ্ট। এই যন্ত্র দ্বারা কর্ণ ও
নাসিকাদির মলাদি বাহির করিতে হয়। এই
যন্ত্র ১২ অঙ্গুলি লম্বা করিয়া প্রস্তুত করিতে
হয়।

নাড়ী যন্ত্র। এই যন্ত্র নানাবিধ
আকারে প্রস্তুত করিতে হয়। সাধারণতঃ
মুখ ভেদে ইহা দুই প্রকার, এক প্রকারের
একদিকে মুখ থাকে এবং অল্প প্রকারের দুই
দিকে মুখ থাকে। এই যন্ত্রসকল ছিদ্র
বিশিষ্ট। এই যন্ত্র দ্বারা দেহের স্রোতোগত
কণ্টকাদি শল্য বাহির করা হয় এবং শরীরের
মধ্যগত ফোড়া ও অর্শাদি রোগ পরীক্ষা করা
হয়। ইহা ভিন্ন এই যন্ত্র সাহায্যে দেহ মধ্যস্থ
কতাদিতে ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা এবং আর
ও নানারূপ কার্য সাধিত হইয়া থাকে।

শলাকা। ইহাও আটাইশ প্রকার। এই আটাইশ প্রকারের মধ্যে গণ্ডপদ বা কঁচোর মুখের অরূপ শলাকা বহু দুই প্রকার, শরপুত্র মুখের অরূপ দুই প্রকার, সর্পকণা মুখাকৃতি দুই প্রকার ও বড়িশ মুখাকৃতি দুই প্রকার। ইহাদিগের মধ্যে গণ্ডপদ মুখাকৃতি দুইটি অর্থাৎ ত্রণাদির শোষ বা নালী অথেষণে ব্যবহার করিতে হয়। শরপুত্র মুখাকৃতি দুইটি বৃহৎ কার্য অর্থাৎ ত্রণাদির মধ্যগত কোনো অংশ ছেদন পূর্বক তুলিবার জন্ত ব্যবহার করিতে হয়, সর্পকণাকৃতি দুইটি চালন কার্যে অর্থাৎ আঘাতাদি হেতু স্থানান্তরিত অস্থি প্রভৃতি চালনা করিয়া স্বস্থানে নিয়োজন্য এবং বড়িশ মুখাকৃতি দুইটি আহরণ কার্যে অর্থাৎ শরীর হইতে কণ্টকাদি কোনো বস্তু আহরণ পূর্বক বাহির করিবার জন্য প্রযুক্ত হয়।

আর কয়েক প্রকার শলাকা যন্ত্রের মধ্যে দুই প্রকার অর্দ্ধ খণ্ড মস্তুর দাইলের আকারের মত এবং অল্প আনত মুখ বিশিষ্ট। শ্রোতগত কণ্টকাদিশল্য ইহাদের দ্বারা বাহির করা হয়। ক্ষতস্থান পরিষ্কারের জন্ত তুলির মত ছয় প্রকার যন্ত্র নির্মাণ করা হয়, ইহাদের মুখে বা অগ্রভাগে তুলান জড়ান থাকে। হাতীর আকারে তিন প্রকার যন্ত্র নির্মাণ করিতে হয়, ইহাদের আকার হাতীর জায় এবং মুখ গঠন খলের অরূপ। এই যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষতস্থানে ক্ষার এবং ঔষধাদির প্রয়োগ করিতে হয়। ত্রণাদি দণ্ড করিবার জন্ত ছয় প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে তিন প্রকার জাম কলের জায় মুখ বিশিষ্ট এবং তিনটি অঙ্গুলের জায় বক্র মুখ বিশিষ্ট। নাসিকাদির

মধ্যগত আৰ তুলিবার জন্ত কলের আঁটির মধ্যগত শস্যের অর্দ্ধ খণ্ডের অরূপ এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। আর এক প্রকার শলাকা যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে এক প্রকারের আকার মাষ কলাইয়ের জায় স্থল এবং উহার দুইদিকে পুষ্পের মুকুলের মত দুইটি মুখবিশিষ্ট। এই যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুতে অঙ্গন প্রয়োগ করিতে হয়। আর এক প্রকার শলাকা যন্ত্র আছে— তাহার মুখের অগ্রভাগ মালতী পুষ্পের বোটার জায় স্থল ও গোলাকার। এই যন্ত্র দ্বারা মূত্রমার্গ, যোনিদ্বার ও লিঙ্গনাল পরিষ্কার করিতে হয়।

উপযন্ত্র। ইহা পঁচিশ প্রকার। রজ্জু, বেণীকা, পাট, চর্ম, বস্ত্র, লতা, বস্ত্র, অষ্টীলাশ্ম, মুদগর, হস্ততল, পদতল, অঙ্গুলি, জিহ্বা, নখ, চুল, মুখ, অশ্বকটক (ঘোড়ার মুখ সংলগ্ন লৌহ বলয়) বৃক্ষ শাখা, জীবন (খত), প্রবাহন (বমন, বিবেচনাদি), চর্ষ (সন্তোষজনক দ্রব্যাদি) অন্নকাস্ত (পাষণ বিশেষ), ক্ষার, অগ্নি ও ঔষধ।

শস্ত্র। ইহা বিংশতি প্রকার। মণ্ডলাগ্র, করপত্র, —বুদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপল পত্র, অর্দ্ধধার, হুচ, কুশপত্র, আটীমুখ, শরীরী মুখ, অস্ত্রমুখ, ত্রিকণক, কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেনস পত্রক, বড়িশ, দন্তশঙ্খ ও এবণী।

নান্য প্রকার শস্ত্রের পরিচয়। মণ্ডলাগ্র ও করপত্র (করাত) নামক অস্ত্র ছেদন (কর্তন) ও লেখন (আঁচড়ান বা ছাল তোলা) কার্যে ব্যবহার করিতে হয়। বুদ্ধি পত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা,

কিংশপ পত্র ও অর্দ্ধধার নামক পাঁচ প্রকার অস্ত্র—হেমন, ভেদন ও লেখন কার্যে ব্যবহার করিতে হয়। স্থচী (স্থঁচ), কুশপত্র, আঢ়ী-মুখ, শরারী মুখ, অস্ত্রমুখ, ও ত্রিকুণ্ডল নামক ছয় প্রকার অস্ত্র—বিস্রাবন কার্যে অর্থাৎ ব্রণাদি হইতে—পুণ রক্তাদি নিঃসারণ করিবার অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। কুঠারিকা, ত্রীহি মুখ, আরা, বেতস পত্র ও স্থচী—এই পাঁচ প্রকার অস্ত্র—ব্যধন কার্যে অর্থাৎ কোনো স্থান বিদ্ধ করিবার অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। বড়িণ ও হস্তশলু নামক অস্ত্রদ্বয়—আহরণ কার্যে অর্থাৎ শরীর হইতে কোনো শল্য আহরণ পূর্বক বাহির করিবার অস্ত্র ব্যবহার্য। এবণী অস্ত্র—এষণ কার্যে অর্থাৎ দেহ মধ্যগত কোনো বস্তু আবেষণ করিবার অস্ত্র এবং অনুলোমন কার্যে

অর্থাৎ কোনো দ্রব্য উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে আনিবার অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। স্থচী—অস্ত্র—শরীরের কোনো অংশ স্লেই করিবার অস্ত্র ব্যবহার্য।

এই সকল অস্ত্র ক্রিপণ ভাবে বালক, বৃক, য়া ও শিশুর শরীরে প্রয়োগ করিতে হয়, কোন অস্ত্র কাহার শরীরে প্রয়োগ করা উচিত নহে—সে সকল পৰিচয় সুশ্রুত অতি সুন্দর রূপেই দিয়াছেন, আমরা এখানে আর সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয় দিয়া পুঁপি বাড়াইব না। এখনকার দিনে ডাক্তারি অস্ত্র চিকিৎসা সমুন্নতি লাভ করিলেও আর্য্য ঋষি এক সময়ে এ সম্বন্ধে ক্রিপণ গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র এখানে প্রদান করিলাম।

ওলাউঠার কারণ নির্ণয়।

—:o:—

ওলাউঠার কারণ বহুতর, এবং তাহাদের কার্য অনেক সময়ে যুগপৎ ও মিশ্রভাবে হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণকে তিনটি মূখ্য শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা;—

প্রথম। ব্যাপক (Epidemic) কারণ, যথা সৌর উত্তাপ; শীতোকতার অতিমাত্রা; বিভিন্নতা; বায়ু মণ্ডলস্থিত তড়িৎ; ওজোন (ozone) বা ভ্রাণকের অভাব; বিষবায়ু (Malaria)।

দ্বিতীয়। ভৌম (Telluric) কারণ,

যথা, অনুপদেশ বা নিম্নভূমি। তৃতীয়। দৈনিক (Endemic) কারণ যথা,— তীর্থাদি উপলক্ষে দূর যাত্রা; হৃগ্নক উত্তাপ (Effluiria); অপরিষ্কার জল; অপকৃত খাদ্য ও অতিভোজন; দস্তোদাম অস্ত্র উপদ্রাব; বিবেচক ঔষধ; স্তরা; স্নায়বোত্তেজক অর্থাৎ বায়ুহৃদিকারক; মন-সিক আবেগ; রাত্রিগত কাল প্রভাব বিশেষ; এক ব্যক্তির এবং এক জাতি বারংবার আক্রান্ত হইবার প্রবণতা।

সৌর উত্তাপ। ওলাউঠার উৎপাদন

* এই একটি একজন এম, বি ডাক্তারের লিখিত একটি ইচ্ছাতে যে সকল বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আলোপ্যাথিক বৃত্তিই বর্ণিত। অংস।

সবচেয়ে স্বর্ষোত্তাপের যে বিশিষ্টরূপ প্রত্যক্ষ আছে; ইহা এক প্রকার সর্কবাসিসম্বত। সমশীতোষ্ণ দেশে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই ছয় মাসেই ওলাউঠা বেশী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে, বৎসরের সকল সময়েই ওলাউঠা হইতে দেখা যায়; যে সময়ে স্বর্ষোত্তাপ খুব বেশী হয়, তাহার প্রায় কয়েক সপ্তাহ পরে বায়ুমণ্ডলে ঐ উত্তাপ-বিক্যের প্রভাব বলবান হইয়া থাকে; যে সকল ব্যাধির শ্রীবৃদ্ধি পক্ষে অতিরিক্ত উষ্ণতা আনুকূল্য করিয়া থাকে, তাহারা প্রায় উত্তাপাবিক্য হওয়ার কিছুকাল পরে প্রভাব প্রকাশ করে।

শীতোষ্ণতার অতিমাত্র বিভিন্নতা। যদিও ওলাউঠার উৎপাদন পক্ষে উষ্ণতাধিক্যের প্রয়োজন হয়; পরন্তু এই উত্তাপ-বাহুল্যের সহিত যখন প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উষ্ণতার চূড়ান্ত পরিমাণ ও শৈত্যের চূড়ান্ত পরিমাণ এই দুইয়ের মধ্যে অত্যন্ত বেশী তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সময়েই এই রোগের বেশী প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

বায়ুমণ্ডলের শুষ্ক ও স্বচ্ছতাও ওলাউঠা বিকাশের অনুকূল; কিন্তু ইহাও অতিশয় শীতোষ্ণতাসত্ত্বের সহবর্তী অবস্থা মাত্র। মেঘচ্ছন্ন দিনে দিবাভাগ ঠাণ্ডা থাকে, এবং রাত্রিভাগ অপেক্ষাকৃত গরম থাকে। অত্র দেশের কথা ছাড়িয়া, আমাদের এই বঙ্গদেশে বর্ষার কয়েক মাসে, উত্তাপমান, যদিও গড়ে ৮৩ অংশ থাকে, তথাপি, ওলাউঠার, মৃত্যু-সংখ্যা কম হইয়া থাকে। এপ্রিল, ও মে মাসে যদিও ৩ মাত্র উষ্ণতা বাড়ে, তথাপি

ঐ দুই মাসে ওলাউঠার মৃত্যুসংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি হয়।

শুক বায়ু, প্রচণ্ড ও গ্রীষ্ম ও শীতোষ্ণতার অতিমাত্র অন্তর, ওলাউঠার উৎপাদন পক্ষে অনুকূল অবস্থা; আর আর্দ্র বায়ু, প্রচণ্ড উত্তাপ, শীতোষ্ণতার অল্পমাত্র অন্তর তৎপক্ষে নিতান্ত পতিকূল। কিন্তু শীতোষ্ণতার অন্তরের সহিত যত, বায়ুর শুষ্কতা ও আর্দ্রতার সহিত ওলাউঠার কার্যাকারণ সম্বন্ধ তত নয়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যদিও মধ্যে মধ্যে শুষ্ক গ্রীষ্ম সময়ে ওলাউঠা দেখা যায়; কিন্তু অধিকাংশ মড়ক বর্ষার সময়েই হয়। শীতোষ্ণতার অতিমাত্র তফাতের দ্বারা যে উদর পীড়া হইবার সম্ভাবনা, তাহার প্রমাণ স্থলে আর একটি দৃষ্টান্ত দেখান যাউতে পারে। সমতল হইতে দাক্ষিণ্য, সিমলা প্রভৃতি পাহাড়ের উপর উঠিলে, অনেক সময় উদরাময় হইতে দেখা যায়। কিন্তু এখানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, কখনও কখনও অত্যন্ত শীতালিক্যের সময়েও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ১৮৬৬ সালে কুসিয়ার রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গে প্রচণ্ড শীতের সময়ে একবার ওলাউঠার মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা বেশী হয় নাই। ১১ হাজারেরও অধিক লোকে আক্রান্ত হয়, ২৭০০ আত্মজ মবে।

বায়ু মণ্ডলস্থিত তাড়িত। মায়াব্য জ্বল যে বিশ্বব্যাপী তাড়িতের রূপান্তর মাত্র, ইহা প্রায় দেহতত্ত্ববিৎ মাত্রেরই স্বীকার করিয়া থাকেন। ওলাউঠাকে যদি বায়ু মণ্ডলের ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে, তাড়িতের পরিবর্তন বিশেষের দ্বারা যে উহার

উৎপাতের আতঙ্ক হইবে, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না; অপিচ উত্তাপের সহিত যে তাড়িতের সন্ধ আছে, তাহার নির্যাস দেখ, গ্রীষ্মকালে যেদিন বত গরম হয়, সেদিন প্রায়ই দিবাশেষে মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রপাত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যমণ্ডলার ব্যাধির সহিত যে বায়ু মণ্ডলস্থিত তাড়িতের সন্ধ থাকে সম্ভব, [তৎপ্রতিপাদনার্থ ডাক্তার চার্চ' ছিল প্রণীত স্বাক্ষরবিদ্যা বিষয়ক পুস্তকে প্রসবাস্তিক আক্ষেপ রোগ সন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহার মর্শ্বোন্মেষ করিতেছি। তিনি অনেকবার গ্রীষ্মের সময়ে এবং যৎকালে মেঘসকল বৈদ্যুতিক জবে পূর্ণ আছে আকাশের তাব দেখিলে বৃষ্টি-বজ্রপাত হইবে কি—এই কতক্ষণ হইয়া গিয়াছে, বলিয়া বোধ হইয়াছে এই রকম সময়ে এই রোগ অনেকগুলি হইতে দেখিয়াছেন। তন্নিম্ন অনেক চিকিৎসকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে যখন ইহা উপস্থিত হয়, তখন একেবারে কতকগুলি প্রসবাস্তিক আক্ষেপের কেস (case) হইয়া থাকে, যেন কোন বিশেষ বহুবাণী কারণের উপর তাহার উৎপত্তি নির্ভর করে।

করানী বিদ্রোহের পর যৎকালে প্যারী নগরের সমস্ত হাসপাতাল আহত ব্যক্তিতে ভরা ছিল, সেই সময় একদিন প্রচণ্ড বজ্রাবাত হয়। সেই দ্রব্যোগের সাক্ষিতে সকল হাসপাতালেই মৃত্যুসংখ্যাও পূর্বের ও পরের সকল দিন অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল।

অপিচ, বিদ্রোহাহত ব্যক্তিদিগের ওলাউঠার প্রায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ত্রম, মুছা, কর্ণনাশ, বধিরতা, আক্ষেপ—স্বাস্থ্য ও পৌষগুনিক উত্তরবিধ—

এ সমস্তই দৃষ্ট হয়। খানকৃত, স্বাস্থ্যপ্রদোষ নিশীড়ন, উত্তরবিধে নিশীড়ক ব্যাধি, এগুলিও নিতান্ত বিরল নহে। এই অবস্থার বর কীণ ও লুপ্ত ওলাউঠার শোষণ লক্ষণও কখনও কখনও উপস্থিত হইয়া থাকে। বমন সচরাচরই। নির্গত হইতেও দেখা যায়। "উদরাগ্নান," অল্প সমূহের টুকিমিৎ সঞ্চরণ ও আক্ষেপিত সঙ্কোচনের দ্বার সঞ্চরণ এগুলি প্রায়ই দেখা যায়। তন্নিম্ন বারবীর তাড়িতের বতগুলি লক্ষণ উৎপন্ন করে, তন্মধ্যে অতীসারই অধিকস্থলে দেখা যায়। কারম্যান কতকগুলির পক্ষীর শরীরে তাড়িত প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাহার সর্বাঙ্গেই মলত্যাগ করে এবং অধিকক্ষণ বিদ্যুৎ প্রয়োগ করিতে থাকিলে মল ক্রমশঃ তরল হইয়া পরিণেবে জলবৎ হয়। মুত্রাঘাত (uremia) সচরাচরই হইয়া থাকে।

আঘাত মাত্র বিদ্রোহাহত ব্যক্তির সম্পূর্ণ হিমাক্রাবস্থা (collapse) উৎপন্ন হয়, এবং এই অবস্থা বহুক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে। নাকী কখনও ক্রীণা, কখনও অনমুভাষ্য (imperceptible); কচিং কোমলা ও সহজে দমনীয়া, কখনও বা এই সকল লক্ষণ যুক্ত থাকে এবং ক্রান্ত হয়। পরন্তু অধিকাংশ স্থলে বিলক্ষণ মন্দাই দৃষ্ট হয়। কখনও কখনও স্থল্লমধ্য লোপিনী এবং বিক্লিষ্ট হইতে থাকে, তৎসঙ্গে শরীর শীতল—তুষারবৎ—বিশেষতঃ হাত পা যে ঘর্ষ থাকিলে উহা শীতল ও পিচ্ছিল হয়।

কতকটা সময়—প্রায়ই কয়েক ঘণ্টা পরে এই অবস্থানাবস্থা হয়, তাঁর পর ইহার শেষে

প্রতিক্রিয়ায় উপস্থিত হয়। এই প্রতিক্রিয়া
দ্যুনাধিক পরিমাণে প্রবল ও দ্রুত থাকে।
তখন নাকী ক্ষতগতি সম্পূর্ণ ও কঠিন হয়।
কারোত্তাপ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, অবশেষে
অগ্নিবৎ হয় এবং কখনও কখনও রোগী
প্রচুর ঘর্ষে ম্রাত হইয়া উঠে। এই জ্বর
সঙ্করই উপস্থিত হইয়া নিদ্রাংশ হয়। কিন্তু
হল বিশেষে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও প্রবল
হইয়াও উঠে ও তৎসঙ্গে অল্প উপসর্গেরও
যোজন্য হয়।

ডাক্তার ম্যাককার্শন তাঁহার পুস্তকে
লিখিয়াছেন যে, ১৮৬৬ সালে বংকালে
সেন্টপিটার্সবার্গে ওলাউঠার মড়ক উপস্থিত
হইয়াছিল, তখন কম্পাসের কাঁটা নৈসার্গিক
আকর্ষণের অঙ্গুগামী হইত না, এবং যে চুম্বকে
প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি পঁচাত্তর পাউণ্ড ভার ধারণ
করার কথা, তাহার শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হইতে
হইতে, শেষ রোগের বধন বড় প্রাচুর্য্য, তখন
উহার ১৫ পাউণ্ড মাত্র ভার ধারণের শক্তি
ছিল। আবার রোগ যেমন কমিতে লাগিল,
উহার শক্তিও তেমন বাড়িতে লাগিল।
অবশেষে উহার পূর্ব শক্তি পুনরায় প্রত্যাগত
হইল। ১৮৪৯ সালে, আরাল্যাণ্ডে যে মড়ক
হয়, তাহাতেও এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল।
অপিচ, অনেক সময়ে প্রচণ্ড বজ্রবাত হইয়া
গেলো তারই পরে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে,
ইহা অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া
থাকিবেন। এরূপ ঘটনা হাসেসাই হয়, যখন
ওলাউঠা ব্যাপকাকারে বিস্তৃত নহে।

বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ল্যালেট পরে ডাক্তার
জে, এল এটকিনসন একবার লিখিয়াছেন যে,
ওলাউঠা রোগীর হিমাবাহার অধিকতর

কমল জড়াইয়া রাখিয়া তাহার পরে অধিকতর
তাহার শরীর স্পর্শ করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
বৈদ্যুতিক রাশি অঙ্গুলির অগ্রভাগের সহিত
চট্ চট্ করিয়া বহির্গত হয়। আমরা এরূপ
কখনও হইতে দেখি নাই। এবং আর কেহ
দেখিয়াছেন, এমনও শুনি নাই।

ওজোন (Ozone) বা জ্বালকের
ন্যূনতা। যখন যে প্রদেশে ওলাউঠার
প্রাচুর্য্য হয়, তখন সেখানে জ্বালকের অভাব
লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং বায়ুশূন্যে জ্বালকের
আধিক্য হইলেই প্রায়ই প্রোভ্যার ব্যাপক
রূপে প্রকাশ পায়।

বিষ বায়ু (Malaria)। বস্তার পর
যখন জল কমিতে আরম্ভ হয়, তখনই
ম্যালেরিয়া বা বিষ বায়ুর উদ্ভব হয়, ইহা
অনেকেই বলিয়া থাকেন। যে গ্রামে বস্তার
জল উঠে, সেখানে হয় জ্বর, নয় ওলাউঠা,
হয় তো দুইটাই এক সঙ্গে কিংবা একটি
আগে একটি পরে হইয়া থাকে, ইহা এক
প্রকার জানা কথা। ডাক্তার ওয়াইজ পূর্ব
বঙ্গ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, বংকালে আমাতীয়ার
ও জ্বর জল প্রদেশে খুব প্রবল, তখন প্রত্যা-
বর্তনশীল মেঘলার চড় সীমান্তে—ওলাউঠা
সর্বনাশ করিতেছিল। তাদৃশস্থলে অরুণে
যদি কোনস্থানের আমদানী না বলি
তো ওলাউঠাকে তাহা বলিবার কোনও
কারণ নাই। নিম্ন বঙ্গে ভাদ্র মাসে বজ্র পুরু
হয়, এবং আশ্বিন-কার্তিক মাসে শুকাইতে
থাকে। ওলাউঠার মৃত্যু সংখ্যা যে ঐ সময়
বরাবর বেদী হয়, ইহাও তাহার একটি
কারণের মধ্যে ধর্তব্য।

বিষ বায়ু জনিত জ্বর প্রারণঃ কম্পজ্বরা

কারে প্রকাশ পায়। অনেকে হৃৎপিণ্ড ও
 ওলাউঠার তুলনা করিয়া থাকেন। কখনও
 কখনও এক প্রকার অর কোনও কোনও
 স্থানে হইতে দেখা যায়। তাহাতে সর্বাগ্রে
 শীত হইয়া, পরে শীত বা হরিৎবর্ণ পিত্ত বমন
 ও রেচন হইতে থাকে এবং উদরে ব্যথা হয়।
 অল্পকালের মধ্যেই মুখশ্রী বিশীর্ণ হয়। চক্ষুদ্বয়
 বাসিয়া যায় ও তাহাদের চারি পাশে গর্ত হইয়া
 অর বাসিয়া যায়। অধঃ পালাজর নামক এক
 প্রকার অরে সন্ধ্যা শরীর নীলবর্ণ ও শীতল হইয়া
 যায়। পিত্তা স্থূল ও সরস কিন্তু তুষার শীতল
 হয় এবং তৎসঙ্গে আভ্যন্তরিক দাহ ও দারুণ
 পিপাসা উপস্থিত হয়। নাড়া স্থল স্রবৎ
 এক একবার মাত্র পাওয়া যায়, কিছুকাল
 পরে একেবারেই থাকে না। মূত্রস্রাব বিরুদ্ধ
 হয়, পায়ের ডিমে ও কোমড়ে বহুগাজনক খিল
 খরিতে থাকে, এবং রোগী ক্রন্দন ও চীৎকার
 করিতে থাকে। রোগীকে হৃৎশূলে ধরে,
 তাহার দম আটকাইয়া আইসে।
 বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশে কসিয়া ধরে, রোগী
 শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। উৎকর্ষাকুল
 হইয়া ছট্-ফট্ করিতে থাকে, তাহার উপর
 আবার সর্পকণ বমন ও ভেদ। শ্বাস ক্রিয়া
 উত্তরোত্তর ক্রম্ভু সাধ্য হইয়া পড়ে এবং ক্রমে
 ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। হৃদৌর্ধ্বা ক্রমেই
 বর্ধিত হইতে হইতে থাকে এবং হৃদয়ের
 আঘাত আর টের পাওয়া যায় না, শীতল
 ঘর্মে রোগীকে ভাসাইয়া দেয় এবং সে দম
 আটকাইয়া পঞ্চদ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই
 ক্রমান্বয়ে মধ্যেও তাহার জ্ঞান প্রায়
 অক্ষুণ্ণ থাকে। আর যদি রোগী না ধরে,
 তবে হঠাৎ প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হয়। নাড়া

অরে অরে দেখা দিতে থাকে, চরম সহজ বর্ণ
 ও নরম হইতে থাকে। হৃদয়ের মূল মূল
 গতি ক্রমশঃ নিরমিত ও শ্রবণ গোচর হয়।
 শ্বাস সহজ ও ক্রমে দীর্ঘ হইতে থাকে।
 মুখের শব্দকতিব ঘুচিয়া যায়, বসি আর হয়
 না এবং ভেদ একেবারে থামিয়া যায়। যদি
 প্রতিক্রিয়া বেশী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে
 অনেক সময়ে বিকল্প লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া
 থাকে। এই অরের ওলাউঠার সঙ্গে অনেক
 সাদৃশ্য আছে তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে,
 কিন্তু প্রভেদও আছে। ইহাতে বেজবোর
 স্রাব হয়, তাহা শীত হরিৎ বা পিত্ত মিশ্রিত ;
 ওলাউঠার আশ্রাব তত্বুলোদকবৎ। ওলা-
 উঠার মুখের চেহারা বত বিকৃত হইয়া যায়,
 এ অরে তত হয় না। কলিকাতার একবার
 এইরূপ ওলাউঠাধর্মী অর হইয়াছিল।
 হিবনী অঞ্চলে অনেক সময়ে ঠিক ওলাউঠার
 লক্ষণ লইয়া অরের আবেশ হয়। এমন কি
 প্রভেদ করা কঠিন হয়।

আনুপ বা নির ভূমি। লণ্ডন নগরে এক-
 বার ওলাউঠার মড়ক হইয়াছিল। ডাক্তার কার
 অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে সহরের
 যে ভাগ বত বেশী উচ্চ, সেই ভাগে মৃত্যু সংখ্যা
 তত কম হইয়াছিল। সমুদ্র সীমা হইতে যে
 সকল স্থান অল্প, নদীতীরস্থিত স্থান সকল,
 এবং নদীমুখ সন্নিকট স্থান সমূহ ওলাউঠার
 প্রিয় বিহার স্থান। নিরভূমি অপেক্ষা পার্বত্য
 স্থানে ওলাউঠা কম হইয়া থাকে। তথাপি
 দার্কিলিং সিরলা সহস্রি প্রভৃতি শৈলনগরীও
 ইহার উৎপাত বিলক্ষণ সহ করিয়া থাকে।

তীর্থাদি উপলক্ষে দূর বাত।—ভূয়োদর্শন
 বারা ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা অসংখ্য হইয়া-

ছেন যে ভারতবর্ষে গোরা ও সিপাহী উভয় জাতীয় সৈনিকদিগের মধ্যে শিবিরে অবস্থান কালের অপেক্ষা যত্নবান কালে মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে। জগন্নাথ-স্বাক্ষরদিগের মধ্যে বৎসরে বৎসরে অনেকেই ওলাউঠার কাল কবলিত হন। যেখানেই ত্রীর্ঘদর্শনোপলক্ষে জন সমাগম বেশী হয়, সেখানেই ওলাউঠার প্রভুত্ব দেখা যায়। মক্কা নগরেও হজ উপলক্ষে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে কলেরা প্রায়ই দেখা দেয়।

হুর্গক উদ্বাপন। ইহা ওলাউঠায় উৎপত্তি বস্তুতম কারণ। সত্য বটে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক স্থান এই রোগের আক্রমণ

হইতে অব্যাহত থাকে; কিন্তু পাইথানা, গাড়ী, নর্দমা, পচনশীল জাতীয় ও উদ্ভিদ আবর্জনা অথবা মানব দেহগত পদার্থ নিচয়ের একত্র অতি সমাবেশ যে স্থানে থাকে, সেই সেই স্থানে যে ওলাউঠা সমধিক মারাত্মক ও সমধিক ব্যাপ্তিশীল হয়, তাহা অনেকবার দেখা গিয়াছে।

অবিশুদ্ধ জল। ইহা যে ওলাউঠার একটি কারণ তাহা ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে। অবিশুদ্ধ জলপানে যে ওলাউঠা বোগ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে সর্ব দেশের চিকিৎসকগণ একমত। সত্যবাং উজায় সবি-স্তাব বর্ণনার আবশ্যকতা নাই।

বাবুমহলে হার্টফেল ।

শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ।

(পূর্বানুবর্তী)

—:১০:—

এক একখানি আস্ত, নিখুঁত, নিরেট, শক্ত, মারবান্ শকটিন ইষ্টক বা প্রস্তরের উপর আর একখানি স্থাপন করিয়া কালক্রমে একটা সুবৃহৎ অট্টালিকা বা সুদৃঢ় দুর্গ নির্মিত হয়। ক্ষীণ, দুর্বল, ছাতাপড়া নোনাধরা, হীনকো, ইট, কাঠ, পাথর দিয়া কি মজবুদ প্রাসাদ গড়িত হয়? কখনও না। সেইরূপ জাতীয় সৌখ্যের উপাদান স্বরূপ ব্যক্তিগত জীবন উন্নত না হইলে কি জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর? প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের চরমোন্নতি কালে প্রত্যেক ব্যক্তি অসাধারণ শৌখিন্যবী

সম্পন্ন মহাপ্রাণ তেজস্বী ছিল। প্রাচীন পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল গ্রীসের অন্তর্গত প্লাটা নগরের প্রত্যেক অধিবাসী দৃঢ়কার সংযতেন্দ্রিয় মহা পরাক্রমশালী অমিত তেজা বীরপদবাচ্য ছিল। এখনও ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি সুসভ্যদেশে যুবকবৃন্দের দৈহিক উৎকর্ষের প্রতি যথোচিত মনোনিবেশ করা হয়—আমাদের দেশের মত খোদার নোকা দছে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। আশ্রয় সংঘম, কঠোরতা, ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না পড়িলে ভারতের জাতীয়

সৌধ কখনও মাথা তুলিতে পারিবে কি না ঘোর সন্দেহ স্থল ।

ইতঃপূর্বে মাংস, মেদ, মজ্জা সম্বন্ধে অনেক বাক্যব্যয় করিয়াছি । এখন এক বার বাবুদের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া প্রাণে বা দিয়া দেখি, ফাটা হাঁড়ির মত বেহুরো কি না । এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই আমার পল্লীর কথা মনে হয় । যখন এতগুলো পল্লী চোখের সান্নে তিল তিল করিয়া মরিতেছে, তখন বাঙ্গালীর হৃদয় আছে আর কোন মুখে বলিব ? লোকে বলে, বাঙ্গালী মাছ খায় বলিয়া এত মেধাবী ও বুদ্ধিমান । এখন বলিয়া দিবেন কি, বাঙ্গালী কি খাইলে ও কিরূপ শিক্ষা পাইলে হৃদয়বান হয় ? আমরা যে দিন দিন স্বার্থপর, শুষ্ক প্রাণ ও হৃদয়হীন হইয়া বাইতেছি, ইহার উপায় কি কেহই নির্দেশ করিবেন না ? কিরূপ খাদ্য খাইলে আমাদের মজ্জার জোর বাঁধে, এবং হৃদয়ে বল ও সাহস হয় তাহা বলিতে আর বেশী বিলম্ব করিলে চলিবেনা । এমন ধর্ম্মনীতি এখন শিথিতে হইবে—যাহাতে প্রাণে উদারতা ও পরার্থপরতার বিমল উৎস খুলিয়া যায় । পাস করিয়া হাতে ঘড়ি ও নাকে চশমা দিলেই কি দেশের উন্নতি হয় ? প্রতি বৎসরই ত কতশত পল্লীবাসী যুবক লেখাপড়া শিখিয়া চাকরী পাইতেছেন, কিন্তু পল্লীব তাঁহার কোন উপকারই করিলেন না । পল্লীর জন্ত তাঁহাদের প্রাণ কান্দিল না । তাই বলি, শিক্ষাতে অনেকেই পাইলেন, কিন্তু দেহ সুগঠিত ও তৈয়ারী হইল কয় জনের ? এমন শিক্ষা এখন চাই যাহাতে বাঙ্গালীর দেহ ও প্রাণ সমুদ্র হয়—শরীরে শক্তি সামর্থ্য হয় এবং

হৃদয়ে প্রেম-ভক্তি-দয়া ও উপচিকীর্ষা আগিয়া উঠে । বিদ্যান ও অর্থবান্ দেশে অনেকেই হইয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মহাপ্রাণ ও উচ্চ হৃদয় কয়জন পাইলেন ? পরম কারুণিক পরমেশ্বরের পবিত্র মঙ্গলময় নাম দয়ার সাগর জঁখর চত্রেই সার্থক হইয়াছিল ।

প্রাচ্য-আর্য্যীয় দেবভূলা বিদ্যাসাগর, ভূদেব, গুরুদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণের উদারচিত্ত ও মহুঘাত্ত কয়জন পাইলেন ? পরের জন্ত তাঁহাদের ছায় বরজনের প্রাণ কান্দিয়াছে ? পরের হৃৎথে তাঁহাদের মত কাতর হইয়া আর কে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে ? দেশ উদ্ধার, জাতীয় উন্নতি—বলিলেই কি হয় ? বড় হইবার উপযুক্ত না হইলে কি বড় হওয়া যায় ? মাংস, মেদ ও আরতনে বৃহৎ হইলেই কি বড় হওয়া চলে ? Bigness জিনিষটা Greatness নয় । বৃহদায়তন মহত্ত্ব নয় ; প্রকাণ্ড শূন্তেরও কোন মূল্য নাই । ত্যাগই উন্নতি ও মহত্ত্বের মূল ; বড় হইবার আদি কারণ—বড় মন । যে জাতি কুস্তলগত প্রাণ—অবোধ নারীর ছায় কেবল বেশ ভূষার পারিপাট্যে সর্বদা শশব্যস্ত ; যে জাতির আরামপ্রিয়তা ও ব্যসন বিলাসিতা মজ্জাগত হইয়াছে, যে জাতির পানে একটু চূর্ণ কম হইলে পৃথিবী রসাতলে যায়, সে জাতি ক্রমশঃ হালকা হইয়া অবনতি ও ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হয় । দেশের ও দেশের উন্নতি চাও, আহা-বিহার বসনভূষণ-বচন প্রভৃতি দিবসে কঠোর সংযম অভ্যাস কর ; বিলাসিতা, আরাম স্পর্শ, হালকা আঘাতি—রঙ্গরস একবারে বর্জন কর ; স্বার্থের স্বর্গোপগলভী ছিন্ন কর ; পরকে প্রেম ভোরে বাঁধিয়া আপন কর ; পরের হৃৎথে

ব্যাঙ্কলো ও কাতর হইতে শিখ এবং পরের গলা
খরিয়া কাঁদিয়া তঁহার চোখের জল মুছাইয়া
দাও। ইহাই শিক্ষা, ইহাই দীক্ষা, ইহাই
উন্নতির বীজ মন্ত্র। পিতামাতার কাছে ও
হৃৎকেন্দ্রের পাঠশালায় পড়িয়া বিজ্ঞানসাগর এই
উচ্চ শিক্ষা পাইয়াই আদর্শ জীবন গঠন করিতে
সমর্থ হইয়াছিলেন। অহো! কে আর তেমন
করিয়া পরের জন্ত কাঁদিবে; আত্মপূরণ ভুলিয়া,
সর্বজীবে সমদর্শী হইয়া কে আর পরার্থে সর্ব-
ব্যত্যাগ করিবে? ওগো বঙ্গজননি। কি
দোষে আর তেমন রক্তসম সুসন্তান প্রসব
করিতেছনা? তারার আলোকে কি মা
রজনীর অন্ধকার দূরীভূত হয়? সমুজ্জল
চন্দ্র কিরণ আবার কবে দেখিব?

শিক্ষিত সুসভ্য মানব যদি হৃদয়চীন
হয়, তবে কান্নার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মন সাধাবণ
শিক্ষা লাভ করিবে? শিক্ষিত লোক যদি
একে একে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যান, তবে
আর পল্লী সংস্কার কে করিবে? চাষা পণ্ডিত
জোবে লাঙ্গল ঠেলিয়া ফসল উৎপাদন করে;
কাঠ গোয়ার দৈনিক বন্দুক ধরিয়া লাড়াই
করিতে পারে, কিন্তু কাপ্তেন না থাকিলে
কি যুদ্ধ হয়? মাথায় 'চাল' বলিয়া না
দিলে কি শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কাজ করিতে
পারে? শিক্ষিত বাবু সহরে রেজিষ্টার
করিয়া কি নিজ নিজ পল্লীতে আসিয়া গ্রামের
উন্নতি বিধান করিতে পারেন না? তাঁহা-
দের যুক্তি আপত্তি—পল্লীতে গেলে মরিয়া
মাইব। কেন, সহরে কি মানুষ মরে না?
সহরে কি এক মাত্র পাশ করা ছেলে, পিতা
মাতাও নবোঢ়া পল্লীর বুকে শেল্যবিদ্ধ করিয়া
সকলকে শোক সাগরে ডাসাইয়া যায়

না? সহরে কি চোখের সামনে স্বর্ণলতিকার
নয়নভারা বিধবা হয় না? কৃত্রিমতাল
প্রাণিত ধুমধূলিপূর্ণ কোলাহল আকুলিত সহরের
ঠেসাঠেসিতে কোজনরী ব্যারাম তো লাগিয়াই
আছে, তবে দেওয়ানী ম্যালেরিয়ার প্রকোপ
কিছু কম। বঙ্গের বাহিরে গিয়া ত হাওয়া
খাইতেই হয়। শিমূল তলা, রাতি, ও
গিরিড়ির হাওয়া কি এত মিষ্ট? কেন
বঙ্গপল্লীতে কি হাওয়া নাই? জল আছে,
হাওয়া আছে, বাঙ্গালীর মোটামুটি খাওয়া
পাওয়ার সবই আছে। ষাট সত্তর বৎসর
পূর্বে এই পল্লীই ভূষণ ছিল। কি প্রাচুর্য,
কি স্বাস্থ্য কি নৈতিক বল, কি পবিত্রতা,
কি সরলতা, কি আনন্দ, কি নির্দোষ
আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি যে কি সুখশান্তি
ছিল—তাহা এখনও প্রাচীন লোকের মুখে
শুনিতে পাওয়া যায়। তখনও বনজঙ্গল,
পুকুর ডোবা, গম্বু-খাল—বিল সবই ছিল, তবে
ছিল না কেবল এই সর্বনাশিনী ম্যালেরিয়া-
রাক্ষসী। তাই পল্লীগুলি বনাবৃত হইলেও
তপোবন তুল্য শান্তি নিকেতন ছিল। তখন
কিছু পয়সা হইলেই লোকে নিজের ভদ্রাসন
কেন্দ্রিয়া বৎসরে ৫' এক সপ্তাহ হাওয়া
খাইবার জন্ত পশ্চিমে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী
তৈয়ারী করিতে অস্থির হইত না। সকলেই
সহরে থাকিলেও আপন আপন পল্লীগ্রামের
প্রতি কৃপা দৃষ্টি রাখিতেন—অন্ততঃ বৎসরে
৩ পূজার ছুটিতেও একবার বাড়ী আসিয়া
বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীর সহিত আমোদ
আহ্লাদ করিতেন। কয়েক বৎসর হইতে
দেখিতেছি, পল্লীর প্রতি বাবুদের আর
তেমন টান নাই। শিক্ষিত লোক মাঝেই

গ্রাম ছাড়িয়া নগরে গিয়া বসবাস করিতেছেন । এমন করিলে কি দেশের উন্নতি হয় ? ম্যালেরিয়া-রাকসীর উৎপাতেই তো বঙ্গপল্লী স্ত্রিয়মাণ । এই তাড়কাতে বধ করিবার জন্য কি কোন বিশ্বামিত্রই রামলক্ষ্মণ লইয়া আসিবেন না ? বিশ্বামিত্রের মহাপ্রাণ, উচ্চহৃদয় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কি কাহারও নাই ? এমন কি কেহই নাই, যিনি রাম লক্ষ্মণের ক্রোধভোজ্যে এই বঙ্গধ্বংসকারিণী ম্যালেরিয়া সংহার করিতে পারেন ? রণে ভয় দিয়া বঙ্গের বাহিরে পলায়ন করা কি বীরের ধর্ম ? পাশ্চাত্য কর্মবীরগণের অদম্য অধ্যবসায় ও একতা-বলে কত আধিব্যাধি-প্রণীড়িত প্রাচীন পল্লী-নগর আবার পরম রমণীয় বলবীৰ্য্যপ্রদ স্বাস্থ্য-নিবাসে পরিণত হইয়াছে । আর আমাদের বঙ্গবীরগণ জ্বরের আলায় নিজ নিজ পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া জন্মভূমি বঙ্গমাতাকে চরণে দালায় পশ্চিমাদিকে ধাবমান । কি অদ্ভুত শোচনীয় পার্থক্য ॥ এই আশঙ্ক্যের স্বার্থসেবী তীক্ষ্ণ কাপুরুষ পলাতকের ক্ষুদ্র ও দুর্বল হৃদয় লইয়া দেশ উদ্ধার করা চলে ? আমাদের আত্মোদ্ধার যদি না হইল—আমরা যদি ক্রমশঃই বর্তমান সভ্যতার বাহ্য চাকাচাক্যময়ী মনোহারিণী ভোগবিলাস-বস্ত্রের গা ঢালিয়া দিই ; আমরা যদি সামান্য একটা পল্লী উদ্ধার করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের উচ্চাভিলাষের ভিত্তি কোথায় ? এ সংশয় কি একেবারেই অমূলক ? বঙ্গপল্লীজাত স্বেচ্ছাশ্রমী বাবুরা একবার স্বার্থ ভুলিয়া, একতা-বদ্ধ হইয়া নিজ নিজ পল্লীগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া বন-জঙ্গল পরিষ্কার ও পচা পুকুরের

পঙ্কোদ্ধার করিয়া দেখুন, স্বীয় পল্লীর হাওয়া পশ্চিমের হাওয়া অপেক্ষা মধুর কিনা । কত সহস্র দানবীর দেশে শিকার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্ত হস্তে দান করিয়াছেন, একবার বঙ্গপল্লীর বন-জঙ্গল পরিষ্কার ও জলাশয়গুলির পঙ্কোদ্ধার করিলে ঐর্ধদানে মনোনিবেশ করিয়া দেখুন, পল্লী আবার সজীব হইয়া উঠে কিনা । এখনও সময় আছে, পল্লী—ম্যালেরিয়ার সহিত লড়িয়া এখনও গতাশ্ব হয় নাই । কিন্তু প্রাণবায়ু থাকিতে থাকিতে চিকিৎসার দরকার, নতুবা সকল চেষ্টা বিফল হইবে ।

দেশের যাহারা মাথা—সেই গণ্যমান্য ভদ্রলোকদিগের হৃদয়ই যদি এমন দুর্বল হয়, তাহা হইলে অন্তে পরে কা কথা । বাবু-মহলে আজ কাল যখন তখন হার্টফেল । খবরের কাগজে প্রায়ই দেখিতে পাই, হার্টফেল হইয়া অমুক বাবুর মৃত্যু হইল । পাঁচ বছরের ছেলেটি পক্ষান্ত বলে—আজ অমুকের হার্টফেল হ'ল । ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, মাংস-মেদ-মজ্জার উন্নতি হইলেও আমাদের হৃদয়গুলো ক্রমশঃ স্বীর্ণ-দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে । ইহার আশু প্রতিকার সর্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়, নতুবা এই সব স্থূলকার বুদ্ধিজীবী স্বাধিবীর বঙ্গবাসী দিন দিন অস্তঃসারশূন্য হৃদয়হীন আমড়া ফাঠের ঢেঁকি হইয়া যাইবে । তবে এক হৃদয় রোগের চিকিৎসা বড় কঠিন—ভারতে হইতে পারে কি না—এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে ডাক্তার-কবিরাজ মহাশয়দিগের একটা বিশেষ স্বাস্থ্যবৈজ্ঞানিক হাওয়া আবশ্যক । আমার কিন্তু বিশ্বাস, খুব দামী বড়ি বেমন থাকে তা'কে সারাইতে দেওয়া চলেনা,

সেইরূপ বিলাতপ্রিয় আমাদের বহুমূল্য পৈতৃক জমিরগুলো একবার খাস বিলাতে রডা কোম্পানীর হেড অফিস হইতে মেরামত হইয়া আসিলে আবার দুই একশত বৎসর বেশ চলিতে পারে। Power House বা বিদ্যুৎ আগারে তাড়িত উৎপাদিত হইয়া যেমন সহরের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ জমিরকেন্দ্রে বলশক্তি উৎপাদিত হইয়া অল্প প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, আহা-বিহারের প্রতি সম্বর লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রচুর বিপুল খাজনা খাইলে

জমিরে কখনই জোর বাধিবে না। এইরূপ শ্রোতে গা ভাসাইয়া চলিতে থাকিলে পাউয়ার হাউসের কল বিগড়াইয়া কথার কথার খাবুদের হার্টফেল হইবে। কলকথা, আমাদেব জুংপিও, হুসফুস, বকুৎ, মস্তিষ্ক প্রভৃতি জীবনীশক্তির উৎসস্বরূপ অত্যাবশ্যক যন্ত্র বস্ত্রগুলির কাড়া মেরামত ও অয়েল করা নিত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি, জাতির এই জীব সংস্কার বিষয়ে দেশের নেতৃবৃন্দ শীঘ্রই মনোযোগ দিবেন।

পলাশ ।

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন) ।

•••••

পলাশ—হিং ঢাক টেস্ট কেন্দ্র। পলাশ বৃক্ষ বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। গোয়ালিয়র অঞ্চলে অপরিখাপ্ত পলাশ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, শাল পত্র দ্বারা যেরূপ ভোজন পাত্র নির্মিত হইয়া থাকে, গোয়ালিয়র অঞ্চলে তজ্জপ পলাশ পত্র দ্বারা ভোজন পাত্র ব্যাহত হয়।

পলাশের শিখী চেপ্টা, ঠিহার কুল সুদৃশ্য। পোষের শেষ হইতে পুষ্প দৃষ্ট হয়। পলাশ পুষ্পে বজ্রাদি রঞ্জিত করা হয়। মাঘ মাসে পলাশের প্রায় পত্রশূন্য হইয়া থাকে, ঐ সময় পুষ্প শোভিত বৃক্ষগুলি দেখিতে অতি মনোরম।

কৃষি রোগে—পলাশ বীজ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে কৃষি নষ্ট হয়।

রক্ত পিত্তে পলাশ—পলাশ বৃক্ষের কাণ্ড ও কল দ্বারা স্নাত পাক করিয়া ঐ স্নাত সেবনে রক্তপিত্ত উর্দ্ধ ও অধো উভয়বিধ রোগে বিশেষ হিতকর।

অতিসারে পলাশ—বিরেচনযোগ্য অতিসারে পলাশ বীজের কাণ্ড দুগ্ধসহ পান করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয়। ইহা আমাতিসারেই প্রযোজ্য।

অর্শে পলাশ পত্র—কচি পলাশ পত্র কয়েকটি গ্রহণ করিবে, অতঃপর সমপরিমাণ তিল তৈল ও গব্য স্নাত মিশ্রিত করিয়া ঐ সংগৃহীত পলাশ পত্র ভাজিয়া গো-দুগ্ধজাত

হৃদয়ের সর্বত্র সহিত ভাষিত পত্র পেষণ করিয়া সেবন করিবে।

রক্তরোধক পলাশ—পলাশ বৃক্কের কাণ্ড লীভল করিয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষু চিনি অথবা মধু সহযোগে প্রত্যাহ একবার সেবন করিলে রক্ত বমন ও অর্শের রক্তস্রাব নিবৃত্তি হয়। কাণ্ডের নিয়ম—পলাশ বৃক্ক ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের। শেষ অর্দ্ধ পোরা।

রক্ত গুল্মে পলাশ—পলাশের কারোদক দ্বারা পক্ক দ্রুত--গুল্ম রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

অক্ষিরোগে পলাশ—চক্ষুতে ছানি পড়িবার প্রথম মৃত্তপাতে ডহরকরকার বীজ চূর্ণ করিয়া পলাশ পুষ্পের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া উহা দ্বারা বর্ষি প্রস্তুত করিবে, ঐ বর্ষি (ঈষৎ লবাকৃতি বটিকা) মধু অথবা ছাগী ছত্বের সহিত ঘর্ষণ করিয়া নয়নে প্রলেপ দিবে। কবুতরের পালকের দ্বারা চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রলেপ লাগাইবে, ইহাতে চক্ষুর ছানি বিনষ্ট হইবে।

ব্রণে পলাশ—পলাশ পত্র পেষণ করিয়া উত্তপ্ত করিবে উহা দ্বারা প্রলেপ দিলে ফোঁড়া বসিয়া যায়।

পলাশ পত্রের কাণ্ড প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা

রক্তপ্রদরপ্রবাহ নারীর বোনিতে পিচকারী প্রদান করিলে রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়।

মূত্র-ক্লেতে এবং কঠিন মূত্রের ক্লেতে ঐ কাণ্ড দ্বারা কবল করিলে ঐ ক্লেতসমূহ আরোগ্য হয়।

ফিতা ক্রুরি নষ্ট করিতে পলাশ বীজ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে।

মূত্র ক্লেদে পলাশ—পলাশ বীজের কাণ্ড ও পলাশ ফুলের কাণ্ড (পলাশ পুষ্প গরম জলে উত্তমরূপে চটকাইয়া লইলে কাণ্ড হয়) সেবন করিলে মূত্র ক্লেদ ও মূত্রাঘাত রোগে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহাতে প্রস্রাব সরল হইয়া নির্গত হয়।

পলাশ পুষ্প মূত্রকারক, বত্তিদেশে (নাভির নিম্ন স্থানে) পলাশ পুষ্পের দল পুঙ্ক করিয়া বিছাইয়া কদলী পত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিলে মূত্রাঘাত ও মূত্রক্লেদ উপকার দর্শে। পলাশ পুষ্প পেষণ করিয়া বত্তিতে প্রলেপ দিলেও মূত্র সরলভাবে নির্গত হয়।

পলাশ পত্রের কাণ্ড অথবা স্বরস শৌষ রোগীর ঘর্ষণ হইতে থাকিলে পান করিলে উপশম হয়। রক্তপ্রদর, ক্রুরি ও শূল রোগীর পক্ষে ও ইহা বিশেষ হিতকর।

অতিসারে পলাশ বৃক্কের কাণ্ড প্রয়োগ করিলে অতিসার নিবৃত্তি হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ ।

—:~::~:—

পরলোক ।—বর্তমান মাসে কলিকাতার তিন জন কবিরাজের পরলোক ঘটিয়াছে । ইহাদিগের মধ্যে এক জন নেবুতলার সুপ্রসিদ্ধ মহানন্দ গুপ্ত, এক জন হরিনাথ বিশারদ ও অপরের নাম মনোরঞ্জন গুপ্ত । মহানন্দ গুপ্ত মহাশয় ইদানীন্তন কালে বয়োপ্রবীণ ও বিচক্ষণ চিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, হরিনাথ বিশারদ মহাশয় চরকের টীকা রচনার যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতেছিলেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয় সবে মাত্র উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ছিলেন । আমরা ইহাদিগের বিরোধে ইচ্ছা-দিগের পরিজনবর্গের সহিত সমবেদনা অনুভব করিতেছি ।

বিহারে আয়ুর্বেদ ।—বিহারের ভাগলপুর জেলার সাগুন্দা নামক গ্রামে তত্রত্য ডিস্ট্রিক্টবোর্ড একটা দাতব্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন । আমরা ভাগলপুর ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের কর্তৃপক্ষগণকে এজন্য স্বত্ববাদ জ্ঞাপন করিতেছি । বাঙ্গালার সকল ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের কর্তৃপক্ষগণই এরূপ সাধু-অনুষ্ঠানে অগ্রসর হউন না ।

ডাক্তারের উদ্ভাবনা ।—“অমৃতবাজার পত্রিকায়” এক জন ডাক্তার প্রকাশ করিয়াছেন যে, নোনা আত্মার (Custard apple) পাতার রসে ও গুলটিশে কার্কাঙ্কল আরোগ্য হইয়া থাকে । তিনি অনেক রোগীর মধ্যে

ইহার ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন । নোনাআত্মা ও সাধারণ আত্মার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া কাটিয়া থাকে । ইহাদিগের রসে ক্ষত আরোগ্য হয়, এ সকল কথা দেশীয় চিকিৎসকেরা বহু কাল পূর্ব হইতেই অবগত আছেন । কিন্তু তাহাতে কি হইবে ? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদের মুখে আমাদের দেশের লোক যে পর্য্যন্ত সে কথা না শুনিতেছে, সে পর্য্যন্ত তাহাতে আস্থা স্থাপন করা চলে কি ? দেশীয় চিকিৎসা এই জন্তই ত মাথা তুলিতে পারিতেছে না ।

ঔষধের অপব্যবহার ।—রসায়ন ও বাজী-করণাধিকারোক্ত ত্রীমদনানন্দ মোদক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রোক্ত একট উৎকৃষ্ট ঔষধ । ঐঔষধ-টির অপব্যবহার কিন্তু এক্ষণে যথেষ্ট ভাবেই দেখিতে পাইতেছি । ঐ মোদকের উপাদান-গুলির মধ্যে সিদ্ধি অন্ততম উপাদান । এই জন্ত নেশার উদ্দেশ্যে এই মোদক অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন । তাঁহাদের কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ঔষধে ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে, অকারণে তাহার অবস্থা ব্যবহারে সেই ঔষধে সেই ব্যাধির উৎপত্তিও হইতে পারে । সামান্য সর্দি কাসিতে যদি যন্না অধিকারের ঔষধ সেবন করা যায়, তাহা হইলে অতি শীঘ্র সর্দি কাসির উপশম হইয়া থাকে কিন্তু ভবিষ্যতে তাহারই কলে যন্নারোগে আক্রান্ত হইতে

হয়। সিদ্ধি ঘটত মোদকও সুস্থ শরীরে সেবনের কল তরুণ। কলিকাতার পানের দোকানে, মণিহারি দোকানে এই সিদ্ধি ঘটত মদনানন্দ মোদকের কিন্তু অবাধ বিক্রয় চলিতেছে। গ্রে ট্রিট, বিডন ট্রিট প্রভৃতি স্থানের মোড়ে মোড়েও কোন কোনও কবিরাজ নামধারীর ফেরিওয়ালাগণও “চাই মদনানন্দ মোদক” বলিয়া উহার বিক্রয় অপ্রতিহত গতিতে চালাইতেছে। এরূপ প্রচারাধিক্যে দেশবাসীর স্বাস্থ্যের যে কত দূর অনিষ্ট করা হইতেছে—তাহা প্রত্যেক চিকিৎসকই স্বীকার করিবেন। সিদ্ধিঘটিত

মোদক বিক্রয়ের অল্প আকারি বিভাগ হইতে যে লাইসেন্স লইতে হয়, তাহাতে কেবল ষোগীদিগকে উহা বিক্রয় করিবারই অনুমতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। এরূপভাবে রাস্তায় রাস্তায় ফেরিওয়ালার সাহায্যে এবং পানের দোকানে, মণিহারি দোকানে ইহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা আবগারি-আইনের কখনই উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে, কলিকাতার মত সহরেও আবগারি বিভাগ এ বিষয়ে লক্ষ্যহীন। সাধারণের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এ বিষয়ে তাঁহাদের দুটি আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

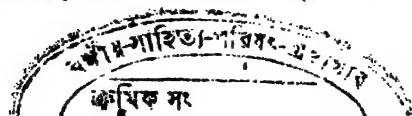
সমালোচনা।

—o:—

বৈদিক ভারত।—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট প্রণীত। শ্রীযুক্ত শিশির কুমার মিত্র বি-এ সম্পাদিত। এই পুস্তকের সকল গল্পই বেদ অবলম্বনে লিখিত। স্বকুমার মতি শিশু-হৃদয়ে এই পুস্তকের গল্পগুলি অঙ্কিত হইলে দেশে ধর্ম্মের স্রোত যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা ইংলণ্ডের কুলজী মুগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু আপনাদের দেশের আত্ম গরিব আনিয়া ইহা কম দুঃখের কথা নহে। রায় বাহাদুরের এই গ্রন্থ লিখিবার উদ্দেশ্যও বোধ হয় তাহাই। গল্পগুলি অতি সহজ

ভাষায় লিখিত, একজন্ম বড়ই সরস হইয়াছে। এই বৈদিক ভারত প্রত্যেক ছাত্রের হস্তে প্রদান করিয়া তাহাদিগের কোমল প্রাণে ধর্ম্ম-বীজ অঙ্কুর করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক অভিভাবকের কর্তব্য—আমরা রায় বাহাদুরের এই পুস্তকখানি পাইয়া অতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। এখনকার যুগে দীনেশ বাবুকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্রাট বলা যাইতে পারে। তিনি এই ধরণের গ্রন্থ প্রণয়নে শিল্প সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করুন—ইহাই আমাদের কামনা।

কবিরাজ শ্রীযুক্তকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যার্থ কর্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ১৭১৯নং গ্রামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্তৃক প্রকাশিত।





আয়ুর্বেদ

৭ম বর্ষ

মাঘ, ১৩২৯ সাল।

৫ম সংখ্যা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের স্বরূপ।

[শ্রী—পাইকর, বীরভূম।]

ম্যালেরিয়া জ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এবার কিছু আলোচনা করা আবশ্যিক। আমাদের মনে হয় ম্যালেরিয়া রোগ উপস্থিত হইলে আমাদের শরীর মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহার প্রকৃত চিত্র অঙ্কন করিতে পারিলেই ম্যালেরিয়ার স্বরূপ প্রদর্শিত হইবে। আমরা পূর্বে বাহা বলিয়াছি তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, আমাদের দেহস্থ স্বাভাবিক তাপ—দেহ প্রবিষ্ট পদার্থ সমূহকে পরিণাক করে এবং এই পাচিত পদার্থের সারাংশ দেহের উপযোগী বলিয়া দেহ পুষ্টির জন্য তাহা পরিগৃহীত ও অপসারণ অল্পপযোগী বলিয়া মলরূপে পরিত্যক্ত হইতেছে। এইরূপ পাকক্রিয়া বর্জন নির্মিয়ে সম্পন্ন হয় ততদিন আমরা শরীরের মধ্যে কোনরূপ গ্লানি বৃদ্ধিতে পারি না, কিন্তু এই পাকক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলেই শরীরবস্তুর গ্লানি নিম্ন নিম্ন ক্রিয়া সাধনে এক প্রকার

বাধা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে আমাদের শরীর “মাল্য মাল্য” করিতে থাকে।

আত্মপূর্বিক পর্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আলোচ্য পাকক্রিয়ার সময় দেহস্থ অম্লি ও দেহপ্রবিষ্ট পদার্থ এতদ্রূপের মধ্যে একরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সংগ্রামে অম্লির জয় হইলে দেহমধ্যে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু দেহপ্রবিষ্ট পদার্থ রাশির আধিক্য ও প্রকৃতি বিপর্যয় উপস্থিত হইলে অম্লি পরাজিত হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে এই সকল পদার্থের পরিণাক ক্রিয়া বধায়িত সম্পন্ন হয় না। কাজেই তখন দেহপ্রবিষ্ট বস্তুর সারাংশ বিগ্নিষ্ট হইয়া শরীর পোষণে নিয়োজিত হইতে পারে না। উপরন্তু উহা অসারাগণের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের উপাদানের মধ্যে একরূপ বিভ্রাট উপস্থিত করে। বলা বাহুল্য,

এই বিভ্রাটই বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্যাবস্থা ঘটাইবার প্রধান কারণ । যতদিন দেহপ্রবিষ্ট বস্তুর যথারীতি পরিপাক ক্রিয়া সমাপিত হইতে থাকে, ততদিন দৈনিক উপাদানের শাসক বায়ু, পিত্ত ও কফ নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া সাম্যাবস্থার থাকিতে সমর্থ হয় । কিন্তু সেই পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত হইলেই দেহপ্রবিষ্ট পদার্থ রাশির অসারাংশ—সারাংশের সহিত মিলিত হইয়া বায়ু, পিত্ত ও কফের ক্রিয়াশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাহার ফলে, বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটির মধ্যে কোন একটা, অথবা দুইটা কিবা তিনটাই কুপিত হইয়া পড়ে ।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেহস্থ তাপ স্বভাব বশেই দেহের মধ্যস্থ যাবতীয় পদার্থকে শাসন করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ অবস্থার আনয়ন করিবার চেষ্টা করে । সুতরাং বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইলেও এই অগ্নি যে তাহাদিগকে শাসন করিয়া তাহাদিগের নিজ নিজ অবস্থার আনয়ন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? পার্থক্য আরও অবগত আছেন যে, এই পাকায়িত্র শক্তি অসাধারণ । স্বভাবতঃ ইহার তাপের মাত্রা ৯৮°০ রেখা হইলেও নরদেহে ইহা কারণ বিশেষে ১১০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিতে পারে ।

বায়ু, পিত্ত ও কফ যখন সামান্য মাত্রায় বৃদ্ধি হয়, তখন আমাদের দেহের তাপ স্বাভাবিক অবস্থার থাকিয়াও তাহাদিগের সাম্যাবস্থা আনয়ন করিতে সমর্থ হয় । আমাদের শরীর যখন সামান্য রূপে ভার বোধ হয়, তখন উক্ত ত্রিদোষের প্রকোপ সামান্যরূপে হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হয় এবং তখন একটু

সাবধান হইলেই অর্থাৎ ২।১ পৌণ্ড উপবাস বা লঘু আহার করিলেই আমাদের দেহস্থ অগ্নি তাহার শোধন করিতে সমর্থ হয় । কিন্তু হ্রস্বগতক্রমে যদি কেহ সতর্ক না হইয়া পূর্ণ আহার বা অন্তরূপ অত্যাচার করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহার ফলে বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং পাচকায়িত্র সেই দোষের ফলে ক্ষীণবল হইয়া থাকে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অগ্নি—দোষের প্রাহুর্ভাবে ক্ষীণবল হইলেও একেবারে পরাভূত হয় না । পরন্তু এই অগ্নি যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দোষের মাত্রা অনুসারে প্রবলতর হইয়া দোষকে দখল করতঃ তাহার শোধন করিতে ক্রান্ত থাকে না ।

যখন এইরূপ তাপ বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ যখন আমাদের অন্ন হয়—তখন বুঝিতে হইবে যে, আমাদের দেহস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে কোন একটা, অথবা ২টা অথবা তিনটির দোষ উপস্থিত হইয়াছে এবং দেহাগ্নি কুপিত দোষকে পরিপাক করিবার জন্য নিরোজিত হইয়াছে । কোন্ দোষের প্রকোপ হইয়াছে আর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নাড়ী পরীক্ষা করিলেই অনায়াসে বুঝা যায় । ডাক্তার বাবু এইরূপ নাড়ী পরীক্ষার গুরুত্ব স্বীকার না করিলেও আমাদের ত্রিকালজ্ঞ আচার্যবিগণ তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন । আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এইরূপ নাড়ী পরীক্ষা বিষয়ে বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের প্রকৃত কবিরাজগণ এই মন্তেরই সন্নিধক ।

উপরে বাহা বলা হইল, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, ত্রিদোষের সহিত দেহস্থ অগ্নির

মলযুক্ত বাধে অগ্নি বিশেষে তাহারই নাম জ্বর। এই জ্বরে অগ্নি বধন স্বাভাবিক অবস্থার অর্থাৎ ৯৮।° রেখায় থাকিয়া দোষকে সংশোধন করিয়া লইতেছে তখন আর তাহা জ্বর বলিয়া কথিত হয় না, কিন্তু দোষের গুরুত্ব নিবন্ধন অগ্নির যেমন ৯৯, ১০০, ১০১ ডিগ্রি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, রোগী তত ডিগ্রির (রেখার) জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি।

যাহা হউক এখন কথা এই যে, বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ ও দেহস্থ অগ্নি এতদুভয়ের মধ্যে যে মল যুক্ত উপস্থিত হয় তাহারই নাম যে জ্বর তাহা বেশ বুঝা গেল। এই মলযুক্ত কিছুদিন পরে থামিয়া গেলেই তাহা তরুণজ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অনেক-সময় দেখা যায় যে, এই মলযুক্ত যেন লাগিয়াই আছে। দেহের অগ্নি সকল সময় স্বাভাবিক রেখা অতিক্রম করে না বটে কিন্তু তখনও দোষের সহিত তাহার সংঘর্ষ বদ্ধ হয় না। এই অবস্থা থাকিতে থাকিতে এক সময় হঠাৎ অগ্নির রেখা বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। ফলতঃ কোনক্রমেই উভয়ের মলযুক্ত বদ্ধ হয় না। দোষের সহিত অগ্নির যে এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী মলযুক্ত আয়ুর্কেন্দ শাস্ত্র তাহাকেই বিষম-জ্বর নামে অভিহিত করেন। বলা নিম্নো-জন, ইহারই ইংরাজি নাম ম্যালেরিয়া।

এই ম্যালেরিয়া বা বিষমজ্বর নানাবিধ। শারীরাত্মিক সহিত যে ত্রিদোষের এইরূপ মলযুক্ত হয়, সেই দোষের প্রকৃতি অনুসারে বিষমজ্বর নানাপ্রকার। তবে সাধারণতঃ এই মলযুক্ত ত্রিবিধ। একপ্রকার মলযুক্তের সময় শারীরাত্মিক তাপ স্বাভাবিক রেখায়

(Normal Temperature) থাকিয়া দোষত্রয়কে পরিপাক করিতে থাকে। এমনতর অবস্থায় শরীর ভার থাকিয়া রোগের অন্তত্ব হইয়া যায়। কিন্তু গাত্রের তাপ বৃদ্ধি হয় না। কাজেই জ্বর হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না। এই সময় সতর্ক হইয়া দোষের ক্ষালন করিবার চেষ্টা করিলে দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং শারীরাত্মিক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে দুর্বল দোষ গুলিকে পরিপাক করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় অবস্থায় দোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তখন শারীরাত্মিক আর স্বাভাবিক অবস্থায় তৎসমুদয়কে পরিপাক করিতে পারেনা। তখন দেখা যায়, শারীরাত্মিক নিজের তাপের রেখা বৃদ্ধি করে এবং হতাশন সূর্তিতে দোষগুলিকে দগ্ধ করিবার জন্য মলযোক্তার জ্বায় তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই সময় গাত্রতাপ ১০৭।১০৮ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিয়া থাকে। এইরূপে দোষগুলি কথঞ্চিৎ দগ্ধ হইলেই শারীরাত্মিক পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়া দোষগুলিকে পরিপাক করিতে থাকে। তৃতীয় অবস্থায় শারীরাত্মিক স্বাভাবিক অবস্থা ত্যাগ পূর্বক উচ্চতর রেখার অহরহঃ দোষ-গুলিকে দগ্ধ করে এবং বহুদিন না দোষ সমূলে বিনষ্ট হয়, ততদিন পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা গ্রহণ করেনা। বলা বাহুল্য এই তিন অবস্থাতেই রোগী রোগের অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতে পারে। তবে ইহা ঠিক যে, রোগী ১ম অবস্থা অপেক্ষা দ্বিতীয়াবস্থায়, এবং দ্বিতীয়বস্থা অপেক্ষা তৃতীয়াবস্থায় রোগ-জনিত ব্যর্থতার অধিকতর অনুভূতি করিয়া থাকে।

পূর্বে যাহা বলা হইল, যাহা তাহাতে বুঝা

যায় যে, শারীরিক ও দেহপ্রবিষ্ট পদার্থ শরীর মধ্যে সততই একরূপ সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে শারীরিক বতদিন বিজয়ী থাকে অর্থাৎ বতদিন দেহপ্রবিষ্ট পদার্থগুলিকে নির্বিঘ্নে পরিপাক করিয়া তাহা হইতে দেহের উপযোগী সারাংশ বিল্লিষ্ট করিয়া লইতে পারে, ততদিন দেহের মধ্যে আমরা কোনরূপ গ্লানি অনুভব করিনা। কিন্তু যখন শরীর প্রবিষ্ট পদার্থের মাত্রাধিক্য ঘটে অথবা ক্ষুদ্র পদার্থ বিদ্যুত হইয়া শরীরে স্থান প্রাপ্ত হয়, তখন দেহাগ্নি আর স্বচ্ছন্দে নিজ ক্রিয়া সাধন করিতে সক্ষম হয় না। বলা বাহুল্য, তখনই আমরা শারীরিক গ্লানি উপলব্ধি করিয়া থাকি।

একণে এই দেহাগ্নি কিরূপ পদার্থ এবং কিরূপেই তাহার শক্তি ক্রিয়াশীল অথবা ক্ষীণক্রিয়া হয় এইবার তাহাই আলোচ্য। অধ্যাত্ম শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, আমাদের প্রাপ্ত অগ্নিস্বরূপ। এই অগ্নি—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান—এই পঞ্চ শাখায় বিভক্ত হইয়া একই শক্তির পঞ্চ ধারার ন্যায় সর্বশরীর ব্যাপক হয় এবং তাহার ফলে শরীরগত বস্তুর পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং প্রত্যেক অণুগুরুমাণু বথাবশ্যক ভাবে উষ্ণ থাকিয়া অবিকৃত থাকে। অন্তএব ইহা সিদ্ধান্ত করা বাইতে পারে যে, শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে এই প্রাণাগ্নি ও দেহ প্রবিষ্ট পদার্থ নিচর এতদূতরেরই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

আমাদের প্রাণ যে অগ্নিস্বরূপ তাহা ব্রাহ্মণশাস্ত্রেই অবগত আছেন। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে প্রাণকে পুনঃপুনঃ অগ্নিনামে অভিহিত করা হইয়াছে। সংস্কৃত

মাত্রেই উপদেশ দিয়া থাকেন যে, এই অগ্নির শক্তি ও ক্রিয়া অক্ষয় রাখিতে হইলে সন্ধ্যা, উপাসনা, ধ্যান ধারণা, প্রাণায়াম, ইত্যাদির অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যিক; কারণ ইহা তথ্যাত্মবিশ্লেষণসম্মত এবং সত্য। সৌভাগ্যক্রমে কোন কোন লোক প্রবল প্রাণসংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সাক্ষাত্তিক না করিয়াও সুস্থ থাকিতে পারেন। কিন্তু বাহ্যিকের প্রাণসংস্কার দুর্বল, তাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিলে ক্লান্ত থাকিয়া যান। কারণ তাঁহাদের প্রাণাগ্নি দুর্বল বলিয়া দেহ প্রবিষ্ট পদার্থের পরিপাক ক্রিয়া হ্রাসরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অনেকেই এই গুণতত্ত্বের উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহেন। ফলে দেখা যায়, বাহ্যিকের প্রাণসংস্কার দুর্বল, তাঁহারা প্রবল প্রাণসংস্কার সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিতে গিয়া নানারূপ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করেন। রামবাবু সন্ধ্যা বন্দনাদি করেন না, কদাচার করিতেও ক্রান্ত নহেন, পানাহারও মিতাচারী থাকেন না, অথচ তাঁহার শরীর সবল ও সুস্থ। কিন্তু শ্যামবাবু এইরূপ অন্যায় কর্ম করিতে না করিতেই পীড়িত হন। 'একরূপ ক্ষেত্রে অজ্ঞান ব্যক্তিগণ কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিয়াই ক্রান্ত থাকেন। কারণ, তাঁহারা অজ্ঞানাকুল বলিয়া ইহা ধারণা করিতে পারেন না যে, রামবাবু ও শ্যামবাবু প্রাণসংস্কারের বিশেষ তারতম্যই উল্লিখিতরূপ বৈচিত্র্যের অবিসম্বাদী কারণ।

যাহা হউক, 'এ সব অধ্যাত্ম বিজ্ঞার কথা এখানে আলোচনা করা অনাবশ্যক।

দিয়াই আমরা 'বিবেচনা' করি। তবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এই 'অধ্যাত্ম' তত্ত্বের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া স্থূল জগতের যে বিচার করিয়াছেন তৎসম্বন্ধেই ২।১ করা বলা আবশ্যিক। আয়ুর্বেদের মতে এই দেহাগ্নির নাম পাচকাগ্নি, রজকাগ্নি, সাধকাগ্নি, আলোচকাগ্নি ও ভ্রাজকাগ্নি। এই দেহাগ্নিকে সর্বল ও ক্রিয়াশীল রাখিতে হইলে এই পঞ্চাগ্নির ক্রিয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ তাহা হইলেই দেহাগ্নি দেহের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিয়া দেহপ্রবিষ্ট বস্তুর পাকক্রিয়ানুসম্পাদন করিবে। এবং তৎসমুদয় তখন যথাবশ্যকভাবে উষ্ণ রাখিবে। এস্থলে প্রকাশ থাকা আবশ্যিক যে, অন্নব্যঞ্জনাদি খাদ্য বস্তুর উষ্ণতার হ্রাস ও শৈত্যের বৃদ্ধি অনুসারে তৎসমুদয় যেমন বিকৃত হইয়া উঠে, তদ্রূপ প্রাণাগ্নির তাপে বিকৃত হইলে আমাদের দেহও বিকৃত ও বিভিন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

অতঃপর আমাদের দেহ প্রবিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যিক। এই দেহপ্রবিষ্ট বস্তু স্থূলতঃ ত্রিবিধ। ১ম, চর্ক্য, চোষ্য, লেহ ও পেষ এই চতুর্বিধ অন্নপান। ইহা আমাদের মুখ গহ্বর দিয়া প্রবিষ্ট হয়। ২য়, বায়ু প্রকৃতি অর্থাৎ মুক্তিকা, জল, তেজ, আকাশ ও বায়ু। এই পঞ্চবিধ স্থূলভূত অহরহঃ আমাদের দেহের আহার বা আহৃত পদার্থ। আমাদের জন্ম-লব্ধ সংস্কার খাদ্য-পানীয়ের জ্ঞান সত্তত এই এই 'পঞ্চ' স্থূলভূত পদার্থকেও দেহ সংলগ্ন করিয়া দিতেছে। অতএব এই স্ফূটনপান ও পঞ্চস্থূলভূত যে পরিমাণে খাটি হইবে, আমরা দেহাগ্নি নিজ সংস্কার বশেই সেই পরি-

মাণে নির্বিঘ্নে তাহারের পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। আর যে পরিমাণে তাহার দূষিত হইবে, সেই পরিমাণে এই অগ্নি নিজ ক্রিয়া সাধনে বাধা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার ফলে দেহ গঠনের মূখ্য উপাদান রসাসি রক্তধাতু ও বায়ু, পিত্ত এবং কফ নামক দোষধাতু দূষিত হইবে। এই দশটি পদার্থ লইয়াই যখন দেহ, তখন তাহার সমস্তগুলি অথবা কতকগুলি দূষিত হইলে যে দেহের অসুস্থতা আনয়ন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

দেহাগ্নি খাদ্য, পানীয় ও আহৃত পঞ্চভূত হইতেই রস এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক দোষধাতু প্রস্তুত করে। আবার রস হইতে যখন রক্ত মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রস্তুত হইতেছে, তখন রস দূষিত হইলে সকল গুলিই যে দূষিত হইবে তাহাতে আর মতভেদ থাকিতে পারে না। এইরূপে ঐ সকল ভূত পীত ও মাজিত বস্তুই যখন বায়ু, পিত্ত ও কফের জনক, তখন তাহাদের বিকৃতিতে এই দোষধাতু ত্রয়ের বিকৃতি হওয়াও সম্ভব।

বর্তমান প্রবন্ধে সমস্ত খাদ্য ও পানীয় বস্তুর আলোচনা করা অসম্ভব। সুতরাং এস্থলে আমরা কেবল ২।১ টীর দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। শরীর নির্মাণার্থ যে সকল উপাদান আবশ্যিক তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই যে জল তাহা আমরা বহবার প্রদর্শন করিয়াছি। কি আয়ুর্বেদশাস্ত্র, কি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র, কি এলোপ্যাথিক শাস্ত্র, সকল শাস্ত্রই একবাক্যে এতৎ পরিমাণ জলের অত্যাৱশ্যকতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন

কিন্তু আজকাল এদেশের লোক কিরূপ জল ব্যবহার করিতেছেন তাহাই আলোচ্য।

সুশ্রুত বলেন,—

কীটমুক্ত পুরীষাভ্য শবকোথপ্রদূষিতং

তৃণপণোৎকর যুতং কলুষং বিবসংযুতং

বোহবগাহেত বর্ষাশু শিবৎ বাপি নবং জলং

স বাহ্যভ্যন্তরানু রোগানু প্রাপ্নুয়াৎ ক্ষিপ্রেমবতুঃ

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি কীট, মূত্র, পুরীষ, শব অথবা বিব কর্তৃক দূষিত কিম্বা তৃণপত্র প্রভৃতি দ্বারা কলঙ্কিত জলে অবগাহন বা সেই জল পান করে অথবা যে ব্যক্তি বর্ষাকালে নূতন জল অবগাহনার্থে ব্যবহার করে, তাহার বাহ্যিক ও আন্তরিক নানাবিধ রোগ জন্মে।

পল্লীবাসী জনসাধারণ ও পল্লীর অবস্থান্তিত্ত চৈতন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, পল্লীমাত্রেই ঐরূপ জল ব্যতীত অন্যরূপ জল পাওয়া যায় না। কারণ পল্লীবাসিগণ পুকুরিণীর জলে মূত্র ও তাহার তীরে মলত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারে না। একে তো পল্লীগ্রামের পুকুরিণীগুলির সংস্কার হয়না অথবা তথায় আর নূতন পুকুরিণী খনন করা হয় না, তাহার উপর এতাদৃশ পণ্ডবৎ অত্যাচার! অজ্ঞান গবাদি জন্তু যেমন গোশালার মলমূত্র ত্যাগ করে, পণ্ড প্রভৃতি অনেক পল্লীবাসী নিজ নিজ স্বাস্থ্যের আধার স্থানগুলি তদ্রূপ মলমূত্র ত্যাগ করিয়া দূষিত করে। মলমূত্রাদি শরীরের অম্লপযোগী বলিয়া প্রাণক্রিয়ার ফলে পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু পল্লীবাসীগণ এমনই ছর্ভাগা যে, পুনরায় তাহারা তৎসমুদয়কে জলের সহিত দেহপ্রবিষ্ট করিয়া থাকে।

‘এই তো গেল জলের’ কথা। এখন শরীর রক্ষা ও শোষণের অন্যতম প্রধান উপাদান বায়ুর বিষয় আলোচ্য। জলমধ্যে যেমন জল জরুর বাস, স্থলচর জন্তুগণ তদ্রূপ বায়ুর মধ্যে বাস করিয়া নিজ নিজ জীবন রক্ষা করে। বায়ু মধ্যস্থ অল্পজান প্রাণাধির প্রধানতম ইন্ধন বিশেষ। সেই জন্য ক্রীণস্বাস রোগীদিগকে অল্পজান তঁকাই বার ব্যবস্থা করা হয়। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত অথবা অন্য কোন বোগে দুর্বল ব্যক্তিগণ এই জন্ত মৃহমধুর প্রাতঃসমীরণ সেবন করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়া থাকেন। উষাকালে পুষ্প চয়নাদি করিলেও অধিক মাত্রায় অগ্নাজন বায়ু কুস্কুস্ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণাধিকে প্রবলতর করিতে সক্ষম হয়।

পাঠক অবগত আছেন যে, পল্লীমাত্রেই পরঃনালীর (Drainage) সুবন্দোবস্ত নাই, কাজেই গ্রামের মধ্যস্থ খাল—ডোবার জল জমে এবং তাহার কলে তৃণ পত্রাদি পচিয়া বায়ু দূষিত করে। পল্লীবাসীগণ নিজনিজ বাটার নিকটে “সারগড়” রাখে এবং তন্মধ্যে গলিত খড়, গোময় ও গো-মূত্রাদি বায়ুকে বিসাক্ত করে। এতদ্ব্যতীত প্রতিগ্রামের অধিকাংশ পুকুরিণী ও গর্ভে দূষিত জল পূর্ণ বলিয়া তৎসমুদয় হইতেও বিসাক্ত বায়ু উৎখিত হয়। এইরূপ নানারূপ অত্যাচারের ফলে মৃত্তিকা হইতে যে বাষ্প উৎখিত হয়, তাহা দূষিত হইয়া পল্লী বাসীর দেহে ভবিষ্যৎ ব্যয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এই ভূবায়ুর উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। অনেক

বাড়ীর মল মূত্রাগারী দ্বারা দূষিত জলই পুষ্করিনীর জল সরবরাহ কার্যে সহায়তা করে । যে সমস্ত পল্লীতে এইরূপ ক্রীড়া বিদ্যমান, তৎসমুদয়ের, বায়ুই দূষিত । সুতরাং জৈব বায়ু সেবন করিলে রুসুহুসে অল্পজান প্রবেশ না করিয়া কেবল অজারজান প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ অপকারই করিয়া থাকে ।"

দেহের জন্ত যে সকল বস্তু আবৃত্ত হইয়া, ওষুধে জল ও বায়ু প্রধান হইলেও ঘৃত, তৈল, মৎস্ত, মাংস, তণ্ডুলাদি বস্তুও কদাচ উপেক্ষণীয় নহে । এখন লোকে ঘৃতের নামে প্রায় শৃগাল কুকুরাদি ও গলিত শবদেহ হইতে নিঃসৃত চর্বি ভোজন করে । খনিজ জলীর পদার্থ মিশ্রিত তৈল, বিযাক্ত জলের মৎস্ত প্রভৃতিও বিশেষ অনিষ্টকর । উল্লিখিত দূষিত খাদ্য ও আহার্য-বস্তু পাকস্থলী নিহিত হইলে তাহা হইতে যে রস শ্রোত হইয়া তাহাও দূষিত পদার্থ । এইরূপ তৎসমুদয় হইতে দেহস্থ বায়ু, পিত্ত, কফের ক্ষয়পূরণার্থ যে বায়ু, পিত্ত ও কফ জন্মে, তাহাও দূষিত । সুতরাং এই সকল দূষিত বায়ু পিত্তাদি দেহস্থ বায়ু-পিত্তাদির ক্ষয়পূরণ করিবে কি— তাহাদিগকে বিকৃত ও কুপিতই করিয়া থাকে । দেহাগ্নি যতই কেন পরিপাক ক্রিয়া সক্ষম হউক না, তাহার স্নেহে নিরন্তরকাল এইরূপ সংস্কার বিকৃত পদার্থরাশি প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে তাহা আর কতকাল পাকক্রিয়ার সক্ষম থাকিবে ? ফলে এই অগ্নি অচিরকাল মধ্যেই দুর্বল হইয়া পড়ে ।

আমরা পূর্বেই বলিবারছি যে, দেহস্থ দূষিত রসাদি ৩টা ধাতু এবং বায়ু, পিত্ত ৭) কফ এই তিনটি দোষধাতু মোট এই ১০টা বা তাহাদের কয়েকটির সহিত দেহাগ্নির সংগ্রামই, জ্বরের

বীজাবস্থা । এই সংগ্রামের সময় মিথ্যাহার, অথবা বিহার, অথবা ঋতুবিপর্যয় নিবন্ধন দূষিত ধাতুর বলাধিক্য ঘটিলেই দেহাগ্নি নিজ রেখা (Degree) চড়াইয়া ফেলে এবং তাহার ফলে আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপ (Normal-temperature) উচ্চতর রেখায় (High Temperature) এ উপনীত হয় । বলা বাহুল্য, এই জন্তই শুধু ম্যালেরিয়ার রোগী কেন, যে কোন রোগীরই বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করা উচিত ।

উপরে বাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যায় যে, জ্বর ছাড়াইতে হইলে বাহাতে আমাদের দেহে দোষের মাত্রা কমিয়া আসে তৎপ্রতিই বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে । কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, ডাক্তার বাবুরা কুইনাইন প্রয়োগ এবং কবিরাজগণ হরিতাল তন্ম ও পাচন প্রভৃতি কষায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অগ্নির ক্রিয়া অস্বাভাবিকভাবে সংবত করিয়া থাকেন । ফলে দেখা যায়, ইহাতে দোষের বৃদ্ধি ও অগ্নির ক্ষয় হইয়া থাকে । এমন কি শেষ পর্য্যন্ত দোষের মাত্রাধিক্য ঘটিলে অগ্নি নির্বাপন হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে । রোগীর অকৃতি হইলে অখাদ্য বস্তু তাহার মুখরোচক হয় বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম অতি শোচনীয় হইয়া থাকে । তজ্জন কুইনাইন, হরিতাল তন্ম প্রভৃতি অগ্নিনাশক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দেহাগ্নির হ্রাস হইলে প্রথম প্রথম দেখিতে ও শুনিতে তৃপ্তিপ্রদ হয় বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম অতি ভীষণ । কারণ, শারীরাত্মিকে কমাইবার জন্ত এইরূপ অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াবলন করিলে দেহের মধ্যে দোষরাশি ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করে এবং তাহা বিবিধ রোগবীজাত্মক কেন্দ্রবস্তু

হইয়া বিবিধ রোগকে, আনয়ন করে। বলা বাহুল্য, এই জন্তই ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তি শেব পর্য্যন্ত ক্ষয়, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এইরূপ চিকিৎসা-বিভ্রাটের জন্ত সকল সময় চিকিৎসকগণ দায়ী নহেন। অনেক অভিভাবক ও রোগীর জর নিবারণ জন্ত ঔদৃশ চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী। এই দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আয়ুর্বেদশাস্ত্র ঔষধ প্রয়োগ করার একটি নির্দিষ্ট কাল নির্ণয় করিয়াছেন যথা—

মৃদোজরে লঘৌ মেহে প্রচলেনু মলেনু চ পকং দোষং বিজানীয়াৎ জরে দেয়ং তদৌষধং ।
ক্ষুৎকামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রানাম্ জর মাদিবাং ।
দোষ প্রবৃত্তিরটাহো নিরাম জর লক্ষণং ॥

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, ম্যালেরিয়ার স্বরূপ প্রবন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, তাহার সমস্তই হিন্দুশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া আমরা অবগত আছি। অতএব ইহাতে কোন শাস্ত্র বিকল্প কথা প্রকাশিত হইয়া থাকিলে কোন চিকিৎসক বা কোন অভিজ্ঞ লোক তাহার যথার্থ প্রতিবাদ করিলে আমরা সুখী হইব। আর যদি আমাদের উক্তিই অত্রান্ত বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদের সন্তোষিত হাহাতে চিকিৎসা কার্য সমাপিত হয় এবং রোগীগণও সতর্ক হইতে পারেন তৎপক্ষে আমাদের পাঠক এবং চিকিৎসক মণ্ডলী চেষ্টা করিলে আমরা সুখী হইব। তবে আজকাল অস্বাভাবিকভাবে জর চিকিৎসা করিবার যে মত প্রবল তাহা সমাদ্

হইতেছে তাহাতে আমাদের মতের কোন রূপ আলোচনা অরণ্যে রোদনবৎ হইবে বলিয়াই আমাদের মনে এক আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর এ কথাও বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করি, আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান তারতরে ঘোষণা করিতেছে যে, এনোকেলিস মশকই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। কেননা তাহার দংশনে শরীর মধ্যে একপ্রকার ম্যালেরিয়া রোগের বীজাণু প্রবিষ্ট হয়। বলা বাহুল্য আমরা ও যে এ মতের সমর্থন একেবারে করিনা তাহা নহে। কারণ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও মশক কর্তৃক রোগ-বীজাণু আনয়নের কথাও উল্লেখ আছে। তবে ডাক্তার বাবুরা যে ভাবে মশা ব্যাচীরীদের দায়ী করেন, আমরা তেমন করি না। আমরা বলি, যে যে কারণে আমাদের শরীরে দোষ উৎপন্ন হয়, এনোকেলিস মশক তাহার অন্ততম। জল বায়ু দূষিত না হইলে এই মশক জন্মাইতেই পারে না। সুতরাং ইহা বলা বাইতে পারে যে, ইহার দূষিত বায়ুতে জন্ম গ্রহণ করিয়া জল বায়ুর জার মানব শরীরে দোষ বা রোগ-বীজাণু জন্মাইবার সহায়তা করিয়া থাকে। ফলতঃ ইহারা ইহাদের সুখ নিঃসৃত বিধাতৃ লালা দ্বারা শরীরে বিবই প্রবেশ করাইয়া দেয়, কিন্তু যে তাপ দ্বারা জরের অন্তর্ভূতি হয়, এনোকেলিস মশক সেই 'তাপ বা তাহার বীজ' আনয়ন করে না। সেই তাপ আমাদের দেহেরই নিজস্ব সম্পত্তি, তাহার নাম পিত্ত। এনোকেলিস মশক, অবশ্য আহার বিহার, প্রভৃতিবিধায় প্রভূতি

যে কোন কারণেই দেহ-দোষ উৎপন্ন হউক না কেন, আমাদের দেহস্থিত "নিদ্রা" উত্তেজিত হইয়া তাহার ফলন অথবা পরিণাম ক্রিয়ার জন্ত চেষ্টা করে এবং একজন্ত পিত্ত অবস্থা-বিশেষে নিদ্রা তাপের মাত্রা (temperature) বৃদ্ধি করে। বলা বাহুল্য, তাপের এই মাত্রাধিকার নান্যই জ্ঞান। সুতরাং ইহা বেশ বুঝা যায়, এনোফিলিস মশক জর আনিয়ন করে না। তবে যে অসংখ্য কারণে জর হইয়া থাকে, এই মশক তাহার অন্ততম প্রবল কারণ মাত্র। আয়ুর্বেদ বলেন যে, এক জাতীয় মশক দংশনে কুট্যব্যাধি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শুধু মশক কেন, মাকড়সা, সরীসৃপ জন্ত প্রভৃতির দংশনেও আমাদের

বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত ও কুপিত হইয়া বিবিধ রোগ জন্মিতে পারে।

ছূর্তীগোত্র বিষয় বর্তমান দেশ, কাল ও পাত্র মাছাছ্যা এইরূপ ম্যালেরিয়া বা বিষম-জর উপস্থিত হওয়ার কারণ বর্ণিত। যে হেতু আমাদের হাবভাব, চালচলন, আহার-ব্যবহার, ধর্ম ও সমাজ প্রভৃতি নিম্নকই আমাদের প্রাণাগ্নির ক্ষয় ও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দোষত্রয়ের প্রকোপ কল্পে সহায়তা করিতেছে। সুতরাং ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে প্রাণাগ্নির শক্তি ও দোষত্রয়ের সাম্যাবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

নিদ্রা তত্ত্ব ।

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ]

যাদেনৌ সর্বভূতেষু নিদ্রাক্রমণে সংস্থিতা —

নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমোনমঃ ॥

সূর্য্যাকে দীপ্তিতে যেমন প্রদীপ জ্বলিতে হয়না; নিদ্রাকে জ্বলিতেও তেমনই কোন যুক্তিতর্কের আবশ্যক নাই। নিদ্রা আমাদের সকলেরই সুপরিচিত। তাঁর আশ্রয় হ্রিঃ কাহারও গত্যন্তর নাই। আহারের হ্রাস নিদ্রাও যে মানুষের স্বথ, ছঃথ, পুষ্টি, কার্শা, বলাবল, বুঝতা, ক্লীবতা, জ্ঞান ও অজ্ঞান জীবন ও মরণের কারণ হইয়া থাকে—ইহা প্রত্যক

সিদ্ধ সত্য। বিশেষজ্ঞগণ ইহার সত্যতা উল্লিখি করিয়া থাকেন। অতএব প্রত্যেক স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তির খাওয়াখাওয়া বিষয়ে জ্ঞান থাকা যেমন প্রয়োজন, নিদ্রাবিশয়েও তদ্রূপ জ্ঞান আবশ্যক। আমাদের জীবনের প্রায় একতৃতীয়াংশ যার সেবার অভিবাহিত হয়, শব্দবৈষয় প্রত্যেক অণু পরমাণু পর্য্যন্ত যার স্বেচ্ছাবিন্দু পনে বঞ্চিত হয় না, যিনি পথপ্রান্ত পথিকের সকল প্রান্তি কণিকের মধ্যে বিভাজিত ক'রে অনির্বচনীয় শান্তির ক্রোড়ে

নিরে ধান, ধীর স্পর্শনে শোকাভূত জননীর
আকুল ক্রন্দন সহসা ঘের কোণার অন্তর্হিত
হ'য়ে যায়, রোগের যন্ত্রণার রোগী ছটফট
করিতেছে—বৈজ্ঞের শতশত ঔষধ বিফল হ'য়ে
গেল—জীবন যায় যায়—সকলে হতাশ-প্রাণে
ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিতেছে, এমন
সময়ে ধীর আগমন-বার্তা দর্শকবৃন্দের শুষ্কমুখে
হাসি ফুটিয়ে তোলে, ধীর অগাধকরণার
আমরা প্রতিদিন নবজীবন লাভ করি, সেই
অসামান্য শক্তি-সম্পন্ন নিদ্রা জিনিষটা কি
তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। ভাবিলে
ভগবৎ শক্তির মাহাত্ম্য দেখিয়া আনন্দে
বিভোর হইতে হয়। কিন্তু হায়। আমরা
স্বচ্ছন্দে সে রসে বঞ্চিত।

নিদ্রাকে কেবল শারীরিক চেষ্টা-বিশেষ
ব'লে জানিলেই সম্যক্ জ্ঞান হয় না। তাঁকে
জানিতে হইলে যিনি তাঁর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, ধীর
ইচ্ছার এবং ধীর শক্তি নিদ্রারূপে জীব দেহে
কার্য্য করে তাঁকে জানিতে হয়। যিনি সেই
সর্ব্বজ্ঞ মূলকর্ত্তাকে নিজের রূপে স্থান দিতে
সমর্থ হন তাঁর অস্ত্রের কিছু থাকেনা। তাঁকে
জানাই সম্যক্ জ্ঞান হয়। সেই দেবতার অমুগ্রহ
প্রাপ্ত মানুষই একমাত্র সত্য আবিস্কার করিতে
সক্ষম এবং সেই সত্যই ত্রিকালে অব্যাহত
থাকে; অতএব আমি সেই দেবতাবিষ্ট
ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের আবিষ্কৃত সত্য বাহা
নিদ্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতার বাণীকূপে ঋষিগণের
দ্বারা সংপ্রকাশিত হয়েছিল তাহাই বথাসাধ্য
প্রকাশ করিয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত
করিতেছি।

জাগতিক কোন পদার্থই নিরন্তর সুখ বা
দুঃখ দিতে পারেনা। ভগবান্ বাহা কিছু

দিয়াছেন তাহার এমন একটামাত্র। ও অবস্থা
নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, ঠিক সেই মাত্রায়
ও অবস্থায় প্রযুক্ত হইলে তাহা সুখাবহ হইবে;
নতুবা দুঃখ দিবে। অন্ন যেমন সাক্ষাৎ
প্রাণস্বরূপ হইয়াও অযুক্ত-যুক্ত প্রয়োণে
জীবন-নাশের কারণ হয়—যে বিষকে যমের
অমৃতের ব'লেও অতুক্তি হয় না, সেই বিষও
যেমন অবস্থা-ভেদে যুক্তিযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইলে
মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে এনে দেয়, সেইরূপ
প্রত্যেক পদার্থেই হিতাহিত সুখদুঃখ ভেদ-
প্রভেদ আছে বিদ্যমান। মানুষ কর্তব্যকর্তব্যে
অনিভিজ্ঞতা অথবা জ্ঞান সত্ত্বেও কার্য্যে সামর্থ্য-
হীনতা অথবা স্থিতির অভাব বশতঃই রোগ বা
দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা যদি আর্ষ্য
ঋষিগণের উপদেশ মত কার্য্য করিতে পারি,
তাহাই হইলে যে, নীরোগা হইয়া সুখে দীর্ঘ জীবন
লাভ করিতে পারিব তাহাতে কোনই সন্দেহ
নাই। ভগবান্ নিদ্রাকে আমাদের দেহের
ক্ষয় পূরণ করিতে, প্রসূতা সম্পাদন কারতে
এবং সকল দাঁতুর আদি যে রস বাতু তাহাকে
বদ্ধিত করিতে অমুমতি এবং তদুপযুক্ত শক্তি
দিয়ে পাঠায়েছেন। সে তাহা করিবেই।
যেমন অগ্নির দাহক শক্তি আছে, সে দগ্ধ
করিবেই, তাহার দ্বারা আর্শনি প্রয়োজন মত
ভাল মন্দ উভয় কাঙ্ক্ষাই করাইতে পারেন;
সেইরূপ নিদ্রার বাহা কর্তব্য সে তাহা করিয়া
যাইবে, আপনি যদি তাহাকে প্রয়োজন
অনুযায়ী কার্য্যে লইতে পারেন তাহা হইলেই
নিদ্রা সুখপ্রদ হ'বে, নতুবা নয়। মনে করুন
আপনার শ্রেষ্ঠা বুদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ দেহে যে
পরিমাণ জীবাণু বাহ্যের অমুকুল—তাহার
অধিক হইয়াছে, সে অবস্থার যদি আপনি দিবা

নিদ্রা যান তাহা হইলে নিদ্রান্ত দৈর্ঘ্যে না যে আপনার শ্লেষ্মা অধিক আছে, কাজেই তাহার যাহা কার্য্য শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করা, তাহা করিল এবং তাহার ফলে আপনাকে শয্যাশায়ী হইতে হইল। এই যে আপনার কষ্ট ভোগ তাহার জন্ত নিদ্রা দায়ী নহে, দায়ী আপনার কর্ম এবং তাহার ফলে জ্ঞানেন্দ্রিয় ভ্রান্ত।

নিদ্রা অকালে, অতিমাত্রায় বা অল্পমাত্রায় সেবিত হইলে অথবা একেবারেই সেবিত না হইলে নানারূপ রোগের উৎপত্তি হয় এবং সম্ভবই আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া থাকে। লক্ষণ যে ছাদশ বৎসর অনিদ্রায় ছিলেন তাহা অগৌলিক অথবা অভ্যাস ও সাধনাসাধ্য।

আমরা সমীক্ষিতঃ উত্তম ও অধম ভেদে নিদ্রার দুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ উত্তম অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা, যাহাতে চিত্তবৃত্তি একেবারে অন্তর্হিত হয়, কোনরূপ স্বপ্ন পর্য্যাপ্ত থাকে না, ইহাকেই সুশুপ্তি বলে। যে নিদ্রায় স্বপ্ন দর্শন হয় তাহাকে অধম নিদ্রা বলা যায় এই নিদ্রাই অধিকাংশ লোকের হইয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থায় যে সকল শুভাশুভ বিষয় অনুভূত হয়, নিদ্রাকালে জীবাত্মা রজোগুণ বিশিষ্ট মন দ্বারা সেই সকল বিষয় গ্রহণ করেন। এইরূপ পূর্বকর্ত্তের অনুভূত বিষয়ও নিদ্রাকালে জীবাত্মা অনুভব করিয়া থাকেন। তাহারই নাম স্বপ্নদর্শন। নিদ্রার স্বপ্ন বা লঘু অবস্থাতেই স্বপ্ন হয়। কাবণ এই নিদ্রায় বায়ুর সঞ্চক থাকায় মন কিছু কিছু কাজ করে, অথচ নিজের বশে থাকে না। কোন কোন নিদ্রা কেবল স্বপ্নময়। নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্ন যোগে কখন রাজা, কখন বা কৃষ্ণকাল হয়। কখন আনন্দ লাগবে

তাসিতে থাকে, কখন কান্দিয়া আকুল হয়। এক একজন স্বপ্ন যোগে একরূপ কাজ করিয়া বসে। যাহা শুনিতে আশ্চর্য্যবিত হইতে হয়। অনেক দিন পূর্বে আমি এক ব্যক্তিকে গভীর রজনীতে নিদ্রাবস্থায় উঠিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া ক্রোশাধিক পথ যাইতে শুনিয়াছিলাম। আর একটা লোক ঘুমাইতে ঘুমাইতে সমস্ত রাত্রি দ্বিতলস্থ এক অনাবৃত ছাদে ভ্রমণ করিয়াছিল। নিদ্রা একটা রহস্যময় ব্যাপার। নিদ্রার পূর্বে সর্বাঙ্গীন অবসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এক অন্তঃত শক্তি যাহাকে আমরা দৈবী শক্তি বলি—মন ও বীরের উপর কার্য্য করিতে থাকে। অক্ষিগ্নয় ভার হয় ও মুদ্রিয়া যায়। ক্রমে দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, ও স্পর্শ শক্তি, পর্য্যায়ক্রমে স্তিমিত হয়, বাস প্রস্থাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্ষীণ হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে। বহিমুখী গতি—অন্তর্মুখী হয়।

নিদ্রার মত আর একটা জিনিষ আছে, তাহাকে তন্ত্রা বলে, ইহাও অতি প্রসিদ্ধ। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিখবার প্রয়োজন নাই। নিদ্রা ইন্দ্রিয় ও মন উভয়েরই মোহ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রূপ রসাদি নিজ নিজ বিষয় গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া থাকে, কিন্তু তন্ত্রায় কেবল ইন্দ্রিয় মোহ, ইন্দ্রিয় সকলের অস্পষ্ট অনুভূতি থাকে এবং নিদ্রার্ত্ত ব্যক্তির হ্রাস চেষ্টা ও দেহের ভার বোধ হয়। নিদ্রাবেশে বোধ করিলে অর্থাৎ থিয়েটার বাত্মা অথবা বিবাহাদি কোন উৎসব বশতঃ নিদ্রাকে বর্জন পূর্বক বিভাঙিত করিলে, তন্ত্রা হয়, একরূপ স্থলে নিদ্রা ও সংবাহন (গাটেপান) হিতকর।

কোন কোন রোগের লক্ষণেও তজ্জা থাকে ।

মহাবি চরক নিজার ছয় প্রকার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—

তমোভবা স্নেহা সমুভবা চ মনঃ শরীর শ্রম
সমুভবা চ

আগন্তকা ব্যাধ্যাহুর্জিনী চ রাত্রি শ্রভাব প্রভবা
চ নিজা ॥

রাত্রি শ্রভাব প্রভবা মতা যা তাং তৃত্বধাত্রীঃ
প্রবদন্তি নিজাঃ

তমোভবামাহরষতমূলং শেখঃ পুনর্ব্যাধিযু
নির্দিশন্তি ॥

নিজা তমোশুণ হইতে উৎপন্ন হয়, স্নেহা হইতে উৎপন্ন হয়, মন ও শরীরের শ্রান্তি হইতেও উৎপন্ন হয়, আগন্তক কারণে অর্থাৎ অহিনেনাদি সেবনেও উৎপন্ন হয়, কোন কোন ব্যাধি হইতেও উৎপন্ন হয়, লোকে নিজাকে তৃত্বধাত্রী কহিয়া থাকে, কেহ তমোভবা নিজাকে পাপের মূল কহেন এবং অন্তান্ত নিজাকে ব্যাধির মধ্যে গণ্য করেন ।

তমো শুণ জন্ম নিজা যথা—যে সকল আলস্তপরায়ণ ব্যক্তি দিবা রাত্রি উভয় কালেই নিজা যান—তাদের অধিকাংশই তমোশুণ প্রধান । তমো শুণ হইতে নিজা কিরূপ হয় তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের প্রকৃতি সমুদ্র স্রব, রজ, তমো এই তিনটি গুণের বিধে কিকিঞ্চ জ্ঞান থাকা আবশ্যক । যতপি অনেকেই এই শুণ তিনটির বিষয় কিছু কিছু অবগত আছেন, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে কিকিঞ্চ বলা প্রয়োজন ।

আমরা আগতিক বাহা কিছু দেখি,

প্রত্যেক বস্তুই কোন না কোন শুণ বিশিষ্ট, নিশ্চয় কোন বস্তুই নাই । যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি পঞ্চ মহাত্মতের প্রধান শুণ । ইহাদিগকে বাদ দিলে আর কাহারও অস্তিত্ব থাকে না । শাস্ত্র বলেন—যাহাতে শুণ কর্ম আশ্রয় করে—তাহাকেই দ্রব্য কহে । সেইরূপ স্রব রজ ও তমো এই শুণ তিনটিকে বাদ দিলে জগতের বাহা মূল কারণ বাহার বিকারকেই আমরা জগৎ বলি—সেই প্রকৃতিকে আর পাওয়া যাইবে না । প্রকৃতি না থাকিলে তার বিকৃতি জগৎও থাকিতে পারে না । বিকৃতি কি তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি । সমতা প্রকৃতি ও বিঘ্নমতা বিকৃতি । সমতা যথা, সকল দ্রব্যোই ছয় প্রকার রস আছে, কিন্তু যদি এমন কোন দ্রব্য পাওয়া যায় যাহাতে ছয় প্রকার রসই সমভাবে বিস্তমান, তাহা হইলে কোন রসেবই আনন্দন সেই বস্তুতে পাওয়া যাইবে না । সকল রসই তাহাতে আচ্ছাদিত ভাবে বিস্তমান সত্ত্বেও কোন রস যে তাহাতে আছে ইহা কাহারও বোধগম্য হইবে না । সেইরূপ স্রব, রজঃ তমো এই শুণ তিনটি যখন সমভাবে থাকে অর্থাৎ যখন প্রকাশও নয়, অপ্ৰকাশ নয়, জ্ঞানও নয়, অজ্ঞানও নয়, সুখও নয়, দুঃখও নয়, এই যে দ্বন্দ্বাতীত অব্যক্ত অবস্থা—ইহাকেই প্রকৃতি এবং কোন শুণ ব্যক্ত হইলেই তাহাকে বিকৃতি বলে । কোনও একটি গুণের আধিক্য বা অল্পতা না হইলে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে না । দুইজন মল্লযুদ্ধ করিতেছে—যদি উভয়েরই শক্তি সমান থাকে—তাহা হইলে উভয়েরই একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবে, কেহই

হটবে না । যদি এক জনের বল বেশী হয়, সে অপরকে হটাইবেই ।

সবঃ, রজঃ তমো এই তিনটি গুণ সমভাবে (অব্যক্ত অবস্থায়) না থাকিলে সৃষ্টি হইতে পারে না, এই জন্ত বন্দ লইয়া জগৎ এবং ঘনাতীত অবস্থাকে সৃষ্টি বলে । বাহ্য হটুক শুড়ের মধুবতা যেমন শুড়, বিকার চিনি মিছরী প্রভৃতিতে সংক্রামিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতির গুণ সকল প্রত্যেক জীবের বিদ্যমান থাকিয়া স্বকীয় কার্য্য সুখ দুঃখ মোহাদি দ্বারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ জীবাত্মাকে দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া থাকে । যেমন লক্ষণ দ্বারা রোগ নির্ণয় করিতে হয়, সেইরূপ কার্য্য দেখিয়া সব রজ, অথবা তমো গুণের স্থিতি কনিয়া লইতে হয়, মানবদেহে প্রতিনিয়ত এই গুণত্রয়ের যুদ্ধ চলিতেছে, যখন যে গুণের প্রাধান্য হয়; তখন মানসিক অবস্থাও ঠিক সেই ভাবে পরিবর্তিত হইতে দেখা যায় । যখন সখ-জ্ঞান জন্মে, সকল বস্তুতেই সেই বিরাট পুরুষের অস্তিত্ব অনুভব করে, সুখ দুঃখ মানাপমান তুল্য হইয়া যায় স্বার্থ বুদ্ধি থাকে না, সত্য জ্ঞান হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তখনই সখগুণের প্রাধান্য হইয়া থাকে । যখন আসক্তি বৃদ্ধি হয়, কর্ম্ম স্পৃহা প্ৰবল হইয়া উঠে, নিত্যকে অনিত্য ও অনিত্যে নিত্য বোধ জন্মে; অহঙ্কার, দম্ব, মান, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইতে হয়, তখনই রজো গুণের প্রাধান্য বৃদ্ধিতে হইবে । যখন জ্ঞান আবৃত, কোন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকে না, বিবাদ, নাস্তিকতা, দ্বিষ্ট বুদ্ধিতা, অশ্রদ্ধা, অসংস্কারিতা, ও নিদ্রাধিক্য হইয়া থাকে, তখনই তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে । জ্ঞানকে

আবৃত করা তমোগুণের কার্য্য । যখন দেখিব জ্ঞানোচ্চর, কে যেন তাহার প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করিয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে তমোগুণের আধিক্য বশতঃ সব ও রজঃগুণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে এবং তমোগুণ তাহার দ্বাভাবিক শক্তি দ্বারা জ্ঞান বাগ্নো নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে ।

হৃদয় চেতনার স্থান, তাহা তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইলে শরীরে নিদ্রা প্রবেশ করে অর্থাৎ চিন্তা অবসাদ জন্মিয়া তাহার কার্য্য-করী শক্তি নষ্ট করিয়া দেয় । তখন ইন্দ্রিয়গণও সারথির অভাবে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় । বিশ্রাম উপভোগ নিদ্রা যে তমোগুণের কার্য্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাহা বলিয়াছেন ।

তমস্ত জ্ঞানস্ত বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্
পমাদালস্ত নিদ্রাভিস্তরিতপ্রাতি ভারত ॥

এখন দেখা যাউক তমোগুণজাত নিদ্রাকে পাপের কারণ বলা হইয়াছে কেন ? পাপ তাহাতে বলা এত প্রাচুর্য উত্তরে আমরা দেখিতে পাই, বাহ্য আত্ম বিকাশের প্রতিকূল, বাহ্য ঈশ্বরের নিকট থেকে দূরে নিধে যায় তাহাকেই পাপ বলিয়া থাকে । এই আত্ম বিকাশের প্রতিকূল পরার্থ টীর নাম অজ্ঞান বা মোহ । এই মোহই ভগবানকে চিনতে দেয় না । এখন আমরা যদি অনুসন্ধান করি মোহ কোথা থেকে আসে—কে তাহার জন্ম দাতা—তাহা হইলে দেখিতে পাইব তমোগুণই তাহার কারণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে । তাহা হইলে তমো গুণই যখন মূলতঃ পাপের কাবণ হইল, তখন তজ্জাত নিদ্রাও যে পাপের কারণ হইবে, তাহাতে আব কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না । তমোগুণ যেমন

নিদ্রাকে বর্ধিত করে, নিদ্রাও যেমনই তমো-
 গুণকে বর্ধিত করে। যা'র তমোগুণ যত
 বেশী, সে জ্ঞানরূপী ভগবানের নিকট থেকে
 তত বেশী দূরে সরে যায়। অতএব অধিক
 নিদ্রার যেমন বোগ জন্মায় সেইরূপ পাপও
 জন্মাইয়া থাকে। ঔষধের যেমন রোগ-বিনা-
 শক শক্তি থাকে, সেইরূপ তমোগুণেরও নিদ্রা
 জনক শক্তি আছে—ইহা একটু চেষ্টা করিলে
 সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এখন শ্লেষ্মা
 জন্ম নিদ্রার বিষয় আলোচনা করা যাউক।
 শ্লেষ্মা কাহারও অপরিচিত নহে। যা'কে
 সর্দি লাগা বলে, তাহা ঐ শ্লেষ্মারই—
 কর্ম। শ্লেষ্মা প্রধান ব্যক্তির নিদ্রা অধিক
 হয়। শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে যেমন নানাবিধ
 রোগের উৎপত্তি হয় সেইরূপ নিদ্রার আধিক্য
 জন্মাইয়া থাকে। শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দ্রব্য প্রায়ই
 নিদ্রা বর্দ্ধক হয়। আহারের পর যে নিদ্রার
 ভাগ আসে, শয়্যা গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মায় ঐ
 আহার জন্ম তাৎকালিক শ্লেষ্মা বৃদ্ধিই তাহার
 কারণ। শ্লেষ্মা জন্ম নিদ্রাকে জানিতে হইলে
 প্রথমে শ্লেষ্মার ধারণা করা প্রয়োজন, অতএব
 শ্লেষ্মা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলি আবশ্যক।
 সকলেই জানেন যে, ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও
 আকাশ এই পাঁচটি মহাভূতের সংমিশ্রণে
 আমাদের এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ প্রস্তুত
 হইয়াছে। এই পঞ্চভূতই তিন ভাগে বিভক্ত
 হইয়া বায়ব্য, আশ্বয়, ও সৌম্যরূপে জীবদেহে
 বর্তমান থাকে এবং স্বয়ং কার্য দ্বারা বহুকে
 রক্ষা করে। যখন সৌম্য (জলীয়) ভাগের
 আধিক্য ঘটে অর্থাৎ বহুতুক জলোরাংশ দেহ
 রক্ষার উপযোগী—তদনুসারে অধিক হইয়া পড়ে,
 তাহাকেই আমরা শ্লেষ্মা বৃদ্ধি বলিয়া থাকি।

শ্লেষ্মার যে আশ্রয়ন শক্তি আছে তাহা দ্বারা
 সে চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। গুরুতা
 প্রযুক্ত শারীরিক যন্ত্রগুলি গুরুভার বহন
 করিয়া কার্য্য করায় অবশ্য হইয়া পড়ে এবং
 জলীয় ভাগের আধিক্য বশতঃ স্রোত সকল
 বদ্ধ হওয়ার মন তাহার পথ দিয়া ইচ্ছিন্নগণেব
 নিকট পৌঁছিতে পারে না, বিষয় গ্রহণও হয়
 না। জড়ত্ব হেতু দেহেবও জড়তা বৃদ্ধি
 করিয়া তমো গুণের কার্য্য প্রকাশ করে ও
 নিদ্রা জন্মায়। অথবা ক্ষিতি ও জল নামক
 যে দুইটা ভূতের আধিক্যে শ্লেষ্মার উৎপত্তি,
 সেই দুইটাই তমোগুণ বহুল বলিয়া চিত্তের
 অবসাদক হয়, অতএব মনোবিগল নিদ্রাকে
 কফের কর্ম বলিয়াছেন যথা—

“চিরকর্তৃত্ব শোথো নিদ্রাধিক্যঃরসৌ

পটুস্বাত

বর্ণঃ স্বেতোহলসতা কর্ম্মণি কক্ষসা

জানীয়াৎ

বায়ু নিদ্রানাশক ও কক্ষ নিদ্রাজনক ইহা
 যদি আমরা শরীরের দিকে একটু দৃষ্টি রাখি—
 তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব। নিদ্রার যে
 ছয়টা কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে ইন্দ্রিয় তমো ও
 শ্লেষ্মাই প্রধান বা ক্ষেত্র (উৎপত্তিস্থান)।
 যেমন শস্যের ক্ষেত্র ভূমি, ভূমি ভিন্ন শস্য
 জন্মিতে পারে না। এই প্রকার প্রত্যেক
 রোগেরই এক একটা ক্ষেত্র আছে। যেমন
 পিত্তকে জ্বরের ক্ষেত্র বলে, যেহেতু পিত্ত ভিন্ন
 জ্বর হইতে পারে না। জ্বর মাত্রই সন্ধ্যাপ আছে,
 সেই সন্ধ্যাপ পিত্ত ভিন্ন থাকে না। সেইরূপ
 তমো ও শ্লেষ্মাই নিদ্রা জন্মায়, এই দুইটা ভিন্ন
 জন্মিতে পারে না। নিদ্রার যে মোহ থাকে,

তাঁহা তমোগুণ না হইলে হইতে পারে না এবং স্নিগ্ধবাদি গুণও শ্লেষ্মা ভিন্ন হয় না । অতএব তমো ও শ্লেষ্মাই নিদ্রার ক্ষেত্র বৃত্তিতে হইবে, অতীত গুলি সহায় হয় মাত্র । তন্মধ্যে যাহার প্রাধান্য থাকে—যে প্রধান ও প্রথম কারণরূপে প্রতীয়মান হয়—আমবা তাহাকেই নিদ্রার কারণ বলি । তমো জন্ত নিদ্রাতে শ্লেষ্মা এবং শ্লেষ্মা জন্ত নিদ্রাতেও তমোগুণ থাকে । কিন্তু প্রাধান্য অনুসারে নাম নির্দেশ হয় ।

তমোগুণের কার্য্য যে সংজ্ঞানাশ—তাহা মুচ্ছা, ভ্রম, তন্দ্রা ও নিদ্রা এই সকলের মধ্যেই থাকে । কিন্তু আমরা যে উহাদের পার্থক্য প্রকৃত করি—তাহার কারণ বাত-পিত্ত শ্লেষ্মা । উহারাই নিজ নিজ পৃথক পৃথক কার্য্য দ্বারা পার্থক্য প্রদর্শাইয়া থাকে । এই জন্ত শাস্ত্রকার উহাদের ভেদ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন ।

মুচ্ছা পিত্ত তমো প্রায়ঃ বজ্রঃ পিত্তানলাদ ভ্রমঃ
তমো বাত কফঃ তন্দ্রা নদ্রা শ্লেষ্মা তমো ভবা ॥

এই প্রকারেই আমরা যে নিদ্রা হয় তাহা যেন ভগবানের আশীর্বাদ প্রকৃপ । তিনি যেন তাঁ'র অনুচরবর্গকে পরিগ্রহে কাতর দেখে দয়াবশে হৃদয়ে ছুটি দিয়েছেন । যনও ইচ্ছিয়গণ ক্রান্ত হইয়া যখনই ছুটির প্রার্থনা জানায়, আশ্রয়ী ভগবান্ সচতুর প্রহর মত তৎক্ষণাৎ তাঁ'দের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন । নেত্র-মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন জ্ঞানরূপী স্বপ্নগুণও জুজিয়ে যায় । তমোগুণ তাঁ'র সমস্ত শক্তি দ্বিগুণ সহ ও বজ্র গুণকে স্থাভিত্ত করি ফেলে ।

ইচ্ছিয়গণ নিজ নিজ আশ্রয়ে বিশ্রাম স্থখ

উপভোগ ক'রে নববনে বলীয়ান হয় । কে যেন অজ্ঞাতসারে কোথা থেকে নূতনশক্তি নিয়ে এসে তাঁ'দের শরীরে প্রবেশ করিয়ে চ'লে যায় । জাগরণের সঙ্গেসঙ্গেই তাঁ'রা নূতন ক্ষু'তি—নূতন উত্তম নিয়ে আবার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় । এইজন্যই শাস্ত্র ব্যক্তির দিবানিদ্রা অজ্ঞার নহে ।

আকস্মিক কারণে যে সকল নিদ্রা উপস্থিত হয় তাহাদিগকে আগন্তুকী নিদ্রা বলে । যেমন অহিষ্কেনাদি সেবন জন্ত নিদ্রা । অহিষ্কেনের এমন একটা আকর্ষণ আছে, যাহা দ্বারা সে শুধু মনকেই আকর্ষণ করে না, শারীরিক যাবতীয় যন্ত্রকেই সজ্জ্বিত করে এবং সেই আকর্ষণের ফলে স্বপ্নদ্বারে বসপুংক মুদ্রিত করে, তখন ইচ্ছিয়গণ কন্ড করিতে সমর্থ হয় না । কে যেন ভিতর হ'তে চক্ষুর পাতা ছুটিকে টানিয়া নামিয়ে দেয়, তখন আমাদের কাছে বাদ্য হয়ে নিদ্রার আশ্রয় নতে হয় । ডাক্তার আলেকজান্ডার ফ্রেমিং বলেন, গলাব উত্তর পার্শ্বস্থ কেরোটিড ভ্রমনী অঙ্গুলী চাপিয়া ধরিলে ও নিদ্রা আইসে । এতদ্বারা মস্তকের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শিবা সকলের সাময়িক সংকোচন হইয়া অতীষ্ট সিদ্ধ হয় । ইহাও আমাদের আগন্তকের মধ্যে পরিগণিত । কোন কোন ব্যাধিতে নিদ্রা ও অনিদ্রা উভয়ই উদ্ভবরূপে উপস্থিত হয় । যেমন শৈল্পিক জবে অতিশয় নিদ্রা ও বাতিক জবে অনিদ্রা হয়, এসকল স্থলে কেবল শ্লেষ্মাকেই নিদ্রা কারণ বলিতে চণিবে না । কারণ তাহা হইলে শ্লেষ্মা জন্ত যত প্রকার রোগ আছে সকল রোগেই নিদ্রা হইতে পারিত তাহা হয় না । অতএব বৃত্তিতে হইবে কোন কোন ব্যাধিরও এমন একটা শক্তি আছে

যাহা নিজা জন্মাইবার পক্ষে সহায়তা করে। এই নিজা মূল রোগের উপশমের সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়। যে সকল স্থানে রোগ অপেক্ষা উপদ্রবের প্রাবল্য দৃষ্ট হয় সে স্থানে উপদ্রবেরও পৃথক চিকিৎসা আবশ্যক, অতএব যদি নিজা বা অনিদ্ভার এমন অনিষ্টজনক আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহাদের পৃথক চিকিৎসা করিতে হইবে। যে নিজা রাত্রি স্বভাববশতঃ প্রতিদিন হইয়া থাকে উহাকেই স্বাধিগণ জীবজননী বলিয়াছেন। নৈশ অন্ধকার ও নিম্নকৃত্তা বায়ু মণ্ডলীর উত্তেজনা দূর করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিদ্ভাকর্ষনের বেশ সুবিধা করিয়া দেয়। এ নিজা অস্ত্রান্ত্র নিদ্ভার জ্বর কারণ হইতে জ্ঞাত নহে। সকলকেই সমভাবে ইহা আশ্রয় দিয়া থাকে।

পেচক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী আছে তাহারা রাত্রিতে ভাগ্রত থাকে ও দিবাভাগে নিজা যায়। সাপ, ব্যাঙ, প্রভৃতি কেহ কেহ সমস্ত শীত কালটা নিদ্ভার কাটায়। আবার বোহিত মৎস্য একেবারেই নিজা যায় না। আমরা বহু প্রাণী দেখিতে পাই অধিকাংশই রাত্রিতে নিজা যায়। নিদ্ভার অনেক প্রকার আশ্চর্য্য অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ শয়নের পর নিমেষ মধ্যেই নিদ্ভার মগ্ন হয়। আবার কাহারও বা অনেক পরে নিজা আইসে। কোন কোন ব্যক্তির নিদ্ভাবস্থায় ভয়ানক নাসিকা গর্জিতে থাকে। ঐ গর্জনে বাড়ীর অস্ত্রান্ত্র লোকের ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়। 'হা' করিয়া ঘুমাইলে বাস গ্রহণ কালে তালুতে বায়ুর আঘাত লাগিয়া ঐ শব্দ উৎপন্ন হয়। গলায় মধ্যে আলমিড্ বড় থাকিলে অথবা স্নেহায়নাক বন্ধ থাকিলেও ঐরূপ শব্দ হইতে

পারে। কেহ কেহ নিজাবস্থায় ভয় পায়, মনে করে কে যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিতেছে। সে নিশ্বাস কেলিতে পারে না, শ্বাস কটে অস্থির হইয়া উঠে, হস্ত পদাদি অবণ হয়, নাড়িবার শক্তি থাকে না। এই কণ্ঠময় জগতে সর্বদা কাজ করিবার জন্তই বিধাতা জীব সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং কণ্ঠের উপযোগী বাহা কিছু দরকার সমস্তই দিয়াছেন। রাত্রিটা যেন কেরাণীদের রবিবার, অকিস বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ইলো ট্রিকের কারেন্ট বন্ধ হয়। আলো আর জ্বলে না। বিনা প্রয়োজনে এক কপর্দিকও ব্যয় করিতে মহাজন রাজী নয়; অথবা কেরাণীদের সঙ্গে সঙ্গে তা'রাও ছুটি পায়। যদি কেহ দিনের বেলায় (অকিস টাইমে) কণ্ঠক্ষেত্রে নিযুক্ত না থাকে; তাঁর আদিষ্ট কণ্ঠে অবহেলা প্রদর্শন করতঃ নিদ্ভাস্থ উপভোগ করিতে চায়, বিশ্বপ্রভু তাঁকে ভবনদী উত্তীর্ণ হ'বার মাটিকিতে ত দেনই না। অধিকন্তু আইন অমান্ত জন্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যথোচিত শাস্তি দিবে বাহাতে পুনর্বার এরূপ পাপ কর্ম না করে তাহার জ্ঞান জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। এই জন্তই আমাদের উপনয়নে 'মা দিবা স্বাস্তী' বলিয়া দিবা নিদ্ভার নিষেধ করা হইয়াছে। এস্থলে অনেকের এরূপ প্রশ্ন আসিতে পারে যে, যদি দিবা নিদ্ভা পাপই হয় তাহা হইলে শূদ্রের পক্ষে এরূপ নিষেধ নাট কেন। সকল প্রকারই তো সকলের পক্ষে সমান যে মতপান ব্রাহ্মণের মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত, তাহা শূদ্রের পক্ষেও পাপ নহে কি। বুকের বাহা পাপ

বালকের ভাষাতে পাপ নাই। 'অকাল মৃত্যুর যতগুলি কারণ আছে তন্মধ্যে দিবানিদ্রা অগ্রতম। দিবানিদ্রা অতি কৰ্ম্মা কৰ্ম্ম; অসময়ে বা অতিশয় নিদ্রা গুণ্ড কাস, শ্বাস, প্রেতিশ্যার মস্তকের ভার, অঙ্গমর্দ, অরুচি, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, হলীমক, শিরঃশূল, 'স্তৈমিত্য, গাত্রভার, হৃদয়ের উৎক্ৰেশ, শোথ, হল্লাস, 'গীনস, অর্দ্ধাবভেদক, কোঠপিড়কা, কণ্ঠ, তন্দ্রা, কর্ণরোগ, স্মৃতিনাশ, বুদ্ধিনাশ, শ্রোত্রোরোধ ইন্দ্రిয়গণের সামর্থ্যহীনতা প্রভৃতি বুদ্ধি হইয়া থাকে।

রাত্রিকালে আগরণ করিলেও বায়ু, পিত্ত গুণ্ড ঐ সকল উপদ্রব জন্মাইতে পারে। অতএব রাত্রি আগরণ ও দিবানিদ্রা—উভয়ই বর্জন করিতে শাস্ত্রের উপদেশ আছে। প্রায় দেখা যায় নিকর্মা লোকেরা দিবসের অধিকাংশ সময় নিদ্রায় ব্যয় করিয়া থাকেন। আবার পক্ষান্তরে কৰ্ম্মবীরেরা কাষের নেশায় পড়িয়া সময়ে সময়ের নিদ্রার নিয়মিত কালকেও প্রায় নির্বাসিত করিবার যোগাড় করিয়া তোলেন। এতদুভয়ই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল।

রাত্রি আগরণে পরীরের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। দিবানিদ্রায় শিথলতা বৃদ্ধি হইয়া স্নেহা গুণ্ড রোগ সকল জন্মায়।

গ্রীষ্মকালে লোকের শরীর উত্তরায়ন কাল-ধর্ম্মে ক্ষুধ হয়। তখন দেহে বায়ু সঞ্চিত হইতে থাকে। আদানকালের পরিপূর্ণতা হেতু স্বর্ঘ্যের তেজ বৃদ্ধি হয় এবং দিনমান বৃদ্ধি হওয়ার স্বর্ঘ্য আমাদের, দেহ হইতে অগ্ন্যন্ত গুত্ব অপেক্ষা এই গুত্বতে অধিক রস গ্রহণ করেন! রাত্রিমান অন্ন হওয়ার এবং

গ্রীষ্ম গুণ্ড রাত্রিতেও উপযুক্ত নিদ্রা হয় না। অতএব কেবল গ্রীষ্ম গুত্বতেই দিবানিদ্রা প্রশস্ত। ঐ গুত্বতে স্বর্ঘ্য-সম্ভাণে অধিক ক্ষয় হওয়ার স্নেহা বর্জিত না হইয়া ক্ষয়পূরণের সহায়ক হয়। আমাদের শরীরের জলীয় ভাগ শারীরিক উষ্ণা দ্বারা উত্তপ্ত হইয়া সর্বদা বাষ্পাকারে উথিত হইতেছে। তাহা এত সূক্ষ্ম যে, কেবল শীত গুত্ব ভিন্ন অমূল্যব করিতে পারা যায় না। শীতকালে বাহিরের শৈত্যপ্রভাবে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প গাঢ় হইয়া ধূমাকারে উথিত হওয়ার দেখিতে পাওয়া যায়।

সমস্ত দিনে যাহা ক্ষয় হয় রাত্রিতে নিদ্রা দ্বারা তাহার পূরণ হইয়া সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। সকল বিষয়েরই একটা নিয়মিত মাত্রা আছে, তাহার অধিক বা অল্প হইলেও দুঃখের কারণ হয়। আমরা যদি রাত্রিতে আগরণ করি, তাহা হইলে নিদ্রার যে ক্ষয় পূরণ হইত তাহা হইতে পারে না। তাহার ফলে বায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবার যদি দিবসে নিদ্রা ঘাই, তাহা হইলেও আগরণে যে ক্ষয় হইত তাহা না হইয়া স্নেহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি উভয়ই দোষজনক জানিয়া পরিমিত রূপে নিদ্রা ঘাইবেন। নিদ্রা পরিমিত হইলে দেহ নীরোগ ও বল বর্ধ যুক্ত হয়—স্থূল বা ক্লশ না হইয়া মধ্য ভাবে থাকে। একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক ৭৮ ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন। রাত্রি ৯টা হইতে ৪টা অথবা ৫টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়াই বিধি। বৃদ্ধদিগের পক্ষে পূর্ণ বয়স্ক অপেক্ষা নিদ্রার পরিমাণ আরও কিছু বৃদ্ধি করিতে হইবে, কারণ বার্দ্ধক্যে

শারীরিক ক্ষয় অধিক হইতে থাকে । শিশুদের বধেই ঘুমাইতে দেওয়ার বিধি আছে । ৪ ঘণ্টাতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ১০ ঘণ্টা ঘুমান মাত্রা করা মন্দ নহে ।

অরুণোদয়ের পূর্বেই শয্যাভ্যাগ করা বিধেয় ।

এই সময়ের বায়ু পবিত্র ও মিশ্রল থাকায় দেহ রক্ষার সমধিক উপযোগী হয় । অধিক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া উঠিলে শরীরে জড়তা বৃদ্ধি হওয়ার ভেদন ক্ষুণ্ণির সঞ্চার হয় না ।

তাহা ছাড়া চক্ষু দুটা অকালে শক্তিশীন হইয়া পড়ে । সমস্ত রাত্রি যে চক্ষু মুদ্রিত অবস্থার ছিল, তাহাকে হঠাৎ যদি সূর্যের প্রথর কিরণের মধ্যে ধোলা হয়, তাহাতে দ্রাব্য মণ্ডলীর অস্বাভাবিক উত্তেজনা বশতঃ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়া থাকে ।

দিবানিত্রা দোষাবহ হইলেও আশার এমন কতকগুলি স্থান আছে যেখানে দিবা নিত্রাতে অপকার না হইয়া থাকে । কারণ সে স্থানে রোগের বৃদ্ধিরই প্রয়োজন ।

যে যে অবস্থার দিবা নিত্রা প্রশস্ত, মহামতি চরক একটা শ্লোকে তাহার উপদেশ দিয়াছেন । শ্লোকটির অর্থ এই,—

“বাহারী গীত, অধারন, মদ্যপান, জীসংসর্গ, গরিশ্রম, ভারবহন ও পথ ভ্রমণ দ্বারা ক্লান্ত হইয়াছেন ; বাহারী অজীর্ণ রোগী, ক্ষত রোগী বা ক্ষীণ রোগী—বাহারী বৃদ্ধ বা বালক বা শ্রবল, বাহারী পতিত, আহত বা উন্নত, বাহারী তৃষ্ণা, অতিসার ও শূলরোগে আক্রান্ত, বাহারী শ্বাসরোগ বা হিকাগ্রস্ত বা ক্রুশ ; বাহারী বানারোহণ ও রাত্রি আগরণ দ্বারা প্রান্ত, বাহারী ক্রোধ, শোক ও ভয়ে ক্লান্ত এবং

বাহারী দিবা নিত্রা অত্যন্ত, তাহারী সকলেই সর্বকালে দিবা নিত্রা সেবন করিবেন ।

তৃষ্ণা, শূল, হিকা, অজীর্ণ ও অতিসার রোগে দিবানিত্রায় বিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

বায়ুপ্রবনতা, পিত্তপ্রবনতা, মনস্তাপ, ক্ষয়, তর, লোভ, উবেগ, মানসিক হুশ্চিন্তা এই সকলই অনিত্রার প্রধান কারণ । নিত্রা হীন ব্যক্তি এক বিষম দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করে । যখনই দোষবিশেষ রাত্রিতে উপযুক্ত নিত্রা হইতেছে না, তখনই তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত । নিত্রা নাশ হইলেই প্রত্য-নিক্রিয়া অর্থাৎ যে সকল কারণে নিত্রা নষ্ট হয় তাহার বিপরীত ক্রিয়া করিতে হয় । অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, গ্রাম্য ও গুদক মাংস রস, শাল্য, দধি ও দুগ্ধাদি ক্ষেপে সেবনের ব্যবস্থা করা উচিত । নিম্নে কয়েকটি মুষ্টি-যোগের কথা বলা যাইতেছে,—

আমলকী চূর্ণ স্নেহে তাজিয়া ১ জেলা মাত্রার মধুর সহিত রাত্রিতে সেবন করিলে হুনিত্রা হইয়া থাকে । মন্দনিত্র ব্যক্তি পিপুলের মূল চূর্ণ গুড়ের সহিত আলোড়িত করিয়া লেহন করিবেন, জ্বর, মাংসরস, দধি, অভ্যঙ্গ তৈল মর্দন, স্নান, মস্তক কণ ও চক্ষুর তৃপ্তি সাধন এই গুলি অভ্যাস করিবেন । ইক্ষুবিকার, ঝুঁইশাক, মাষকলাই, মাংস-রস, জ্বর, পোণু, তিল ও মংগ এই সকল দ্রব্য নিত্রাক্রমক । যে সকল ব্যক্তি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত মানসিক শ্রম করেন, তাহারী শয়ন করিবার পূর্বে অল্পকাল স্তম্ভবায়ুতে পরিত্রমণ করিবে সহজেই অনিত্রার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন । আমল্য দেখিরাহি, রক্তবৃত্ত রোগীকণ অধারন করিলে বায়ু বৃদ্ধি

হইয়া আর নিদ্রা আসিতে চায় না, সেরূপ হলে মস্তক, মুখ ও চক্ষু নীতল হইয়া ধোত করিয়া একটু ভ্রমণের পর শয়ন করিলেই নিদ্রা আসে। কান্দীর দেশে একটা প্রথা

আছে যে, তথাকার জননীগণ রাত্রিতে শয়নের পূর্বে নীতল জলে সন্ধানের মস্তক ধোত করিয়া দেন। ইহাও সুমিষ্ট আনন্দের প্রকৃষ্ট উপায়।

ক্ষুধা ।

[শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ*]

— ৪০১ —

আমরা সকলেই ক্ষুধার জন্ত লালারিত। কাহারও ক্ষুধা না থাকিলে বা তাহার হ্রাস হইলে তিনি বিপদ মনে করেন, কত ডাক্তার-কবিরাজের নিকট যান, কত ঔষধ খান, তাহাতেও হয়ত তৃপ্ত হন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ক্ষুধাই যে আমাদের সর্ব-নাশ সাধক, প্রাণহারক—তাহা আমরা বুঝি না।

আমাদের শরীর নিত্য ক্ষয় হইতেছে। আমরা প্রত্যহ যাহা কিছু করি—নড়াচড়া, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া—তাহাতে তিলে তিলে আমাদের শরীর ধ্বংস-মুখে অগ্রসর হয়। কিছু কর্ম না করিয়া চুপ করিয়া নীরব নিম্পন্দ ভাবে বসিয়া থাকিলেও শ্বাস প্রশ্বাসের হাত হইতে আমরা অব্যাহতি পাই না, সুতরাং তাহাতেও আমরা মৃত্যুপথে ধাবিত হই। অনেক রোগী রোগমুক্ত হইয়াও কেবল মিথ্যাসংগ্রামের শক্তির অভাবে দেহত্যাগ করে। এমনই ভাবে, যে কোন কর্মই আমাদের 'মাথা খার'।

যোগ-সাধন করিতে হইলে সকল কর্ম ত্যাগ করাই সেই জন্ত সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাহা না করিলে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায় না। যোগে এই জন্ত শ্বাসরোধ পর্যন্ত উপদ্রষ্ট হইয়াছে। প্রাণায়াম-সাধনার সে কার্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাই মহাযোগীর যোগ-সাধনার তীহার তৎকালীন অবস্থা “নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্” বলিয়া “কুমার সম্ভবে” কবি লিখিয়াছেন।

যাহার যতটা ক্ষুধার আধিক্য, তাহার সেই পরিমাণে শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে। যাহাদের সুস্থ শরীরে অনেক খাইলে ক্ষুধিবৃত্তি

* প্রস্তাব-লেখক প্রথিতনামা সঙ্গীতব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র এবং অমর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্রুতপুত্র। ইনি স্বয়ং একজন নানা শাস্ত্রবিশী হৃৎপতি ও ভগবদ্ভক্ত, ভক্তির হৃৎধর উচ্ছ্বাস ময় কীর্তন-গায়ক। ইহার শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে ইনি “শ্রী জ্যোতিষচন্দ্র” নামে খ্যাত। সংবাদ পত্রাদিতে ইহার সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা হইয়া থাকে। ইহাকে প্রবন্ধ-লেখক রূপে পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আং সং

হয়, প্রায় দেখা যায়, তাঁহার অধিক দিন
 বাঁচেন না। রোগীর মধ্যে বহুমুত্র রোগীও
 ইহার অন্ততম দৃষ্টান্ত। ধামমিটারে যেমন অর
 পরিমিত হয়, ক্ষুধার ন্যূনাধিক্যে সেইরূপ দেহের
 ক্ষয় পরিমিত হইয়া থাকে। সেই জন্ত সন্ধ্যা
 লেরই অন্নাদী বা মাত্রাদী হওয়ার কথা আয়ু-
 র্বেদে তারবরে বলিয়াছেন। যোগাত্ম্যাসের
 প্রথম অবস্থার ঐ রূপ অন্নাহার করিতে হয়,
 ফল পাতা খাইয়া দিনপাত করিতে হয়। তখন
 বোগীর সবিকল্প সমাধির অবস্থা থাকে, তাহার
 ব্যাধান আছে। তাহাই কিছু আহ্বারের
 আবশ্যক হয়। তাহার পর আর আহ্বারের
 আবশ্যকই হয় না। তখন নির্বিকল্প সমাধির
 অবস্থার বোগী ক্ষুৎপিপাসাদি বিবাক্কিত হইয়া
 সূত্মাশ্রয় বা শিবস্থ লাভ করেন। যতদিন
 তাঁহাকে ক্ষুধার অধীন থাকিতে হয়, অর্থাৎ
 যতদিন তিনি কিছু না খাইয়া পারেন না, তত-
 দিন তাঁহার সবিকল্প সমাধি থাকে, ততদিন
 তিনি অমর বা শিব নহেন। বোধ হয়, এই
 জন্তই শিবের অন্নভোগ হয় না। শিলাকুপী
 নারায়ণকেও অন্ন ভোগ দিতে হয়। কিন্তু
 লিঙ্গরূপী শিবের সে 'হেঁড়া-ল্যাঠা' নাই।
 কারণ শিব বোগীশ্বর—মহাবোগী। তবে
 তাঁহাকে নৈবেদ্যাদি নিবেদন করিয়া দেওয়া হয়
 বটে, তাঁহার কারণ, ভক্তের কাতর আবাহনে
 তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয়। কাজেই তখন
 বোগীর সবিকল্প সমাধির ব্যাধানের জ্ঞান
 তাঁহাকে কিছু খাইতে হয়; কিন্তু তখন বাহা
 তিনি খান, তাহা ফল পাতা বা তাহারই মত
 কিছু;—অন্নের জ্ঞান গুরুতোজ্য নহে। ভক্ত
 বা পূজক যে তাঁহার সমাধিভঙ্গ করে, তৎ-
 সৎকে আমাদের দেশে একটি সনাতন পদ্ধতি

প্রচলিত আছে। শিব-ব্রত বা গাজনের সময়
 'সন্ন্যাসী'রা পূজা করিবার পূর্বে 'প্রভু বোগ-
 নিত্রা কর ভক্ত, সেবকের দেখ রক্ত, পরিহার
 তোমার চরণে', ইত্যাদি স্তব করিয়া তাঁহার
 সমাধি ভঙ্গ করে।

আমরা বাহা খাই, তাহার সারাংশ আমা-
 দের শরীরস্থ সপ্তধাতুর পোষণ করিয়া অসার
 অংশ মলরূপে নির্গত হয়। কিন্তু বাহাদের
 অগ্নির বিলক্ষণ তেজ আছে, তাঁহাদের মলসঞ্চয়
 অল্পই হইয়া থাকে; এই জন্ত তাঁহাদের শৌচ-
 ক্রিয়ার নিত্য প্রয়োজন হয় না। আমরা এমনও
 লোক দেখিয়াছি, বাহারা সপ্তাহে দুই বারের
 অধিক মলত্যাগ করেন না। অথচ তাঁহাদিগের
 শরীরে কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখা যায় না,
 পরন্তু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ দৃষ্টপুষ্টি ও আনন্দ-
 ময় দেখা যায়। বোগীরাও এই কারণে
 নিত্য মলত্যাগ করেন না। একটা প্রবাদ
 আছে :—একবার বোগী, দুইবার ভোগী,
 তিনবার রোগী।

মিতাচারী ও অন্নভোগী হইলে
 এবং পারমার্থিক চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলে
 শরীর ও মন সুস্থ থাকে। সে অবস্থার বলে
 হৃর্গন্ধের পরিবর্তে সঙ্গন্ধ হইয়া থাকে।
 শ্রীমদ্ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের
 ৩২ শ্লোকে ভগবান ঋষভদেবের বোগসাধন
 বিষয়ে ঐ কথা লিখিত হইয়াছে, যথা :—

তত্ত্ব হ যঃ পুরীষসুরভিসৌগন্ধা বায়ুস্তং
 দেশং দশবোজনং সমস্তাং সুরভী চকার ।

ইহার মোট অর্থ এই যে, ঋষভদেবের
 বিষ্ঠার সঙ্গন্ধে দশবোজন স্থান পর্যন্ত
 আমোদিত হইয়াছিল।

একজন চিকিৎসাতত্ত্ববিদ ইংরাজও এই

ভাবের কথা বলিয়াছেন । ৫১৩ বৎসর পূর্বে “Statesman” সংবাদপত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, সুস্থবাস্তব মলে দুর্গন্ধের পরিবর্তে সদৃগন্ধ থাকে । সে কাগজখানি এখন আমার সম্মুখে নাই ও তাহার সন তারিখও আমার মনে নাষ্ট, কিন্তু তিনি যে উক্ত মল সম্বন্ধে ‘of good odour’ (সদৃগন্ধ-বিশিষ্ট) লিখিয়াছিলেন, ইহা আমার বেশ মনে আছে । কাগজখানি আমি সবদে রাখিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না । তাহাটী তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না ।

এখন এ সকল কথা যাক । ক্ষুধার বিষয় বলিতে বাইরা আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি । আমরা বলিয়াছি যে, ক্ষুধাই আমাদের দেহ নষ্ট করে । শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ত্রিগুণের মধ্যে রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন বা স্থিতি এবং তমোগুণে নাশ হয় । ক্ষুধা রজোগুণের সহায়ক ; কারণ, উহাতে আহারের দ্বারা দেহের সর্বপ্রাণী ধাতু গুলকের পুষ্টিসাধন হয় ; সুতরাং উহা জীবনস্থিতির হেতুরূপে কার্য্য করে । পরাস্তরে, ইহাতে স্থিতি বা পালন কার্য্যও হয় । কারণ, ক্ষুধা না হইলে আমরা আহার করিতে পারি না, এবং আহার না করিলে আমরা জীবিত থাকিতে পারি না । এই রূপে ক্ষুধা—সৃষ্টি ও স্থিতির সহায়ক হইয়াও ভিতরে ভিতরে প্রলয়ের বা নাশের কার্য্য করিয়া থাকে । কারণ পূর্বেই বলিয়াছি—ক্ষুধা দেহ-ক্ষয়ের একরূপ পরিমাপক বস্তু মাত্র ।

এখন একদিকে আমরা দেখিতেছি যে, তমোগুণাত্মক ক্ষুধাই সত্ত্ব গুণের ও রজোগুণের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত । ইহা হইতে

আমরা পুরাণের একটি গভীর তথ্য বুঝিতে পারি । শৈব-পুরাণ মাত্রেই, রজোগুণাত্মক ব্রহ্মা ও সত্ত্বগুণাত্মক বিষ্ণু এতদুভয়ের উপর তমোগুণাত্মক শিবের বা রুদ্রের প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । উহা কিরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা এখন আমাদের বুঝিতে বাকী রহিল না, অন্ততঃ আমরা কতকটাও বুঝিলাম । কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এ তিনের (বা সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের) প্রত্যেকের অপর দুইটির উপরে বিষয়-বিশেষে প্রভুতা আছে বা হইয়া থাকে, এবং ইহারা আপনাদের মধ্যে কাহাকেও ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করেন না । তাহাই মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়াছেন :—
ক্ষণং বিরোগো ন হেবাং ন ত্যজন্তি পরম্পরম্ ।

দেবী ভগবতী মহামায়া ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া পুরাণে কথিত । রজোগুণের কার্য্যে—তিনি ব্রহ্মার শক্তি বা ব্রাহ্মী, সত্ত্বগুণের কার্য্যে—তিনি বৈষ্ণবী বা বিষ্ণুর শক্তি এবং তমোগুণের কার্য্যে তিনি শৈবী, রুদ্রানী বা শিব-শক্তি । মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীতে তাঁহাকে ত্রিগুণাত্মিকা ভাবে অনেক স্থলে স্তব করা হইয়াছে । উদাহরণ “নারায়ণী স্তোত্র” বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহাতে তাঁহার রজোগুণাত্মক ও সত্ত্বগুণাত্মক ভাবের স্ততির সহিত তমোগুণাত্মক বা নাশকর ভাবের স্ততিকালে বিশেষ মতে উল্লিখিত হইয়াছে—
বা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ ॥

আবার তাঁহার তমোগুণ বা প্রলয়করী শক্তি সম্বন্ধে “আস্ত্রা” স্তোত্রে বলা হইয়াছে :—

ক্ষুধা যং সর্বভূতানাম্ বেলা যং সাগরস্য চ ।

সাগরের বেলাও এলয়ের বা বিনাশের
পক্ষীর চিহ্ন। এই বেলায় কত না জলময়
নর-নারী-দেহ বিলুপ্তিত। এই বেলায় কত না
দুঃস্থ শব্দুক পশু পক্ষীদিগের কঠোর
চীৎকারে নিদ্রস্তর মুখরিত। এই বেলায়
কত না গোত চূর্ণীকৃত—অন্ধকারে সে দৃশ্য
আরও কত ভয়ানক। তাইই আমেরিকান
কবি Edgar Allan Poe তাঁহার বিখ্যাত
“Raven” নামক কবিতায় সাগর-বেলায়

সমুদ্রে লিখিয়াছেন, Night's Plutonian
shore অর্থাৎ “কুর্ভাস্তের তামসী-বেলা”।

পুনশ্চ “প্রাধানিক রহস্ত” নামক তন্ত্র—
তামসী অর্থাৎ বিনাশকারিণী শক্তি মহাকাশীর
নামকরণ কালে “কুখা” তাঁহার অন্ততম নাম
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা : -

মহামায়া মহাকাশী মহামাদী কুখাতৃষা।

নিজা তুচ্ছ চৈকবীরা কালক্রান্তিহরত্যাগা ॥

এখন বুঝ কুখা কি জিনিস !!

পল্লীমাতার অরণ্যে রোদন।

[শ্রীকীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ]

পল্লী উদ্ধারে প্রত্যেক নগরবাসী মনো-
নিবেশ করুন। সহরে ভ্রমরহোদরগণ
জুলজিত বৈঠকে বসিয়া বুদ্ধিবলে অর্থোপার্জন
করিতেছেন বটে, কিন্তু দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার
(লবু বালাম চালের ভাত ও মুগের দাল ও)
সম্পূর্ণরূপে পল্লীর উপর নির্ভর করিতেছে।
পল্লী মরিলে, তাঁহার কি ইট-কাঠ পাথর-
মোটর-জীর গহনা ও কোম্পানীর কাগজ
চর্চণ করিয়া প্রাণধারণ করিবেন? ভীমকার
নগরানুরকে খাওয়াইবার জন্য শেব রাজিতে
প্রিয়মাণ পল্লী হইতে হুখ, মাছ, তরকারী
প্রভৃতি খাদ্য সম্ভার লইয়া মনোহাসে বাষ্পীয়
শকট সহরাতিযুখে ছুটিয়াছে। পল্লী মরিলে
কে এই বিরাট দৈত্যের খোরাক যোগাইবে?

আর বসিয়া মতা দেখিবেন না—কার্যমনো-
প্রাণে পল্লী উদ্ধার ব্রতে লাগিয়া যান। মানুষ
যাহা করিয়াছে, মানব কেন তাহা করিতে

পারিবেন? প্রতীচ্য জগতে বহু ব্যাধি পীড়িত
অস্বাস্থ্যকর স্থানও এক্ষণে অমরাবতী সদৃশ
বলবীৰ্য্যপ্রদ সুন্দর স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত
হইয়াছে। সুরেজ ও পানামা ধাল মাহুবেই
কাটিয়াছে, আর আমাদের দেশের মাহুয কি
তাঁহাদের পূর্বপুরুষের খাত দীঘিপুকুরের
পঙ্কোদ্ধার করিতে পারিবে না? নিবিড় বন
জঙ্গল পাহাড় কাটিয়া মাহুবেই রেলবন্দ লইয়া
গিয়াছে; আর আমাদের দেশের মাহুয
কি নিজ নিজ জম্বুকুমি ক্ষুদ্রপল্লীর বনঝোপ
কাটিয়া স্থানটিকে বাসোপযোগী করিতে
পারিবে না? প্রচেষ্টা, একাগ্রতা, অধ্যবসায়
ত্যাগ, একতা, সহযোগিতা ও সমবায়ের ফল
অবশ্যই ফলিবে। সাধন-সময়ে কর্মকেন্দ্রী
নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। ‘মন্ত্রের সাধন
কিংবা শরীর পাতন’—এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য
রাখিয়া, ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, জ্বরে

অসৌম্য সাহস, উদ্ভ্রম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ধারণ করিয়া পল্লীউদ্ধারে লাগিয়া দেখুন, আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমের পুরস্কার মিলে কি না।

যাহারা ইংরাজী-বিদ্যা ও পাশ্চাত্য ভাবা-
পত্র তাঁহারা যেন স্থিরচিত্তে একটীবার ভাবিয়া
দেখেন যে প্রতীচ্য জগতে Back to the
country, back to the land এই সঙ্গল
বাণী উদ্‌ঘোষিত হইতেছে সে দেশের মহাপ্রাণ
ব্যক্তিগণ বুঝিয়াছেন যে, সহরগুলি শিল্প
বাণিজ্য ব্যবসায়াদির কর্মক্ষেত্র হইলেও, স্বাস্থ্য
ও দীর্ঘ-জীবনপ্রার্থী মানবকে ধূম-ধূলি আকু-
লিত অতি কোলাহল আলোড়িত কৃত্রিমতা
মণ্ডিত জনতাপূর্ণ অগ্নিভূলা নগর পরিত্যাগ
করিয়া স্বভাবস্বন্দর সঙ্কুণ-প্রধান উষ্ম
বিহীন আনন্দময় পল্লীর শান্তিময় সুশীতল
ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেই হইবে। তাঁহাদের
মনে লাগিয়াছে যে, কৃষিকার্যের উৎকর্ষ না
হইলে শুধু বিজ্ঞান-বলে উদ্ভাবিত শুষ্ক নীরস
যন্ত্রে মানবের ক্ষুৎপিপাসা দূর করিতে পারিবে
না, এজন্য তাঁহারাও পল্লী উদ্ধারে বদ্ধ পরিকর
হইয়াছেন। তাহা হইলে, আমাদের দেশের
ইংরাজী শিক্ষিত মার্জিত কৃচি সুসভ্য নগর-
বাসী ভদ্র মহোদয়গণ কি স্বীয় জন্মভূমি পল্লী
জননীকে এখনও অজ্ঞানভিমিরাক্ষয় পাগ
পঙ্কময় কটকাকৌর্ণ ‘পাড়াগাঁ’ বলিয়া ঘৃণা
করিবেন? স্বদেশ ও স্বজাতি-বৎসল ইংরাজ
জ্ঞানশিক্ষা ও অর্থোপার্জনের জন্য পৃথিবীর

দর্শিত্য পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাণ
পড়িয়া থাকুক আপনার প্রিয়তম জন্মভূমি
গ্রেটব্রিটেনের পল্লীগ্রামে। আর আমাদের
দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত মহাজনেরা স্বীয় জন্ম-
ভূমি পল্লীকে একবারে তুলিয়া সহরে নগরে
পরিণত রোজগার করিতেছেন—পল্লীর নাম
উচ্চারণ করিতে, কিংবা “পল্লী আমার পূর্ব-
নিবাস” এ কথা বলিতেও যেন ঘৃণার নাসিকা
কুঞ্চিত করেন।

পল্লীর প্রতি বিধিই বাম দেখিতেছি, নতুবা
পুত্র থাকিতে যে মাতার হৃৎপিণ্ড ছিল না,
তাঁহাকে আর ভাগ-বাণী কোন্ মুখে বলিব?
পল্লী মাতার যে সম্মানগুলি বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান
বলে উচ্চ স্থান অধিকার পূর্বক মাথা তুলিয়া
দাঁড়াইতেছেন, তাঁহারা আর হৃৎপিণ্ডী মাতার
হৃৎপিণ্ড দারিদ্র্য মোচনে যন্ত্রণা নহেন—মায়ের
প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহেন না। কি
বিচিত্র কালের ধর্ম। তাঁহারা বড় লোক
হইয়া সর্বস্বের বড়লোক সমাজের অঙ্গীভূত
হইয়া যাইতেছেন, স্বীয় জন্মভূমি অনাথা
পল্লীমাতার চোখের জল মুছাইতেছেন কই?
পল্লীমাতা তাই অহোরাত্র অরণ্যে রোদন
করিতেছেন—শিরে করাঘাত করিয়া করুণ
স্বরে বিলাপ করিতেছেন :—“হায়! কতক-
গুলি শ্রাণহীন কৃত্রিম পশু প্রসব ও পালন
করিয়া আমার কাঁদিতেই জন্ম গেল—সুখ
ভোগ আর ভোগে ঘটিল না।”

আচমন ও প্রাণায়ামে আয়ুর্বেদ ।

[শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ রেদান্ত শাস্ত্রী]

—:o:—

১ম

আচমন সকল ধর্ম কার্যেরই অঙ্গ ।
ভোজনের পূর্বে অবশ্য করণীয় । আচমন
না করিয়া অন্ন ভোজন (অবশ্য বর্তমান
সময়েও) দ্বিজের পক্ষে নিষিদ্ধ । কিন্তু যে
কোন খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের (ভোজনের) পূর্বে
আচমনের বিধি । আচমন অন্নের (খাদ্য
দ্রব্যের) বাস বা আচ্ছাদন । বাস বা
আচ্ছাদন যেমন উপরে ও নিচে দুই প্রকার,
আচমনও তাই ভোজনের পূর্বে ও পরে
“আস্তরণ ও পিধান” ভেদে দুই রকম । বিবিধ
প্রমাণ বখা ।

“অমৃতোহপিপ্তরং মসি”

“অমৃতপিধান মসিস্বাহা”

জলই অমৃত । সেই জলই অন্নের আস্তরণ
(পাতিবার বস্ত্র বখা গালিচা সতরঞ্চি প্রভৃতি)
হউক ইহাই ভোজনের পূর্বের প্রার্থনা ।
জলই আবার ভোজনের শেষে পিধান অর্থাৎ
আচ্ছাদন স্বরূপ হউক ; ইহা ভোজনের পরের
প্রার্থনা । আচ্ছাদন (ঢাকনি দ্রব্য) খুঁগিয়া
ভোজনের পূর্বে কিঞ্চিৎ জলপান এবং
ভোজনের শেষে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ জলপান
অবশ্য কর্তব্য—এই ধর্ম, কর্তব্য এবং স্বাস্থ্য
বিষয়ে নিরতিশয় উপকারক ।

খাদ্য দ্রব্য যত সত্ত্ব দ্রবীভূত হইয়া
আইসে, খাদ্য দ্রব্যের কঠিন যত সত্ত্ব দূর

হয়, তাহাই কর্তব্য । কারণ কঠিন দূর হইলে,
তরল এবং দ্রবীভূত হইয়া আসিলে সহজে
এবং দ্রুত গল-নাল পথে প্রবেশ করিতে
পারে । এটি জীর্ণতার পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা
হয়—তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না ।

“প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, ব্যানায়
স্বাহা, উদানায় স্বাহা এবং সমানায় স্বাহা ।”
এই পাঁচটি মন্ত্রে অন্নগ্রাস গ্রহণের বিধি ।
প্রাণ অগ্নানাদি পাঁচটি বায়ু জীব-শরীরে
বর্তমান । প্রাণ-গমনশীল বায়ুই প্রাণ ।
নিম্ন গমনশীল বায়ু অপান । উর্দ্ধগমনশীল
বায়ু উদান । সর্কশরীরব্যাপী বায়ু ব্যান ।
সমীকরণশীল—অর্থাৎ পরিপচনকর্তা বায়ু
সমান ।

আচমনের পূর্বে অন্নের কিঞ্চিৎ অগ্রভাগ
ভ্যাগ বিধেয় । অগ্রভাগেই যত কিছু দোষ
থাকে, বাহা কিছু পড়িলে সম্ভাবনা উপরি-
ভাগেই থাকে । ঐ অগ্রভাগ জীবকে দান
করার ব্যবস্থা আচমনে দৃষ্ট হয় । যে খাদ্য-
দ্রব্য এত প্রিয়, সুধার, সময়েও সেই খাদ্য-
দ্রব্যের অগ্রভাগ অগ্রে জীবের উদ্দেশে দান
করা—কি উদার স্বার্থভ্যাগের ব্যবস্থা, কিবা
মহান সংযমের শিক্ষা !

সুধার প্রকোপে পরিশ্রমের শান্তিতে
কঠিনালী শুঁকি হইয়া সারা শরীরে পাকস্থলীতে
একটি উন্নত তাপ দেখা যায় । আচমনের জলে

সেই উচ্চা দূরীভূত হয় এবং কঠিনালী সরল হইয়া উঠে। অল্পে অল্পে কষ্ট ভিজাইলে গলনাগী-পথ পরিস্কৃত হইয়া আসে। ফলে খাদ্য প্রবেশের কোন ব্যাঘাত জন্মে না, গলায় গলায় বাধিয়া যাইবার ভয় থাকে না, হঠাৎ উয়া পাকস্থলীতে পড়িয়া কোনপ্রকার বিষম ফল উৎপাদিত হইতে পারে না।

ভোজনের পূর্বে কেবল অল্প অর্থাৎ শুধু ভাত পঞ্চগ্রাসে খাওয়ার ব্যাপারে কেবল যে জীর্ণতার সুবিধা হয় তাহা নহে, প্রীহা-

বকুতাদি আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। একটি সরাসরী আমাদের প্রীহা যোগের একটি মুষ্টিযোগ শিখাইয়া দেন। বলেন—ভোজনের পূর্বে বড় বড় পঞ্চগ্রাস শুধু ভাত খাইয়া লইতে, তৎপরে ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিবে। ঐ আচমনটিই বড় বড় প্রাসে ব্যবহৃত হইল। বলা বাহুল্য আমি তাহা করিতাম এবং তাহার ফলেই হটক আর অন্ত কারণে হটক, আমার প্রীহা সারিয়া গেল।

দম্পতী জীবন ।

সুস্থ তত্ত্ব ।

(পূর্বানুবর্তি—গত বর্ষের পর হইতে)

[কবিরাজ শ্রীবারকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ]

—::—

শিশুর যত প্রকার খাদ্য দ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে শুন দুইই সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তাহা বিত্ত্ব না হইলে শিশুর পক্ষে হিতকর না হইয়া, অশেষবিধ রোগেরই কারণ হইয়া থাকে, এই জন্ত দুই বিত্ত্ব কিনা—সে দিকে লক্ষ্য করা নিতান্ত কর্তব্য।

ভুক্ত দ্রব্য পারিপাক্য না হইতে পুনর্বার ভোজন করা, কুপথ্য ভোজন, কোন দিন বেশী—কোন দিন বা কম এবং ঠিক সময়ে না খাওয়া, 'মৎস্ত, মাংস', দুই প্রভৃতি বিত্ত্ব দ্রব্যের এককালে ভোজন, অতিমাত্রায় ভোজন, লবণ, অন্ন, বাল, কারজব্যা এবং পচাদ্রব্যের

অতি সেবন, মানসিক দুঃখ, শরীরের সন্তাপ, রাহিজাগরণ, চিন্তা, মলমূত্রের বেগধারণ বা বেগ না আসিলেও বেগ প্রদান, শুড় কৃত পরমাণ, দধি, মৎস্ত, ছাগাদি গ্রাম্যমাংস, বা কচ্ছপাদি জলজমাংস বা শূকরাদি আনুপ-মাংসের অতি ভোজন, প্রত্যহ আহারের পরই দিবা নিদ্রা, অতিশয় মদ্যপান, পরিশ্রম-হীনতা, লগুড়াদি দ্বারা আঘাত, ক্রোধ এবং রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শরীরের ক্ষয় প্রভৃতি কারণে বায়ু, পিত্ত এবং কক প্রকৃপিত হইয়া হৃৎকাহিনী শিরা সকলকে আশ্রয় করতঃ হৃৎকে দূষিত করে। এই স্তম্ভ দোষ আট

প্রকার, বর্ণা বৈরত, ফেনিলতা ও রক্ততা, বৈবর্ণ্য, দৌর্গন্ধ্য, দ্বিধতা, পিচ্ছিলতা ও শুষ্কতা ।

ইহার মধ্যে স্তন্যের ফেনিলতা ও রক্ততা—এই দোষ দুইটি কেবল দুই বায়ুর দ্বারা উৎপন্ন হয়। কিন্তু কুণিত বায়ু ইহার কারণ হইলেও ইহার সহিত পিত্ত ও কফের কিছু সম্পর্ক থাকে ।

স্তন্যের বৈবর্ণ্য ও দৌর্গন্ধ্য প্রধানতঃ পিত্তের দোষেই হইয়া থাকে, তবে বৈবর্ণ্য দোষে বায়ু ও কফের এবং দৌর্গন্ধ্যে কেবল কফেরই সম্বন্ধ থাকিতে পারে ।

দুই কফের দ্বারা স্তন্যের দ্বিধতা, পিচ্ছিলতা ও শুষ্কতা দোষ জন্মে ।

এই আটপ্রকার দোষের উৎপত্তি ক্রম-লক্ষণ ও চিকিৎসার্থ ঔষধ লিখিত হইতেছে,

(১) বায়ু রক্তাদি নিম্ন প্রকোপক কারণে ক্রম হইয়া হৃৎযন্ত্রকে আশ্রয় করতঃ স্তন্যের স্বাভাবিক বিকৃতি করিয়া থাকে, সেই বায়ু সংস্রষ্টে বিরস হৃৎ পান করিলে শিশু ক্রম হয়। উহার হৃৎ রুচি থাকে না এবং উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীঘ্র পুটে না হইয়া দীর্ঘ-কালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (স্তন্যের বৈবর্ণ্য দোষের লক্ষণ ।)

নারীর হৃৎ বিরস হইলে ত্রাণা, বষ্টিমধু, অনন্তমূল ও কীরকাকোলী প্রত্যেক দ্রব্য সমান পরিমাণে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ চারি আনা মাত্রার সকালে একবার ও বৈকালে একবার গরম জল সহ পান করিবে ।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঠ ও বনকুলথ কলার, সমান ভাগে ভাল করিয়া

বাটিয়া তাহার দ্বারা স্তন্যের উপর প্রলেপ দিতে হইবে, উহা দুইয়। ফেলিয়া নিঃশেষরূপে হৃৎ গালিয়া ফেলিবে। এইরূপ কিছু দিন করিলে স্তন্যের বিরসতা দোষ দূর হয় ।

(২)

বায়ু কুণিত হইয়া হৃৎকে অন্তরে মথিত করে, সেই কারণে স্তন্যের ফেনিলতা দোষ জন্মে, ইহাতে হৃৎ অঙ্গ পরিমাণে কঠে নির্গত হয়। এই হৃৎ পান করিলে শিশুর স্বরভঙ্গ অথবা কণ স্বর হয়, মল ও মূত্রের বিবন্ধ—বায়ু জন্ত শিরোরোগ এবং পীনস (সর্দি) হইয়া থাকে ।

এই দোষে প্রসূতিকে আকনাদি, শুঠ, কাকলম্বার মূল ও মুর্খা, এই কয়টি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমানভাগে মিশাইয়া একাঙ্গিক পরিমাণে ঐ চূর্ণ সকালে ও বৈকালে দুইবেলা গরম জল দ্বারা খাইতে দিবে ।

রসাজন, তগরপাছকা, দেবদারু, বেলেরমূল ও প্রিয়ঙ্গু সমানভাগে জল সহ বাটিয়া স্তন্যের প্রলেপ দিতে হইবে, প্রলেপ শুষ্ক হইলে দুইয়। হৃৎ গালিয়া ফেলিবে। ইহাতে হৃৎ শোধন হইবে ।

চিরতা, শুঠ ও গুলকের কাথ পান করিলে স্তন্য শোধন হয়। (কাথ পাচনব্য ব্যবহার) ।

এইরূপ হৃৎ শোধনের জন্ত যব, গম, যেত সর্ষপ বাটিয়া পূর্ববৎ লেপন দিবে ।

(৩)

দুই বায়ু হৃৎের স্নেহভাগ শোষণ করিলে উহা রক্ত হয়, সেই হৃৎ পান করিলে শিশুর বল কমিয়া যায় এবং শরীর কর্কশ (খসখসে) হয় ।

আকনাদিমূল শুঠ, দেবদারু, মুখা, মুর্খা,

(হুগ্জো), গুলক, ইজ্জুব, চিরতা, কটকী, অনন্তমূল এই দশটি দ্রব্যের সহিত গোচর্য্য পাক করিয়া খাইলে শুভ্রের রুদ্ধতা দোষ দূর হয় ।

ঐ দশটি দ্রব্যের কাথ ও রস দিয়া দ্বিত পাক করিয়া সেই দ্বিত খাইলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয় ।

বেলছাল, শোনাছাল, গাস্তারীছাল, পাকল-ছাল ও গণিয়ারী ছাল অথবা শালিপানি, চাকুলে, বৃহতী, কটকারী ও গোক্ষুর একত্র বাটিয়া ঈষৎ গরম করিয়া পূর্ব্ববৎ লেপন দিলে শুভ্রের রুদ্ধতা দূর হয় ।

এই রোগে জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলা, ক্ষৌরকাকোলা মুগানি, মাষানি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু উষ্ণ প্রলেপও হিতকর ।

(৪)

৫ প্রস্থতি লবণ, বাল, অন্ন, গরম দ্রব্য প্রভৃতি অতিমাত্রায় সেবন করেন, পিত্ত কুপিত হইয়া তাঁহার হৃদ্বাশয়কে আশ্রয় করিয়া হৃৎকের বৈবর্ণ্য উৎপাদন করে, ইহাতে হৃৎ নীল, হলদে, কাল প্রভৃতি বর্ণ ধারণ করে, শিশু সেই হৃৎ পান করিলে তাহার গাত্র বিবর্ণ ও বর্ষ্যযুক্ত হয়, পিপাসা হয়, পাতলা দান্ত হয়, সর্ব্বদা শরীর গরম হইয়া থাকে, শিশু ঐ হৃৎ খাইতে চাহে না ।

যষ্টিমধু, কিস্মিস, ক্ষৌরকাকোলা ও নিসিন্দা মূল প্রত্যেক দ্রব্য এক আনা একত্র বাটিয়া শীতল জলের সহিত সকালে ও বৈকালে পান করিলে হৃৎকের বিবর্ণতা নষ্ট হয় ।

জাফা ও যষ্টিমধু বাটিয়া শুনে লেপন দিতে

হয় । প্রলেপ শুষ্ক হইলে জল দিয়া ধুইয়া পুনঃ পুনঃ গালিয়া কেলিবে ।

(৫)

বাসি-পচা প্রভৃতি দ্রব্যের সেবন হেতু পিত্ত খারাপ হইলে হৃৎকের দুর্গন্ধতা হয়, তাহা পান করিলে শিশুর পাণ্ডুরোগ ও কামলা হইয়া থাকে ।

মেঘশুকী, অজশুকী, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা ও বচ মিলিত একসিকি বাটিয়া জল মিশ্রিত হৃৎকের সহিত পান করিলে হৃৎকের দুর্গন্ধ নষ্ট হয় ।

প্রস্থতি পথ্যাম্বিনী হইয়া হরীতকী, শুঠ, পিঁপুল ও গোলমরিচের চূর্ণ মধুর সহিত আলোড়ন করিয়া পান করবেন ।

অনন্তমূল, বেণারমূল, মজ্জিষ্ঠা, চালতা ও রক্তচন্দন কিংবা তেজপাতা, রক্তচন্দন ও বেণারমূল বাটিয়া শুনের উপর প্রলেপ দিবে । শুষ্ক হইলে ধুইয়া হৃৎ গালিয়া কেলিতে হইবে ।

৬)

শ্লেষ্মগুরু প্রভৃতি কারণে কুপিত হইয়া প্রস্থতির হৃদ্বাশয়কে আশ্রয় করে এবং শিশুর শ্লেষ্মগুণ দ্বারা হৃৎকে অতিশয় স্নেহাঙ্কিত করে । এই অতি স্নিগ্ধ হৃৎ পান করিলে শিশুর বমি, কুঁখুরী ও লালাস্রাব হয় । আর শিশুর মূল শিরা সকল শ্লেষ্মালিপ্ত হওয়াতে অতিশয় নিদ্রা ও আলস্য, খাস, কাস এবং তমক খাস হইয়া থাকে ।

শুনহৃৎ স্নিগ্ধতা দোষে দুর্ব্বিত হইলে দেবদারু, মুখা, আকনাদিমূল ও সৈন্ধবলবণ একত্র বাটিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে শিশুর শুভ্রদোষের শান্তি হয় ।

দুহিত কক ঐভাবে হৃৎকে দুহিত করিয়া উহার পিচ্ছিলতা দোষ উৎপাদন করে। ঐ পিচ্ছিল হৃৎ পান করিলে শিশুর লালাস্রাব, মুখ, চক্ষু শোধযুক্ত ও জড়তা হইয়া থাকে।

তখনহৃৎ পিচ্ছিল হইলে কাকজন্মা, হরীতকী ও বচ; কিংবা মুখা, শুঠ ও আকনাদি মূল বাটিকা গরম জল সহ পান করিবে।

এই দোষে ভূমি কুম্মাণ্ড, বেলছাল ও বষ্টিমধু পেষণ করিয়া তনে লেপন দিতে হইবে।

(৮)

হৃৎ কক হৃৎশায়ন হইলে নিজের গুরুত্ব-গুণে হৃৎের গুরুতা দোষ বর্গাইয়া থাকে। ঐ হৃৎ পান করিলে সন্তানের হৃদ্রোগ জন্মে এবং কক জন্ম রোগ হইয়া থাকে।

তখনহৃৎ গুরু হইলে প্রহুতি বলাড়ুমুর, গুলঞ্চ, নিমছাল, পলতা, আমলা, হরীতকী ও বহেড়ার কাথ পান করিবে।

পিপুলমূল, টে, চিতামূল ও শুঠের কাথ ও এই দোষে হিতকর।

হৃৎের গুরুত্ব দোষ নিবারণের জন্ম বেড়ালামূল, শুঠ, কাকজন্মা, মুর্কী পেষণ করিয়া তনে প্রলেপ দিবে।

চাকুলে ও কীরকাকোলীর লেপনও হৃৎের গুরুতা দোষ দূর করিয়া থাকে।

(হৃৎ শোধনার্থ সামান্যতঃ কয়েকটি যোগ),—

(১) আকনাদিমূল, শুঠ, দেবদারু, মুখা, মুগ্গনো, (মুর্কী) গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কটুকী ও অনন্তমূল।

(২) কাকজন্মা, ছাতিমছাল, অখণ্ডা।

(৩) গুলঞ্চ ও ছাতিমছালের কাথে, শুঠচূর্ণসহ।

(৪) বেলছাল, শোনাছাল, গাভারী ছাল, পাকলছাল, গণিয়ারীছাল, শালিপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুব।

ইহাদের মধ্যে যে কোনটী যোগের পাচন করিয়া খাইলেও সকল প্রকার স্তন্য দোষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

দুহ্য জনন দ্রব্য

প্রহুতির দুহ্য কম হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য-গুলি ভোজন করিলে উহা বর্দ্ধিত হয়। মাংস, শাক, অধিক মিষ্ট, জল, ও দুহ্য।

ভূমি কুম্মাণ্ডের চূর্ণ মজের সহিত অথবা রামশালি, কোকশালি প্রভৃতি শালি ধানের চাউল গোহৃৎ সহ বাটিকা খাইলে জননীগণের স্তন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

হরিত্রা, দারুহরিত্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও বষ্টিমধু, অথবা বচ, মুখা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগেশ্বর এই সমস্ত দ্রব্যের পাচন করিয়া খাইলেও দুহ্য বর্দ্ধিত হয়।

বিশুদ্ধ দুহ্যের লক্ষণ

দুহ্য যদি শীতল, নির্দ্বন্দ্ব, পাতলা, স্বেতবর্ণ এবং জলে নিক্ষেপ করিলে জলের সহিত মিশিয়া যায়, ফেন যুক্ত হয় এবং তাহাতে সূতা না কাটে, তাহা হইলে সে দুহ্য বিশুদ্ধ। ইহার বিপরীত হইলে তাহা দোষযুক্ত জানিবে।

উড় স্বর ।

(রিপোর্টারের পত্র)।

কলিকাতার আয়ুর্বেদ সভায় উত্তোপ্তে
গত ১লা মার্চ সোমবার কুলেজ স্কোয়ারে খিও
সকিকেণ হলে 'উড়ুধর-পত্রের গুণ আবিষ্কার
উপলক্ষে উক্ত সভার এক সাধারণ অধি-
বেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কলিকাতার
বিখ্যাত কবিরাজ, ডাক্তার ও ভদ্র মহোদয়গণ
বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া
ছিলেন। বহু পত্রিকার সম্পাদক ও উপস্থিত
ছিলেন।

সর্বপ্রথমে আত্মকর্ষণ সভার স্থায়ী সভাপতি
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথসেন
সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস, মহাশয়
যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে
প্রদত্ত হইল।

“অন্ত আমি আপনাদের নিকট চিকিৎসক
চূড়ামণি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ধর মিশ্র
মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। ইনি
চম্পারণ জেলার অন্তর্গত রত্নমালা গ্রামের
সদ ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত সম্ভ্রান্ত জমিদার। ইনি
বিপুল অর্থশালী হইয়াও, পরোপকার ব্রতে
নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি
জমিদারীর আয় হইতে বৎসামাত্র মাত্র স্বীয়
পরিজনবর্গের ভরণ পোষণার্থ গ্রহণ করিয়া
অবশিষ্ট অর্থ দীন হীন, মরণোন্মুখ রোগীর
ঔষধের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন।
এদেশে একরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। বৈদকে বিদ্যার

উন্নতি করলে এই মহাশয় স্বীয় গ্নানভূমি রত্ন-
মাণ্ডপ গায়ে এষ্টী আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত একটী
“আত্মরান্দন” স্থাপন করিয়া বোগীদিগকে
বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান ও গ্রাসাচ্ছাদনের
ব্যবস্থা করিয়া দ্বীন দবিদ্র বোগার্ভজনের
অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। বিদ্যার্থী
গণের শিক্ষণ স্বরক্ষকেন্দ্র ও তাহাদের আত্ম-
রের ব্যাঘাত করিয়া আয়ুর্বেদের প্রভূত উপ-
কার করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয়—
ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের গুণাবিকারে সর্বদা রত
থাকেন। নিম্নলি আয়ুর্বেদ সমুদ্র মন্থন করিয়া
স্বীয় প্রতিভাবলে সম্প্রতি তিনি যে সকল
ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্ষিপ্ত
শৃগাল কুস্কুর দংশনজনিত বিষের ঔষধ, সর্প
দংশন জনিত বিষের ঔষধ ও জলোদরের ঔষধ
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আবিষ্কৃত
ঔষধের মধ্যে আজ উদ্ভূত পত্রের গুণ সৰ্ব্বদে
তিনি আপনাদের নিকট তাঁহার অভি-
জ্ঞতার পরিচয় দিবেন,—”

আয়ুর্বেদের অতীত ও বর্তমান অবস্থার
নিকৃদর্শন করাটোবার নিমিত্ত উক্ত পণ্ডিত
মহাশয় নিম্নলিখিত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান
করিয়াছিলেন,—

“আমি যদিও বাল্যকাল হইতে আয়ুর্বেদ
শাস্ত্রে প্রকাসম্পন্ন ছিলাম, কিন্তু আমার বিশ্বাস,

ছিল—আয়ুর্বেদ 'অপূর্ণ শাস্ত্র, পঞ্চাশত্রে শাস্ত্রাত্মক চিকিৎসা শাস্ত্র পূর্ণ। কারণ শাস্ত্রাত্মক চিকিৎসা—আয়ুর্বেদ ও ইউনানী প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের সারাংশ লইয়া বহু পরীক্ষা ও গবেষণার পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। একজন আমার নিকট তখন বত রোগী আসিল, আমি তাহাদিগকে নিকটবর্তী এলোপ্যাথিক ডিসপেনসারীতে সাচাষ্য লইতে পাঠাইয়া দিতাম। ঐ ডিসপেনসারীতে ৫০।৬০ বৎসর বয়সের ছইটি জীর্ণজ্বর, গ্রহণী ও শোথগ্রস্ত রোগী পাঠাইয়াছিলাম, তৃতীয়া বশতঃ ৬ মাসের মধ্যে উভয় রোগীই আমার প্রাণে আবাত দিয়া ইহলোক ত্যাগ কবে। কিছুদিন পরে আমার পুজনীয়া মাতাঠাকুরানী উরুরোগে আক্রান্ত হইলেন। আমি তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া ত্রিমাসভাগবত পাঠ প্রভৃতি শুনান কার্যে নিযুক্ত হইলাম। কিছুদিন পরে আমার একজন শিষ্যের পরামর্শে নিজে আয়ুর্বেদ প্রণালীতে তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই আমার মা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। ইহার পরে আমার একজন প্রজার জলোদর হইয়াছিল, সে ব্যক্তি ডাক্তারী চিকিৎসার ব্যর্থমনোরথ হইয়া আমার নিকট আসিলে ভগবানের অনুগ্রহে আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করিয়া উক্ত রোগীকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অষ্টাদশ বর্ষীয় একজন মুসলমান বালকেরও ৩ মাসের মধ্যে জলোদরের চিকিৎসার সকলকাম হইয়াছিলাম। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইল, আমাদের

আয়ুর্বেদ 'শাস্ত্রে এখনও বহু অমূল্য রহস্য নিহিত আছে। অতঃপর আমি বিশেষ সাহসের সহিত আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা-কার্যে প্রাণমন সমর্পণ করিলাম। ভগবানের অনুগ্রহে, আমার হাতে বহু রোগীর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে—এই টুকু আমি বিনীত ভাবে আপনাদের কাছে নিবেদন করিতেছি। আমার নিজের 'গ্রাম ও তৎসম্বন্ধিত গ্রামের লোক সমূহের ধারণা হইল—আমি বাহুমুখে চিকিৎসা করি। কিন্তু বাস্তবিক আমার ঐরূপ কোন মন্ত্র নাই—বাহা কিছু আছে সমুদয় আয়ুর্বেদের সাহায্যে। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন—আমার এরূপ খ্যাতি শুনিয়া স্থায়ী হাঁসপাতালের ডাক্তার মহাশয়ের দীর্ঘা হইল। তিনি জেলার কলেকটর সাহেবের নিকট—আমার বিকল্পে আমি অর্থ না লইয়া চিকিৎসা করিয়া হাঁসপাতাল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছি—এই মর্মে অভিযোগ করিলেন। সৌভাগ্যের দ্বিধা, কলেকটর সাহেব নিজেই আসিয়া আমার কার্য্য পদ্ধতি দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং ডাক্তারের অভিযোগ আমার প্রশংসায় পরিণত হইল। তিনি আমার কার্য্যে বাধা না দিয়া বরং সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আমাকে বিশেষ রূপে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কমিশনার সাহেব আমার চিকিৎসা-প্রণালী দেখিয়া বড়ই পরিদৃষ্ট হইলেন ও বিদ্যালয়ের কার্য্যে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নূতন নূতন ভেবজের 'আবিষ্কার' কার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম। জন সাধারণের সুবিধার জন্য আমার আবিষ্কৃত প্রত্যেক ফলপ্রসূ ঔষধ-গুলির সংশ্লিষ্ট বিবরণ আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিব। [আগামীবারে সমাপ্য]।

প্রাচীন চিকিৎসকের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।*

(পূর্বাঙ্গবর্তী)

[কবিরাজ শ্রী ইন্দু ভূষণ সেন গুপ্ত এচ্, এম্, বি]

—:—

(৫৪) অজীর্ণ রোগে—ধনিয়া এক তোলা ও শুঠ এক তোলা ইহাদের কাথ সেবনে অজীর্ণ ভাল হয়।

(৫৫) ত্রিফলা চূর্ণ সৈন্ধব লবণ সহ সেবনে অজীর্ণ উপশমিত হয়।

(৫৬) প্রত্যহ প্রাতঃকালে আদা, কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ও মন্দারি ভাল হয়।

(৫৭) যোয়ান ও শুঠ উভয়ে এক তোলা লইয়া ১/০ এক পোয়া জলে সিদ্ধ করতঃ ১/০ ছটাক থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে অজীর্ণ, পেটকাঁপা চুঁয়া ঢেকুর প্রভৃতি নষ্ট হয়,। উপরোক্ত মুষ্টিযোগ চারটি আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত।

(৫৮) হিকার—পলতার রস এক তোলা ও আমলকীর রস এক তোলা মধুর সহিত পান করিলে হিকা প্রশমিত হয়।

(৫৯) শুঠ চূর্ণ সহ গরম গরম ছাগদুগ্ধ পান করিলে হিকা নষ্ট হয়।*

(৬০) খাসে খেত শ্বতুরার শুক মূল শুঁড়া করিয়া কাগজের দ্বারা চুকট করিয়া

তাহার ধূম পান করিবে খাস ভাল হয়। ইহা ব্যবহারে আমরা অনেক স্থলে বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

(৬১) পিপাসায়—পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত দধি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আশু পিপাসায় নিবৃত্তি হয়। দাহ রোগে—ধনিয়ার কাথ চিনির সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিলে দাহ ও তৃষ্ণা নষ্ট হয়।

(৬২) উপদংশে—সাদা ধুনার শুঁড়া ও মাখম—সম পরিমাণে মর্দন করিলে উপদংশের বা শুকাইয়া যায়।

(৬৩) বামন হাটির মূল, আপাঙ্গ মূল, চন্দন, মনঃশিলা এই সকল পোষণ করিয়া দ্ব্যুত সহযোগে প্রলেপ দিলে উপদংশের কৃত ভাল হয়।

(৬৪) সোণাছাল, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ইহাদের কাথে, গুগ্গুলু ও ত্রিফলা চূর্ণ ১/০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া ৫৭ দিন পান করিলে উপদংশের বিস্র নষ্ট হয়। ইহা ব্যবহারে আমরা অনেক স্থলে বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

(৬৫) বসন্তে—পিড়কা সকল সম্পূর্ণরূপে উন্নত না হইলে কাঁচা হরিজ্ঞার রস, মাখমের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাজে মর্দন করিবে।

(৬৬) বসন্তের প্রথম অবস্থায়—মেথী

* আয়ারি পিতামহ ইটালির বনামধন্য ঋষিকর্তৃক কবিরাজ বর্গীর ঈশ্বর চন্দ্র নির্মোহনি মহাপ্রেরণের পরীক্ষিত ঔষধাবলীর জীর্ণ খাতা হইতে সংগৃহীত।—লেখক।

ভিজান জল, কুড় ও বাবুই তুলসীর কাথ অথবা কুড়, বাবুইতুলসীর শিকড় ও মানকচুর শিকড়ের কাথ সেবন করিলে উপকার হয়।

(৬৭) বসন্তের প্রথমাবস্থায় কুম্মুরিয়া লতার কাথে ১০ আনা পরিমিত হিং প্রক্ষেপে দিয়া সেবন করিলে উপকার হয়।

(৭৮) বসন্তের প্রথমাবস্থায় জরন্তী অথবা

শিকটী মূল-মুত ও পার্যাদিক জলের সহিত পান করিতে হইবে।

(৬৯) স্থপারীর মূল কিষা মরিচ ও ময়না কল অথবা মরিচ ও নাটাকরঞ্জার মূল বাসি জলের সহিত প্রয়োগ করা বসন্তের প্রথমাবস্থায় উপকারী।

(৭০) ষেত চন্দন ঘষা ১০ আনা ও অল্প ছটাক হিফেলাকের রস পান করিলে বসন্তের ফোটকগুলি তাসিয়া উঠে।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ ।

—:o:—

শোক সংবাদ ।

আমরা শোক সন্তপ্ত হিতে প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১ শে পৌষ মাসের রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় হুগলহাটীর বিখ্যাত বড় রাজকুমার ঘনশ্য নাথ রায় বাহাদুর পরলোক প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। স্বর্ধর্মপাষণতা, আশ্রিত বাৎসল্য, অতিথি সেবা, দানপান্ন, পরোপকার প্রভৃতি বাঞ্ছোচিত গুণে হুগলহাটীর রাজসংশ চিরকালই বঙ্গদেশের শ্রদ্ধাশ্রয় অধিকার করিয়া আছে। স্বর্গগত কুমার বাহাদুর বংশোদ্ভূত সমস্ত গুণবান আধারী ছিলেন। ইহার স্বগীয় পিতা রাজা হর নাথ রায় বাহাদুর রাজসাহী কলেজ প্রাতিষ্ঠার প্রথম লকারক মুজা মূল্যের ভূসম্পত্তি গভর্ণমেন্টকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রচুর অর্থায়ত্বল্যে প্রতিষ্ঠিত বোরালিয়া “তমসো যত্র” বিদ্যুত “হিন্দুরজিকা” মুদ্রিত হইয়া অত্যাশি গোরা বেস সহিত সমগ্র বঙ্গদেশে বিবিধ ধর্ম্মালোচ-

নার পথ প্রদান করিয়া আসিতেছে। পিতৃ-দেবের আচরিত পছন্দসুসরণে উক্ত কুমার বাহাদুর দেশের ও সাধারণের বিবিধ হিতানুষ্ঠান রত ছিলেন। প্রব্রামণ্ডলীর হিতার্থ রাজধানীতে প্রথম শ্রেণীর এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ইহাদের অত্যন্ত সাধারণ কীর্তি। আমাদের অষ্টক আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীমম্বতলাল দাস গুপ্ত কাব্যার্থ কবিত্বমণ মহাশয় উক্ত রাজ বংশের পারিবারিক চিকিৎসক পদে দীর্ঘ ২০ শ বর্ষ ব্যপিতকাল বর্তমান ছিলেন। আমরা তাঁহার মূখে বহু দিন হইতেই স্বর্গীয় কুমার বাহাদুরের বিবিধ সদগুণের কথা শুনিয়া আসিয়াছি। তাঁহার অমায়িক উদার চরিত্রে ইতর, ভ্রাতৃ সঙ্গেরই প্রীতিলাভ করিত। সর্বসাধারণের উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি নিজ বাটীতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিভাগে বহুদূরগত নিঃস্ব ছাত্রগণ রাজারহুকুল্যে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইতেছে।

কবিরাজ শ্রীমম্বতলাল দাস গুপ্ত কাকতীর্থ কর্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
১৯১২নং প্রামাণ্যের প্রিন্স মোড় হইতে মুদ্রিত কর্তৃক প্রকাশিত।



আয়ুর্বেদ

৭ম বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল।

৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শ্বংসের পথে বাঙ্গালী।

(ডাক্তার শ্রীধরেন্দ্রনাথ বসু-কাব্যবিনোদ।)

— : ১০ : —

বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে গেলেই আতঙ্কে প্রাণ শুকাইয়া যায়, বাঙ্গালী উচ্চ শিক্ষা পাইতেছে, সভ্য হইতেছে, সভ্যজগতে সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে, কিন্তু এদিকে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বিদেশ হইতে যে কেহ আগ্রহ, সে একবার বাঙ্গালীর উপর তাহার প্রভুত্ব খাটাইতে কিছুমাত্র বিধা বোধ করে না। ফল কথা, বাঙ্গালী সকলের নিকটেই যেন সঙ্করী নাগর হইয়া পড়িয়া আছে, যে আসিবে, সেই একবার ঠাহকে পিটিয়া বাইবে; ব্যাধিগুলিও বাঙ্গালার মাটিতে কি মধু . যে পাইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালীর একবার যে হুকিতেছে সেই কারেমী মোরনী জমা লইয়া চিরদিনের জন্য থাকিয়া বাইতেছে, তাহাকে তাড়াইবে এমন শক্তি কার ?

পূর্নগণেশের সেনসাস রিপোর্ট হইতে আমরা দেখিতে পাই, ১৯১১ সালের মার্চমাসের গণনা অনুসারে সমগ্র ভারতে লোকসংখ্যা একত্রিশ কোটি একাত্তর লক্ষ ছায়াত্র হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই ছিল, ১৯২১ মার্চ মাসের গণনার মোটামুটি একত্রিশ কোটি নব্বই লক্ষ হইয়াছে অর্থাৎ দশবৎসরে মাত্র ৩৯ লক্ষের কিছু উপরে বাড়িয়াছে। কিন্তু ১৯০১ হইতে ১১ সালে দুইকোটি আটলক্ষ লোক বাড়িয়া ছিল, গত দশবৎসরে লোক বাড়িয়াছে শতকরা ১২৬ জন, তৎপূর্ব্ব দশবৎসরে বাড়িয়াছিল শতকরা ৭ জনের বেশী। পাঠক দেখিবেন, এই হতভাগ্য পরাধীন দেশে জন্মের হার কেমন ভাবে কমিয়া যাইতেছে! পরাধীনতার অবসাদ হৃদয় দারিদ্র্যের সহিত যোর সংগ্রামে জীবনীশক্তির দ্রুত অপচয়, আর কলেরা-ইনফ্লুয়েঞ্জা বসন্ত-ম্যালেরিয়া ইত্যাদি

ব্যাবির ডাঙবলীলা—ইহাই কি যথেষ্ট কারণ নহে।

আবার স্বাধীন দেশের সহিত তুলনা করিয়া দেখুন—ইংলণ্ড ও ওয়েলসের লোক-সংখ্যা ১৮৪১ সালের গণনার শতকরা ১৪.২, ১৮৫১তে ১২.৬; ১৮৬১তে ১১.২, ১৮৭১তে ১০.২, ১৮৮১তে ১৪.৩, ১৮৯১তে ১১.৬, ১৯০১ এ ১২.১, এবং ১৯১০-রে ১০.৯ বাড়িয়া ছিল।

বাল্যায় মৃত্যুর হারই বা কি ভীষণ। বাল্যায় গভর্ণমেন্টের মিউনিসিপাল বিভাগ হইতে ১৯১৯ সালের জন্মমৃত্যুর যে তালিকা বাহির হয়, তাহাতে প্রকাশ, গত পূর্ব বৎসরের জন্মসংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা ০৯৬০০০ বেশী। কলিকাতার মৃত্যুর সংখ্যা ১,২৫০০০, বসন্তে ৩৭০০, অরে ১২,২৯০০০। শিশুমৃত্যুর হার আরও ভয়ানক। যেখানে বিলাতে হাজার করা ২০, স্কটল্যান্ডে ২৭ অথবা আরায়লণ্ডে ৮৩, সেখানে বাল্যায় মরণে হাজার করা ১০৫ (কলিকাতায় ২৫০) শিশু মারা যায়। বাল্যায় অদৃষ্টবাদী, তাই সে মনে করে সবই অদৃষ্টের কল, নিয়তির গতিরোধ করিবার কসত কাহারও নাই, ঈশ্বর বেন শুধু ভারত-বাসী—তথা বাল্যায়ের অদৃষ্ট অদৃষ্ট ও নিয়তির নৃষ্টি করিয়াছেন। বাল্যায় এমনি অপদার্থ, শক্তিকীন, ‘জড়ভরত’ ইহারা পড়িয়াছে যে, তাহার একবার বাঁচিবার ইচ্ছা হয় না, কখনও সে মনে করে না যে, একবার গা’ঝাড়া দিয়া উঠি, জীবন-সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হই। সে নিতান্ত অসহায়ের মত আপন ইচ্ছার কৃতান্তের জালুর ভিতরে বাইরা ধরা দিতেছে।

চীমদেশে অকাল মৃত্যুর হার বাড়িয়া

গিয়াছে, সেখানকার লোকসংখ্যা ৪০ কোটি, অথচ বৎসরে বেড়ে কোটি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেজন্য সেখানে শিশুমৃত্যুর বিপুল আরোজন চলিতেছে। স্বাস্থ্যসভা, শিশু সংরক্ষণ সমিতি, স্বাস্থ্য প্রদর্শনী প্রভৃতি অল্পটান দ্বারা সজানবতী জননী সমাজকে এবং কুসংস্কার-পন্ন গ্রামবাসীদিগকে নানাবিধ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বলা বাহুল্য তাহাতে কলও হইতেছে আশাতিরিক্ত।

বিশেষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, প্রথম বৎসরেই অনেক শিশু মারা যায়, ইহার মধ্যে সম্ভবতঃ শিশু মৃত্যুর হার বোধ হয় বেশী, এবং টিটেনাস বা ধনুষ্ঠিকারই সম্ভবতঃ শিশুমৃত্যুর অত্যন্ত প্রধান কারণ, কলিকাতায় তার সহরে শিশুমৃত্যু অত্যন্ত। পূর্বে এ সবকে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। পল্লীগ্রামে ধনুষ্ঠিকার ব্যাবির নামান্তর “পেঁচোর পাওয়া।”

আজকাল বোধ হয় অনেকেই জানেন, কলিকাতার স্বাস্থ্যকর দুধই শিশুমৃত্যুর একমাত্র প্রধান কারণ। এখন আর মাছু-সুত্তরূপ অমৃত অনেক শিশু-ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না, বামাগণের স্বাস্থ্য আলোচনা করিবার সময়ে এ সবকে আমরা বিস্তারিত বলিব।

গাভীকে যদি উত্তম মরদানে চরিতে না দেওয়া যায় সর্বদাই অল্প পরিসর স্থানে বাঁধিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সে গাভীর দুধ কখনও সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না, ‘কুকা’ দেওয়া দুধ শিশুগণের পক্ষে বিধ তুল্য বলিলেও অত্যাঁজি হয় না, অথচ কলিকাতার অধিকাংশ দুধই এই দোষে দুষ্ট, কলিকাতার জ্ঞান স্থানে উত্তম মরদানে গোচারণ

অসম্ভব হইলেও শেযোক্ত প্রক্রিয়ার, কৃত্রিম উপারে দ্রুত বহিষ্করণ চেষ্টা করিলে নিবারণ করা বাইতে পারে।

পল্লীগ্রামে অনেকে গাভীপালন করিয়া থাকেন, কিন্তু বাহাদেবের অপরের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহাদের ভাগ্যে খাঁটি জিনিস মিলে না। কলিকাতার দ্রুত কলের জল মিশাইলে বোধ হয় স্বাস্থ্যের পক্ষে তত হানি খনক হয় না, কিন্তু পল্লীগ্রামের অনেকেই গচা ডোবা, হাঁদাপুকুর প্রভৃতির সস্ত্র প্রাণ নাশক ধীলানুসন্ধানিত জল মিশাইয়া দ্রুতকে বিষবৎ করিয়া তুলে, ইহা ভিন্ন দ্রুতের মাখন তুলিয়া অনেকে মরদা ইত্যাদি নানাবিধ বিক্রয় করে।

“পেঁচোর পাওয়া” বা পল্লীগ্রামের ভাষায় বাহাদেব বলে “পেঁচোপেঁচি”, কুসংস্কারাপন্ন পল্লী রসনীদেবের মতে উপদেবতা বিশেষ। বোধ হয় তাহার যুগলে অবস্থান করে বলিয়াই তাহাদের নাম পেঁচোপাঁচি, আঁতুড় ঘরের আনাচে কানাচের ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে, ক্ষণে ক্ষণে শিশু নানাবিধ বর্ণধারণ করে ও তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া যায়, অভিজ্ঞ পাঠক বিবেচনা করিবার দেখিবেন, এক্রপ লক্ষণ সন্ধ্যাত শিশুর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়াই হইয়া থাকে, অগিচ সন্ধ্যাপ্রস্তু শিশুর খাসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলেই তাহার দেহের বর্ণের ও পরিবর্তন হইয়া থাকে শিশুর ধনুটোয়ও এই সমস্ত লক্ষণ ও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় পল্লীগ্রামের আঁতুড় ঘর যে পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়। তাহাতে শিশুদের খাস কষ্ট হইয়া মৃত্যু ঘটতে বেশী দেরী লাগে না, সাধারণতঃ বাকীর মধ্যে যেটি নিকট ঘর, তাহাতে অথবা

তাহারই মত বারান্দার আঁতুড় ঘর প্রস্তুত করা হইয়া থাকে—বাহাতে কোনরূপ পেঁচো পাঁচিরা নিখাস পর্য্যন্ত না প্রবেশ করাইতে পারে এক্রপভাবে আলোক ও বাতাসের সামান্য পথটুকু রুদ্ধ করিয়াই ঘর খানি প্রস্তুত করা হয়, পরে সপ্তাহ ধরিয়া সেই ঘরে আঁতুড়ের কুণ্ড জ্বলিতে থাকে, তাহার গ্যাসটুকু পর্য্যন্ত বহির্গত হইবার উপায় থাকে না, ইহাতেও যে সমস্ত শিশু খাস কষ্টে না মরিয়া বাঁচিয়া উঠে—তাহাদের পরমায়ুর বাহাদুরী আছে বলিতে হইবে।

কুসংস্কাররূপ ব্যাধির শেষ এই খানেই নহে। আঁতুড়ঘরে কুমুরিয়া লতা নামক এক প্রকার কাঁটায়ুক্ত লতার ঘের দেওয়া হইয়া থাকে। বেতের কাঁটাও দেওয়া হয়। বজা নামক একপ্রকার শুষ্কের ডাল বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে শুষ্ক জিয়া দেওয়া হয়। কাঁটা দেওয়াতে বোধ হয় আঁতুড় বাওয়ার ভয়ে অপদেবতা আঁতুড় ঘরে ঢুকিতে সাহস করে না।

এক কড়ি, দু কড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, ছ'কড়ি, সাতকড়ি ইত্যাদি নামের একটা কৌতুকজনক ইতিহাস আছে, ছেলে জন্মান মাত্র খাজী অথবা মাসী-মিসী ইত্যাদি আত্মীয়রা মায়ের নিকট হইতে, এক কড়া, দু'কড়া ইত্যাদি কড়ি দিয়া ছেলেকে কিনিয়া লয়, ছেলে তখনই বিক্রীত হইয়া গেল, স্ত্রত্নায় অপদেবতার সাধ্য কি পরের ছেলেকে লইবেন, অথবা ‘উচ্ছিষ্ট’ মনে করিয়াও তিনি ত্যাগ করিয়া বাইতে পারেন। ‘কড়ির’ সংখ্যানুসারেই ছেলের নামকরণ হইয়া থাকে।

‘মরাত্বে’ পোষ্যভ্রম ছেলে জন্মান মাত্র তাহার কাণ, মেয়ে হইলে নাক—অথবা শরীরের অন্ত কোনস্থান ফুঁড়িয়া দেওয়া হয়। তাহাতে ছেলে খুঁতো হইয়া গেল, এবং খুঁতো ছেলে যমের কোন প্রয়োজনে আইসে না।

কবি বলিয়াছেন—

বে নদী হারা’রে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবাল দাম বাধে আসি তারে।
বে জাতি জীবন হারা অচল অশাঙ,
পদে পদে বাধে তা’রে জীর্ণ লোকাচার।

কবির উক্তি এই হতভাগ্য জাতির উপর অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইতেছে। এই জাতি আজ সহস্র শৈবাল দাম পারিবেষ্টিত ভটিনীর ভায় শক্তিহীন—এই জাতি আজ মর্জিতা অভিশপ্তা দেববালার ভায় দীনা ও মলিন।

আমাদের দেশে আতুড় ঘর অত্যন্ত অপবিজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হয়, ইহার কারণ নির্দেশ করা আমাদের ভায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির অসাধ্য। আমাদের ধাত্রী বিদ্যার অধ্যাপক -

—বিকুর সহিত গর্ভস্থ ক্রণের তুলনা করিতেন। ক্রণের ফুলটি (placenta) বিকুর নাতি হইতে উখিত পদ্মের সহিত তুলিত হইত, যেখানেবীর আগমন পথ অথবা অবস্থান গৃহ সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা হয়, ক্রণরূপ বিকুর ধরাভলে অবতীর্ণ হন বলিয়া তাহার পথটীও প্রাকৃতিক নিয়মে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শিশু ভূমিষ্ট হইবার কিছু পূর্বেই ‘পানমুচি’ তাকিয়া অপত্যপথ আপনা হইতেই পরিষ্কৃত হইয়া যায়। দেবতাদের সহিত বাহার তুলনা হইতে পারে—এরূপ সদাঃ

প্রস্তুত শিশুর গৃহটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পবিত্র জ্ঞান করাই উচিত। অথচ তাহার ঠিক বিপরীতই আমাদের দেশে হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্বে সংবাদ পত্রে অবগত হইয়াছিলাম, পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যবস্থা দিয়াছেন, আতুড়ঘর অপবিত্র নহে, উহাতে নারায়ণ পূজা পর্য্যন্ত চলিতে পারে। এই ব্যবস্থাহুসারে যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারী তাহাদের আজন্ম সংস্কার দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে, তবেই শিশুদের মঙ্গল, নতুবা এই হতভাগ্য দেশে তাহাদের মঙ্গলের আশা দূরশা মাত্র।

অনেকে হয়ত বলিবেন, এই সমস্ত কুসংস্কারের মধ্যেও তো আমরা মানুষ হইয়া উঠিয়াছি, তখনকার দিনে এখনকার মত এরূপ পরিবর্তনের কিছু দরকার হইত না। তাহার উত্তরে বলা যায়, অনেকে মানুষ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু এরূপ প্রথার ফলে একালে যে কত জীব নষ্ট হইয়া গিয়াছে আজকালকার ভায়—তাহার ধোঁজ খবর সকালে কেহই রাখিতেন না।

নাড়ী কাটার দোষে নাড়ীর প্রদাহ হইয়া ও ঠাণ্ডা লাগিয়া এবং অস্ত্রাত্ত কতকগুলি কারণও শিশুর ধনুটকার ৩ রোগ জন্মিয়া থাকে। এই রোগে, শরীরটা আড়ষ্ট হইয়া ধনুকের ভায় বক্র হইয়া যায় এবং শিশু স্তম্ভপান করিতে পারে না। ‘পেটোর পাওয়ার’ ইহাই সর্বপ্রথম লক্ষণ। শুনিতে পাওয়া যায়, ওঝারা পেটোর পাওয়া শিশুদের হাতে কাটি দিয়া তাহাদগকে হাঁটাইয়া থাকে, ইহাতেও তাঁহাদের বাহাহরী বিশেষ কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। ধনুটকারগ্রস্ত

আড়ঠে শিশুর হাতে কাটি দিয়া তাহাকে বে
কেহ হাঁটাইতে পারে। তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাছে
শিশুকে নিক্ষেপ করিয়া বায়স বেড় ইত্যাদি
জন্ততে পরিণত করার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।
সদ্যজাতি শিশুকে কিছু সময় ধরিয়া ঐরূপ
করিলে তাহার ক্রুর আকার ধারণ করিতে
পারে তাহা সুখাগণ একবার বিবেচনা
করিয়া দেখিবেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে
আমাদের গ্রামে একটা পৈশাচিক ঘটনা
ঘটে বলিয়া শুনিতে পাই। সে কথা স্মরণ
করিতে আজও সর্বশরীর আতঙ্কে শিহরিয়া
উঠে, একটা নিম্ন শ্রেণীর গৃহে এক সদ্যজাত
শিশুর ধনুষ্কার হয়। ফকির আসিয়া মত
দিয়া গেল,—“ইহার ভিতরের সারপদার্থ অর্থাৎ

জীবন অনেক ক্ষণ হইল পেঁচোপাঁচিতে লইয়া
গিয়াছে, ফিরাইবার আর কোন উপায় নাই,
এখন বাহা দেখিতেছ, সে অপদেবতার লীলা
মাত্র। ইহাকে এখন ফেলিয়া দিতে পার,
কিন্তু লাগি মারিতে মারিতে লইয়া বাইতে
হইবে, অপদেবতাকে তো জয় করা চাই।”
গৃহস্থানীত সেই হতভাগ্য শিশুটিকে কুটলের
জায় কিক্ (Kick) করিতে করিতে লইয়া
গেল। হায় বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য শিশুরা!—
হায় তাহাদের দুর্ভাগ্য পিতৃমাতৃগণ! এই
সমস্ত রোমহর্ষণ পৈশাচিক অহুষ্ঠানের ফল-
ভোগ আর তাহার কতদিন করিবে?

(ক্রমশঃ)

হিতকথা ।



[শ্রী ক্ষীরোদ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ]

— :::: —

গৃহের লক্ষ্মী বজ্রনারীকে রায়বাঘিনী করোনা।
পরাদীন এই দুঃই জাতির গৃহ-দুখটি ঘুচও না।
রোগে শোকে দাসস্বৈচ্ছ্যার পরাণ ওষ্ঠাগত
প্রায় ;
শ্রান্ত পাহসম জুড়াক (এসে) ঠাণ্ডাগৃহ
বটতলায় ।
ভাঙ্গা সহজ, গড়া কঠিন—এই কথাটা ভুলোনা ;
পরের দেখে ধাঁ করে তাই নিজের ভাল
ছেড়োনা ।

জাতি ধর্ম বজ্রের রেখে সবাই বেড়ে উঠেছে ;
আম কখনো হয়নি কাঁঠাল—কান কি ময়ূর
হ'য়েছে ?
নারী শিক্ষা ভাল বটে, স্বাতন্ত্র্যে তা'র নাই
কল্যাণ—
বিধাতার এই শুভ বিধান—নরের পাশে
নারীর স্থান ।
স্বাস্থ্য, সেবা, ধর্ম, নীতি, কুটার শিল্প শিক্ষা
দাও ;

সতী সহধর্মিনীকে সহযোগিনী গড়ে' নাও।

সবাই যদি বাহিরে গিরে মাঠে বাটে হাওরা
খার,

রান্না বাড়ী গৃহস্থালী—শিশু, পালন হ'বে দার।

ত্রীকে স্বাধীন করতে তোমরা

নাছোড়বন্দা দেখছি তাই,

(কিন্তু) লক্ষ লক্ষ পল্লী ম'রছে—

সেদিকে মোটেই দৃষ্টি নাই।

দ্রুত সর স্বীয় ছানা ননী দই

মাখন গোরস শূভ দেশ :—

গোপালন তুলি, কুকুর পুষিলে,

মোক তোমার মাথার কেশ।

বাসন-বিলাসে গাত্র ঢালিয়া

সাবান মাখিয়া খাইছ ছাই ;

ভেজাল ময়দা দ্রুত তেল চিনি,—

বিগড় খাত দেশেতে নাই।

রোগের আবার পাগল হইয়া

কত বে ওষুধ হ'বেলা খাও,

তথাপি আহাির বিহারে সংঘর

সুচিটার দিকে মন না দাও।

(আর) বেনী বলিবনা, মিঠেকড়া ভাল,

তিক্ত হইলে গিলেনা কেহ ;—

দেশের অবস্থা জানিতে হইলে

যুবকের দেখ জীর্ণ মেহ।

সব ব্যাগারে মুক্ত স্বাধীন নারী যদি হ'তে চায়,

মেহ-মুখা মাঝি' কে গো ক্ষুধার অন্ন দিবে

বা হার !!

বহুমূলী অন্নশূলী খেটে অহি চর্ম সার,

ক্লিষ্টমাণ এই জাতিটাকে যা বিনে কে বাঁচাবে

আর !!

হ'লে শুচি গিতা মাতা জ্ঞান শক্তি পুণ্যসর,

জাতিক গণেশ জন্মিবে রে পুনঃ দেশে সুশিষ্টর।

যারের মত মা হয়ে রে যদি দেশে ভাল চাও ;—

সখের নারী কচের পুতুল 'তাকে' তুলে বর
সাজাও।

জাতিটা আগে রক্ষা কর—পল্লীগুলো বাঁচিয়ে
দাও,

স্বাধ্যনীতি খাঙতবে কোমর বেঁধে লেগে দাও।

জোর কলমে লেখা লিখি চলছে বেরপ দেশটা
বর,

রান্না বরে আঁতুড় বরেও মোদের বুঝি হুকুতে
হয় !

এখনো তো অনেক গৃহে পাচক ঠাকুর আসেনি,

যা সকলই কটে স্টেটে মৌল ভাতটা রাখেনই।

স্বাধ্যহীন এই 'মোরো' জাতির ভেজাল নোংরা
খাত খেয়ে

অন্ন শূল আর বুক আলা বে, নারী দেশটা
কে'লু ছেয়ে।

বে দিন হ'তে বন্ধনারী পরের হাতে রান্নাঘর

সঁপে দিয়ে কলম নিয়ে ব'লে গেলেন চেয়ার,
পর,

সেই দিন হ'তে স্বামীপুত্রের ডিসপেনসিয়ারী
লেগেছে—

পরের অন্ন প্রাণের দরদ দিয়ে কি কেউ
রোঁযেছে ?

মার্কিভরুচি জ্ঞান বিজ্ঞান

সত্যতালোকে ব্যতিচার,

উজ্জ্বল স্বাধীনতা আর

বেজাচারিতা—পানাহার ;

নভেলি প্রাণর মাঝারে পিরীত

হোটেলি মিলন উপহার,

উৎকট আমব কারমা কানুন

কপট-মোকামি-শিটাচার ;

পাশের জোড়ে গবিত্ততা ।

তেসে গেছে অনেক দিন,

পতা, খিচুড়ি একাকার

এলোমেলো সংঘ হীন ।

সমাজ যদি আদর্শ হয়,

কতি বুদ্ধি নাই আমার ;—

শ্রেমানন্দ শান্তি জ্ঞান

উন্নতি চাই গো আর ;

হ'লেই বাচি—হর্ষে বিবাদ,

শিব গ'ড়তে বানর না হয়,

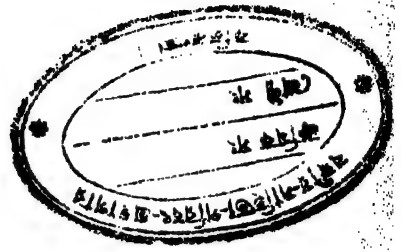
জ্ঞান অজ্ঞান, আগোর আধার—

এই শুধু মোর আছে ভয় ।

উড়ষর ।

(রিপোর্টারের পত্র)

(পূর্বোক্তবর্তী)



১। স্বাপদ বিবের মহোৎসব

উড়ষর পত্রের সার সেবনে কুকুর শিয়াল
দংশন জনিত বিষ নষ্ট হইয়া দ্রুত ব্যক্তির প্রাণ
রক্ষা হয়। হাজার হাজার রোগীর মধ্যে
২১১টা রোগীর বেলায় ইহা ব্যর্থ হইতে পারে।

২। বিষধর সর্প বিবের মহোৎসব।

সর্বপ্রকার সর্পদংশন জনিত মৃত্যুর কবল
হইতে রক্ষা করিতে ইহা অব্যর্থ মহোৎসব।

আমি বহুবিধ বনস্পতি ও উদ্ভিদের সার
নিকাশন করিয়াছি এবং ভিন্ন ভিন্ন রোগে—
প্ররোগ করিয়া যে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়াছি
তদ্ব্যয্যে উড়ষরের (বক্তা ডুবুরের) সার অমোঘ
ও অব্যর্থ। আমার এই বিশ্বাস আছে,
উড়ষর সার হাজার হাজার রোগীকে ব্যবহার
করাইলে একদিকেও ব্যর্থ হইবেনা। অতঃপর
আমি এই সারের গুণ বর্ণনা করিতে প্রয়াস
পাইব।

এই উড়ষর সার শত্রুঘাত জনিত সর্ব-
বিধ রক্তশ্রাব বন্ধ করিয়া আলা যন্ত্রণা দূর
করিবার জন্য অব্যর্থ ঔষধ। সংক্ষেপতঃ ইহা
সক্ষত ও অক্ষত অভিঘাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।
নূতন ও সাধারণ ব্রণ (কোড়া) উঠিবার
পূর্বে ও পরে সমস্ত অবস্থায় ইহার প্রয়োগে
অত্যন্ত ব্যবহার্য ঔষধ অপেক্ষা বিশেষ
কার্যকরী হয়। কোড়া উঠিবার সময় যদি
সার প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে আলা
যন্ত্রণা ও শোথ (সুলা) দূর হইয়া কোড়া
বসিয়া যায়। কোড়া পাকাইবার জন্য ও
এই সার ব্যবহার করিলে কোড়া পাকিয়া
আপনি কাটিয়া যায়। অস্ত্রোপচারের
(operation) পর এই সার ব্রণের ভিতর
প্রয়োগ করিলে Idnoform carbolic
lotion প্রভৃতি প্রতিবেদক ঔষধের কাজ
করে। যে সকল ডাক্তারী ঔষধে ক্ষত শুকা-
ইতে ও ব্রণের পূরণ করিতে ৭৮ দিন সময়

লাগে, সেক্ষেত্রে এই সার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নালী বা প্রভৃতির আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূর করিয়া ক্ষত শুকাইয়া দেয় ও ত্রণ পূরণ করিয়া দেয়। ইহা রক্ত শোধক ও ত্রণ শোধক। চক্রব্রণে ও নাড়ী ত্রণে ইহার বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন সাংঘাতিক ক্ষত স্থানে কীট উৎপন্ন হইলেও এই সারের প্রয়োগে ঐসকল কীট মরিয়া যায় ও ক্ষত ক্রমে শুকাইয়া যায়। তপস্বর প্রভৃতি কৃত্তিকিৎস্ত রোগে ইহার প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। হঠ প্রাণহারী জীবাণুর ধ্বংস সাধন করিতে এই সার অব্যর্থ।

আমার ঔষধানয়ের ম্যানেজার চণ্ডীচরণ শর্মার অভুলীতে এক প্রকার ত্রণ হইয়াছিল। অন্নোপচারের পর কৃত্তিক বংশনবৎ অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ঔষধানয়ের প্রাণনে ইতস্ততঃ ছুটাহুটি করিতেছিলেন তৎপর আমি উক্ত সারের পত্রের প্রলেপ দিয়া তাহাকে আরোগ্য করিয়াছিলাম। একরূপ বহুবিধ অবস্থায় উক্ত সার পত্রের প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

চক্ররোগে, পামা বিচর্জিকা নেত্রাভি-
যান্দে, বাবতীর মুখরোগে, জিহ্বাও দস্তাঘাতে,
বস্তমূলে বা হইলে, গ্রীবাদেশে শোথ হইলে,
কর্ণ রোগে, নাসিকা রোগে, চক্ষুর
বাবতীর আলা যন্ত্রণায়, স্নীপস প্রভৃতি
রোগে ইহার ফল প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছে।
ইহা ছাড়া কণ্ঠ রোগ (গ্রহি উদ্ভূত হইয়াছে
অথচ পাকে নাট), প্রচলী, মন্দাগ্নি, অতিসার,
গণোরিয়া, সিকিলিস, রক্তপিত্ত, অঙ্গুগ, প্রদর,
প্রবহ প্রভৃতিরোগে ইহা সেবনে বিশেষ ফল

পাওয়া যায়। অধ্বাদি পত্বর দস্তাঘাতে যন্ত্রণা
হইলে এই সারের ব্যবহারে উহা দূর হয়।
কিছুদিন পূর্বে আমি একবার টম্‌টম্‌ নাড়ী
হইতে পতিত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে-
ছিলাম; আমার সমস্ত ভাঙ্গ অসহ্য বেদনা—
এমন কি কোন কোন স্থানে ক্ষত হইয়াছিল।
এই উদ্ভূত পত্র ব্যবহারে আমি অল্প সময়ের
মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিলাম। এক
জন রাজমিস্ত্রী আমার বাড়ীতে দেওয়ালের
উপরে কাজ করিতেছিল; সে হঠাৎ ঐরূপ
উচ্চস্থান হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া
সাংঘাতিক রূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল,
তাহাকেও এই সার ব্যবহার করাইয়া উহার
অত্যাশ্চর্য্য ফল আমি নিজের প্রত্যক্ষ করি-
য়াছি। পলতল কাটিয়া গেলে এই সার
প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। অগ্নিদগ্ধ
ব্যক্তির ক্ষত ইত্যাদি দূরীকরণার্থ এই সার
উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আমার আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের একজন
অধ্যাপকের একবার রাত্রি কারবার সময়
ডালের ভাও হইতে উদ্ভূত ডাল পায়ে
পড়িয়া অসহ্য আলা যন্ত্রণা হয়, ঐ সময়ও
আমি এই সারের অল্পত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ
করিয়াছি। কিছুদিন পূর্বে 'আমার ভাঙ্গ-
দেশে অসহ্য বেদনা হই, বহু ঔষধ প্রয়োগ
করিয়া নানা প্রকার ঔষধ মর্দন করিয়াও
কোন ফল পাই নাই: অবশেষে Electric
Battery প্রয়োগ করিয়াছিলাম— তাহাতেও
কোন ফল হয় নাই। আমি তখন জীবনের
আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সোভাগ্যের
বিষয় এই উদ্ভূত পত্রের প্রলেপ দেওয়ার
ঐ স্থানের দূষিত রক্ত সংকুত হওয়ার পর

সমুদ্র বরণী প্রৌঢ় হইয়াছিল । এক প্রকার
বায়ু বিকারেও ইহার কল প্রত্যক্ষ করিয়াছি ।

এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমি নিজে প্রত্যক্ষ
করিয়া উড়ুধরের অত্যাচার্য্য আপনাদের
নিকট সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম । এই ঔষধ
সর্বত্র সুলভ ও ভ্রমণে অধিকারী । আপ-
নারা ইহা ব্যবহার করিয়া যদি কল পান, তাহা
হইলে আমার আবিষ্কার সার্থক হইবে ।

অতঃপর পণ্ডিত মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ
হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার হিন্দী বক্তৃতা
সংক্ষেপে বক্তৃত্বার বুঝাইয়া দিয়া তৎপ্রসঙ্গে
বলিলেন—“এই মহাত্মার একটা বিশেষত্ব
এই, তিনি অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করেন
না । স্বীয় পারিশ্রমিক গণনা দূরের কথা,
ঔষধের মূল্য পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না । একান্ত
বহু ক্ষেত্রে তিনি এই ঔষধ প্রয়োগের সুবিধা
পাইয়া উহার গুণ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ
পাইয়াছিলেন । পণ্ডিত মহাশয়ের নিঃস্বার্থ
পরতাগুণে তিনি ভারতবর্ষে চিকিৎসক
সমাজে বরণ্য হইয়াছেন ।

না স্বার্থং নাপি কামার্থং অত ভূতদয়াং প্রতি
কর্ত্ততে যচ্চিকিৎসায়াম্ স সর্বমতি বর্ত্ততে ।

অর্থ বিনিময়ে চিকিৎসা না করিয়া
রোগীকে জন্মের হৃৎকম্পনোদন করিয়া তিনি
ব্যর্থ চিকিৎসক চূড়ামণি হইয়াছেন । আর
আমরা অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করিয়া
পারমার্থিক অমূল্য কাকন পরিচাণ পূর্বক
খুলিয়া দিই প্রেরণ করিতেছি, যথা—

‘স্বর্গতে যে তু বৃত্তার্থং চিকিৎসা পণ্য

বিক্রয়ং ।

তে হিমা কাকনং রাণি পাণ্ড রাণি

মুপাসতে ।

পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট আমি পূর্বেই
যজ্ঞ ভ্রমুরের সারের গুণাবলী প্রবণ করিয়াছি
এবং পরীক্ষার্থ অনেক স্থলে প্রয়োগ করিয়া
বিশেষ ফলও পাইয়াছি । আমার নিজের
বাড়ীতে আমার জ্বর একবার চক্ষুর অভ্যন্তরে
আঘাত লাগিয়া জ্বালা-যরণা হর ; চক্ষু লাল
হইয়া ফুগিয়া উঠে । ডাক্তারী ঔষধ প্রয়োগ
করিয়া কোন ফল না পাওয়ার এই উড়ুধর
সার প্রয়োগ করিয়া অত্যাচার্য্য ফল প্রত্যক্ষ
করিয়াছি । পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট আমার
নিবেদন এই যে, তিনি ভবিষ্যতে আরও নূতন
নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়া আয়ুর্বেদের
লুপ্ত বিদ্যার উদ্ধার করিবেন । আমি সভার
পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান
করিতেছি ।” সভাপতি মহাশয় আসন
গ্রহণ করিলে কলিকাতা অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ
বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীযুক্ত
অমৃতলাল গুপ্ত কাব্যার্থ মহাশয় নাতি দীর্ঘ
সংস্কৃত ভাষায় উক্ত আবিষ্কারের জন্ত পণ্ডিত
মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন । তৎপরে
লক্ষপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বামিনীভূষণ
রায় কবিরত্ন এম এ এম বি মহাশয়
বলিলেন—“পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ধর মিশ্র
মহাশয়ের সহিত ইতিপূর্বে সভাপতি
মহাশয়ের বাড়ীতে আমার পরিচয় হইয়াছিল ।
সেই সময় তাঁহার নিকট যজ্ঞভ্রমুরের গুণের
কথা প্রবণ করিয়া আমি বহুস্থলে উহা প্রয়োগ
করিয়া বিশেষ ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি । ইতি-
পূর্বে আমরা এই যজ্ঞ ভ্রমুর একমাত্র অঙ্গপান
ও সহপান হিসাবে প্রয়োগ করিতাম, কিন্তু
এই যজ্ঞভ্রমুরের সারের মধ্যে যে এরূপ অসা-
ধারণ শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা কোন দিন

কমলাভেও আনিতে পারি নাই। পণ্ডিত মহা-
শয়ের আবিষ্কারের ফলে ইহা সর্বত্র প্রচারিত
হইল। আরও কত শত বনোবধির মধ্যে
এইশ বহু রোগনাশক শক্তি নিহিত রহিয়াছে,
তাহা কে জানে? যদি সর্ব চিকিৎসা
বিদ্যার প্রহতি আমাদের বৈদ্যক-বিদ্যার লুপ্ত
সৌর্য উদ্ধার করিবার বাসনা থাকে, তাহা
হইলে প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্তব্য এই

বৈদ্যকুলনারক পণ্ডিত মহাশয়কে আদর্শ
করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পন্থানুসরণ পূর্বক
বনোবধি সমূহের গুণাবলীর উদ্ভাবনার চেষ্টা
করা। তাহার পর তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে
ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাপতি মহাশয়ের
আদেশে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এ।

বহুমূত্রের নব বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা।

[ডাক্তার মৈত্র]

—:~::~:—

চিকিৎসা জগতে আশ্চর্য্য বহুমূত্র রোগের
যে নব চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্তিত হইয়া
আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ উথিত হইয়াছে,
তাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু সঠিকভাবে জানিতে
পারিয়াছি,—এখানে তাহারই অবতারণা
করিব। ইহা “Insulin treatment” of
Diabetes নামে পরিচিত এবং পেন্সিল-
ভেনিয়া ও অত্যন্ত আমেরিক্যান ইউনি-
ভার্সিটির মেডিকেল স্কোলে কলকাতা সাদরে
অঙ্গীকারিত হইয়াছে।

কথিত চিকিৎসা প্রথার প্রবর্তক হইতেছেন
Dr. F. C. Banting এবং তাঁহার সঙ্গী
Dr. C. H. Best। উভয়েই টরন্টো বিশ্ব
বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। বর্তমান সনের বিগত
জানুয়ারী মাস হইতে এই প্রথার চিকিৎসা
অনেক ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগীর উপর
পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে। Toronto
জেনারেল হাসপাতালে কয়েকটা সৈনিক ও

গৃহস্থ তরলোকের উপর এই পরীক্ষা চলিয়াছিল,
এই সকল চিকিৎসিত রোগীর মধ্যে কয়েক
জনের পীড়ার অবস্থা খুব বৃদ্ধিই পাইয়াছিল।
Toronto বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিয়লজী বিভাগের
প্রধান অধ্যাপক S. J. R. Macleod বলেন,
এই চিকিৎসার কাহারও মৃত্যু হইতে দেখা
যায় নাই এবং বাহারো ইহার প্রভাব দ্বারা
চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছিল, তাহার সর্ব-
বিধ প্রকারে বাহ্যে উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম
হইয়াছিল—(যথার প্রকৃত ফিজিয়লজীক এক্স-
ট্রাক্ট সন্তোষজনক ভাবে পাওয়া গিয়াছিল)।

বহুমূত্র পীড়ার উহা প্রকৃত আরোগ্যকারী
চিকিৎসা কিনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার
তিনি বলেন—“এখনও ইহাকে ডায়াবিটিসের
আরোগ্যকারী চিকিৎসা ঠিক বলিতে পারা যায়
না। তবে খাইরইড, ম্যাগ্নেজ পীড়াদিতে খাই-
রইড একট্রাক্ট বেরুণ কার্যকরী, ইহাও সেইরূপ
জানিবে। ৫ম পর্য্যন্ত ইহার প্রয়োগের ব্যবহার

* এ প্রবন্ধের লিখিত বিষয়ের সহিত আয়ুর্বেদের চিকিৎসার সম্বন্ধ না থাকিলেও ইহা একজন
জ্ঞানপ্রিয় ডাক্তারের দোষা বলিয়া ইহা আমরা প্রকাশ করিলাম।—ধাঃ সঃ।

চলিবে, ততদিনই উন্নতি হইবে। এখনও পরীক্ষার সম্পূর্ণ স্থিতি হইতে পারে না। তবে যাহা আছে, তাহাতে উহা কলগ্রন্থ বলিয়া স্থিতি হইতে পারে। ম্যাকলাউড বলেন, ইহাকে ঠিক “সিরাম চিকিৎসা” বলা হইতে পারে না, কারণ যে পদার্থটি এই চিকিৎসার ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাকে একত্রে বা সার পদার্থ মাত্র বলা হইতে পারে (সিরাম নহে), মাত্র চর্শ্ব নিয়ে Subcutaneously হাইপো-ডার্মিক ইন্জেকশনরূপে প্রয়োগের ব্যবহার সিরাম চিকিৎসার সহ প্রয়োগ আছে জানিবে।

কথিত সার পদার্থটি “ইনসুলিন” নামে পরিচিত, উহা প্যানক্রিয়াসের—আইল্যাও টিসু হইতে সংগৃহীত, এই দ্রব্যই উক্ত চিকিৎসা প্রণালী “ইনসুলার চিকিৎসা” আখ্যায় প্রচলিত হইয়াছে জানিবে। কিন্তু কথিত ইনসুলিন পদার্থটি is not a substance which can be separated and to be had pure in fact বিতৃষ্ণভাবে পাওয়া বড়ই মুকঠিন—যেহেতু উহার সহিত প্রায়ই অন্ত্র করণাদি বিমিশ্রিত অবস্থায় থাকিয়া যায়। প্রকৃতিতে ইহা একটি ferment কার্যেণ্ট বিবেক। ইহার: ফিজিওলজীক্যাল strength শক্তি বলিতে বুঝিতে হইবে যে, পরিমিত মাত্রার বিতৃষ্ণ বা অবিমিশ্রিত উক্ত পদার্থ উহার কথিত সার পদার্থ মধ্যে বিস্তারিত আছে।

কথিত পদার্থ প্রয়োগে প্রকৃত আরোগ্য হইতে দেখা না হইলেও উহার ব্যবহার

কালে বিশেষ উপকার যে লক্ষিত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। ডাঃ বিটিস দীড়ার বিশেষ এই যে, ইহাতে শরীরে বিধানের শর্করা বা চিনি পদার্থের সমীকরণ বা স্যাক্সিডাইজ oxdise করিবার অক্ষমতা আনাইয়া দেয়, সুতরাং শর্করা এবং স্টার্চ starch বা খেতসার পদার্থাদি সমন্বিত খাদ্য দ্রব্যাদি আর আহাৰ করা চলে না।

ডাঃ বিটিসের তীব্রতার নানারূপ প্রতিদ্বন্দ্বি চিকিৎসা পুস্তকে বর্ণিত থাকিলেও অভিধান দৃষ্টে ইহার মেলিটাস বা সশর্কর বহুব্রূই সাধারণতঃ fatal বিষম বলিয়া স্বীকৃত হয়। ক্যান্সার বা টুবারকুলোসিসের ন্যায় ইহা অতি মাত্রার পাশ্চাত্য জগতে দৃষ্ট না হইলেও উহার বিদ্যমানতা নিতান্ত স্বল্পও নহে—একমাত্র টরেন্টো সহরে ৩০০,০০০ বাসিন্দা মধ্যে ৫০০০ ব্যক্তিতে ইহা দৃষ্ট হইয়াছে।

অধুনা ডাঃ বিটিসের চিকিৎসার প্রধানতঃ পথ্যাদির উপরই জোর দেওয়া হইয়া থাকে। মৃদু আক্রান্তের স্থলে এতদূর্ণ পথ্য বিচারে ফলপাওয়া যায়, কিন্তু কঠিন স্থলে মাত্র উহার উপরে যে নির্ভর করা হইতেই পারে না—তাহা ব্যক্তিগে সাহেব বলেন। এতদূর্ণ উপারে পথ্য-বিচার দ্বারা কোন কোন রোগীতে আহাৰের মাত্রা প্রত্যহ ১০০০ ক্যালরীতে calory দাঁড়াইয়া যায়, কিন্তু স্বভাবতঃ মনুষ্যের খাদ্য পরিমাণ নিত্য ২০০০ ২৫০০ ক্যালরী হওয়া আবশ্যক বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং এই হিসাবে বুঝিতে পারা যায় যে, কথিত প্রকারের পথ্য বিচারে নির্ভরীকৃত রোগীগণ আর নিরাহারের সীমানার তখন আসিয়া পৌছিয়াছিলেন।

ইন্থলিন ইন্জেকশন চলিতে থাকার সময়ে কিস্তি কথিত রোগীগণকে বাতাবিক মাত্রার আহার্য পদার্থাদি খাইতে দেওয়া হয়। একটি রোগী এতৎ চিকিৎসার সময় প্রায় ১১ গুণ অধিক শর্করা পদার্থ খাইয়াছিল—অথচ তৎকালে কোন প্রকার মন্দফল উদ্ভূত হইতে দেখা যায় নাই (পূর্বে শর্করাজাত কোন পদার্থ বা শর্করা এত অধিক মাত্রার খাইলে আদৌ সম্ভব হইত না)।

১৯২০ সালে একদিন সন্ধ্যার সময় Iles of Laugurans নামক প্রবন্ধ পাঠকালে কথিত চিকিৎসা প্রণালী ব্যাটিং সাহেবের মনে ইঙ্গিতভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল। ল্যান্ডারবাল নামক এক জন জাৰ্মান পণ্ডিত ‘আইলস অব ল্যান্ডারবাল’ নাম দিয়া প্যানক্রিয়াসের (ক্লোন বয়) একটি অংশ বিশেষকে পরিচিত করিয়াছেন। কথিত উক্ত স্থান হইতেই শরীরস্থ রক্ত মধ্যে দেহস্থ শর্করার অক্সিজেশন জন্য আবশ্যকীয় তরল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকার কথা তিনি বলেন। এতাদৃশ নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে অপারগ হইলেই—ডায়াবিটিস বা বহুত্র (শর্কর) পীড়া দেখা দেয় বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

প্যানক্রিয়াসের কিস্তি আরও একটি নির্দিষ্ট কার্য আছে জানিবে। অল্পমধ্যে অন্য একটি দ্বিতীয় তরল পদার্থের নিঃসরণ দ্বারা পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য ইহাতে হইয়া থাকে। ব্যাটিং সাহেব স্থির করিলেন যে, যদি কোন প্রাণীর দেহে অস্ত্রের সহিত প্যানক্রিয়াসের সংযোগ প্রাণী বা ডাক্তার duct প্রতিরোধ দ্বারা কোন প্রকারে উত্তরের মধ্যস্থ চলাচল

ক্রিয়া স্থগিত করিতে পারা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে প্যানক্রিয়া বয়টির সম্পাদনীয় একটি কার্যে বাধা প্রাপ্ত হওয়ার অন্যটির ক্রিয়ার উত্তেজনা পাইতে পারে অর্থাৎ শর্করা অক্সিডাইজ করিবার কার্যটি বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই প্রকারে কথিত সমধিক উত্তেজনা প্রাপ্তির ফলে করিত পদার্থের surplus প্রয়োজনান্নিত অংশ সংগ্রহ করিতে পারা সম্ভবপর হইলে উহার সার পদার্থ extract লইয়া ডায়াবিটিস বা বহুত্রাজাত রোগীর শরীরে ইন্জেক্ট করিলে নিশ্চয়ই তৎ প্রভাবে দেহস্থ শর্করা অক্সিডাইজ হইয়া রোগীকে উপশম প্রদান করিতে সক্ষম হইবে।

প্রথমে কুকুরের উপর ইহার ব্যবহারিক পরীক্ষা লওয়া যায়। কুকুরের প্যানক্রিয়াস হইতে একটুকু বাহির করিয়া ডায়াবিটিস কুকুরের উপর উহার প্রয়োগ করা হয়। ডায়াবিটিক কুকুর বলিতে এই বুঝায় যে, তাহার শরীর হইতে প্যানক্রিয়াসটি কাটিয়া বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে (ডায়াবিটিস রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে এতদর্থ সবলেই অবগত আছেন)। এতাদৃশ প্যানক্রিয়াস শূন্য কুকুর মাত্র ১৪ দিন জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু উহার শরীরে ইন্থলিন চিকিৎসা করার পর (১৯২০ সালের মে মাসে) কথিত কুকুরটি ৭০ দিবস পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল দেখা গিয়াছে।

তাহার পর বিগত ডিসেম্বর মাসে মল্লুয়া শরীরে কথিত পদার্থ ইন্জেক্ট করার বিষয় ফল উদ্ভূত হইতে পারে কিনা তাহা দেখিবার জন্য উভয়েই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু

সাহস করিয়া অস্ত্র কাহারও উপর পরীক্ষা গ্রহণ করিতে প্রাণ চাহে নাই । পরিশেষে ব্যাটিং নিজ দেহে উহা প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিতে সম্মত হইলেন এবং প্রথম ইন্জেক্সন্ ডাক্তার বৈঠে তাঁহার শরীরে প্রয়োগ করেন । ব্যাটিং তৎপরে ডাক্তার বৈঠের শরীরেও কথিত ইন্জুলিন ইন্জেক্ট করিয়া দিলেন । এই পরীক্ষার সময়ে একটা বাঁড়ের ox প্যাঙ্ক্রিয়াস হইতে একস্ট্রাক্ট লওয়া হইয়াছিল ।

বিগত আমুরারী মাসে বহুমুত্র দ্বারা পীড়াগ্রস্ত কয়েকটা মনুষ্যের উপর এই চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছিল । তাহাতে যে কল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, বিখ্যাত ক্যানাডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন জার্নাল তাহা নিম্নলিখিত প্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন :—

(১) রক্তের মধ্যস্থ শর্করার অংশকে স্বাভাবিক মাত্রার আনিতে পারা সম্ভব ।

(২) মুত্রের মধ্য হইতে শর্করা চিহ্ন বিলোপ করা যাইতে পারে ।

(৩) মুত্র হইতে “সাসিটোন” পদার্থের বিদূরণ করা যাইতে পারে ।

(৪) শ্বাস গ্রন্থাসে কার্কো হাইড্রেটের ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ব্যবহারের চিহ্ন লক্ষিত হয় ; রোগীর সাধারণ ক্ষমতা বিশেষ প্রকারে লক্ষিত ভাবে উন্নত হইতে দেখা গিয়াছে ।

বর্তমানে এই চিকিৎসা প্রণালীতে প্রতি দিবস দুই একবার করিয়া হাইপোডার্মিক ইন্জেক্সন্ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ; একশত ইন্জেক্সন্ লইয়াও ডার্মাটিক রোগীগণ এতৎ প্রভাব জনিত কোন প্রকার মন্দ কল উৎপন্ন হইতে দেখেন নাই । যেহেতু এই চিকিৎসা-প্রণালীতে খাদ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ

বাধা নিষেধ না থাকায় রোগীগণের শরীরগত পরিপোষণের কোনই অভাব লক্ষিত হয় নাই ; অথচ শরীরস্থ লুপ্ত শক্তি ক্রমশঃ ফিরিয়া পাইতে থাকায় দৈনিক কার্য্য প্রণালী নিরমিত ভাবে চলিয়া ক্রমশঃ পীড়াটিকে অদূর ভবিষ্যতে আরোগ্য করিবারই সহায়তা করিয়া থাকে ।

ডাক্তার ব্যাটিং বলেন, কথিত ইন্জুলিন পদার্থটা সংগ্রহ করিবার সঠিক উপায় স্থিরীকৃত হইলে টরেন্টো ইউনিভারসিটির মেডিক্যাল বিভাগের সাহায্যে বাহাতে উহা সর্ব সাধারণের পক্ষে সহজেই প্রাপ্য হইয়া লগতে ডার্মাটিস্ম রোগগ্রস্থের প্রকৃত কল্যাণপ্রদ ভেষজরূপে পরিগণিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি উহার পেটেন্ট স্বত্ব এবং তাহা হইতে প্রভূত অর্থ লাভের আশা সমুদয়ই ত্যাগ করিবেন ।

সম্ভাব্যতাঃ—নব বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা নামে ডার্মাটিস্মের যে বিষয়টির বর্ণনা প্রবন্ধান্তর হইতে উপরে অমুদিত করা হইল, তাহা বর্তমান প্রচলিত এলোপ্যাথির এন্ডোক্রাইনস্ ভেষজাদিরই অন্তর্গত । বহুবিধ রাসায়নিক পদার্থাদির একত্র সংমিশ্রনে নানা প্রকারের বিকট এবং উৎকট নামধারী ভেষজ পদার্থাদি ব্যবহারে কোন একটা রোগ দূরীকরণের নামে নূতন ১০টা রোগের সৃষ্টি হইতে দেখিয়া মূর্খীর ও বীমান প্রকৃত রাসায়নিক চিকিৎসকবৃন্দ ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া বর্তমান সময়ে এই মীমাংসার উপনীত হইয়াছেন যে, দেহীগণ যখন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখনই তাহার শরীরস্থ গ্র্যাণ্ড সমুদরের ক্ষরণ কার্য্য বিকৃত, বাধাযুক্ত অথবা স্বাভাবিক অপেক্ষা মাত্রার বৃদ্ধিভাব বা হ্রাসতা প্রাপ্ত হয় ।

দেহ মধ্যে ছোট বৃহৎ আকারের অসংখ্য
গ্নাণ্ড বিস্তারিত আছে। উহাদের মধ্যে প্রধান-
তম কয়েকটির কার্য মাত্র কিজিগলী শাস্ত্রপাঠে
আমরা জানিতে পারিয়াছি। বিজ্ঞান বতই
কেম উন্নত না হউক, দেহ মধ্যে পূর্ণ
কথিত অসংখ্য গ্নাণ্ডাদির অস্তিত্ব রাখার
সেই বিখ্যাত ষে কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে,
আজিও তাহা মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির গোচরীভূত
হয় নাই। কথিত গ্নাণ্ড আদির আত্যন্তরীক
পৃথক ও সমবার করণ দ্বারা দেহীগণের আত্ম-
রকি করাবস্থা যে পরিপূরিত ও স্বাভাবিক
অবস্থার আনীত হইবার পক্ষে সমূহ
সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার সত্যতা
বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। স্থির
ভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে সহজেই ইহার উত্তর
পাইতে পাইবে। তাবিয়া দেখ, বিনা চিকিৎসা-
সাতেও কঠিন পীড়াগ্রস্ত রোগী সময়ে
আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। কি প্রকারে
ইহা হওয়া সম্ভব? সকলেই বলিয়া থাকেন যে,
প্রকৃতি Nature সর্বদাই তাহার বিকৃতি
অবস্থার পরিপূরণ বা তাহার সংস্কার সাধনে
নিজ চেষ্টাবান আছে। ইহা সত্য, কিন্তু
প্রকৃতির তো হাত পা নাই বা ভেবজ পদার্থও
নাই। তবে কেমন করিয়া এতদূর্ণ কার্যাদি
সম্পন্ন হইতে পারে? অনন্ত সৃষ্টি কোশলী
সেই পরম দয়াবান শাখতঃ জগদীশ্বরেরই অনন্ত
করণারই ইহা একটি নিদর্শনমাত্র। অর্থ নাই
বলিয়া দরিদ্র রোগে ভুগিয়া অকালে মারা

যাইবে ইহা কখনই হইতে পারে না। এই
অন্তই দেহ যথাক্রমে অস্থি, মেদ, মজ্জা, মাংস,
তন্তু, বায়ু রস, ইত্যাদি পৃথক সমবার কিরূপ
কলে দেহস্থ বিকৃতিবস্থা স্বাভাবিকভাবে কিরূপ
আসিতে পারার কল্পনা তিনিই করিয়া
রাখিয়াছেন—যিনি উগাদিগণের জগতের
আলোক দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মানব এত
দিন আত্ম জ্ঞান পরিবার উৎকৃষ্ট থাকিয়া নিজ
নিজ কল্পনাগ্রহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি
ব্যবহারে দেহস্থ বিকৃতিবস্থা বিদূরিত করিবার
অন্তই সচেষ্ট ছিল; কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী
এবম্পকারে পরীক্ষা কর ও করিত জ্ঞানাদির
প্রয়োগ প্রবর্তনে যখন দেখিতে ও বুঝিতে
পারিল যে, “অত্যন্ত জ্ঞান শিখরে উন্নীত
হইয়া রোগ নিরাময়ের চেষ্টার বাইরা ক্রমশঃ
উহা বর্জিত করিয়াই দিতেছে”—তখন কয়েক
জন শাস্ত্র স্বধীর ব্যক্তির মাতার আসিল—
“ব্যাধি হরণের প্রকৃত জিনিস নিশ্চয়ই
অন্ত কোথাও নাই, যদি কোথাও থাকে
তবে তাহা ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের মধ্যেই
আছে। সুতরাং পীড়া নিরাময়ের অস্ত
পীড়িতের শরীরের পদার্থ বিশেষই প্রধান
সাহায্যকারী—এই insprition বা ইঞ্জীত
হইতেই বর্তমান সময়ের এণ্ডোক্রিনম্ বা
ইন্ট্রানিস জাতীয় পদার্থ দ্বারা চিকিৎসা প্রথা
অবলম্বিত হইতেছে।

‘চক্রদত্তে’র প্রথম শ্লোকের টীকা ।*

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ)

“চক্রদত্ত” একখানি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদীয় সংগ্রহ-গ্রন্থ । “শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী” ইত্যাদি উল্লেখে গ্রন্থকার তাৎপ্রেতে আত্মপরিচয় দিয়াছেন । এই গ্রন্থের “ভবচক্রিকা” নামী টীকা ধোমান্ শিবনাথ সেন র্ত্ত ।

মূলগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে নিম্নলিখিত শ্লোক দেখা যায় :—

গুণত্রয়বিভেদেন মূর্ত্তিত্রয়মুপেযুযে ।

ত্রয়ীভূবে ত্রিনেত্রায় ত্রিলোকীপতরে নমঃ ॥

ইহার টীকার উক্ত টীকাকার বলিতেছেন,—

“গুণত্রয়ঃ সত্ত্বরজস্তমোরূপং মূর্ত্তিত্রয়ং ব্রহ্ম-
হরিরহরস্বরূপম্ ।” পৌরীন্দ্রপৌরীন্দ্রাসুরে ইহাতে
ব্রহ্মকে সত্ত্বগুণাত্মক, হরিকে রজোগুণাত্মক
এবং হরকে তমোগুণাত্মক বুঝায় । অনেকে
ইহাতে আপত্তি করেন । তাঁহারা বলেন,
“ব্রহ্মা রজোগুণাত্মক, হরি বা বিষ্ণু সত্ত্বগুণাত্মক
এবং হর তমোগুণাত্মক ইহাই প্রসিদ্ধি ; তবে
টীকাকার অন্যরূপ বলেন কেন ? এরূপ
বলা তাঁহার ভ্রম ভিন্ন কিছুই নহে ।” আমরা
এই আপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব । প্রথমে,
বিষ্ণুরজোগুণাত্মক হওয়া সম্ভব কিনা, তাহা
দেখিব ।

ভগবত্বসম্বন্ধে প্রথমতঃ কোন কোন
পুৰাণাদিতে শ্রীভগবানের কেবলমাত্র ত্রিতরয়
(অর্থাৎ ত্রিগুণ-ভেদে ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব, শিবত্ব)

স্বীকৃত হইয়াছে । সে সকলে তাঁহাদের
“একেই তিন ও তিনেই এক” বলা হইয়াছে ।
দ্বিতীয়তঃ, কোথায়ও বা তাঁহাদের অতিরিক্ত
এক স্বতন্ত্র ত্রিগুণাত্মক পরমেশ্বরের বিবরণ উক্ত
হইয়াছে । যেমন ‘চতুর্ভূতে নারায়ণকে বলা
হইয়াছে :—

—জগৎশ্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ ।

এখানে শ্রষ্টা, পাতা, সংহর্তা—একাধারে

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব—নারায়ণই । তাঁহার কাছে
ত্রিমূর্ত্তির ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের “কদম” কাজেই
কম । আবার শিব পূজাকালে—

বিধিবিষ্ণুশিবস্তত পাদযুগং ।

প্রণামানি শিবং শিবকমলতরুণম্ ॥

বলিয়া যে শুব পাঠ করা হয়, তাহাতে তৎকালে
পূজিত শিবকেই বিধি বিষ্ণু-শিব কর্তৃক স্তুত
বলা হইয়া থাকে । এত শিবেরই পূজা
হইতেছে, তবে আবার কোন শিব তাঁহাকে
স্তুত করেন বলি ? ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে
শিব স্তুত করেন বলা হয়, তিনি ত্রিমূর্ত্তির
অন্ততম—নামান্তর রূপ । তিনি ব্যষ্টি, আর
পূজ্যমান্ শিব সমষ্টি । অর্থাৎ রূঢ় ত্রিগুণের
এক-তৃতীয়াংশ মাত্র । কাজেই তাঁহার পক্ষে
সমষ্টি-শিবকে স্তুত করা অযৌক্তিক নহে ।
মঙ্গলাপ্রবণের শ্লোক, বাহা আমরা পূর্বে
উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও একপ্রকার ইহার
দৃষ্টান্ত । এখন তত্ত্ব হইতে এক স্থান উদ্ধৃত
করি :—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রূঢ়শ্চ জৈবরশ্চ সর্গাশিবঃ ।

এতে সর্বৈ খুরাঃ প্রোক্তাঃ ফলকোহস্ত
পরশিবঃ ।

এখানে ত্রিমূর্তির অতিরিক্ত “ঈশ্বর,” তদতিরিক্ত “সদাশিব,” তদতিরিক্ত “পরমশিব,” স্বীকার করা হইয়াছে। এই পরম শিবই এখানে “একমেবাদ্বিতীয়ম্”। একরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অবশ্য, এ সবলের বিশেষ অর্থ আছে, অস্ত্র উদ্দেশ্যও আছে, কিন্তু সে সকল এখন আমাদের আলোচ্য নহে।

তৃতীয়তঃ, উপরোক্ত দুই ভাবের ভগবতা নির্দেশ ব্যতীত আরও এক ভাবে উহা নির্দিষ্ট হইতে দেখা যায়। নারদ-পঞ্চরাত্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণ (ইহা বৈষ্ণব-পুরাণ মধ্যে গণ্য) শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে শ্রী ভগবানের চতুর্ভূজের উল্লেখ আছে। এই চতুর্ভূজের মধ্যে প্রথম, বাহুদেব; ইনি ত্রিগুণাতীত—সুতরাং অরূপ, ব্রহ্মহানীর। দ্বিতীয়, সর্ষপ; ইনি তমোগুণাত্মক (অবতারবিগের মধ্যে ইনিই বলদেব—তমোগুণের অনেক লক্ষণ, যথা অঘথাক্রোধ, দম্ভ, পানদোষ প্রভৃতি ইহার চরিত্রে পরিস্ফুট দেখা যায়। পঞ্চাস্তরে, তমোগুণাত্মক রুদ্রভেদেও ঐরূপ বিখ্যাত হারক ক্রোধ ভাঙ্গ ধুত্বাং প্রভৃতি প্রভৃতি আরোপিত হইয়াছে) তৃতীয়, প্রহ্মা; ইনি সত্ত্বগুণাত্মক। চতুর্থ, অনিরুদ্ধ; ইনি রজোগুণাত্মক, শেষব্যাপারী—সৃষ্টিকর্তা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহার মূর্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

চতুর্ভূজলমধ্যাহ্না শেতে পরগতলগা ।
রজস্তম্ভা গুণঃ সর্গং সা করোতি সর্গেব হি ॥
শেযোক্ত তিন ভাব অন্তর্যকথিত ত্রিমূর্তিরই অরূপ। প্রহ্মা—বিষ্ণু, অনিরুদ্ধ—ব্রহ্মা, এবং সর্ষপ—রুদ্র। ইহাতে এই তর্ক হইতে পারে যে, যিনি শেষাবস্টি অর্থাৎ অনিরুদ্ধ, তাঁহা হইতেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে। তবে আবার তিনি সৃষ্টিকর্তা কিরূপে হইবেন?

ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মা অব্যক্ত-জগৎ হইলেও একরূপ প্রথম সৃষ্টি—সৃষ্টির আদিভূত। মত-বিশেষে তাঁহার ললাট হইতেই রুদ্রের উৎপত্তি। তাহা হইলে শেষ-শারীকেই সকল সৃষ্টির মূল বলিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাকে যে উপরের স্রোকে সৃষ্টিকর্তা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত নহে। আবার ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতিরাই জীবাদি সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহার আমাদের পিতৃহানীর এবং ব্রহ্মা পিতামহ-হানীর; সেইজন্য তাঁহাকে লোকপিতামহ বলে। যে কারণে তিনি আমাদের পিতামহ, সেই কারণেই নারায়ণ আমাদের প্রপিতামহ এবং শাস্ত্র সেই নামেই তাঁহাকে অনেক স্থানে অভিহিত করিয়াছেন। গীতার একাদশে অর্জুন তাঁহাকে বলিতেছেন :—

বায়ুর্ধমোহির্ঘর্ষণঃ শশাঙ্ক
প্রজাপতিস্তং প্রপিতামহম্ ।

শঙ্কর বলেন,

“প্রপিতামহম্ পিতামহস্তাপি পিতা
প্রপিতামহোব্রহ্মণোহপি পিতা ইত্যর্থঃ”।

স্বামিনার এবং সরস্বতীও ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন।

গরাকৃত্যোর ময়ে ও তাঁহাকে বলা হয় :—

ও কলৌ মহেশ্বরো লোকা

যেন তস্মাৎ গুণাধরঃ ।

লিঙ্গরূপো ভবেৎস্বক

বন্দে শ্রী প্রপিতামহম্ ।

ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পূর্বকথিত চতুর্ভূজের উল্লেখ আছে। যথা :—

নমস্তে বাহুদেব্যায় নমঃ সর্ষপায় চ ।

প্রহ্মাশারীনিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ।

ইত্যাদি।

দেখা' যার যে, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ-কথিত
শেষশারী অনিরুদ্ধকেই সাধারণতঃ নারায়ণ
বা হরি বলা হইয়া থাকে । দেখাইয়াছি, ইনি
রজোশূণ্যক এবং ত্রিমূর্ত্তির অন্ততমও বটে।
কাজেই তাঁহাকে “তত্ত্বচক্রিকা” টীকাকারের
রজোশূণ্যক বলা অশাস্ত্রীয় হয় নাই । কৃষ্ণা-
ভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা এই শেষ শারীর
নিকটেই দেবভাগ্য আসিয়া স্থব করেন ।
আমরা দেখিব যে, তাঁহার সে অবতারও
রজো শূণ্যের । ভবিষ্যপুরাণে আছে :—

ঐধরঃ তথচঃ স্রষ্টা গন্তঃ প্রাক্রমতায়ত্নঃ ।

কীরোদে যত্র বৈকুণ্ঠঃ স্তম্ভঃ স ভূজগোপরি ।

হংসপৃষ্ঠে সমাক্রম্য হরৈরস্তিক্রমায়কৌ ॥

এখন, কারণজলে—কীরোদ-সমুদ্রে --যিনি
অনন্ত-শব্দাশায়ী হরি, তিনিই ভবিষ্যপুরাণে
বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং
কীরোদেই বৈকুণ্ঠধাম উহাতে উক্ত হইয়াছে ।
আবার ভাগবতে দেখা যায় যে, শঙ্খচক্রাদিধারী
চতুর্ভূজ বৈকুণ্ঠনাথই কংস-কারাগারে অবতীর্ণ
হইয়াছিলেন । তাঁহার জন্ম হইলে ভাগবতে
এইরূপ বর্ণনা দেখা যায় :—

তমহুতং বালকমধুজেক্ষণঃ

চতুর্ভূজঃ শঙ্খগদাচ্যাদায়ুধম্

এখন পুরাণাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া
সাধারণ বুদ্ধিতে একটি কথা বলা যায়
যে, নারায়ণ যদি শুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্টই
হইবেন, তবে তাঁহার হস্তে উক্ত ভয়ঙ্কর
গদা-চক্রাদি অস্ত্র কেন ? কেবল সত্ত্বগুণে
ত মারাকটা সম্ভবে না ? তবেই স্বীকার
করিতে হইবে যে, এ হেন অস্ত্রধারী
পুরুষের অস্ত্রতঃ একটুও রজোশূণ্য আছে । আর
যদি তিনি পালন-কর্ত্তাই (সত্ত্বগুণাত্মক) হন,

তবে হুইয়ের দমন ভিন্ন পালন হইরতই পারে
না । দমন রজোশূণ্যের কার্য্য । অতএব
সত্ত্বগুণাত্মক পালন-কর্ত্তাতে একটু রজোশূণ্য
না থাকিলে পালন হইতেই পারে না । আবার
দেখুন, সরস্বতী সত্ত্বগুণাত্মিকা ; তথাপি তাঁহার
ঘারাই শুভনিস্তম্ভব সংঘটিত হইয়াছিল । তৎ-
সম্বন্ধে ‘বৈকৃতিক রহস্ত’ নামক তন্ত্রে লিখিত
আছে :—

গৌরীদেহাৎ সমুদ্ভূতা যা সট্টৈকগুণাপ্রয়া ।

সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুভাস্রনিবাহিণী ॥

পাঠক, “সট্টৈকগুণাপ্রয়া” পাঠের প্রতি
লক্ষ করিবেন । তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে,
ঐ সত্ত্বগুণেও রজোশূণ্যের আশ্রয়বশতঃ বধ-
কার্য্য সম্ভব হইয়াছিল ; নতুবা তাহা অসম্ভব ।
অপরূপে নাগোজী ভট্ট “চতীর” টীকায়
উপক্রমণিকায় বিষ্ণুসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

বিষ্ণুঃ সরস্বতীজন্তব্যঃ সাত্ত্বিকঃ কর্মতঃ, +
+ রূপতত্ত্বমোময় ইতি । তত্র সত্ত্বতমসোঃ সমতা ।

অর্থাৎ “প্রাধানিক রহস্ত” তন্ত্রমতে বিষ্ণুর
উৎপত্তি সরস্বতী হইতে । ঐ সরস্বতী সাত্ত্বিকী ;
সুতরাং পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও সাত্ত্বিক, ইহাই
বলা নাগোজীর উদ্দেশ্য । অথচ বিষ্ণু অস্রর
নিধন করিয়াছেন । শুদ্ধ সত্ত্বগুণে এমনটা
কিরূপে হয়, তাহা বুঝিতে হইলে নাগোজীর
“তত্র সত্ত্বতমসোঃ সমতা” এই কথা বুঝিলেই
হইল । অর্থাৎ বিষ্ণুতে রজোশূণ্যও আছে,
কারণ সত্ত্বও তমোশূণ্যের সমবায়ের রজোশূণ্য ।
মার্কণ্ডেয়-পুরাণও ঠিক ঐ কথা বলেন ;
যথা :—

তিলেষু বা যথা ঠৈলং স্তম্ভং পরসি বা স্থিতম্ ।

তথা তমসি সত্ত্বৈ চ রজোপাত্মস্বতঃ স্থিতম্ ॥

ইহা অবশ্য একটি দার্শনিক সত্য ।

আর এক কথা। শেষশারী নারায়ণ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া আদর্শকর্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি সেরূপ কর্মস্থলান গ্রন্থ রজোগুণ ব্যতীত কি সম্ভব? রজোগুণই ত ক্রিয়ায়ক। কাঁকেই, 'চক্রবর্ত্তের' টীকাকারের হরিকে রজোগুণায়ক বলা দোষের কিসে? পবিত্র ইহা শাস্ত্রাভ্যাসে দোষিতও বটে। অবশ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণ শেষ-শাশারীর কৃষ্ণাবতার স্বীকার করেন না, গোষ্ঠীয় বৈষ্ণবাচার্যগণও তাহা প্রকাণ্ডস্বরে স্বীকার করেন না। অর্থাৎ তাঁহাকে অবতারী-কৃষ্ণ বলেন না। তাঁহারা অনন্ত-সাধারণ বিচারশক্তি দেখাইয়া বলেন :—

কৃষ্ণোহন্তঃ বহুশস্ত্রো বস্ত গোপেন্দ্র নন্দনঃ ।
বুদ্ধাবনঃ পরিত্যজ্য পানমেকং ন গচ্ছতি ॥

কিন্তু কোনকোন পুরাণ যে শেষ শাশারীর কৃষ্ণাবতার স্বীকার করেন, তাহা আমরা তবিশ্বপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পূর্বে দেখাইয়াছি।

এখন হরির রজোগুণ প্রতিপাদক ভাবের আর এক দিক দেখি। তাঁহারই জন্মটিমী-ব্রতাস্থলানের একটি মন্ত্র এই:—

সং দেবং দেবকীদেবী বাহুদেবাদজীজনং ।

ভৌমস্ত ব্রহ্মণো গোপ্তে তস্য ব্রহ্মায়নে নমঃ ॥

“ভৌমস্ত ব্রহ্মণো গোপ্তে” এই পাঠের অর্থ এই:—ভৌম, মঙ্গল; তাঁহার ব্রাহ্মণদিগের রক্ষা-কর্ত্তা বিনি, তাঁহাকে। এখন মঙ্গল হইতে-ছেন সাম-বেদাধিপ, তাঁহার ব্রাহ্মণ হইতেছেন সামবেদীয়গণ, আর পূর্বকথিত মন্ত্রানুসারে, তাঁহাদের রক্ষা কর্ত্তা হইতেছেন হরি—নারায়ণ। ইত্যং তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন:—

“বেদানাং সামবেদোহধি, আর, “গায়ত্রি যং সামগাঃ” ইত্যাদি কথাও শাস্ত্রে আছে, তন্নির উক্ত ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞোপবীত গ্রহী দেওয়ার পর “এতৎ যজ্ঞোপবীতম্ভ্রং ও শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমন্তু” এই উৎসর্গমন্ত্র বলিয়া তাহা ব্যবহার করার বিধিও আছে। পবিত্র মঙ্গল রজোগুণায়ক গ্রহ—তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় বলিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন তাঁহার ধ্যানে আছে:—

“আবস্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং” ইত্যাদি।

তাঁহাৎ রক্তবর্ণে তাঁহার রজোগুণ বুঝাইতেছে। গুণ-ত্রয়ের বিভিন্ন বর্ণ-কল্পনার কথা আমরা পরে বলিব। তিনি ক্ষত্রিয় জাতি সূত্রায় সঙ্ক-রজোগুণায়ক। শাস্ত্রে চতুর্ভুজের গুণ এইরূপ কথিত হইয়াছে; ব্রাহ্মণ সঙ্ক অথবা সঙ্কবহন; ক্ষত্রিয় সঙ্ক-রক্তঃ, অর্থাৎ রজোগুণবহন; বৈষ্ণব বক্তমঃ, অর্থাৎ তনো-বহন; শূদ্র কেবল তমঃ। তাহা হইলে সঙ্ক-রজোগুণী মঙ্গলের ব্রাহ্মণদিগের একটু রজোগুণ থাকাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়—সেটা অস্ত্র বেদীয় ব্রাহ্মণদিগের তায় তাঁহাদের অতিচার-ক্রিয়া অভিমুখিত ও আদি কার্যে বিলক্ষণ প্রতীত হয়। এখন মঙ্গলের ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ গুণ হইলে তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্তা হরিও যে একেবারে রজোগুণ-বিবর্জিত হইতে পারেন, এমনটা সম্ভব নহে। কারণ সাধক যেমন, সাধ্যও অনেকটা সেই রূপে না হইলে পরস্পর ‘খাপ’ খায় না।

অপিচ তাঁহাতে রজোগুণ আছে বলিয়াই মাংস দিক্কা বিফুর ভোগ দেওয়ার বিধি পদ্ম-পুরাণে দেখা যায়। কারণ, সঙ্কগুণে

ননাদি কুর্ধ্য নাই; রজোগুণে তাহা আছে। সেই জন্ম দুর্গোৎসবের সময় কোন কোন স্থানে সপ্তমী (সাত্বিকী তিথি) পূজায় বলিদান হয় না; অষ্টমী (রাজসিকী তিথি) পূজায় ও নবমী (তামসী তিথি) পূজায় তাহা হইয়া থাকে। জগদ্ধাত্রী পূজাতেও প্রথম প্রহরের পূজাকালীন কোথাও কোথাও বলিদান হয় না; অপর প্রহরদ্বয়ের পূজায় (রাজসী ও তামসী) তাহা হইয়া থাকে। এষ্ট প্রথম পূজা-সম্বন্ধে বিশ্বাস-তত্ত্ব বলিয়াছেন,—
“প্রথমে সাত্বিকী পূজা”।

পুনশ্চ, তিথি বিচারে সপ্তমী সাত্বিকী বলিয়া যাত্ৰিক, অষ্টমী রাজসী বলিয়া যাত্ৰা সম্বন্ধে প্রশস্তা নহে, আর নবমী তামসী বলিয়া উহা সর্বকার্য্যে একেবারে পরিত্যজ্য। এইবার দেখুন, শেষশায়ী নারায়ণ কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতেই কৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব তাহাতে রজোগুণের কলনা অসম্ভব নহে।

এইবার আমাদের বক্তব্য অধিকতর পরিষ্কৃত করিবার জন্ম আয়ুর্কেন্দ্রের মুখ চাহিয়া ছই একটি কথা বলিব। আমাদের বায়ু, পিত্ত, কফ বলিয়া যে তিন নাড়ী আছে, উহারাই এক একটি ত্রিগুণের ব্যষ্টিভাব, অর্থাৎ আমাদের দেহরূপ সূত্র-রজাণ্ডে উহারাই সেই পৌরাণিক ত্রিমূর্তি। দৈনন্দিন ব্যাপারে আমাদের প্রভাতে শ্রেষ্ঠার আধিক্য, মধ্যাহ্নে পিত্তাধিক্য ও সায়ংকালে বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মানবের অয়ুষ্কালের যে প্রধান তিন ভাগ—বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য—বায়ু পিত্তাদিরও এক একটি তত্ত্বভাগের এক এক ভাগে পর্যায়ক্রমে প্রবল হইয়া থাকে।

বার্দ্ধক্যে বায়ুর প্রাবল্য হয়। এই বায়ুকেই আমাদের শেবাভরণ-শায়ী নারায়ণ বলিয়া ভাবিতে পাৰা যায়—যাহাকে মার্কণ্ডেয়-পুরাণে রজোগুণাত্মক বল্য হইয়াছে, আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। এষ্ট বায়ু-সম্বন্ধে যুক্ত লিখিয়াছেন:—

স্বদন্তুরেষ ভগবান্ বায়ুরিত্যভিশক্তিঃ।

পিত্তাংপতিবিনাশেষু ভূতানামেব কারণম্।

ত্রিগুণগো দ্বিগুণশ্চৈব রজোবহল এবচ।

অচিন্ত্যবীৰ্য্যো দোষাণাং নেতা রোগসমুহরাট্।

এখন দেখুন, এই বায়ুকেই “রজোবহল” বল্য হইয়াছে। ইহা সত্ত্বগুণবিশিষ্ট বটে, কিন্তু তদপেক্ষা ইহাতে রজোগুণের আধিক্য; অধিকতর ইহা প্রাণীদিগের সৃষ্টিস্থিতি ও বিনাশের কারণ, এবং ত্রিগুণগামী (সর্গ-গতি-বিশিষ্ট) অপিচ ইহা পিত্ত ও কফের পরিচালক বোগেব প্রবর্তকরূপে রোগ-সমূহের রাজা—অচিন্ত্যবীৰ্য্য। শেষশায়ী-সম্বন্ধেও এই সকল কথা ঠিক পাটে। তিনি রজোগুণাত্মক তাহা ত পুরাণেই দেখা যায়—সে সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি; রজোগুণবিশিষ্ট বলিয়াই তিনি বায়ুর জ্ঞার সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশেরও হেতুভূত। কারণ, আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে রজোগুণ সম্বন্ধেও আছে, তমোগুণেও আছে। এখানে একবার ‘চতুর্থ’ নারায়ণ-সম্বন্ধে পূর্বকথিত “জগৎস্ত্রী জগৎ-পাতালি যো জগৎ” এই শ্লোকাংশ মনে করিলেই আমাদের কথা বিশদ হইবে। আবার হরি দেবতাদিগের নেতাধরূপ; দেবতাদিগের যত “আবদাব,” তাহারই কাছে,

“দেবানাঞ্চ বখা হরিঃ”, ইত্যাদি কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্বন্দপুরাণে দেখা যায়, হরব্রহ্ম-প্রমুখ দেবগণ তাঁহাকে ত্রিভুবনেখরের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ফলে, হর ও ব্রহ্মা (অপর দুই গুণের ব্যষ্টিভাব এবং নাড়ী-বিচারে অত্র নাড়ীঘর) তাঁহার দ্বারা শাসিত বা পরিচালিত হইতেন। এই জন্য শাস্ত্রে তিনি “ত্রিভুবনাবীশ” বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। বায়ু যেমন “নেতা” ও “রোগ-সমূহ-রাট, তিনিও তদ্রূপ নেতা, পরিচালক, শাসক, বা দেব-রাট পক্ষান্তরে তিনি জনাৰ্দ্দন। এই “রোগ-সমূহরাট” ও “জনাৰ্দ্দন” কথার পার্থক্য কোথায়? রাজ সন্মানও নারায়ণের রজোগুণের পরিচায়ক; কারণ রাজা রজোগুণাত্মক, সম্বন্ধে শাসন কার্য চলিতেই পারে না। পুরাকালের শাস্ত্র বিধি-মুহুরারে রজোগুণাত্মক ক্ষত্রিয়গণই রাজ-পাৰ্হ ছিলেন। এখনও এতদ্রুপে সাধারণের বিশ্বাস আছে যে, কাহারও মাথার উপর সাপে ফণা ধরিলে সে রাজা হয়। রাজা নারায়ণের সর্পণব্যায় ঐরূপ বিশ্বাসের ভিত্তি। অপিচ বায়ু যেমন তিৰ্য্যগ্গ, নারায়ণ ও সেইরূপ তিৰ্য্যগ্গ, কারণ তিনিও তিৰ্য্যক্‌বোনি অনন্তরূপী সর্পণব্যায় শরিত। এই অনন্ত-মূর্ত্তি-স্বৰূপে মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়াছেন :—

তামসী সা সমখ্যাভা তিৰ্য্যক্‌ত্বে সমুপাশ্রিতা ।
তদ্বিত্ত শরিতা-মূর্ত্তিকে (নারায়ণকে) উক্ত পুরাণ “পন্নগতন্নগা” বলিয়াছেন। সে শ্লোক আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। পুনশ্চ, বায়ুকে স্পষ্টত যে “অচিন্ত্যবীৰ্য্য” বলিয়াছেন, শাস্ত্রে নারায়ণকে ঠিক তাহাই বলা

হইয়া থাকে। “চতী”তে নারায়ণ-শক্তিকে “ঋং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীৰ্য্য”

বলা হইয়াছে, সুতরাং বিষ্ণু বা নারায়ণও অনন্তবীৰ্য্য; এবং তাহা হইলে তিনি বায়ুর জায় অচিন্ত্য-বীৰ্য্যও বটে, কারণ অনন্তবীৰ্য্যের অনন্তভাবে চিন্তা হয় না—তাহা অচিন্ত্য।

মতান্তরে, এই শরিত পুরুষ-শক্তি সরস্বতী-কেই ঋগেদীয় সাং সন্ধ্যাকাণী

“ও বৃদ্ধা বৃদ্ধাদিত্যমণ্ডলহাং শ্রামাধরাহু-
লেপনম্নগাভিভরণাং একবক্তাং শম্ভচক্র-
গদাপদ্মাক চতুহুজাং গকড়াক্রাং বিষ্ণু দেবতাং
সামবেদমুদাহরন্তীং স্বলৌকাধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং
নাম তাং ধ্যায়েৎ।”

বলিয়া ধ্যান করিতে হয়। পাঠক দেখিবেন, জীবনের সন্ধ্যায় অর্থাৎ বার্কিকো বায়ুর প্রাবল্য হয়, এবং সেই বায়ুই শেষ-শরী এবং শেষ-শরীই যে সামবেদের দেবতা তাহা আমরা বলিয়াছি। সেই জন্য দিবসের বার্কিকো অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে সেই সামবেদোচ্চারণকারিণী বৃদ্ধা সরস্বতী নারী শেষায়ায় শক্তিকে স্মরণ করিতে হয়। এসকল কি আমাদের কথার পোষকে যায় না? স্মরণ রাখিতে হইবে, “শক্তি-শক্তোরভেদম্”। আর ঐ শক্তি যে বৃদ্ধা, তাহার অন্ততম কারণ, তিনি প্রণিতামহ-মহাশয়ের শক্তি—সাক্ষাৎ প্রণিতামহী।

আর এক কথা। যে সকল দেবমূর্ত্তি আমরা সর্প সংযুক্ত বা সর্পভূষিত দেখিতে পাই, সে সকল রাজসী বা তামসী। গুণত্রয়ের যে সকল বর্ণ শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে, তদনুসারে সাধারণতঃ সাদৃশ্যী মূর্ত্তি খেতবর্ণী, রাজসী রক্তবর্ণী এবং তামসী কৃষ্ণবর্ণী এবং প্রায়শই দিশম্বা এবং সুগুমালাধারিণী দেখিতে পাওয়া যায়।

সরস্বতী সাধিকী, অতএব ষ্ঠতবর্ণী । জগদ্ধাত্রী
হুর্গী রাজসী—অতএব রক্তবর্ণী, • অধিকন্তু
নাগযজ্ঞোপবীতিনী, • আর সংহারিণী কালী
তামসী—অতএব ঘোরকৃষ্ণবর্ণী, মহামেঘ-
প্রভাশাসমা, পরন্তু মুণ্ডমালাধারিণী ও দিগম্বরী ।
আমরা যে কথা বালতেছি, তাহা সাধিক,
রাজসিক ও তামসিক শিবের নিম্নলিখিত
শাস্ত্রোক্তধ্যানত্রয়ে স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

(সাধিক ধ্যান)

বন্দে বাণং ক্ষটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসি বকুঃ
দিব্যাকর্ষেন্নর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিনীনুপূরাটীয়াঃ ।
দীপ্তাকারং বিশদবসনং স্ত্রুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং
ইত্যাক্ষাভ্যাং বটুকমনিং শূলদণ্ডৌ দধানম্ ॥

(রাজস-ধ্যান)

উদ্যাক্ষরসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাক্ষাগস্তম্ভং
শ্বেরাস্তং বরদং কপালাভরণং শূলং দধানং কঠৈঃ
নীলগ্রীবমুদার ভূষণশতং পীতাংগচূড়োচ্ছলং
বকু কাক্ষণবাসনং ভয়হরং দেবং সঙ্গা ভাবয়ে ॥

(তামস ধ্যান)

ধ্যারেন্নীলাভ্রকান্তিং শশিকলধরং মুণ্ডমালাং
মহেশং
দিশ্বস্রং পিজকেশং ভয়কমথ স্মৃণিঃ শঙ্খশূলা-
ভয়ানি ।
নাগং বটীং কপালং কর-সরসিকঠৈঃ বিভ্রতং
ভীমদংষ্ট্রং

সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঙ্কিনী
নুপূরাটীয়াং ॥

সাধিক-ধ্যানলিখিত “ক্ষটিকসদৃশম্”
“বিশদবসনম্”, রাজস-ধ্যানের “উদ্যাক্ষর-
সন্নিভম্”, “রক্তাক্ষাগস্তম্ভম্” “কপালম্”,
“বকু কাক্ষণবাসনম্” এবং “তামস-ধ্যান
কথিত “নীলাভ্রকান্তিম্” “মুণ্ডমালাম্”

“দিশ্বস্রম্” “নাগম্” “সর্পাকল্পম্” শব্দগুলির
প্রতি আমরা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ
করিতেছি ।

এখন ভাবিমা-দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে
যে, ষষ নারায়ণের মস্তকোপরি-সহস্র শীর্ষ
সর্প ছত্রধারীস্বরূপ ফণা উন্নত করিয়া আছে,
অনন্ত রূপের ধ্যানে বাঁহাকে নাগ-
যজ্ঞোপবীতি বলা হইয়াছে, আর বাঁহার বাহন
গরুড়কেও শাস্ত্রে “হুট্টাহিচ্ছেদীতুঙ” বলা
হইয়াছে, সেই অনন্ত-নারায়ণরূপ ঠিক
তমোগুণের হইতে পারে না, অথবা সৎগুণেরও
হইতে পারে না—পরন্তু উহা এতহৃৎয়ের মধ্য-
বর্তী রজোগুণ-বিশিষ্ট হওয়াই-সম্ভব । “অনন্ত-
নারায়ণের” ধ্যান নিয়ে দেওয়া গেল ; তাহা
দেখিরা পাঠক বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন
যে, বর্ণে তিনি সৎগুণাত্মক, আয়ুধে তাঁহার
রজোগুণস্ফুটিত এবং সর্প-সংযুক্ত ইত্যাদি
কারণে তাঁহাতে তমোগুণও আছে বুঝা যায় ।
অর্থাৎ তিনি ত্রিগুণাত্মক, অথবা এককথায়
তিনি রজোগুণশালী । কারণ রজোগুণ সৎও
আছে, তমোগুণও আছে । ইহা আমরা
পূর্বে দেখাইয়াছি । এই নারায়ণের প্রকৃতি
স্বয়ং দেবী হুর্গী—তিনিও ত্রিগুণাত্মিকা—
রজো-প্রধানা । তাঁহাই তাহার একটি নাম
রাজসী । অনন্তের ধ্যান যথা :—

ঐ দিব্যসিংহাসনানীনং দেবেশং গরুড়ধ্বজম্ ।
শুক্লবর্ণং চতুর্ভূহং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং পীতাভরণং বিভূম্ ।
প্রিয়া বাণ্যা চ সংলিষ্টং কিরীটাদি সমুচ্ছলম্ ॥
কণাশতসমায়ুক্তং জগদ্রাথং জগদগুরুম্ ।
অনন্তং চিত্তয়েদেবং নারদাত্তরুণস্ততম্ ॥

এখন ব্রাহ্মার সবকে কিছু বলি । টীকাকার

ব্রহ্মকে রজোগুণাত্মক না বলিয়া সৰ্বগুণবিশিষ্ট বলিয়াছেন। দেখা যায়, ব্রহ্ম অজ্ঞাতাঙ্গী নহেন, কাহাকেও দমন বা বধ করা তাঁহার কার্য্য নহে। তিনি বেদ, অগ্নিমালা, কমণ্ডলু ইত্যাদি লইয়া এক হিসাবে সৰ্বগুণোচিত আচার-পরায়ণ। তাঁহা হইতে উদ্ভূত ব্রাহ্মগণকে সাত্বিক বলা হইয়া থাকে, তবে স্বয়ং তাঁহাকে সাত্বিক ভাবিতে দোষ কি? “চতী”তে দেখা যায় যে, শুভনিশুভ-বধের সময় সকল দেবশক্তি মাতৃগণই অগ্নিগ্রহণে সহায়-কার্য্যে ব্যাপ্তা, স্বয়ং বৈষ্ণবীশক্তিও সশস্ত্রা ছিগেম, কিন্তু কেবল ব্রহ্মাণীই নিরায়ুধ। “চতীতে” সে কথা এইরূপ আছে :—

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষত্ব কমণ্ডলুঃ।

আরাতা ব্রহ্মণঃ শক্তি ব্রহ্মাণী সাত্বিবীরতে ॥

এ ত দেখিতেছি অক্ষত্ব ও কমণ্ডলু—সন্ন্যাসীর জিনিস, এ কি যুদ্ধক্ষেত্রের ভরসা? তবে ব্রহ্মাণী যুদ্ধের কোন কার্য্যে লাগিলেন? “চতীতে” বলা হইয়াছে :—

কমণ্ডলু-জলাক্ষেপ হতবীৰ্য্যান্ হতোজসঃ।

ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছ্রজন বেন বেন স্ব ধাবতি ॥

অর্থাৎ শত্রুগণের প্রতি কমণ্ডলু হইতে কেবল ময়ূপূত বারি-প্রক্ষেপ, ইহাই ব্রহ্মাণীর একমাত্র অস্ত্র। ইহা সৰ্বগুণাত্মক ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য—অনেকটা অভিচার-ক্রিয়ায় মত বটে। তাই ইহা সৰ্ব্বোত্তম রজোগুণের আভাস দেয় বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ব্রহ্মকে সৰ্বগুণাত্মক ভাবিলে কতি কি? পূর্বে বলিয়াছি যে, সৰ্ব-গুণেও রজোগুণ আছে। সুতরাং ব্রহ্মকে এই ছুই গুণের যে ভাবে বুঝ, তিনি অস্বাভাবিক তাহাই, ইহা একরূপ বলা বাইতে পারে।

টীকার উল্লেখিত হরসম্বন্ধে টীকাবাদের

সহিত সাধারণের মত-ভেদ নাই। সুতরাং আমাদের সে সম্বন্ধে বলিবার ও কিছু নাই।

উপসংহারে আবার বলি, টীকাকার কোন অশাস্ত্রীয় ‘অসঙ্গত কথা’ আলোচ্য টীকা-সম্বন্ধে বলেন নাই। বলিলে এ টীকার এত কাল ধরিয়া আদর থাকিবে কেন? সাধকের প্রকৃতি অল্পসবে তাহার ইষ্ট দেবতা নির্দিষ্ট হওয়ার একেশ্বর-সম্বন্ধে পুরাণাদিতে বহুমত দেখা যায়। দৃষ্টান্তরূপ নাগোজী ভট্ট দেবী ভগবতী মহালক্ষ্মী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তিনি “লিঙ্গং যোনিকং বিব্রতী—ইত্যনেনাস্যাঃ পুং-রূপম্ভঃ স্ত্রীরূপম্ভঃ চ ধ্বনিতম্। এতদেব রূপং শৈবাঃ সদাশিব ইত্যাহঃ। বৈষ্ণবাঃ বাহুদেব ইতি শাক্তা মহালক্ষ্মীবীতি।” * এষা শৈবী বৈষ্ণবীচ।’ সুতরাং আমাদের টীকাকার যদি কোন এক বিশেষ শাস্ত্রমত অনুসরণ করিয়া তাঁহার টীকা লিখিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রম বলা যায় না। আর ত্রিগুণ যে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, সে সম্বন্ধেও পূর্বে উল্লেখ দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেন :—

এত এব ত্রয়ো দেবা এত এব ত্রয়ো গুণাঃ।

অন্যান্য মিথুনাচ্ছেতে অন্যান্যাপ্রসিদ্ধস্তথা।

কণং বিরোগো ন হেচ্ছাং ন তঃ স্ত্রিঃ পরস্পরম্।

ইহাতে সব তর্ক এক কথায় চুকিয়া যায়। অর্থাৎ আমরা এখন যে কথা বলিলাম, তাহাতে ত্রিমূর্ত্তির প্রত্যেকটিতেই সৰ্বগুণ আছে, তবে তাঁহাদের এক একটিতে এক একটি বিশেষ গুণের আধিক্য আছে মাত্র, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। এখন সেই তিনেই এক, একেই তিন দাঁড়াইল। ত্রিমূর্ত্তিব সম্বন্ধে ব্রহ্মা রজোগুণাত্মক, বিষ্ণু সৰ্বগুণাত্মক

এবং হরী তাম্রাণ্ডপাঙ্ক, ইহাই সাধারণতঃ
পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়।
তবে কোন কোন শাস্ত্র-গ্রন্থে যে সে সম্বন্ধে

অন্তরূপ লিখিত আছে, তাহাই আমরা এ
প্রবন্ধে দেখাইলাম।

শিব-চতুর্দশী ।

(কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ) ।



(১)

শুভ চতুর্দশী তিথি লইয়া ভকতি প্রীতি,
পূজিতে এসেছি আজ, শব্দর। তোমারে,
এমন দেবতা আর দেখিনি সংসারে।

প্রেমময়—অনাসক্ত ভক্তের পরম-ভক্ত,
“পূজা” ভেবে তুষ্ট কেবা দাম্পণ্য-প্রহারে ?
এমন উদার প্রাণ আছে কি সংসারে ?

(২)

স্বর্গ মর্ত্য সব খুঁজে, তেত্রিশ কোটিরে পূজে
দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি যত দয়া বা’র,
পবিত্র “দেবত্ব” আছে কোন্ দেবতার ?

এত মায়া—এত মেহ,
জানেনা ত আর কেহ,
ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, কুবের, তপন,
দয়ার দেবতা—এরা বহে একজন !

(৩)

এ ভারত “আত্ম-ভোলা”
• তুমিও যে “আত্ম-ভোলা,”
গ্যান-মগ্ন—মহাদেব—বীজজ্ঞান হত।
ভারতের দেব, ঠিক ভারতেরই মত।
তাই এত ভালবাসি—
ঈশান—ঋশান-বাসী,

গৃহে “অন্নপূর্ণা” বা’র কুবের ভাণ্ডারী,
কি ভ্যাগ-স্বীকার, তবু সে শিব ভিখারী !

(৪)

কালসর্পে—কুতূহলে, জড়া’য়ে বেখেঁচ গলে,
শিরে—গজা-তরঙ্গের আতঙ্ক গর্জনে ?
অক্লেপ নাইকি তা’র, কি উদার মন !
নাহি মানি—অপমান—স্থান কুস্থান জ্ঞান,
নাহি ভেদাভেদ, চির পাছ উদাসীন।
কি অজ্ঞেয়—আপনাতে আপনি বিলীন।

(৫)

ভূত ও পিশাচে হার ! স্থান দে’ছ রাডা পায়,
ভারতেরই মত তুমি বেদনা-বিধুর,
হে অব্যয় ! হে স্বরত্ন ! হে চির মধুর !
সর্বোত্তম তুষি করে কোটি কাম পুড়ে মরে,
আত্মজরী আত্মতোষ ! প্রভো ! পঞ্চানন !
পঞ্চতাবে, পঞ্চপ্রাণে, তোমারি আসন।

(৬)

কর্ম-ক্ষেত্রে—আছে “কর্ম,”
তথাপি সন্ন্যাস-ধর্ম,
শক্তি বৃকে, শান্তি মুখে, হর দিগম্বর !
স্বভাব ব্রততি তুমি—সার্থক স্থন্দর।
সতী-দেহ—ল’য়ে বন্ধে,
কেবা মত্ত প্রেমানলে ?

কোন দেব জানে এত সতীর আদর ?

ভারত-সতীর ভেঙ্গে—মুগ্ধ চরাচর ।

(৭)

সমুদ্র-বন্থনে—যবে, সম্পদ লভিল সবে,

তব ভাগ্যে কালকূট—বিধির লিখন—

সে বিষ, আকর্ষিত ত'রে ক'বেছ সেবন ।

আমরাও, পেলো ক্ষুধা, বিষ খাই ভেবে ক্ষুধা,

আমাদেরও তমোশুণ—আলস্ত জড়তা—

তাই তুমি ভারতের আরাধ্য দেবতা !

(৮)

'পোড়া হাড়'—'ভুগ্ন হাই'—

মোদেরও মলমল তাই,

জারারে অর্ধেক দিগে "অর্ধ নারীধর"—

নারীর সম্মান জানে, ভারতেরও নর ।

এ ম্যালেরিয়ার দেশে—

যেন "মৃত্যুঞ্জয়" বেশে

পর-হিতে, আপনার সর্বস্ব বিলাই,

তোমার চরণে, প্রভো! এই ভিক্ষা চাই ॥

প্রাচীন চিকিৎসকের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত ব্রহ্মচ, এম্, বি]

—:—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৭১) অর্জুন বৃক্ষের ছাল চূর্ণ ১০ আনা
মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ দুগ্ধসহ
সেবনে কদরোগ ভাল হয় ।

(৭২) হরিণের শৃঙ্গ পুটপাকে দধি করতঃ
পেষণ করিয়া চার পাঁচ রতি মাত্রায় প্রত্যহ
আহারের পর গরম জল অল্পপানে সেবন
করিলে হৃৎ বেদনা ও পৃষ্ঠ বেদনা শীঘ্র
নষ্ট হয় ।

(৭৩) অর্জুন ছালের কাথে কিঞ্চিৎ
কুড় চূর্ণ ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে
কদরোগ ভাল হয় ।

(৭৪) সোমরাজী ও শুষ্ঠীচূর্ণ সমভাগে
মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ প্রশমিত
হয় ।

(৭৫) চিরতা, বাসক ছাল, কটুকী,
পটল-পত্র, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও
রক্তচন্দন ইহাদের কাথ প্রাতে ও সন্ধ্যায়
পান করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয় ।

(৭৬) সোহাগার থৈ, কপূর ও স্নত
দ্বারা অগ্নিতাপে মলম প্রস্তুত করিয়া লাগা-
ইলে কুষ্ঠরোগ ভাল হয় ।

আয়ুৰ্বেদ

৭ম বর্ষ

চৈত্র, ১৩২৯ সাল।

৮ম সংখ্যা।

কবিরাজী ও ডাক্তারী মতে নাড়ী পরীক্ষার আলোচনা।

[ডাঃ পি, কে, রায় চৌধুরী এল, এম্ এফ্.]

রক্তপূর্ণ ধমনীতে যখন হৃৎপিণ্ড প্রেরিত
অতিরিক্ত ৩৪ আউন্স রক্ত হৃৎপিণ্ডের
প্রত্যেক সঙ্কোচনে ধমনীর মধ্যে প্রেরিত হইয়া
ধমনীতে যে স্পন্দন উৎপন্ন কবে, সেই স্পন্দনই
নাড়ী নামে অভিহিত হয়।

ডাক্তারীমতে নাড়ীর ছবি Sphygmo-
graph (স্পীগ্মোগ্রাফ) নামক যন্ত্রে তুলিলে
চিত্রের প্রথম রেখাটি হঠাৎ সোজা হইয়া
উর্দ্ধে উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় ও পরে
রেখাটি ক্রমে ক্রমে নীচের দিকে নামিতে
থাকে, কেবল মধ্যে দুইটি বক্রতা দেখিতে
পাওয়া যায়, রেখার শৃঙ্গটিকে Percu sion
wave (পারকাসান্. ওয়েভ্.) বা বায়ুনাড়ী
বলে। • ঐ রেখাটি যখন ক্রমে নামিতে
থাকে তখন প্রথম বক্রকে Tidal Wave
বা পিত্তনাড়ী ও নীচের বক্রকে Diastolic
Wave বা কফ নাড়ী বলে।

কিন্তু বায়ু অর্থে বাতাস, পিত্ত অর্থে
যকৃত নিঃসৃত রস এবং কফ অর্থে থুথু বা
গয়ার বুঝিলে হইবে না।

বায়ু বলিতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বুঝায় এবং ঐ
হৃৎপিণ্ড আবার মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড এবং হৃৎপিণ্ড
স্থিত স্নায়ু সকল হইতে Energy বা ক্ষমতা
প্রাপ্ত হইয়া কার্য করে (Central and
Sympathetic nervous systems and
the gongliens of the heart)

পিত্তনাড়ী অর্থে যকৃত নিঃসৃত রস না
বুঝিয়া (Toxin in Circulation) রক্তमध्ये
একটি বিষাক্ত পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে
বুঝিতে হইবে।

কফনাড়ী অর্থে থুথু বা গয়ার না বুঝিয়া
circulation of lymph) লৈম্বিক রস
অবাধে লৈম্বিক নালীতে প্রবাহিত হইতে
পারিতেছে কিনা বুঝিতে হইবে।

প্রত্যেকটির আলোচনা ।

Percussion wave বা বায়ুনাড়ী
কিজিওলজিক্যাল কারণ:—রক্তপূর্ণ ধমনীতে
হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনে (Systab) ;
হৃৎপিণ্ডপ্রেরিত ৩৪ আউন্স রক্ত ধমনী
মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই যে স্পন্দন
উৎপন্ন করে তাহাকেই Percussion wave
বা বায়ুনাড়ী বলে । Sphymograph নামক
যন্ত্রে এই নাড়ীর গতি ছবি তুলিলে প্রথমেই
যে রেখাটি সোজাখুলী উচ্চ উঠিয়া থাকে,
ঐ রেখার শূন্যকেই Percussion wave এবং
কবিরাজী মতে বায়ু নাড়ী বলা হয় । আবার
হৃৎপিণ্ড মস্তিক হইতে ভেগাস্‌ নায়ু দশম
স্থায় (মেরুদণ্ড হইতে সিম্প্যাথিটিক্‌ নায়ু
এবং হৃৎপিণ্ডস্থিত গ্যাংগ্লিয়ন (ganglions)
সকল হইতে Energy বা ক্ষমতা প্রাপ্ত বইয়া
সঙ্কুচিত (Diastab) এবং প্রসারিত (Ditab
কার্য্য করিয়া থাকে । মস্তিক হইতে উৎপন্ন
ভেগাস্‌ নায়ু হইতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বা
স্পন্দন বৃদ্ধ হয় । মেরুদণ্ডস্থিত সিম্প্যাথিটিক্‌
নায়ু দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বা স্পন্দন
বদ্ধিত হয় (accelaritary action) এবং
হৃৎপিণ্ড স্থিত গ্যাংগ্লিয়ন (Ganglions)
হইতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনকে (Augmentary
action) বলশালী করে ।

অতঃপর এই Percussion wave বা
বায়ুনাড়ী পরীক্ষা কালীন নিম্নলিখিত তিনটি
বিষয় মনোযোগের সহিত লক্ষ্য রাখিতে
হইবে ।

১। Rate per minute.—হৃৎ-
পিণ্ডের স্পন্দন প্রতিমিনিটে কতবার হইতেছে

ইহার দ্বারা ভেগাস্‌ নায়ু ও সিম্প্যাথিটিক্‌
নায়ুর ক্রিয়া বুঝায় ।

২। Rhythm :—হৃৎপিণ্ডের সঙ্গম
গুলি যথাক্রমে পর পর হইতেছে কি না, ইহার
দ্বারা হৃৎপিণ্ডের গ্যাংগ্লিয়নের (Ganglions)
ক্রিয়া কি প্রকার হইতেছে বুঝিতে হইবে ।

৩। Volume :—হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক
সঙ্কোচনে রক্তপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ড কি পরি-
মাণে রক্ত প্রেরণ করিতেছে অর্থাৎ ধমনী
সকল রক্তপূর্ণ বা রক্তাৱত (Large or
small) অবস্থা বুঝায় ।

Tidal Wave:—বা শিত্তনাড়ী (Toxic
in circulation) অর্থাৎ রক্তমধ্যে কোন
রক্তম বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চারিত করিতেছে বুঝিতে
হইবে ।

কিজিওলজিক্যাল কারণ:—রক্তপূর্ণ ধম-
নীতে হৃৎপিণ্ড প্রেরিত অতিরিক্ত ৩৪ আউন্স
রক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনে (Systab)
প্রবেশ করিয়া ধমনীতে যে আঘাত করিতেছে
এবং এই আঘাত জনিত ধমনীর মধ্যে যে
স্পন্দন হইতেছে তাহাকে Percussion
Wave বা বায়ু নাড়ী বলা হয় । পরে হৃৎ-
পিণ্ডের প্রসারিত (Diastab) হইবার সময়
হৃৎপিণ্ডের সেমিলিউনার ভালভস্‌ হঠাৎ বন্ধ
হওয়ার ধমনীস্থিত ঝাঁককে পুনরায় হৃৎপিণ্ডের
ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না; হৃৎপিণ্ডস্থিত
সেমিলিউনার ভালভসেতে রক্ত প্রবাহের
প্রতিবাতজনিত ধমনীর মধ্যে যে স্পন্দন হয়
তাহাকেই Tidal wave এবং কবিরাজী
মতে শিত্তনাড়ী বলা হয় ।

ভূতত্ত্ব আহারের পর পানীয় ও
অন্ত্রের হইতে পাচক রস দ্বারা রূপান্তর ও

শোষিত হইয়া রক্তপ্রণালীমধ্যে রক্তে পরিণত হইয়া সর্বশরীরে প্রবাহিত হয়। এই রক্ত হইতে শরীরস্থ বাবতীয় কোষসকল (tissue cell) পোষণ গঠন ও কার্যকর হয় এবং উক্ত কোষসকলের পরিত্যক্ত অমাবশ্যকীয় পদার্থকে বহন করিয়া শরীর মধ্য হইতে মুক্ত কর্তব্য ও শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা নির্গত হয়। ইহাকেই metabolism কহে। এবং উক্ত অমাবশ্যকীয় পদার্থকে টক্সিন (toxin) বা বিষাক্ত পদার্থ বলে। এই টক্সিন ভ্যাসোমোটর স্নায়ু (ধমনী সকলের উপর যে সমস্ত স্নায়ু ক্রিয়া করে) কে উত্তেজিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈরিক রক্তপ্রণালী সকলকে (capillary blood vessels) সঙ্কুচিত করিয়া রক্তচাপ (Blood pressure) বৃদ্ধি করে। অতএব যতই রক্তচাপ বৃদ্ধি হইবে, হৃৎপিণ্ড প্রেরিত রক্তের, রক্তপূর্ণ ধমনীতে বাইরা হৃৎপিণ্ড প্রসারিত (Diastab) হইবার কালীন ধমনীস্থিত রক্তপ্রবাহের প্রতিঘাত যত জোরে হৃৎপিণ্ডস্থিত সেমিনিউ-নারিভাল্ভ্ সেতে প্রতিহত হইবে। ধমনীর মধ্যে তত জোরে স্পন্দন হইবে, এই স্পন্দনই Tidal wave বা পিত্তনাড়ী। রক্তচাপ যতই বেশী হইবে প্রতিঘাতটীও ততই বেশী হইবে সুতরাং পিত্তনাড়ীও ততই প্রবল বা স্পষ্ট হইবে। রক্তচাপ যত কম হইবে প্রতিঘাতটীও ততই কম হইবে সুতরাং পিত্তনাড়ী ততই অস্পষ্ট বা অদৃশ্য হইবে। রক্তচাপ বৃদ্ধিহইলে শরীরের মধ্যে টক্সিন ও বেশী হইবে, আশ্রয় এই টক্সিন ভ্যাসোমোটর স্নায়ুকে সঙ্কুচিত করিবে, কাজেই রক্তপূর্ণ ধমনীতে যে পরিমাণে রক্ত প্রবেশ করিতেছে, তাহা অপেক্ষা কম রক্ত বাহির হইয়া যাওয়ার রক্তচাপ বৃদ্ধি হইতেছে

এবং পিত্তনাড়ী ততই প্রবল হইতেছে। শরীরের মধ্যে টক্সিন যতই কম হইবে, রক্তচাপ ততই কম হইবে পিত্তনাড়ী ততই অস্পষ্ট হইবে।

Dicrotic wave বা কফনাড়ী। কিঞ্জিও-লজিক্যাল কারণ :—রক্তপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ড আবার প্রত্যেক সঙ্কোচনে (Systab) অতিরিক্ত ৩৪ আউল রক্ত প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। উহাতে প্রথমে ধমনীর মধ্যে যে স্পন্দন হইতেছে তাহাকে percussioin weve বা বাঘুনাড়ী বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ হৃৎপিণ্ড প্রসারিত (Diastab) হইবার কালীন ধমনীস্থিত রক্তপ্রবাহ হৃৎপিণ্ডের সেমিনিউনার ভাগত্ সেতে প্রতিহত হইয়া যে স্পন্দন হইতেছে তাহাকে tidal wave বা পিত্তনাড়ী বলা হয়। তৃতীয়তঃ রক্তপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ড প্রেরিত অতিরিক্ত রক্ত ধমনীর স্থিতি স্থাপকতার Elasticity) গুণ থাকায়, ধমনী সকল প্রসারিত হইয়া অতিরিক্ত রক্তকে স্থান দিতেছে এবং ধমনীর সঙ্কোচনের (Contraction) অবস্থায় যে স্পন্দন ধমনীতে পাওয়া যায়, তাহাকে D'eratic wave এবং কবিরাজী মতে তাহাকে কফ নাড়ী বলা হয়।

খোরাসিক্ ডাক্তার এবং দক্ষিণ লিফক্যাটিক্ ডাক্তার নামক দুইটা প্রধান শৈল্পিক প্রণালী শরীরস্থ বাবতীয় শৈল্পিক রস লইয়া সাবক্লে-ভিয়ান্ ভেন এবং জুগুলার ভেনের সংযোগ স্থলে যথাক্রমে বামে ও দক্ষিণে আসিয়া রক্ত প্রবাহতে মিলিত হইতেছে। কিন্তু রক্তচাপ কম থাকিলে শৈল্পিক রস অবাধে শৈল্পিক প্রণালী হইতে রক্ত প্রণালীতে মিলিত হইতে

পারে না। রক্তচাপ বেশী হইলে হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনেতে প্রৈয়িক প্রণালীর পশ্চাদ্গত হইতে চাপদ্বারা back ward pressure প্রৈয়িক রস অবাধে আসিতে থাকে অধিকতর রক্তচাপ বেশী থাকার শিরার রক্তচাপ দ্বারা প্রৈয়িক প্রণালী হইতে প্রৈয়িক রস এ্যাস্পিরেটিঙের aspirating দ্বারা রক্ত প্রণালী মধ্যে অবাধে আসিতে থাকে। কফ নাড়ী বলিতে শরীরস্থ প্রৈয়িক রসের গতি বুঝার অর্থাৎ যখন রক্তচাপ কম থাকে তখন প্রৈয়িক রস অবাধে শিরাতে আসিয়া পড়িতে পারে না, আবার রক্ত চাপ কম থাকার জন্য ধমনীর স্থিতি স্থাপকতার গুণ থাকার জন্য বেশী সঙ্কোচন Contraction হয়, ধমনীর বহু বেশী সঙ্কোচন হইবে, ততই স্পন্দনটাও বেশী স্পষ্ট

হইবে। রক্তচাপ বেশী থাকিলে ধমনী সকল অভ্যন্তর Tension এতে থাকার উহার স্থিতিস্থাপকতার গুণ কম হইয়া যায়। স্থিতিস্থাপকতার গুণ কম থাকার উহার সঙ্কোচনও কম হয়, সুতরাং স্পন্দনও হইবে অর্থাৎ রক্তচাপ বেশী হইলে প্রৈয়িক রস অবাধে রক্ত প্রণালীতে আসিয়া পড়িতে পারে, সুতরাং এখানে কফ নাড়ী অস্পষ্ট বা অদৃশ্য হইবে। প্রৈয়িক রস দ্বারা বাবতীর শরীরস্থ সেলের গঠন, পোষণ ও কার্যাক্রম হয়। যখন ইহার প্রৈয়িকতা হয় তখন সেলের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। যেখানে কফ-নাড়ী প্রবল সেখানে বৃদ্ধিতে হইবে যে শরীরস্থ সেলের গঠন ও পোষণ ইত্যাদির ব্যাঘাত হইতেছে।

— . —

আয়ুর্বেদ কি অবৈজ্ঞানিক ?

(শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিতাভূষণ)

পশ্চাত্য দেশের যেত স্মরণ্য এবং তথাকথিত যেত উচ্ছিন্ন ভৌমী কৃষ্ণাবতারেরা মনে করেন সারা ভারতটাই অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান আসিল পশ্চিম হইতে, তবে ভারত বিজ্ঞানের ছোঁওয়া ধরা পাবে কোথেকে? ইত্যাদি কথার গল্পনা আমরা শুনে শুনে মনে করি “হা, ঠিকই আমরা বুদ্ধি অবৈজ্ঞানিক, আমাদের আয়ুর্বেদ ও অবৈজ্ঞানিক।” সুখীসমাজে গিয়া, বসে আরো লজ্জা হয় যে, আমাদের আয়ুর্বেদে সর্বোচ্চ স্তরের চিকিৎসা নাই, আয়ুর্বেদে শল্য

বা অন্ত্র চিকিৎসা নাই। এই শল্য চিকিৎসার অভাবই আয়ুর্বেদকে আরো কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। যখন পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের তর্ক উপস্থিত হয়, তখন দূরের লোক আমরা এ ওর পানে মুখ চাওয়া চাওয়া করিয়া তর্কের খতম করি।

বড় দুঃখ হয় আমাদের চরক, সুশ্রুত-নিবান কিছুই বিজ্ঞানের লাগ পায় নাই। আজ কাল দেশবাসীগণ একটু আবলম্বন প্রয়াসী হইয়াছেন, তাই দেশবাসীরা একটু একটু চিকিৎসা বিজ্ঞানের তত্ত্ব অগাধিক পরিমাণে

রাখিতেছেন। পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের দেশে এম, ডি, এম, বি, এল, এম, এস প্রভৃতি বহু চিকিৎসক খাড়া হইয়াছেন। কিন্তু তাঁরা যে সেই পাশ্চাত্য প্রসাদ প্রাপ্তি, যদি বিদেশ হইতে ঔষধ না আসিত তবে তাঁহারা অস্ত্রশলী সেনানীর ভার রণ ক্ষেত্রে কেবল শোভা বর্জনই করিতেন। তাঁদের দ্বারা আর কি কাজ সম্ভব হইতে পারিত ?

দেশের লোক চিকিৎসা সম্বন্ধে একবারে উদাসীন, এই ননুকে অপারেশনের দিনে দেশের লোক অন্ন বস্ত্র দেশ হইতে সংস্থান করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কত দোষাভ্য-অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন তাহার সীমা নাই, কিন্তু কই তাঁহারাভো দেশের স্বাস্থ্য, আরোগ্য লাভের সর্বপ্রধান উপায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার জন্য একটুও মাথা ঘামাই-তেছেন না। বরং দেশের লোক এতটা উদাসীন যে, যে পাশ্চাত্য বিষে আমাদের দেশে জন্মিত হইয়াছে, তাহারই পুষ্টি বর্জন্যার্থে চেষ্টা করিতেছেন! আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রশংসাকারী ধ্বংসরিগণ অসুমান, প্রত্যক্ষ, আপ্তবাক্য ও যুক্তি এই চারি প্রকার প্রমাণ লইয়া চিকিৎসাব নৃষ্টি করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদনৃষ্টির বহু সহস্র বৎসর গত হইলেও আয়ুর্বেদের কোন কথাই অপ্রামাণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য হয় নহে। আয়ুর্বেদ, দেহী মাত্রেয় বায়ু, পিত্ত, কফ তিনটি ধাতুকে সার ধরিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী পাশ্চাত্য ঋণিগণ ইহা বুঝিতে পারেন না বলিয়াই আমাদের আয়ুর্বেদকে

অবৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই ?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কীটাপুর দোহাই দিয়া থাকেন। 'কীটাপুর সর্বরোগের কারণ তাই' কীটাপুর দোষ দিয়া থাকেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে মশক কুল সর্বধ্বংসী। তাই কীটাপুর ধ্বংসোদ্দেশ্যে কুইনাইন নামক পদার্থ গাদা গাদা খাওয়াইয়া রোগীকে আধ-মরা করিয়া ছাড়িতেছেন, অশেষ আয়ুর্বেদে তাহার চিকিৎসা হয়—ইহাই আধুনিক সনাতন প্রথা। "জ্বরাদৌ লজ্জনং পথ্যং" ইহা আয়ুর্বেদের কথা। জ্বর হইলে প্রথমে লজ্জন, দ্বারা দেহ বসন্তীকরণ করা, স্নানাদি রসকর বিষয় বর্জন করা। আয়ুর্বেদীয় 'চিকিৎসকগণ একবারেই কীটাপুর কথা ভাবে না। সুতরাং অনেকেই মনে করিবেন যে, আয়ুর্বেদে কীটাপুর কথা একবারেই নাই। মশক মারিবার জন্য সরকার নানা উপায়ে কামান পাতিয়াছেন, শিশি শিশি কুইনাইন দিয়া রোগীকে কীটাপু মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দু'দিন পরেই আবার জ্বর বাহির হইতেছে। এটা কি ? দেখে যাহাতে কীটাপু প্রবেশ করিতে না পারে বা প্রবেশ করিলেও নিশ্চল হইয়া যায়—ইহাই হচ্ছে আয়ুর্বেদের বিধান। কীটাপু যাহাতে আর দেহপ্রবিষ্ট হইতে না পারে, এইরূপ চিকিৎসাই সম্ভব। দেখে কীটাপু প্রবেশ করিবেই, কিন্তু দেহটাকে এমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে যে, কীটাপু প্রবেশ মাত্রেই ধ্বংস হইয়া যাইবে—ইহাই হচ্ছে প্রকৃত পন্থা। কোনটা করিব ? শরীরকে ব্যাধি অশুপশু করিব—যাহাতে

কীটাপু প্রবেশ করিতে না পারে তাহা করিব—না যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া শরীরে কীটাপু প্রবেশ করাইয়া তাহার চিকিৎসা করিবার জন্য কীটাপু ধ্বংস করিব—কোনটা ইহার সমীচীন ব্যবস্থা—বুঝিতে পারি না।

বিগত এক বৎসর যাবৎ আমি ভীষণ হৃদপিণ্ডের বেদনায় ভুগিতেছি। ময়মনসিংহে আমার বাড়ী, সহরে আমার বাসা বাড়ী। সেখানকার সহরের ছোট বড় পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আমার দেখিতেছেন, অবৈজ্ঞানিক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণও সকলেই উপস্থিত থাকিতেছেন। এম, বি, এল, এম, এস রাও আছেনই, মাসে মাসে সিভিল সার্জানও আসিয়া দেখিতেছেন বোগের কিনারা হইল না। ইলেকট্রনও কম হয় নাই। কিন্তু কই কিছুতেই উপশম হইল না, বুকের বেদনা জনিত কষ্ট এত বাড়িয়া গেল যে, দিবা রাত্রি নিদ্রা লোপ হইল, বসিতে বা শুইতে পারি না, সারা রাত্রি হুই জনের কাছে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকি। দিন মানেও বসিতে পারি না। প্রস্রাব করিলে, মলত্যাগ করিলে, আহাৰ করিলে বেদনা প্রবলতর হইয়া বাতনা দেয়। মল মুত্র ত্যাগ করিতে হইলে অপরের বিশেষ সাহায্য ব্যতীত ফিরিয়া আসিতে পারি না। মল, মুত্র ত্যাগ করিয়া ফিরিবার সময় একটা পিড়ি বা চৌকিতে করিয়া হুইজনকে ধরা ধরি করিয়া ঘরে আনিতে হয়। এই শু তখন আমার অবস্থা। তৎকালে একজন বলিষ্ঠ ভৃত্য আমার সহায়ক স্বরূপ থাকি।

এই অবস্থায় আমি আমার নানা স্থানের তার

করজন অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসক বন্ধুব শরণাপন্ন হই। সকলেই আমাকে অতি যত্নে অবিলম্বে ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন, এখানে বলিয়া রাখা ভাল, ইতিপূর্বে ময়মনসিংহের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের চিকিৎসাধীন কিছুদিন থাকিয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরই অজ্ঞাত স্থানের ঔষধ আসিয়া পৌঁছিল, সকলের ঔষধই অতি বিশ্বাস সহকারে ক্রমে ব্যবহার করিলাম, কিন্তু ভাগ্যক্রমে ইহাতেও বিশেষ ফল ফলিল না, তখন কলিকাতা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। ইহা যে চিকিৎসা যাত্রা তা' মনে করি নাই, গঙ্গা যাত্রাই ভাবিয়াছি, ময়মনসিংহের ডাক্তার কবিরাজগণ বলিলেন, “এরূপভাবে যাওয়া চকেন”, নড়া চাড়ার পোড়া বাড়িবে, হয়ত বা পথেই প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে।” সুতরাং আপাততঃ বাহির হওয়া স্থগিত রাখা গেল, পরে পরামর্শ হইল—বাড়ীওয়াল সকলকে লইয়াই কলিকাতা যাত্রা করিব। আমি ভাবিলাম ভালই হইল, গঙ্গা যাত্রা কালে সবটিকে দেখিয়া মরিতে পারি। কলিকাতায় বাড়ী ভাড়ার জন্য লিখিলাম, এক জন কবিরাজ বন্ধু লিখিলেন—, “ভাড়ার বাড়ীর দরকার নাই, আমার বাড়ীতেই সপরিবারে উঠিবেন।” এই সময় হঠাৎ মৃত্যু হইল, রাজসাহীতে একজন কবিরাজকে পত্র লিখিয়া দেখি না কেন? অবস্থা লিখিয়া পত্র দিলাম, তিনিও অতি সত্বর ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন। ঔষধ আসিল, পরে বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসকেরা এ ঔষধ খাইতে নিবেদন করিলেন। তাঁদের কথা এই—“আমরা বোগ ও রোগী দেখে ঔষধ দিয়ে কিছু কর্কে

পারলেম না। অল্প তিনি রোগও রোগী না দেখে শুধু জল ঔষধ দিলেন, তা'তে কি ফল হবে? তাঁরা ঔষধ খাইতে বারণ করিলেন, তদনুসারে রাজসাহীতে কবিরাজ মহাশয়কে লিখিলাম। তদন্তরে তিনি লিখিলেন—“আগনি ঔষধ খাউন, কাহারো কথা শুনিবেন না, অগ্নে বৃষ্টিতে পড়েন নাই বলেই নানা কথা বলিতেছেন, এই ঔষধেই ফল পাইবেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া ঔষধ খাইলাম, মন্ত্রশক্তির মত ফল পাইলাম, তিন মাস নিদ্রা কাহাকে বলে জানি তাম না। ঔষধ খাওয়ার প্রথম দিনই গভীর রাত্রে আমার নিদ্রা হইল, পরদিন এত সুখ পাইয়াছিলাম যে সাত রাজার ধন আনিয়া দিলেও এতটা সুখী হইতাম না। দ্বিতীয় দিন ঔষধ খাইয়া আরও খানিকটা বেশী ঘুমাইলাম, এসময় গাঢ় নিদ্রা হইল। শুল্কধাকারীর ঘড়ী ধরাই ছিল। দ্বিতীয় দিন বসিয়া বসিয়া কাটাতে পারিলাম। সামনে কয়েকটা বালিশ রাখিয়া নিদ্রা গেলাম, বেদনার বেগও অনেকটা প্রশমিত হইল, মনে হইল যেন রোগ অর্ধেক হইয়াছে। ডাক্তারেরা পরদিন আসিয়া দেখিলেন, আমি চেয়ারে বসিয়া আছি, কোথায় আমি সর্দঙ্গা পাড়াইয়া থাকিতাম, আজ কিনা বসিয়া আছি, তাঁহারা অবাক হইয়া কহিলেন, “এ কিসে হইল? আমি কহিলাম “এ আমাদের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ফল।” তাঁহারা সব কথা শুনিয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চাওরি করিতে লাগিলেন।

এবার তৃতীয় দিনের কথা, তৃতীয় দিন ঔষধ খাইয়া রাত্রে প্রায় তিন ঘণ্টা নিদ্রা

বাঁটেতে পারিলাম। এদিন কিন্তু শুইয়াই নিদ্রা গেলাম। প্রাতে উঠিয়া ভাবিলাম যেন আমি সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়াছি, তাড়াতাড়ি মুখে জল দিয়া রাস্তার বাহির হইয়া পড়িলাম। শুল্কধাকারীরা জাগিয়া উঠিয়া আমার পিছন ধরিল, আমি বলিলাম, “তোমরা কেন সন্ধ্যা গইতেছ, আমিও নীরোগ হইয়াছি মনে করিতেছি?” তবুও তাহারা আমার পিছন ছাড়িল না। আমি একটু হাওয়ার বেড়াইয়া গৃহে ফিরিলাম। আমার এই অবস্থা ঔষধ বা মন্ত্রবলে হইল তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না। এই সময় আবার সমস্ত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণকে ডাকিয়া পাঠাইলাম, সিভিল সার্জনকেও ডাকিতে ভুলিলাম না। তাঁহারা আমাকে দেখিয়াত অবাক। তাহারা বলিলেন—“হায় আমরা কি অপদার্থ, এইরূপ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাকে আমরা আবার অবৈজ্ঞানিক বলিয়া নিন্দা করি, আমাদের মনে হয় আমাদের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ফেলে দিয়ে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসকের নিকট গিয়া অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসক হইয়া আসি। ছাই এ সব, ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়।” আমি যে চিকিৎসকের কথা লিখিতেছি তিনি প্রায় অনীতিপর বৃদ্ধ, এয়ুগে ধনস্তরী সদৃশ। আমি তাঁহার ঔষধ এখনও খাইতেছি, সম্পূর্ণ নিরাময় না হইলেও তাঁহারই ঔষধে বাঁচিয়া আছি, রোগের সামান্য মাত্র অবশিষ্ট আছে, একবার তাঁহাকে দেখাইয়া আসিয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছু দিন বাস করিয়া আসিব।

পথ্য তিনি অভিনব প্রকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভাত খাওয়া নিষেধ, ভাত খাইলেই বেদনা বাড়ে, তাই ভাত খাইনা, জল

একবারেই খাইতে নাহি, পাতলা দুধ পরিভোজ্য। কতকদিন জল পরিভোজ্য করিয়াছিলাম, জলের পরিবর্তে ডাবের জল ও ছানার জল খাইতাম, এখনও প্রত্যহ লুচি খাইয়া আছি। ছানা ও ছানার জল নিত্য পথ্য। টক খাইতে নিবেধ নাই, প্রত্যহ দধি, ঘোল খাই। এখনও মল, মূত্র ত্যাগের পরও হাঁটলে, পরিশ্রম করিলে বেদনা অনুভব করি। পেটে কিছু পড়িলেই বেদনা বাড়ে। ভূরি ভোজন করিলেও যাতনার সীমা থাকে না। কবিরাজ মহাশয় ধনুস্তুরি সদৃশ গঙ্গাধর কবিরাজের ছাত্র, তিনি শলা বা অস্ত্র চিকিৎসা উত্তম রকম জানেন, চক্ষু চিকিৎসার তিনি পারদর্শী, চক্ষুর

অস্ত্র চিকিৎসা তিনি যেমন করেন এমন আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। কে বলে আয়ুর্বেদে অস্ত্র চিকিৎসার নাই? তাঁহার অস্ত্র চিকিৎসা প্রণালী ও অন্তান্ত অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসা দেখিলে অবাক হইতে হয়। এইত আমাদের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও চিকিৎসকের অবস্থা।

আয়ুর্বেদকে অবৈজ্ঞানিক বলিতে বিজ্ঞান অভিমানী চিকিৎসকদের লজ্জিত হওয়া উচিত। এই ঘোরতর ননকোঅপারেশনের দিনে আপন পর চিনিয়া লওয়া সকলেরই উচিত। আয়ুর্বেদকে দেশের কুলের মাল্য দিয়া সাজাইয়া তোল।

পরমায়ু-প্রসঙ্গ বা মানুষ মরে কেন ?

[কবিরাজ শ্রীঅক্ষয়কুমার বিজ্ঞাবিনোদ, ধনুস্তুরি]

দারোপগমন-বিধি ।

পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর ।

জগদীশ্বর জগতে জীব-প্রবাহ প্রবহমান রাখিবার প্রয়োজনে জীবোৎপত্তিব এক কৌশল পূর্ণ অতি চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সর্বশ্রেণী জীবেরই জীবাতি ও পুরুষজাতি এই দুই প্রকার বিভাগ তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। সম্ভাব্যোৎপাদনের অতুল্য কতকগুলি ব্যাপার পুরুষ জাতিতে নিহিত এবং গর্ভ ধারণের

উপযোগী কতকগুলি বিষয় জীবাতিতে ন্যস্ত করিয়া উচ্চাদের পরম্পর সংসর্গ দ্বারা বংশ-বর্ধনের যে প্রণালী প্রবর্তিত করিয়াছেন; সেই প্রথা যে অতীব সমীচীন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আবার উক্ত জীপুরুষে যে সময়ে সময়ে রিঙ্গও হইবে, তন্নিমিত্ত উহাদিগের অন্তরে কামশক্তি প্রদান করিয়াছেন। সেই কামশক্তি

প্রণোদিত হইয়াই জী পুরুষে মিথুন ক্রিয়ায় নিরত হয়, এবং তাহারা গর্ভোৎপত্তি ও কামাস্তরে অপত্যলাভ হইয়া থাকে।

বাবতীয় জরায়ুজ এবং দুই একটি বাতীত প্রায় সীমগ্র অণুজ জীবেরই মিথুন সংসর্গে সন্তানোৎপত্তি হয়। পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী সকলকে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কাম ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। যে সময়ে গর্ভোৎপত্তির সম্ভাবনা, কেবল সেই সময়েই একজাতীয় জী কামুকী হইয়া স্বজাতীয় পুরুষের সংঘর্ষ কামনা করে। তৎকালেই পুরুষজাতির জীজাতির সহিত সঙ্গত হয়, অল্প কালে কখনই মিলিত হয় না। জীজাতির গর্ভ গ্রহণের অব্যবসায় সময়ে কিংবা তাহাদের কামনা-হীন অবস্থায় অন্ত্যজ জাতীয়পুরুষ কদাপি স্বীয় নিকটবর্তী হইতেও ইচ্ছা করে না ; যদি দৈবাত্মক করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জীজাতি কর্তৃক আহত ও বিতাড়িত হইয়া থাকে।

ঈশ্বর সৃষ্ট বাবতীয় পদার্থের মধ্যে মনুষ্য সর্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যোত্তর নিখিল প্রাণী নিচরকে তিনি একপ্রকার স্বাভাবিক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহারা বাবজীবন সেই প্রকৃতি সিদ্ধ জ্ঞানেরই বশবর্তী হইয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করে। কদাচ সেই সহজ জ্ঞানের বহির্ভূত কর্তব্য করে না। পরন্তু যদুগ্রাংকে তিনি হিতাহিত বোধাত্মকশক্তি সম্পন্ন পূর্বক স্বাধীন ভাবে সঞ্চরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন ; অথচ তাহারা নামে মাত্র মনুষ্য হইয়া কার্যে পশুবৎ কদাচারী না হয় এ বিষয়েও বিলক্ষণ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। আহাৰ বিচারাাদি দৈনন্দিন করণীয় কার্যে ভাব বর্জন এবং শিবগ্রহণেই মনুষ্যের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মানব

যে কোন কর্মেরই আচরণ করুক না কেন, সর্ববিষয়ে তাহাকে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। সেই নিগড়চ্যুত হইগেই সংসারে নানা বিশৃঙ্খলার সংঘটন হয়। জন্মমৃত্যু মানবের প্রত্যবায়ের পরিণতি। দারোপগমন সম্বন্ধেও সেই জ্ঞানোপেত নিয়মের অভাব নাই। সহস্রাংশী সংসর্গেও তাহাকে শাস্ত্রীয় শাসন সমূহ অবশ্যই শিরোধার্য করিয়া চলিতে হইবে। নতুবা ইহকালে ও পরকালে তন্নিমিত্ত সর্বপ্রকার কষ্ট ভোগ অনিবার্য। নারী-জাতি কুলগন্ধী, সংসার ত্রী ও সমাজের ভূষণ স্বরূপ। অশুচ, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্সর্গের সহায়। পক্ষান্তরে আবার সেই সৌমস্ত্রীনিগণই ঘোরতর অনশ্চর্য, গৃহস্থাপ্রবেশে হতীক কটক। বাবতীয় অনর্থের মূল, বহুবিধ বিপত্তির আধার এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্সর্গের সংহরী। তজ্জন্ত মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

দিন কা মোহিনী রাত কা বাধিনী

পলক পলক লহ চোমে।

হুনিয়া কা আদমী এসা দোর হোকে।

ঘর ঘর বাধিনী পোষে ॥

ইহাব অর্থ এই রমণীগণ দিবা ভাগে মোহিনী বৃত্তিতে বিরাজমান থাকে বটে ; কিন্তু রজনী যোগে তাহারা ব্যাত্ত্রীভ্যে ভ্রম অন্ন করিয়া মানবের পোষিত পোষণ করে।

মহাত্মা ও মহাপাদু তুলসী দাসের এই সঠিক যে মহা সত্য, এবিষয়ে কিঞ্চিদঙ্গ মনেই নাই।

আর একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে :—

কণে তরুণ্য ভরম, কামে কৃতান্তাদ ভরম।

এই পোকের সন্ন্যাস ভাগ উদ্ধৃতকরিলাম না। অভিপ্রেত অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হইল। ইহার অর্থ এই—রূপের ভর বুঝতীর কাছে, আর শরীরের ভর যমের কাছে। অর্থাৎ তুমি বড় বড়ই রূপবান, বলবান ও জ্ঞানবান হও বা কেন, প্রমদা প্রসঙ্গে তোমার মৃত্যুকার পতঙ্গের আকারে পরিণত হইবেই হইবে। পরম সন্ন্যাসী ভগবান শঙ্করা চার্টের এক শিষ্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ‘ভরো হারং কিমন্তররকত’? অর্থাৎ ভজদেব! নরকে বাইবার পথ কি?

শঙ্করাচার্য উত্তর করিলেন—নারী, অর্থাৎ নারী জাতি নিরস্ত্র প্রাপ্তির সুপ্রশস্ত পথ।

শিষ্য পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—সংসোধ্যেব স্ত্রয়োয়া কা? অর্থাৎ মদিরার মত কে মনুষ্যকে জ্ঞান শূন্য করে?

গুরু উত্তর করিলেন—‘স্ত্রী’ অর্থাৎ প্রাণ প্রিয়া নীতাই মানবকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

শিষ্য পুনরপি প্রশ্ন করিলেন—‘কিমন্ত হেয়ম?’ অর্থাৎ এই পৃথিবীতে ত্যজ্য বস্তু কি?

গুরু বলিলেন “কনকককাত্তা”—অর্থাৎ জগতে কামিনী ও কাকন এই দুইটি সর্বাগ্রে পরিত্যজ্য। সজ্জিত একটি সঙ্গীতে আছে—“ছাড় কামিনী কাকনের মারা কর হরিনাম মঙ্গল” ইহার তাৎপার্থ্য এই যে, স্ত্রীপুত্রাদি ও অর্থাদির মারা কাটাইতে না পারিলে ত আর উদ্ধারের কোন উপায়ই নাই।

জিজ্ঞাসু শিষ্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—“প্রভো? এজগতে অতি বুদ্ধিমান বীর প্রকৃতি ও প্রকৃত শাস্ত্র ব্যক্তি কে?

আচার্য্য সম্মিত বদনে উত্তর দিলেন—প্রাপ্তো ন মোহং ললনাকটাকৈ’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনোমোহিনী মহিলার তির্য্যক দৃষ্টিতে কদাপি তির্য্যকত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, সেই বখার্ব্জ জানী; সেই প্রকৃত বীর এবং সেই বাস্তবিক প্রশান্ত চিত্ত।

শিষ্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—‘জাতু ন শকাং হি কিমপ্তি সর্ষে:?’—অর্থাৎ ভুলোকে লোকে কোন জিনিসটি ঠিক জানিতে পারে না?

উপাধ্যায় উত্তর করিলেন—যোষিযনো বজ্জরিতং তদৌরম্। অর্থাৎ অবনী মণ্ডলে অবলা জাতির অন্তঃকরণ অতি ছুজের। জানা বড় কঠিন। তত্ত্বজ্ঞ মনুষ্য সহস্র প্রকারে আয়াস স্বীকার করিয়াও স্ত্রীজাতির মনের কথা কিছুতেই জানিতে পারে না। তাহাদিগের চরিত্র সৰ্ব্বদা নিশ্চিত জ্ঞান দেবতাদিগের ও অসাধ্য। মাহুয়ের ত কথাই নাই। তরিস্মিত একজন কবি বলিয়াছেন—‘পুরুষস্য ভাগ্যং স্ত্রিচরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা:। ইহার অর্থ এই—পুরুষের ভাগ্য এবং স্ত্রীর চরিত্র দেবতারাও জানিতে পারেন না, মাহুস ত কোন্ ছার?

আমরা এ পর্য্যন্ত সুধাতাণ্ড বরূপ অর্থঃ হগাহল সঙ্গুণ যোষা জাতির সৰ্ব্বদা সাহা ব্যক্ত করিলাম, পাঠকবর্গ তাহা অবশ্যই অবগত হইরাছেন। কিন্তু তৃতীয়াশ্রমীদিগের ত তাহাদিগকে পরিত্যাগের কোন উপায় নাই। আরও এক কথাও ত আছে—‘হাম ভো ছোড়তা হৈ’, নেকল কন্বী ভো] ছোড়তা নহি’। অর্থাৎ তুমিই না হয় ছাড়িলে, কিন্তু সে ছাড়িলে কেন? ছাড়া ছাড়ি হইলেই বা সংসারের সত্তা থাকে কৈ? এক্ষণে তবে

কর্তব্য কি ? তৎপক্ষে রূপরামর্শ এই যে, তাহাদিগকে লইয়াও থাক, অথচ আত্মরক্ষণ বিষয়ে একেবারে 'ভেবা গঙ্গারাম' হইয়া থাকিও না। একটু যেন চৈতন্ত থাকে। এতৎ সন্ধানে আমরা নিয়ে অতি সমান্ত গুটিকতক কথা বিবৃত করিব। কারণ স্থানাভাব।

ভাই! মদালসাদিগকে লইয়া মদন মদিরার একেবারে উন্মত্ত হইও না। কারণ যতপি সম্পূর্ণ বিভোর হইয়া আপনাকে অত্যধিক মাত্রায় কন্দর্পের শরে বিদ্ধ কর, তাহা হইলে পরমাণ্বের পথ তুমি নির্ণয় করিতে পারিবে না। ফলে তদ্বারা অত্যধিক পরিমাণে গুরুক্ষয় এবং তন্নিমিত্ত অতি মাত্রায় অস্থক্ কর ও অনিবার্য হঠরা পড়িবে। সুতরাং পুরুষগণ বাহাতে অনঙ্গ রঙ্গে মজিয়া অবশেষে আপনাদিহই অনঙ্গ না হয়, সে বিষয়ে তাহাদিগের বিবেক রাখা আবশ্যিক। আবার এস্থলে এতদর্থ প্রতিপাদক কয়েকটি শাস্ত্রীয় বিধি নির্দেশ করিতেছি।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—ঋতুর চতুর্থাংশে মাত্রিতে ভাষ্যেতে উপগত হইবে, ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মাসে একবার মাত্র চন্দ্রোপগমন বা স্ত্রীর সহিত মিলিত হওয়া উচিত।

একটি প্রচলিত কথা আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি :—

মাসে এক, বৎসরে বার।

এর কমেও যত পার ॥

এই কথাটির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বৎসরে ছাদশ দিনেরও ন্যূন সংখ্যায় কামকর্মে নিরত থাকিলে সর্বতোভাবেই

শ্রেয়ঃ সাধন হয়। কিন্তু বাসোদক নষ্ট শরীরের পক্ষে এও অসম্ভব। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ আরও কিছুকিংশ শিথিলতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহাশ্মা স্মৃতি লিখিয়াছেন :—

গ্রীষ্মকালে পঞ্চদশ দিবস অন্তর

এবং অপরাহ্নের সময়ে রাসবাত্যার বাসরত্নয় মানব প্রমদা গমন করিতে পারে।

মহোদয় চরকাচার্য্য আবার গ্রীষ্মচর্য্যায় লিখিয়াছেন :—

কাননানি চ নীতানি জনামি কুহুমানি চ।

গ্রীষ্মকালে নিবেবতে মৈথুনাদ্ বিরতো নরঃ ॥

ইহার অর্থ এই—মর্ত্যগণ গ্রীষ্মকালে মৈথুনে বিরত থাকিয়া নিকুলকানন, নীতল পানীয় এবং সুগন্ধি কুহুম উপভোগ করিবে।

মহাভূতব চরকের উক্তিহে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিদাঘে নিতম্বিনী সন্তোষ না করা ভাল। কারণ আতপকালে সন্তোষাধিক্য বশতঃ প্রাণ আই চাই করিতে থাকে। তদুপরি নিধুঘন সমিত পরিশ্রমে কলেবর অতি স্নিগ্ধ হইলে প্রাণী সমূহ অধিকতর বিকল হইয়া উঠিবে। তন্নিমিত্ত আয়ুঃকতির সমধিক সম্ভাবনা।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে :—

ঋতুকালভিগামী তাত্ অদায় নিরতঃ

সদা।

পার্শ্ববর্জ্য ব্রহ্মৈকেনাতঃ তদুভো

রতিকামরা ॥

ইহার অর্থ এই—পুরুষ অপত্যাকাজী হইয়া ঋতুর চতুর্থাংশে নিশায় সর্বাধিক গমন করিলে নিজ জায়াতেই নিরত থাকিবে। যদি

সাতিশর রাগ বশতঃ কদাচিৎ ঋতু ভিন্ন কালেও মানবের কাত্য গমনে কাজকা অঙ্গ, তাহা হইলে, দুইটি অষ্টমী, দুইটি চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই বাসব সপ্তক বর্জনপূর্বক দারাত্তিগমন করিবে। উল্লিখিত বিধি বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সন্তোষবিষয়ে বড়ই স্বল্পতা অবলম্বন করিবে, ততই বাস্তব রক্ষা করিতে পারিবে। ইহার ফলে স্বীয় বাস্তব অক্ষুর থাকিবে এবং তাবী বংশধর সুস্থ সবল ও হৃদীর্ঘজীবী হইয়া সংসারে সর্ব সম্পদ সন্তোষ করিতে পারিবে। আশা করি, পাঠকগণ ইহা অবশ্যই পালন করিতে পারিবেন। অতঃপর অতিরিক্ত স্ত্রী প্রসঙ্গের দোষ সকল সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হইতেছে।

স্বধীষ মহাত্মা মুক্ত লিখিয়াছেন :—

আত্মবান্ ব্যক্তি অতিরিক্ত ঘোষিতসংসর্গ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেন। বারণ, উহাতে শূল, কাস, খাস, জ্বর, পাণ্ডু, বন্ধ্যা এবং আক্ষেপাদি নানা ব্যাধির সৃষ্টি হয়। আবার উহা দ্বারা শরীর সাতিশর নীর্ণ হইয়া পড়ে।

পূর্বকালে ব্রহ্মচর্যের প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা ইতিপূর্বেই পরিবর্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্যের অর্থ বীর সংরক্ষণ, অর্থাৎ বেচ্ছার বা অনিচ্ছার আদৌ শক্তিকর না করা। বিশিষ্ট চেষ্টা এবং নিয়ন্তর সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক ইন্দ্রিয় সংরক্ষণের জন্য শাস্ত্রকারগণ যে সমুদয় পৌরুষোপদেশ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ এ স্থলে বিবৃত হইতেছে।

সাক্ষাৎ প্রজাপতিকল্প মহাত্মা যমু লিখিয়াছেন :—

সকল একাকী অধঃশয্যার শয়ন করিবে। কদাপি নিজ ইচ্ছার রেতঃ খলন করিবে

না। যে হেতু বেচ্ছার বীৰ্য্য শাতনে স্বীয় ব্রহ্মচর্যের হানি হয়, এবং ইহার জন্য বখোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিবার পদ্ধতি আছে।

সেচ্ছার রেতঃপাত করার নামান্তর হস্ত-মৈথুন, এবং অনিচ্ছার স্থিতিযোগে রেতঃচ্যুতি হইলে, তাহাকে স্থিতিখলন বা বপ্ণদোষ বলে। হস্ত মৈথুন ভ্রুতি সাংঘাতিক রোগ। উহার দোষ যে কত, এবং উহার পরিণাম যে কিরূপ ভীষণ, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। বাল্যকালে বালকেরা সঙ্গদোষে পড়িতা এই কদভ্যাসে রত হয়, এবং বাবজীবন শরীরকে একেবারে অকর্মণ্য করিয়া ফেলে। এট বীভৎস কদাচর্য সৰ্ব্বক আয় অধিক লেখনী চালনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না; সংক্ষেপে বাহা কথিত হইল। তাহাতেই পাঠকগণ ইহার মারাত্মক প্রণিধান করিয়া সাবধান হইবেন।

এটবার স্থিতিখলন বিষয়ে শাণ্ডে কি প্রকার ব্যবস্থা আছে, উহাই উল্লিখিত হইতেছে।

যমু সংহিতায় লিখিত আছে :—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রহ্মচারীদিগের যদি যুগ্ম অবস্থায় রেতঃখলন হয়, তাহা হইলে, স্নানান্তর ‘পুনর্নাম্ এহু ইন্দ্রিয়ম্’ অর্থাৎ আমার বীৰ্য্য পুনর্বার কামাঙ্গে প্রাপ্ত হউক; এই মন্ত্র জপ করিবে। ইহাই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

মুসলমানদিগের মধ্যে নিয়ম আছে, স্থিতি খলন হইলে, তখনই (রাতিভেদে) স্নান করিয়া বখাশাখা খোদাতালার নাম আওড়াইবে। পূর্বে বাহা ব্যক্ত হইল, তাহাতে পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে,

রক্তঃ সংরক্ষণ ব্যাপারে সম্বন্ধকে বিশেষ মনো-
যোগী হইতে হইবে। তাহাতে বিশেষ ফল
পাইবেন।

পাঠক, দেখুন, পরমাত্মার কতি বা বুদ্ধি
সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, সেট গুলি
শরীর রক্ষার উপায়। এই নিয়মগুলি অবশ্যই

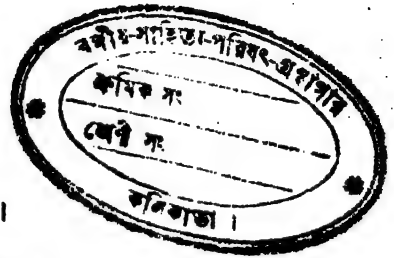
মানিয়া চলিতে হইবে। অজ্ঞতা করিলে
চলিবে না। যত্নপি না মানেন, তাহা হইলে
আপনাকে অকালে কালকবলে কবলিত
হইতে হইবে। তাহাতে আর সংশয়
থাকিবে না।

(ক্রমশঃ)

পিঁপুল।

পিঁপুলী, পিঁপুল, ডিং পীপল।

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন]



পিঁপুলী চারি প্রকার, পিঁপুলী (পিঁপুল),
গজ পিঁপুল, সিংহলী ও বন পিঁপুল। পঞ্জী-
গ্রামে বনপিঁপুল প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহার
মূল ঔষধার্থ কাথে ব্যবহৃত হয়। মূলের
গুণ বিরোধক।

যে পিঁপুল বেনের দোকানে প্রাপ্ত হওয়া
যায়, তাহাই সর্ষদা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া
থাকে।

ক্যাসেস পিঁপুল। গব্য ঘূতে পিঁপুল
ভাজিয়া কিঞ্চিৎ বৈষ্ণব লবণ সহ সেবন
করিলে ক্যাসেস নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পিঁপুল
চূর্ণ; সৈন্ধব লবণ ও কিঞ্চিৎ মিশ্রীর গুড়া
একত্র মধুর সহিত অবলেহ করিলে ক্যাসেস
উপশম হয়।

অক্টেস পিঁপুল। পিঁপুল অরয়; অর
যোগে পিঁপুল চূর্ণ সহপানে ঔষধ প্রয়োগ
করিলে অরের লাঘব হইয়া থাকে, নাগকের
সন্ধিকাসি হইলে গব্য ঘূতের সহিত একটা

পিঁপুল জাল দিবে, ঐ ঘৃত পানে সন্ধিকাসির
উপকার দর্শে। বালকের উদরাময় রোগে
ছাগ ঘূতের সহিত একটা পিঁপুল ও হাওটী
মুখা একত্রে জাল দিয়া ঐ ঘৃত সেবন
করাইবে।

প্রবাহিকারোগে পিঁপুল। পিঁপুল চূর্ণ
ঘোলের সহিত সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগের
উপশম হয়।

ইকুণ্ডের সহিত পিঁপুল চূর্ণ সেবন করিলে
কাস, অজীর্ণ, খাস, জ্বররোগ, কামলা, অজীর্ণ,
অবোচক, পাণ্ডু ও পুরাতন জ্বর বিনষ্ট হয়।
পিঁপুল চূর্ণ ১০ আনা, ইকুণ্ড চারি আনা।

প্রহতির তত্ত্ব বর্জনার্থ পিঁপুল। গোপ-
মরিচ এক আনা, পিঁপুল এক আনা, গব্য
ঘূতের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঐ ঘৃত পান করিলে
তত্ত্ব ঘৃত বর্জিত হইয়া থাকে।

পিঁপুলী প্রীহাষর নাশক, আয়ুর্কোষ শাস্ত্রে
যে 'পিঁপুলী বর্জনান' ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা

আছে তাহা গ্রীষ্ম সংস্কৃত অরে বিশেষ উপকারী ।

রক্তপিত্তে পিঙ্গলী । বাসক পাতার রসের সহিত পিঙ্গল চূর্ণ ৪ রতি ও করেক ফোঁটা মধুসহ সেবন করিলে রক্তপিত্তের উপশম হয় ।

শোথে পিঙ্গলী । সর্কাজ বা একাকগত শোধ রোগে গব্য হৃৎকের সহিত পিঙ্গলী সিদ্ধ করিয়া ঐ হৃৎ পান করিবে ।

অন্নপিত্তে পিঙ্গল । প্রত্যহ মধুসহ পিঙ্গল চূর্ণ দুই কানা সেবনই করিলে অন্নপিত্ত রোগ প্রশমিত হয় ।

পিঙ্গল মূল ১০ পিঙ্গল মূল ইক্ষুগুড়ের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে স্থনিদ্রা হইয়া থাকে ।

পিঙ্গল পত্রের রস বোলতা ও বিছা দংশিত হু'নে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার উপশম হয় । পরিণাম শূন পিঙ্গল—

পিঙ্গলের কাগ ও ককসহ হৃত পাক করিয়া সেবন করিলে পরিণাম শূন নিবৃত্ত হয় । ঐ হৃত পানাস্তে হৃৎ পান করিবে ।

পিঙ্গলী অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক বাত প্রমোহক ।

ক্ষিপ্ত কুকুর দংশনের ঔষধ ।

[শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

১। কাল ধূতীর পাতার রস (অতাবে সালা অথবা কনক ধূতীর পাতার রস) ১ তোলা, গব্য হৃত ১০ চারি আনা, কাশির চিনি ১০ চারি আনা, দধি ২ হুইতোলা একত্রে মিশাইয়া বৈকালে রোগীকে পান করাইতে হইবে । প্রাতঃকালে ভাত পাক করিয়া তাহাতে জল মিশাইয়া রাখিবে এবং ঐ জল দেওয়া ভাত যে পরিমাণে খাইতে পারে তাহাতে দধি মিশাইয়া সন্ধ্যার সময় খাইবে, কিন্তু লবণ মিশাইবে না । ব্যত্রে যে ঘরে রোগী শয়ন করিবে সেই ঘরে লোক থাকার প্রয়োজন ও নেশার রোগী যেন ঘরের বাহির না যাইয়া যায় এবং কোন উপদ্রব না করে, সাবধানে থাকিতে হইবে । কিন্তু ইহাতে

কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই । তৎপর দিন রোগীকে স্নান করাইয়া দধি-ভাত খাইতে দিবে । বৈকালে খাওয়ার সময়ে কোন প্রকার নিয়মের আবশ্যক নাই । জলাতক উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলেও এই ঔষধ তৎক্ষণাৎ খাওয়াইলে রোগী বাঁচিয়া যাইবে এবং সংশয়ের পর এই ঔষধ ব্যবহারে জলাতক হইবে না । ঔষধ একবার খাইবার নিয়ম, কিন্তু ঔষধ খাইয়া বমন হইলে উহা দ্বিতীয়বার সেবন করাটতে হইবে । কুকুর কিম্বা শৃগাল দংশনের ৫।৬ দিন পরে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য ।

২। যে কোন ধূতীর রস ২ তোলা, ইক্ষু গুড় ২ তোলা, খাঁটি কাঁচা হৃৎ ২ তোলা, খাঁটি গব্য হৃত ২ তোলা মোট ৮ তোলা ।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হইবে । এই ঔষধ প্রাতে খালি পেটে সেবন করিতে হয় । সেবনে রোগীর মত্ততা জন্মে এবং তৎক্ষণাৎ সে পাগলের ভাৱ ব্যবহার করে । নিজের পর রোগীর মত্ততা বিদূরিত হয় । ঔষধ সেবনের পর রোগীর অল্প মত্ততা হইলে তাহাকে মানি করাইয়া হুজুর বোল ও বোল দিয়া ভাত খাওয়াইবে । রাত্রিতে রোগীকে ভাল, ভাত, তরকারী, মাছ, দুধ সকলই খাইতে দিবে । কেবল মত্ততা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দিবে না । খুতুরার পাতাগুলি ব্যবহারের পূর্বে খুইয়া শুক কাপড় দিয়া মুছিয়া লইবে এবং রস ছাঁকিয়া লইবে । ফল কথা ঔষধ সেবনের পর খুব মত্ততা জন্মিলেই বিষ নষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে । প্রথম দিন ঔষধ সেবনের পর মত্ততা কম হইলে কয়েক দিন পর আর একবার ঔষধ সেবন করাইবে ।

৩। খেত আকন্দ পাতার রস ১ ঝিড়ুক, কাঁচা খাট দুগ্ধ ৮০ পোয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে খালি পেটে খাইতে হইবে । বিষ থাকিলে বমি হইবে না । যে করদিন বমি না হয়, সে কর দিন প্রাতঃকালে ১ বার করিয়া খাইবে, বমি হইলে বুঝিতে হইবে বিষ নাই, সুতরাং তখন ঔষধ সেবন অনাবশ্যক । এই স্থলে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে শব্দ্য হইতে উঠিয়া জল স্পর্শ না করিয়া উপরি উক্ত গাছের পাতা সংগ্রহ করিতে হইবে, বোগীও সেবনের পূর্বে জল স্পর্শ করিবে না । উপরি উক্ত ১২১৩ নং ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ইহা ফলপ্রসূ ।

৪। খুতুরার মূল ১০ চারি আনা, আকোড়

গাছের মূল ১০ আট আনা বা বাঁশের মূল ১০ আট আনা—দুই পেষণ করিয়া প্রাতে খালি পেটে খাইলে কুকুর বিষ নষ্ট হয় ।

৫। কুকুর কামড়াইবা মাত্র খুতুরার শিকড় ৮০ চারি আনা ২০টা গোলমরিচ দিয়া বাটরা খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয় । প্রাতঃকালে খালি পেটে খাইবে ।

৬। খুতুরার মূল ২ রতি, সাদা পুনর্নবার মূল ১০ চারি আনা বাটরা খাইলে বিষ নষ্ট হয় । প্রাতঃকালে খালি পেটে খাইবে ।

৭। আপাং গাছের মূল সহ অগ্ন্যভাগ ৮০ বার আনা ওজনে লইয়া চিনি সহ বাটরা বড়ি করিবে ঐ বড়ি প্রাতঃকালে জল সহ সেবন করিলে বিষ নষ্ট হয় ।

৮। কুল্লুরকি (কুঁহুর) লতার মূল ২ ভোলা বাটরা আদার রসের সহিত তৎক্ষণে কুকুর দংশন জনিত উন্মাদ আরোগ্য হয় ।

৯। কুচলে ১০ আট আনা, ময়ূরগুচ্ছ ১০ চারি আনা ও তামা বা পিতলের গায়ের যে সবুজ ময়লা জন্মে তাহা ৮০ হই আনা একত্রে ঘুঁটের আঙুনে গুটপাকে পোড়াইবে । পরে পীতল হইলে ঐ চূর্ণ ৬ ছয় রতি স্তত ও মধুর সহিত মাড়িয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয় ।

১০। মোরী—মধুর সহিত বাটরা দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনজনিত ঘায়ের উপকার হয় ।

১১। কুকুর, বিড়াল, শিয়ালাদির দংশনে বা হইলে “কালীকাঁপের” পাতা বেটে দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে বা আরোগ্য হয় ।

১২। আকন্দ আটা, সরিষার তৈল, ইহা শুক সমভাবে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলে বা শুকাইয়া যাব ।

পথ্য। শুষ্ক গব্য দ্বত বা অন্ন পরিমাণ
অন্নের সহিত বেশী পরিমাণ গব্য দ্বত মিশ্রিত
করিয়া খাইলে বিব নষ্ট হয়।

উপরি উক্ত ঔষধগুলির মাত্রা সুবক এবং

বৃদ্ধিগের অল্প। অন্ন বরক রোগদিগের অল্প
অর্দ্ধ কিংবা সিকি মাত্রা ঔষধ গ্রহণ
করিবে।—হিতবাদী।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্বেদ-মেডিকেল কলেজ।

১৭১৯ শ্রীমবাজার ব্রিজরোড, কলিকাতা।

আবেদন।

সনাতন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রীসাধন
করে গত সাত বৎসর হইতে এই বিদ্যালয়ের
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—তাহা সম্ভবতঃ অনেকেই
অবগত আছেন। এক সময়ে শারীর ও শল্য
বিজ্ঞা (এনাটমী ও সার্জারি) এই দেশে বিশেষ
উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এখন সে গৌরব
নষ্ট প্রায়। এই বিলুপ্ত বিজ্ঞার অমূল্য ও
পুনরুদ্ধার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের অন্ততম
উদ্দেশ্য; কিন্তু তাই বলিয়া প্রতীচ্যের শিক্ষা
দীক্ষা আমরা উপেক্ষা করি নাই। আয়ু-
র্বেদকে বিশেষভাবে গুণ ও উজ্জ্বল করিবার
স্বকল্পে প্রতীচ্যের বাহা কিছু উৎকৃষ্ট শিক্ষা—
তাহাও সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা

করিয়াছি। ভগবানের অপর করুণাবলে
আমাদের সে উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধও
হইয়াছে। আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞা-
লয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—এই উত্তর শিক্ষার
মিলন-মন্দির। গত তিন বৎসর যাবৎ বহু-
সংখ্যক ছাত্র আমাদের এই বিদ্যালয়ের শেষ
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ-
পূর্বক বশবী হইয়াছেন। তাঁহারা অত্র-
চিকিৎসার ক্ষেত্রে হঠাৎ গিয়া ভাত্যারের
হাতে বোগীকে সমর্পণ করেন না,
কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের অনন্তসাধারণ প্রতি-
পত্তি আমাদের জাতীয় গৌরবের বিবর
হইয়াছে।

আমাদের এই অনুষ্ঠান ইহার মধ্যেই সকলতার সম্মুখীন হইয়াছে। এবং উজ্জ্বল ইহা সাধারণের অনুকূল দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এই বিদ্যালয়ে বাৎসরিক সাড়ে তিন হাজার টাকা দান করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া এই মহানগরীর উপকণ্ঠে জামবাজারের বিস্তৃত পার্কের সম্মুখে এই বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে এক বিধা এগার কাঠা জমি দান করিয়াছেন। মাটিন কোম্পানি এই গৃহ-নির্মাণের ব্যয় হিসাবে প্রায় তিন লক্ষ টাকার এন্টিমেট দিয়াছেন, ইহা ছাড়া বিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটি উপযুক্ত হাসপাতাল খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সর্ব সাফল্যে ব্যয় অল্প মান ১০ লক্ষ টাকা। আমরা ইহার মধ্যেই ২ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। বাহাতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের উপাধি ও অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তজ্জন্ত ও চেষ্টা চলিতেছে। মোট কথা বৃথা বাগাড়ম্বরে সময় ও উদ্যম নষ্ট না করিয়া এই বিদ্যা-বাটিকা ঘরে ধারে শ্রীশালিনী হইয়া উঠিতেছে—ইহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। আমরা কার্যক্ষেত্রে এতটা অগ্রসর হইয়া সাধারণের নিকট সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়াছি। আমরা অনেকটা সাহায্য পাইয়াছি, এখন সাধারণ আমাদের প্রয়োজনীয় আর আট লক্ষ টাকার ভার গ্রহণ করুন। রাজা মহারাজা ও দেশের অপরাপর বড় লোকের রাজ প্রাসাদের দ্বারে আমরা যেমন উপস্থিত হইতেছি, তেমনই সাধারণ গৃহস্থের কুটিরের পাশেও আমরা মুষ্টিভিকার প্রার্থনা

করিতেছি। আমরা জানি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু লইয়া সমুদ্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ লইয়া বড় বোঝা হয়; ক্ষুদ্রের সমষ্টিতেই বৃহত্তর জন্ম। জাতীয় অনেক অর্থ নানা বৃথা কার্যে জলের মত ব্যয় হইয়া যাইতেছে। এই মহৎকাৰ্য্যে—আয়ুর্বেদের উদ্ধার কল্পে বঙ্গবাসী অগ্রদূত হইয়া ঋষিদের মহাবাক্য বোধনা করুন—ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম অক্ষর করুন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় এবং হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাকালে আমরা উত্তোগী হইয়াছি বটে, কিন্তু স্বরণ রাখিবেন, ইহা সাধারণের সম্পত্তি, সুতরাং ইহা আপনার নিজেরও সম্পত্তি। দেশের সকল বিষয়ের সংস্কারের সাড়া পড়িয়াছে, অধঃপতিত জাতির শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে তাহার জাতীয় চিকিৎসাকে সর্বোচ্চে পুনরুদ্ধার করিবার আবশ্যক হইবে।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা অগাধ সমুদ্র বিশেষ। এই মহা সমুদ্রে যে সকল কৌশলভ্রমণি লুক্কায়িত, তাহা উদ্ধার করিয়া লইতে পারিলে বাঙ্গালী আবার যে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যশ দেশস্ত যো জন্ত উজ্জ্বল তদৌষধং হিতম্।

যে দেশের প্রাণী তাহাদের রোগ নিবারণে সেই দেশজাত ঔষধই উপযোগী—ফলমূলশি আর্ষা ঋষির ইহাই অমূল্য উপদেশ। আমরা এতদিন এ কথা বুঝি নাই বলিয়াই তো আমরা নানারূপ আধিব্যাধি প্রাপ্তি—নিত্য নূতন বোগাধঃস্রবণকে বরণ করিয়া লইয়া ভয়স্বাস্থ্য ও অন্য় হইয়া

উদ্ভিগাছি। এখন এই জাতীয় আগরণের দিনে আমরা বাহাতে নষ্টস্বাস্থ্য কিরিয়া পাইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রকৃত কর্মী হইতে পারি,—আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান কৃতবিশ্ব করিয়া আনুন, তাহারই উপায় বিধান—এই কলেজ ও হাসপাতালের গৃহ নির্মাণে অগ্রসর হই।

এই জীবন বেদ—আয়ুর্বেদকে রক্ষা করিতে পারিলে অক্ষয় শিব প্রতিষ্ঠার ফল হইবে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, অজীর্ণ, বম্বা—এখনকার দিনে বাঙ্গালীর নিত্য সঙ্গী। মৃত্যুর অপলাপ না করিলে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব—সনাতন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পুনঃ প্রচলিত হইলে এ রোগ কমটি ব্যাপকভাবে তিষ্ঠিতে পারিবে না। কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালে মকঃম্বলবাদী ছরারোগ্য রোগী-স্বত্রেই বাহাতে স্থান পাইয়া সুচিকিৎসিত হইতে পারেন তাঁহার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেশকে রক্ষা করিবার জন্ত আনুন, আমরা এই মহদমুঠানে কায়মনপ্রাণ

অর্পণ করি, বাহার যেমন শক্তি এই সংকার্যে নিয়োগ করিয়া শ্রমশ্রমণী হইতে চেষ্টা করি। এক পরমা, হইতে এক লক্ষ টাকা সম্মান আদরে গৃহীত হইবে। আর বেশী কিছু বলিবার নাই। শ্রেয়াংসিঃ বহু বিদ্বানি—সংকার্যে বিদ্ব অনেক; এই জন্ত অতি সত্ব বাহাতে এই পরম কল্যাণকর কার্যটি সুসম্পন্ন হয়, দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার জন্ত ব্যবস্থা করুন—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টীর সভাপতি মাননীয় স্যার আনুতোষ মুখোপাধ্যায় সর্বস্বতী কে, টি, সি, এস, আই এবং কলেজ কাউন্সিলের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সর্বস্বতী এম, এ, এস, এম, এম ইহাও বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। আমরা অতি ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ দান—সকলই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

কবিরাজ—শ্রীধামিনীভূষণ রায়

কবিরাজ, এম, এ, এম, বি।

বৈদ্য-চিকিৎসা ।

চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া চিকিৎসক হইতে ইহিলে চিকিৎসক কাহাকে বলে—সেই কথাটি প্রত্যেক চিকিৎসকের মনে রাখা উচিত।

শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন—

চিকিৎসাং কুরুতে যন্ত স চিকিৎসক উচ্যতে ।

অর্থাৎ যিনি চিকিৎসা করেন, তাঁহাকেই চিকিৎসক বলা যায়।

তা'র পুয়েই-শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

স চ যাদৃক সমীচীন স্তাদৃশোহপি

নিগন্ততে ॥

সেইজন্য দেখা চিকিৎসক সমীচীন—

অর্থাৎ প্রাপ্ত - তাহা বলা যাইতেছে ।

তদ্বাদিত শাস্ত্রার্থো দৃষ্ট কর্মা স্বয়ং

কতী

লবু হস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সদ্যোহপঙ্গর

ভেষজঃ ।

প্রভূতঃ পরমতি ধীমান্ ব্যবসায়ী

প্রিয়দদঃ ।

সত্য ধর্ম্য পরো যশচ বৈদ্যা স্দিদৃক

প্রশস্ততে ॥

অর্থাৎ যিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের তব সকল অধিগত অর্থাৎ আয়ত্ত করিয়াছেন,—দৃষ্টকর্মী অর্থাৎ অন্তর্কৃত চিকিৎসা অনেক দেখিয়াছেন, স্বয়ং কতী অর্থাৎ নিজে চিকিৎসাকুশল হইয়াছেন, যিনি লবু হস্ত, শুচি অর্থাৎ পবিত্রাচার সম্পন্ন, শূরঃ অর্থাৎ বলিষ্ঠ, যিনি নব প্রস্তুত ঔষধ সম্পন্ন, যিনি প্রভূতঃ পরমতি, যিনি ধীমান্, যিনি ব্যবসায়ী, যিনি প্রিয়দদ এবং যিনি সত্য-পরায়ণ ও ধার্মিক তিনিই চিকিৎসক পদ বাচ্য ।

অতএব দেখা যাইতেছে—চিকিৎসক হইতে হইলে শুধু গ্রন্থ-অধ্যয়ন করিলে চলিবে না, উপদেশ শুনিতে চলিবে না, চিকিৎসক হইবার জন্য কতকগুলি গুণ বিশিষ্ট হইলেও চলিবে না, সদ্যোহপঙ্গর ভেষজ হওয়া চাই—ঔষধ প্রস্তুতে সক্ষম হওয়া চাই—ঔষধের দ্রব্য চেনা চাই—আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মন্বন পূর্বক সকল প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত হওয়া চাই—তবেই তিনি চিকিৎসক পদবাচ্য

হইতে পারিবেন—নতুবা শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যিনি বত বড় অধ্যয়ন কুশল বলিয়া পরিগণিত হউন না কেন—যদি ঔষধ প্রস্তুত কার্যে অভিজ্ঞতা না থাকে তাহা হইলে প্রকৃত চিকিৎসক বলিয়া তিনি কখনই চিকিৎসক-সমাজে স্থান লাভ করিতে পারিবেন না ।

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—

বস্ত্বে কেবল শাস্ত্রজ্ঞো ভেষজেদ

বিচক্ষণঃ ।

তং বৈজ্ঞঃ প্রাপ্য রোগীস্তাদ্

বথা নো নাবিকং বিনা ॥

অর্থাৎ যিনি কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু ঔষধ প্রয়োগে বিচক্ষণ নছেন, তিনি চিকিৎসা করিলে কর্ণধার বিহীন তরণীব জায় মঞ্চটে পতিত হইয়া থাকেন ।

আবার শুধু ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানিলেও হইবে না—চিকিৎসা করিতে হইলে—চিকিৎসক হইতে হইলে—শাস্ত্র কুশলও-হওয়া একান্ত আবশ্যক । শাস্ত্রকার এ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন ।

ভেষজং কেবলং কন্তুং যো জানাতি ন

চাময়ম্ ।

বৈজ্ঞ কর্ম সচেদ্ কুর্গাদ বধম্ ইতি

রাজতঃ ॥

অর্থাৎ যিনি কেবল ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানেন, কিন্তু শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন নাই—তিনি যদি চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাণদণ্ডার্থ

অপরাধে অপরাধী হইবেন ;—ইহাই সেকালে রাজার আইন ছিল ।

এখন দেশকাল ক্রটি অন্ততাবে পরিবর্তিত হইরাছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে যে 'রাজকীয় আইন' ও এখন প্রচলিত নাই সত্য এবং তাহারই ফলে ঔষধ প্রস্তুতে অভিজ্ঞ হইরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে এখনকার দিনে সকল চিকিৎসক অবতীর্ণ হন না। হিন্দুর দেশে—হিন্দুর সর্ব প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়—আমাদের সনাতন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অবনতির কারণ ইহাই। ইহারই জ্ঞাত বিলাস কামনা শূন্য টিকিধারী—ফোঁটা কাটা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক সভ্যতায় পূর্ণমুর্তি বিদেশীয় চিকিৎসকদিগের অনেকে পশ্চাতে আসন পাইয়া থাকেন। কি মান-সম্মত—কি অর্থ উপার্জন—অনেক বিষয়েই যে এখন আমরা ডাক্তারদিগের সমকক্ষ হইতে সক্ষম হই না-- ইহার কারণই আমরা যে ভাবে চিকিৎসা বিভাগ শিক্ষা করা উচিত—চিকিৎসার মত জীবন-মরণের দারিদ্র্য পূর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে যে সকল উপাদান ও উপকরণ সকল আরম্ভ করিয়া একরূপ কঠিন ব্যবসারে হস্তক্ষেপ করা উচিত—শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রের প্রত্যেক অধ্যায়—প্রত্যেক ছত্র প্রত্যেক অক্ষরটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধিগত করিয়া, তাহার পর অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসার পদ্ধতি বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া, ঔষধ প্রস্তুত কার্যে সম্পূর্ণ রূপে অভ্যস্ত হইরা চিকিৎসা কার্যে হস্তক্ষেপ করি না। হিন্দু রাজত্বের অবসানে—সুসগমান নরপতিদিগের প্রাণীভাবে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অবনতির সূত্রপাত এমনই করিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল, সেই

আরম্ভের পরিসমাপ্তিও সেই জ্ঞাত ভাষা ধারণ করিয়াছে ।

যাক্—এসময়ে অনেক কথা বলা যায়, এখানে আর সে সকলের আলোচনার আবশ্যক নাই, কেবল এই কথাটা একান্ত মনে রাখিতে হইবে যে, চিকিৎসা ব্যবসার অবলম্বন রূ'রতে হইলে যেমন গ্রন্থ অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন, সেইরূপ ভেষজ কল্লনার শিক্ষাও একান্ত আবশ্যক। আমরা এইবার ভেষজ কল্লনার বিষয় কিছু আলোচনা করিব

ভেষজ লক্ষণে শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

বৈজ্ঞানিক ব্যাধিঃ হ্রবেদ যেন তত্ত্বং প্রোক্ত
মৌষধম্ ।

অর্থাৎ চিকিৎসক যে দ্রব্য দ্বারা ব্যাধি হরণ করেন, তাহার নাম ঔষধ ।

তজ্ যাদৃশমবশ্যং শ্রাদ্ভোগয়ঃ তাদৃশং
ক্ৰবে ।

তাহার মধ্যে যে সকল ঔষধ প্রশস্ত ও রোগের অর্থাৎ রোগ নিবারণে সমর্থ সেই সকল বলা যাইতেছে ।

প্রশস্ত দেশ সজাতং প্রশস্তেহনি চৌকৃতম্ ।

অন্নমাত্রং বহুগুণং গন্ধবর্ণ রসান্বিতম্ ॥

দোষত্রয়ান্নিকরমধিকং ন বিকারি যৎ ।

সমীক্ষ্যকালে দন্তঞ্চ ভেষজং শ্রাদ

গুণাবহম্ ॥

অর্থাৎ প্রশস্ত স্থানে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিবসে উৎকৃত, অন্নমাত্র অর্থাৎ অন্ন পরিমিত, বহু গুণ বিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট গন্ধ, বর্ণ ও রস যুক্ত, দোষত্রয়ান্নিকর বা অধিক বিকৃতভাজনক নহে এবং বাহ্য উপযুক্ত সময়ে প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ ঔষধই বিশেষ ফলোপদায়ক হয় ।

যে ঔষধ .নিজের জানা নাই, সে ঔষধ
কখনও ব্যবহার করিতে নাই, শাস্ত্রকার' সে
সবকে বলিয়া গিয়াছেন—

যথা বিধং যথা শাস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্বিধা ।

তথৈবোষধম বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম মৃতং যথা ॥

অর্থাৎ যেরূপ বিধ, যেরূপ শাস্ত্র, যেরূপ
অগ্নি, যেরূপ অশনি—অজ্ঞাত ঔষধ সেইরূপ
অনিষ্টকর এবং বিজ্ঞাত ঔষধ অমৃত সদৃশ ।

যোগাদপি বিধং তীক্ষ্ণমুত্তমং ভেষজং
ভবেৎ ।

ভেষজং বাপি হৃদ্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে
বিষম্ ॥

যথাবিহিত যোগের দ্বারা তীক্ষ্ণ বিষও
উৎকৃষ্ট ঔষধ হয় এবং হৃদ্যুক্ত ঔষধও তীক্ষ্ণ ;
বিষ সদৃশ হইয়া থাকে ।

এই অজ্ঞাই শাস্ত্রকার মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন
চিকিৎসক পদবাচ্য দিগের নিকট
হইতে ঔষধ গ্রহণ করিতে একেবারে নিষেধ
করিয়া বলিয়াছেন,

বরং দন্তো বরং ব্যাধে বরং ঘাধো-

বিভীষণে ।

সাগরে জীবনোৎসর্গঃ স্তূধোরে বাপি

ধ্বনি ॥

নাথাত শাস্ত্রেনাত্যক্ত কর্ণজ্ঞখিল বৈরিণি ।

ন কার্য্যং হৃদ্যতো পীপে ভিষজ্যাত্ম

সমর্পণম্ ॥

বরং দস্তর-হস্তে, বরং হিংস্র জন্তুতে, বরং
সপ্তর্ষের মুখে ; বরং নক্ষত্রাদি জলচর জন্তু সমাকুল
ভীষণ সমুদ্রে অথবা ঘোরতর মল্লভূমিতে প্রাণ
বিসর্জন করাও কর্তব্য, তথাপি অজ্ঞানবীত শাস্ত্র,
অনভ্যস্ত কর্ণা, সর্জনন বৈরী, হৃদ্যতি ও

পাশায়া চিকিৎসকের হস্তে আশ্রয় সমর্পণ করা
কোনক্রমে বিহিত নহে ।

পাচন চিকিৎসাও ভেষজ কল্পনার
অন্তর্গত । পাচন চিকিৎসা চরকের চিকিৎসা ।
ইহা যেমত অন্নব্যয়সাপেক্ষ্য তেমনি সত্ত্ব বিশেষ
কার্য্যকরী । ভেষজ কল্পনা বলিলে অনন্ত
আয়ুর্কোদ জলধির তাৎপ ঔষধের কথাই বুঝায়,
তাহাতে পাচনও বুঝায়, বাটিকাও বুঝায়, চূর্ণ ও
বুঝায়, অবলেহ ও বুঝায়, আসব ও বুঝায়,
আরিষ্ট ও বুঝায়, প্রাশ ও বুঝায়, মোদকও
বুঝায়, তৈলও বুঝায়, ঘৃত ও বুঝায়, কিন্তু
পাচনের কথা বলিলে সেই ভেষজ সমষ্টির একটা
অঙ্গের কথা বুঝায় । কিন্তু সেই ভেষজ সমষ্টির
সকল অঙ্গগুলির মধ্যে পাচনের ব্যবহারে
যেদ্রুপ ফল পাওয়া যায়, সেইরূপ ফল অনেক
ক্ষেত্রে অনেক ঔষধেও হয় না । মুষ্টিযোগ ও
টোটকা পাচনেরই অন্তর্গত । আমাদের
ভারতবর্ষ স্বর্ণপ্রদর্ভিনী আখ্যা সমবিতা
হইলেও ভারত মাতার সম্ভ্রান সমষ্টির অধি-
কাংশই দরিদ্র । সুতরাং দরিদ্রের রোগ
নিবারণে ব্যয়ের লক্ষ্যও অল্প থাকা কর্তব্য ।
একেতো পাচন-মুষ্টিযোগ ও টোটকার মত
সমৃদ্ধলপ্রদ ঔষধ আর, নাই তার উপর সেই
সমৃদ্ধলপ্রদ পাচন মুষ্টিযোগের ব্যয়ের পরিমাণ
অতি সামান্য,—এমন কি অনেক সময় একটি
পয়সা মাত্রও ব্যয় না করিয়া প্রত্যেক
পল্লীবাসী গৃহস্থ পল্লী রক্ত প্রসুপ্রাপ্তর সকল
হইতে সেই সকল পাচনের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া
অতি দুরারোগ্য ব্যাধির হস্ত হইতে পরিজ্ঞান
পাইতে পাবেন । এক সময়ে দরিদ্র বাঙ্গলা
দেশের অবস্থা ইহাই ছিল । আয়ুর্কোদের
পূর্ণ বিকাশের যুগে দেশের এমন একটা অবস্থা

আসিয়াছিল যে, এখনকার শিশুদিগের প্রীতি
যুক্তের বিবৃদ্ধিজনক বড় বড় চিকিৎসক
ডাক্তার প্রয়োজন হইত না, বোল টাকা
বড়িশ টাকা ভিজিট দিয়া ডাক্তার ডাকিয়া
দিনের মধ্যে পাঁচবার মিক্‌চার ও তিনবার
লোসন প্রয়োগের ব্যবহারও প্রয়োজন
হইত না ।

কালমেঘের রস, আলুইয়ের বটে—এইরূপ
বা হয় একটা কিছু সেবন করানর ব্যবস্থা
তখনকার দ্বীন্দ্রোক্তেরা পর্য্যন্ত অবগত
থাকিতেন । প্রীহার চোনা খাওয়ান চোনার
স্বেদ দেওয়া—এসকল যে ব্যবস্থা ছিল—
এখনকার বড় বড় ঔষধ তাহার কাছে
হারি মানিয়া থাকে ।

ফল কথা—সমস্ত ঔষধের মধ্যে পাচন
মুষ্টিযোগ ও টোটিকা ঔষধ যেরূপ ফলপ্রসূ
অন্ত কোন ঔষধই সেরূপ ফলদায়ক নহে ।

সর্বোষধে পাচন মৃষিতিঃ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ।

যতো কাষি প্রণীড়িতং স্বস্থং করোতি

সত্ত্বম্ ॥

অর্থাৎ সকল প্রকার ঔষধের মধ্যে ঋষি-
গণ পাচনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন । কারণ
ব্যাধি প্রণীড়িতগণ পাচন সেবন করিলে
যেমন সত্ত্ব স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে, অজ্ঞাত
ঔষধে তত শীঘ্র ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।
এই জন্তই পাচনের ব্যবহার জানা একান্ত
কর্তব্য । কিন্তু এই পাচন চিকিৎসা অধুনা
দেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইতেছে ।

অন্ত চিকিৎসান্নোতি ।

(ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার)

∴∴∴

দেশের সম্রাট প্রণোদিত চিকিৎসা প্রণালী
বলিয়া দেশীয় জন সাধারণ প্রগাঢ় রাজ ভক্তি
প্রভাবে অবিচার্য্য ভাবে এক বাক্যে এলো-
প্যাথিক চিকিৎসার পক্ষপাতী । সে চিকিৎসার
কুফল সহস্র বার উপভোগ করিলেও কেহই
যে কোন রোগ হইবামাত্র সর্বপ্রথমে সাগ্রহে
এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে
বাধ্য হইয়া থাকে । কিন্তু অনেক বুদ্ধিমান
ব্যক্তি যে ইহার উপর আন্তরিক বীতশ্রদ্ধ,
তাহারও অনেক সন্ধান পাওয়া যায় ; তথাপি
তাঁহারা এলোপ্যাথিরই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকেন
এবং রোগ হইলেই নিজের ইচ্ছায় বা আত্মীয়
স্বজনগণের উত্তেজনায় সর্ব প্রথমে এলো-
প্যাথিক ডাক্তার ডাকিতেও বাধ্য হন, এসব

কথা সর্বজন বিদিত । এটা যে কি মোহ
তাহা বুঝিতে পারি না ।

এইরূপে অধিকাংশ ব্যক্তি চিকিৎসা
সেই প্রণালীতে করাইয়া বিফল মনোরথ
হইলে পর আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথিক
উভয়ের যে কোন একটি চিকিৎসার আশ্রয়
লইয়া তবে রোগ মুক্ত হইয়া থাকেন । এই
তো অবস্থা, কিন্তু অন্তর্চিকিৎসা বিষয়ে
সকলেই এলোপ্যাথির জয় ঘোষণা করিতে
বাধ্য হইয়াছেন ।

গুণ কর্মাদির আদিক্য দ্বারাই সকল
বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় । অন্তর্চিকিৎসা
বিষয়টীর কি কি গুণ কর্মের লক্ষণ দ্বারা
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা যাইবে ? রোগ শব্দে

দুঃখজনক কারণকে বুঝায়। দুঃখ জনকঃ ব্যাধিৎক হুস্তরাং আরোগ্য শব্দে তদ্বিপরীত অর্থাৎ সুখ বুঝাটাবে। তাহা হইলেই যে চিকিৎসায় রোগ সকল রোগীর সর্ববিষয়ক সুখকর ভাবে (যাপ্য না হইয়া) প্রকৃত আরোগ্য সাধিত হয় তাহাকেই সর্ব শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে হইবে। কথাটা ভাল করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, সুখ সেবা সৃষ্টি ঔষধ দ্বারা অতীব সংক্ষিপ্ত ভাবে বিনা আড়ম্বড়ে ঠিক যেন মন্ত্রশক্তির দ্বারা ক্রান্ত গতিতে স্থায়ী আরোগ্যকারী চিকিৎসা-প্রণালী সেই চিকিৎসাকেই শ্রেষ্ঠতম আসন প্রদান করা উচিত।

অত্র চিকিৎসা ব্যাপারটির বিশদ আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, “অত্র করাই একান্ত প্রয়োজন”—এই কথাটা শ্রবণ মাত্রেই রোগীর আত্মা উড়িয়া যায়। তারপর সেই বিষয় ক্রিয়ায় সময় নিক্রপিত হইলে সেই অস্ত্রধারী প্রভু কখন যে তাহার বাতন যন্ত্র হস্তে লইয়া ভীষণ মুষ্টিতে সমাগত হইবেন, কখন বা আমাদের সেই প্রাণাত্মকর অস্ত্র বাতন! সহ্য করিতে বাধ্য করিবেন এইরূপ নানা বিভীষিকায় রোগীর মন প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। অনন্তর যেই অস্ত্রধারী মহাপুরুষ বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন—এই সংবাদ রোগীর কর্ণগোচর হইবামাত্র হৃৎকম্পের সূচনা হইতে লাগিল। এ অবস্থায় কাহারও কাহারও মুচ্ছা পর্যন্ত হইতে দেখিয়াছি। অস্ত্রের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সম্পন্ন হইলে তদ্ব্যবস্থায় রোগীর পক্ষায়া যে বিপুল হইয়া উঠে—পাত্রে রক্ত পর্যন্ত শুষ্ক হয়—মুখের বিলুপ্ততাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তৎপর অস্ত্রধারীর গৃহ প্রবেশ এবং রোগীকে ঘর পাকর করিয়া অস্ত্র ক্রিয়ায় স্থানে আনয়ন করা হয়, তখনকার অন্তর্ঘাতনা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। অনন্তর যখন সেই বীর পুরুষ অস্ত্র ধারণ করিয়া সমীপবর্তী হন তখন রোগীর আত্মার সন্ধানই নাই।

পরিশেষে যখন ক্রিয়া আদৃত হয় তখন ঠাঁত মুখ সিটকাইয়া তীব্র চিংকার ও উচ্চক্রন্দন সহ গ্রাহি মধুহৃদন রব আরম্ভ হয়। তাই কি অব্যাহতি আছে? তৎপর আবার ড্রেসিং ক্রিয়া! এই ভীষণক্রিয়া ক্ষত আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত সমানভাবে ছটবেলা কাটা ঘায়ে মূনের ছিটে” গোছের ব্যাপার সহ্য করিয়া দিন কাটাইতে হইবে। তা’ ছাড়া বাহ্য প্রযুক্ত ঔষধের অসহ্য যন্ত্রণা তো আছেই। শোগীকে এতদূর দুঃসহ কষ্ট প্রদানই কি চিকিৎসার মুসল্লত ও সমীচীন উপায়? ইহা ভিন্ন কি আর কোন সুখকর উপায়েই অগতে নাই? এই ত গেল অস্ত্র ক্রিয়া ব্যাপার! তারপর অস্ত্র ক্রিয়াতেও চিকিৎসা সমাধা হইবে না। ক্ষত চিকিৎসা করিয়া প্রকৃত নিবাস্য সাধন করা চাই। কিন্তু এ্যালোপ্যাথিক প্রণালীর ভেতর চিকিৎসা (medical Treatment) যে কতদূর আরোগ্যকর তাহার আভাসতো পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। অস্ত্রাত্মক ক্ষেত্রে যদি সে ঔষধ প্রকৃত নিবাস্যকারী না হয় তাহা হইলে অস্ত্র চিকিৎসা স্থলেই বা তদ্বিপরীত কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?

অধিকাংশ ক্ষত চিকিৎসার পরিণামে উহা সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য না হইয়া যাপ্য হওয়াব প্রমাণ পাওয়া যায়। যেহেতু কোন স্থানের ক্ষত এ্যালোপ্যাথিক ঔষধে শুষ্ক হইলে সে স্থানের অস্ত্র অস্ত্র বেদনা এবং ক্ষীতি বহুদিন স্থায়ী হওয়া প্রায় স্বাভাবিক।

ফল কথা যে চিকিৎসার আদাত্ত দুঃখজনক অশান্তিকর এবং অনেক সময় জীবননাশক সে চিকিৎসা কখনই সুখজনক নহে।

যে দেশে কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিকই দুইটা বিজ্ঞানযুক্ত চিকিৎসা বস্তুমান, আমি ডাক্তার হইয়াও বলিতেছি, আমাদের দেশবাসীর সেই দুইটি চিকিৎসারই শরণ গ্রহণ আমাদের পক্ষে একান্তই মঙ্গলজনক। দেশীয়া কবিরাজদিগের গাছ গাছড়া দ্বারা আশ্রয়ী অস্ত্র চিকিৎসার কার্য্য সহজে সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পরিদর্শন। সংপ্রতি গবর্ণমেন্ট নিগোজিত আয়ুর্বেদ কমিটি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ কমিটির 'অন্ততম সদস্য মেজর গেল সাহেব ঐ দিন সকলের সহিত আসিতে না পারায়—তিনি তাহার পর আর একদিন একাকী আসিয়াছিলেন। কমিটির বকল সদস্যই এই বিদ্যালয় ও হাসপাতালের সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া প্রীতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের আশা আছে, এই কমিটি হইতে এই বিদ্যালয় মহামান্য গবর্ণমেন্ট বাহাদুরের সহায়ত্ব লাভে সমর্থ হইবে।

বৈদ্য বাক্য সমিতি। গত ২৬শে চৈত্র রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় কলুটোপার সেন মহাশয়দিগের ভবনে এই সমিতির অষ্টম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন মহাসমারোহে হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সর্বস্বতী এম-এ, এল, এম, এস মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ অতি স্বদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভায় কয়েকজন বক্তাও বক্তৃতা করিয়া সকলকে পুলকিত করিয়াছিলেন। বৈদ্যজ্ঞানির সংক্রামক রোগ পণ প্রথা নিবারণের জন্য কিন্তু সেদিন কোন কথা উত্থাপিত হয় নাই—বৈদ্য বাক্য সমিতি এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা মনোযোগী হউন—ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

মধ্য ভাবতে আয়ুর্বেদ। মধ্য ভারত না

দি, লি, গবর্ণমেন্ট এক সাকুলার জারি করিয়াছেন যে, ২ জন প্রাইমারেট আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য প্রবিষ্ট হইলে প্রত্যেককে মাসিক একশত টাকা করিয়া দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি প্রদান করিবেন। অতি সুসংবাদ, সন্দেহ নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসায় শিক্ষিত তিনজন কবিরাজ ও তাঁহারী এই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ-গণের নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। ঐ চিকিৎসক তিনজন সেন্ট্রাল প্রভিন্সের তিনটি স্থানের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভায় প্রাণ্ড চিকিৎসক হইবেন। মধ্যভারতের দুটো স্কল প্রদেশের কর্তৃপক্ষগণেরই অনুকরণ করা কর্তব্য।

অবকাশ। অতিরিক্ত গরম পড়ার জন্য এবার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ একটু আগেই প্রদান করা হইল। ২৫শে চৈত্র হইতে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এই উপলক্ষে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে। এবার এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার দিন স্থির হইয়াছে আগামী এই আষাঢ়।

কলিকাতার স্বাস্থ্য। কলিকাতার স্বাস্থ্য মোটের উপর এ সময় ভালই দেখা যাইতেছে কিন্তু বড়বাজার অঞ্চলে প্লেগের আক্রমণ দেখা দিয়াছে। হাম বসন্তও সর্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কলিকাতা শ্রীযুক্ত কুমার দাশ গুপ্ত কাব্যার্থ কর্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত

ও ১৭১২নং গ্রামবাজার ব্রিজ, রোড হইতে মুদ্রাকর কর্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্বেদ

৭ম বর্ষ

বৈশাখ ১৩৩০ সাল।

৮ম সংখ্যা।

চরক ও সুশ্রুত।

(কবিরাজ শ্রী ইন্দুভূষণ মেনগুপ্ত এইচ, এম, বি)

—:—

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা যে সকল প্রকার চিকিৎসার মূল, ইহা বড় বড় সাহেব ডাক্তারেরাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং সে কথা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন নাই। সত্য ও ত্রুতর সন্ধিক্ষণে প্রাণী সকল যখন রোগ পীড়িত হইতে লাগিল, মহর্ষি ভরদ্বাজ সেই সময় অমরনাথ ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসিলেন। ত্রিকালদর্শী অজ্ঞাত ঋষিগণও, ঐকুতিপুঞ্জের দীর্ঘায়ু কামনার ভরদ্বাজের নিকট হইতে উহার শিক্ষা আয়ত্ত করিলেন। “চরক সংহিতা” এই সময় রচিত হইয়াছিল। একান্ত “চরক”—ঋষিযুগের আয়ুর্বেদের আদি গ্রন্থ। আর-বীরেরা এই চরকের অনুবাদ করিয়া নাম-করণ করিয়াছিলেন—সরক। ”

সুশ্রুত সংহিতা চরকের অনেক পরে বিরচিত। মহর্ষি ভরদ্বাজ যেমন ইন্দ্রের

নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন, ধনুস্তরিরও সেইরূপ উপদেষ্টা বা গুরু—দেব রাজ ইন্দ্র। ধনুস্তরিই এট বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়া দেবগণের জরাব্যাধি ও মৃত্যু নিবারণ করিয়াছিলেন এবং শল্য তন্ত্রাদি অষ্টাদ্ধ সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জ্ঞান পৃথীতলে অবতীর্ণ হইয়া মানব রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত এবং অজ্ঞাত আর্ষাঋষি এই বিজ্ঞা দিবোদাস বা ধনুস্তরির নিকট উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। মহর্ষি সুশ্রুত প্রণীত “সুশ্রুত সংহিতা” তন্ত্রাধ্য অজ্ঞতম। বর্তমান সময়ে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক দিগের শল্যবিজ্ঞা শিক্ষা করিবার ইহাই প্রধান গ্রন্থ। এই মহাগ্রন্থও আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অধুনা শল্যবিজ্ঞান চরমোন্নতি সাধন করিয়া অসংখ্য ব্যক্তিবৃন্দকে

চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছে—তাহার মূল ভিত্তি হইল এই সূত্রতসংহিতা। কিঞ্চিদধিক আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এই মহাগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

চরক ও সূত্রত—দুইখানি মহাগ্রন্থই আয়ুর্বেদ জলধির অত্যাঙ্কল রত্ন। যিনি এই দুই খানি গ্রন্থ ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাকে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বলিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না। অধুনা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগের ভাগ্যবিশেষ্যে ঐ দুইখানি মহাগ্রন্থের পদ্যাকুসুরণ করিয়া চিকিৎসা করা দেশ হইতে একরূপ লোক পাইয়াছে, কিন্তু এমন একদিন ছিল—যেদিন এই দুইখানি মহাগ্রন্থের অমৃতাস্বাদ পাইবার জন্ত সমগ্র বিশ্ব উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আরব দেশের অধিবাসী বৃন্দ তাহাদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান।

চরক ও সূত্রত উভয় সংহিতা পাঠেই অবগত হওয়া যায়,—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার পরস্পর সংযোগকে আয়ু বলে। এই আয়ুর হিতাহিত, ব্যাধির নিদান ও প্রশমনের উপায় যে শাস্ত্রে বর্ণিত, তাহারই নাম আয়ুর্বেদ। এই আয়ুর হিতাহিত—কথাটির বিশ্লেষণ করিবার জন্ত চরক এবং সূত্রত উভয় সংহিতাকারকেই আগম, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং উপমানের বহুল প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। উভয় সংহিতাকার স্ব স্ব সংহিতায় পুরুষ কি,—ব্যাধি কি,—স্বাভাবিক কি,—অঙ্গম কি,—আয়ের পদার্থ, সৌম্য পদার্থ, ঔষধি বিবরণ, ব্যাধি সঙ্করাদির হেতু অনেক কথারই বিশদভাবে মীমাংসা করিয়া দিয়া তাহার পর চিকিৎসার সূত্রের প্রাঞ্জল

ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এক কথায় চরক ও সূত্রত কেবল চিকিৎসার গ্রন্থ নহে, বিশ্ববাসীর সার্বজনীন শিক্ষা এই দুই খানি মহাগ্রন্থে নিহিত। আমাদের মনে হয়, কাহারও চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্য না থাকিলেও আয়ুর্বেদের অত্যাঙ্কল রত্ন এই দুইখানি মহা গ্রন্থ ভাল করিয়া পড়িয়া রাখিলে, তাহাকে আর সংসার ধর্ম পরিচালনার কোনোরূপ কষ্ট পাইতে হয় না।

বায়ু, পিত্ত ও কফ আয়ুর্বেদের মূলভিত্তি। দেহোৎপত্তির কারণও এই তিনটি। আয়ুর্বেদ বলেন,—

“বাত পিত্ত শ্লেষ্মণি এব দেহ সম্ভব হেতবঃ। তৈরৈবাব্যাপন্নৈরধোমধ্যোর্ধ্ব সন্নিবেষ্টৈঃশরীরমিব ধার্যতেহগারমিব স্থণা-
তিষ্ঠি স্তভিরতশ্চ ত্রিস্থগম্যাহরকে। ত এবচ ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতবস্তদেভিরেব শোণিত চতুর্থে: সম্ভব স্থিতি প্রলয়েষণ্য বিরহিতঃ শরীরঃ তথা। ভবতি চাত্র। নর্কে দেহঃকফাদন্তি ন পিত্তম চ মারুতাং। শোণিতা দপি বা নিত্যং দেহ এতৈস্ত ধার্যতে। সূত্রত সূত্র স্থান একবিংশতিতমোঃধ্যায়।

অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি দেহোৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিবে। অব্যাপন্ন(অবিকৃত) বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটি দেহের অধঃ মধ্য ও উর্দ্ধদেশে অবস্থিত হইয়া তিনটি স্থান অর্থাৎ শুভ্র দ্বারা সংহিত গৃহের স্তায় শরীরকে ধারণ করিয়া রাখে। এই নিমিত্ত কেহ কেহ এই দেহকে ত্রিস্থ গম্য আগার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই বায়ু, পিত্ত কফ ব্যাপন্ন অর্থাৎ বিকৃত হইলে দেহ প্রলয়ের অর্থাৎ নিমাণের হেতু হইয়া থাকে। পরন্তু

এই দোষত্রয় অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফ এবং শোণিত এই চারিটি পদার্থ উৎপত্তি, স্থিতি প্রলয়কালেও অবিরহিত ভাবে দেহ মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে জানিবে। সুতরাং বাত, পিত্ত, কফ ও রক্ত—এই দ্রব্য চতুষ্টয় ব্যতীত কিছুতেই শরীর রক্ষিত হইতে পারেনা বলিয়া উহারা নিম্নত এই দেহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

এই বায়ু, পিত্ত ও কফ ক্রুরূপে শরীরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য আমি বলিয়াছেন,—

“বিসর্গাদান বিক্ষেপৈঃ সোম সৃষ্ঠ্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদেহং কফ পিত্তানিলা শুভা ॥”

অর্থাৎ যেমন চন্দ্র স্বীয় নীত কিরণ অর্থাৎ নীতলতা প্রদান করিয়াও সূর্য আপনার উষ্ণতা দ্বারা চন্দ্রের নীতলতা আকর্ষণ (গ্রহণ) পূর্বক উষ্ণতা প্রদান করিয়া এবং বায়ু ঐ উভয়ের সঞ্চালন দ্বারা জগতকে ধারণ করিয়া রাখে, সেইরূপ কফ—শৈথল্য দ্বারা শরীরকে আর্দ্র করে ও পিত্ত—উষ্ণতা দ্বারা শুষ্ক করে এবং বায়ু স্বীয় গতি প্রবাহ দ্বারা উক্ত শীতোষ্ণাদি সঞ্চালন পূর্বক দেহকে রক্ষা করিতেছে।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার মূল হস্ত্র এই বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রত্যেকটি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। বায়ুই শ্রেণী বিভাগে ইহাদিগের নামকরণ হইয়াছে প্রাণ, অপান সমান, উদান ও বান। পিত্তের নাম করণে উহাদিগের সংজ্ঞা ইহা আছে পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক এবং কফের সংজ্ঞা নির্ণয়ে উহাদিগকে বলা হইয়াছে ক্লেদক, অবলম্বক, বোধক, তর্পক ও

স্নেহক। বায়ুর এক কথায় পরিচয় উহা গমনাদি শরীর চেষ্টা সমূহের প্রবর্তক। শরীরের উচ্চাভ্যাস স্থান সমূহের নিয়ন্তা, মনের প্রণেতা, স্নেহোদ্ভির উত্তোষকারক স্নেহোদ্ভির অভিবাহক, সর্গ শরীরস্থ ষাটু দিগের বাহক, শরীরের সন্ধান কারক, বাক্যের প্রবর্তক, কণের শব্দ বোধ ও স্পর্শোদ্ভির স্পর্শবোধের মূল, হর্ষ ও উৎসাহের যোনি, অশ্রুদ্রবির দোষ নাশক, মল সমূহের নিকাশক, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় বিধ মাণের ভেদকারী, গর্ভাকৃতির কর্তা এবং আয়ু আধারীভূত। বায়ু শরীরে কুপিত হইলে শরীরকে নানাবিধ রোগ দ্বারা ক্রোশিত করে। এই বায়ুই উৎপত্তির কারণ, আবার ও ভ্রতগণের সৃষ্টি সংহার কারক।

পিত্তের পরিচয়ে আমরা জানিতে পারি, প্রাণীদিগের দেহ মধ্যে যে অগ্নি বিদ্যমান, পিত্ত তাহারই নামাস্বর। এই পিত্তই জীব দেহে দাহন ও পাচন প্রভৃতির কার্য্য নির্বাহ করিতেছে। এই পিত্ত ক্ষীণ হইলে অগ্নি গুণবিশিষ্ট তীক্ষ্ণ ও উষ্ণাদিতে পিত্তের সমান গুণাবিত দ্রব্য দ্বারা উহা বর্দ্ধিত হয়, পিত্ত অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে শীতল ক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত হয়।

কফ—পিত্তের বিকল্প গুণ বিশিষ্ট। পিত্তের গতি জীব দেহে উর্দ্ধদিকে ধাবমান হইয়া থাকে, এই জন্তই কফের আশ্রয়—আমাশয়—পিত্তাশয়ের উপরি সংস্থিত। যেরূপ দিক দর্শনে সূর্য্যের উপরি চন্দ্র অবস্থিত থাকায় সূর্য্যের উষ্ণ কিরণের আধার স্বরূপ, সেই প্রকার আমাশয় পিত্তের তেজঃ ক্রিয়ার আধারস্থল হেতু ভোজ্য, ভক্ষ্য, লেহ ও পের

এই চতুর্বিধ আহারেরও আধার বলিয়া জানিবে । এই চতুর্বিধ আহার দ্রব্য উৎকৃষ্ট ওণ, অর্থাৎ দ্রব্য যেহাদি দ্রব্য ওণ যুক্ত, আমাশয়িক রস দ্বারা রূপে ভাবাগর ও শিথিল সংযোগ হইয়া সুখে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে জানিবে ।

উপরে অতি সংক্ষেপে বায়ু, পিত্ত ও কফের পরিচয় প্রদত্ত হইল মাত্র, নহুবা এই তিনটির বিশদ পরিচয় দিতে হইলে প্রবন্ধ অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে । আয়ুর্বেদীর চিকিৎসা এই বায়ু, পিত্ত ও কফ উপরই সংস্থিত । এই বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইলেই প্রাণীদিগকে রোগগ্রস্ত হইতে হইবে— ইহাই আর্থাধ্বির অমূল্য উপদেশ । সুতরাং সুশ্রুত, এই বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষের সকল, প্রকোপ ও প্রশমনের বিষয় বুঝাইবার জন্য দোষ ও সক্রিয়াদি ভেদে ঋতুবিভাগ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ী কেন, সকল গৃহস্থেরই পাঠ করা উচিত । পৃথিবীর কোনো চিকিৎসা শাস্ত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি সকল একতরপভাবে সুবিত্তত আছে কিনা জানিনা । ঐ উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিতে পারিলেই স্বাস্থ্যরক্ষা করা হয় ।

ঋতু উপদেশের কোন কথাটা স্বাস্থ্য রক্ষায় বিহিত বলিব না ? চরক ও সুশ্রুতের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক ছত্রই স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রদানেব জন্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । বায়ু প্রকোপের কারণে সুশ্রুত বলিয়াছেন,—বলবান ব্যক্তি দিগের সহিত অতিরিক্ত ভাবে কুস্তি করিলে, অত্যন্ত দ্রো সংসর্গ করিলে, অধিক অধারন

করিলে, উচ্চস্থান হইতে পড়িত হইলে, অতি দ্রুত দৌড়াইলে, অতিশয় শরীর মর্দন করিলে, লম্বাডা দি, আঘাত প্রাপ্ত হইলে, বেগের সহিত গর্তাদি অতিক্রম করিলে, লাফাইয়া লাফাইয়া চলিলে, অতিরিক্ত সন্তরণ প্রদান করিলে, রাত্রি আগরণ করিলে, ভারবহন করিলে, হস্তী, অশ্ব, গাড়ী ও পদযাত্রা অধিক সময় করিলে, কটু, তিক্ত, কষায়, রূক্ষ, শীতল, শুষ্ক শাক, শুষ্ক মাংস, বস্ত্র কোমোধ্যস্ত প্রভৃতি ভোজন করিলে, অন্ন ভোজন বা উপবাস করিলে, বহু ভোজন বা অকালে ভোজন করিলে, অজীর্ণাবস্থায় ভোজন করিলে, অথোবায়, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, বমি, হাঁচি, উদগার ও ক্রন্দন এই সকলের বেগ ধারণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে ।

পিত্ত প্রকোপের কারণে ঋষি বলিয়াছেন,—ক্রোধ, শোক, ভয়, পরিশ্রম, উপবাস, বিনষ্ট (ভুক্ত দ্রব্য অল্পপাক হেতু কষ্টে জীর্ণ হওয়া) মৈথুন, উপগমন, কটু, অন্ন, লবণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী, তিল তৈল, তিল বাটা, ছাগমাংস, মেঘ মাংস, দধি, তক্র, সূরা সেবন ও আতপ সেবনে পিত্ত প্রকুপিত হয় ।

শ্লেষ্মা প্রকোপের কারণ-নির্ণয়ে ঋষির মৌমাংসা—দিবা নিদ্রা, আঁদো পরিশ্রম না করা, অলসতা, মধুর, অন্ন, লবণ, শীতল, নিম্ন, পিচ্ছিল, রূক্ষজনক, গোধূম, তিল, পিষ্ট বিকৃতি (চাউলের পিঠা), দধি, দুগ্ধ, পায়স, ইকু বিকার (শুড় প্রভৃতি) মহিষ, ববাহাদি মাংস, কচ্ছপ মাংস, কেতুর, পানিকল, তাল, নারিকেলাদি, লাউ, কুমড়া এই সকল দ্রব্য নিত্য সমানভাবে ভোজন এবং অজীর্ণ সবে ভোজনে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় ।

পূর্বেই বলিয়াছি বাহাতে আয়ুর কৃথা বর্ণিত থাকে তাহারই নাম আয়ুর্বেদ । এই আয়ুর হিতাহিত বুঝাইবার জন্যই মহর্ষি চরক ও সুশ্রুতের এত কথা বলিবার আবশ্যক হইয়াছে । সেই জন্যই বলিতেছিলাম চরক ও সুশ্রুত শুধু চিকিৎসা গ্রন্থ নহে, গৃহ পত্রিকার ভায় সকল সংস্কারই ইহা রক্ষিত হওয়া উচিত ।

শরীরের মূল কি—ইহা বুঝাইবার জন্য সুশ্রুত বলিয়াছেন, 'যেমন বৃক্ষাদির উৎপত্তি, জীবন ও বনান্যের পক্ষে মূলই প্রধান, সেই রূপ প্রাণীগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের পক্ষে বাত, পিত্ত ও ক্লেমা ত্রিদোষ, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতু এবং পুরীষাদি মল—শরীরের মূল জানিবে । বায়ু, পিত্ত, কফের দ্বারা দেহীদিগের কি কার্য সাধিত হইতেছে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে । রস ধাতুর দ্বারা শরীরের শ্রীণন অর্থাৎ স্নিগ্ধতা প্রভৃতি কার্য ও রক্তের পোষণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে । রক্তের দ্বারা বর্ণের প্রসন্নতা, মাংসের পোষণ ও জীবন ক্রিয়া নিম্ন হইতেছে । মাংসের দ্বারা শরীরের পোষণ ও মেদের পুষ্টি সাধিত হইতেছে । মেদের দ্বারা মেহ ও স্বেদের পোষণ ও অস্থির দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতেছে । অস্থির দ্বারা মেহ ধারণ ও মজ্জার পোষণ ক্রিয়া নিম্ন হইতেছে । মজ্জার দ্বারা শ্রীতি, মেহ, বল ও শুক্রের পোষণ এবং পূর্ণতা নির্বাহিত হইতেছে । শুক্রের দ্বারা সৈব্য, স্বপ্ন, শ্রীতি, মেহের বল, হর্ষ ও বীজার্ধ অর্থাৎ গর্ভের প্রয়োজন নির্বাহ হইতেছে । পুরীষের দ্বারা—শরীর ধারণ এবং বায়ু

ও অগ্নি ধারণক্রিয়া নিম্ন হইতেছে । সুত্রের দ্বারা বস্তুর পূরণ ও আহারাদির ক্লেদ নিঃসরণ কার্য সম্পন্ন হইতেছে । চরকের চিকিৎসা স্থানের রসায়ন অধ্যায় ইহারই ভিত্তির উপর লিখিত । চরক বলিয়াছেন,—

“লাভো পায়োহি শস্তানাং রসাদীনাম্

বসায়নম্ ।

অর্থাৎ রসাদি ধাতু সমূহ লাভ করিবার উপায় স্বরূপ বলিয়াই ইহার নাম রসায়ন । রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে—

দীর্ঘায়ু স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং

বয়ঃ ।

প্রভাবণ যসৌর্ধাঃ দেহেন্দ্রিয় বলং

পরম ।”

অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য তরুণতা, প্রভা, বর্ণ ও যবের পুষ্টি, দেহ ও ইন্দ্রিয়দিগের বল, বাকসিক্তি, প্রণতি ও কান্তি লাভ হইয়া থাকে । রোগ-বিশেষে আক্রান্ত হওয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও নানা কারণে মানবের ষড় ধাতুর ক্ষয় সর্বদাই হইতেছে, অর্থাৎ ঋষি তাহা চিন্তা করিয়াই চিকিৎসা স্থানের প্রথমেই রসায়ন চিকিৎসার কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন । এই রসায়ন চিকিৎসা আয়ুর্বেদের মহান্ গৌরব । একরূপ চিকিৎসাও অর চিকিৎসা-শাস্ত্র এখনও অধিগত করিতে সমর্থ হয় নাই ।

অপত্য কামী পুংস্ব ও স্ত্রীলোক মাত্রেই শুক্র ও শোণিতের বিভ্রাজন প্রাপ্ত লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । সুশ্রুতের অনুযায়ী উপদেশে এ সকল কথাও বিপদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । ঋতু মতী নারীর কর্তব্য, ঐ সময়ে পুংস্বের কর্তব্য,—কিরূপ নিয়মে থাকিলে সন্তানোৎ

পত্তি হইয়া থাকে—এলব কথাও মহর্ষি হুজুত
অতি পরিকার করিয়া বুঝাইয়াছেন। এসব
উপদেশ পালন করিয়া চলিলে পৃথিবী হইতে
যেমন রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়া থাকে, সেইরূপ
আয়ুর্বেদ সংখ্যাও কমিয়া যায়। আমরা
এ সকল উপদেশ পালন করিতে জানি না
বলিয়াই তো এখন আমাদের এই দুর্গতির
চরম অবস্থা। শুধু রোগ রোগ করিয়া
চিকিৎসা করিলে চলিবে কেন, রোগ না
হইবার যে সকল বিধি-ব্যবস্থা আর্ধ্য ঋষি
দিয়া গিয়াছেন, তাহা অব্যাহত ভাবে পালন
কর; দেখিবে, তোমার সংসারে রোগের প্রাদু-
র্ভাব সত্য সত্যই অনেক কম পড়িয়া গিয়াছে।
ঋষি উপদেশ মানি না বলিয়াই আজ
আমাদের এত দুঃখ। হিন্দু ধর্ম হিন্দুর বাহ্যের
সহিত জড়িত—এ কথাটি আমরা যত দূর
না বুঝিতে পারিব আর্ধ্যঋষির অমূল্য উপদেশ-
বলী যে পর্য্যন্ত না আমরা বর্ণে বর্ণে পালন
করিতে শিখিব, সমগ্র চিকিৎসার ধূল গ্রহ
চরক ও হুজুতকে যে পর্য্যন্ত না আমরা
সমাদর করিয়া সর্ব সময়ে বরণ করিতে না
পারিব, সে পর্য্যন্ত যে আমাদের কল্যাণ নাই
একথা বলিতে পারা যায়।

“বস্তুদেপস্য যো জন্ত তজ্জং ত্রুণীষথম্ হিতম্।”

এই প্রসঙ্গে একথাটিও আমাদের স্মরণ
রাখা একান্ত কর্তব্য। ইহার অর্থ—যে দেশের
প্রাণী, তাহার পক্ষে সেই দেশের ঔষধই
হিতকর। আমরা যে কারণেই হউক—এ
কথাটির মর্যাদা রক্ষা করিতে অধুনা প্রস্তুত
নহি। আমরা জানি, ম্যালেরিয়া আর এলো-
পাথিক চিকিৎসা করাইলে শীঘ্র উপকার
হইবে। কিন্তু সেই উপকারের পরিণতি যে
কোথায়—তাহা তো আমরা ভাবিয়া দেখি না।
ঋষি, বায়ুশক্তিকরের উপর নির্ভর করিয়া
তাবৎ রোগেরই চিকিৎসা কর—উপদেশ
দিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে উহাদিগের ভোগ-
কালেরও যে নির্ণয় কবিয়া দিয়াছেন, প্রকৃত
আরোগ্যকামী ব্যক্তির সেই ভোগকালের
অপেক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু পাশ্চাত্য
বিজ্ঞান বিদেয়া সে ভোগ কালের যে অপেক্ষা
করেন না, তাহার কলে উহাদের চিকিৎসার
আন্ত রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেও উহার
দ্বারা অন্য ব্যাধি কর্তৃক যে আক্রান্ত হইতে
হয়—এ কথা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার
করিতে হইবে। আমরা এ সকল বিষয়
ক্রমণঃ বুঝাইব।

ব্রহ্মচর্য্য ।

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন ।

বতন্তলি কারণে বাঙ্গালীর দৈহিক অব-
অবনতি ঘটরাছে, ব্রহ্মচর্য্যহীনতা তাহাদিগের
অগ্রস্তম। যে সময়ে বাঙ্গালী জাতি এই
ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে জানিত
রাজ পুত্রই হউন, আর গামাত গৃহস্থের পুত্রই

হউন, যে সময়ে বালক নির্বিশেষে সকলকেই
গুরুগৃহে পঠদশা অতিবাহিত করিয়া
উপযুক্ত বয়সে, সংসার মধ্যে প্রবেশ করিতে
হইত, পঞ্চবিংশতি বর্ষের পূর্বে পুরুষের
এবং বোড়শ বর্ষের পূর্বে যখন জী পুরুষের

মিলনের ব্যৱস্থা ছিলনা, তখন বাঙ্গালী জাতি যে এত যোগ্য প্রবণ হইত না,—তাহার বথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন বাংলা বিবাহ—বাঙ্গালী সমাজে প্রচলিত ছিল বটে কিন্তু স্বাধোগ্য কাল উপস্থিত না হইলে স্ত্রী পুরুষের মিলিত হইবার উপায় ছিল না। বিবাহের উদ্দেশ্য কাম প্রবৃত্তির পরিভূক্তি সম্পাদন নহে। স্বাস্থ্যগান ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভই যৌন মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া তখনকার দিনে সকলে জানিত। এখন সে প্রথা যে দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে, দেশের দুর্গতির তাহাই আমরা সর্ব প্রধান কারণ বলিয়া মনে করি।

ব্রহ্মচর্য্য বলিলে ধান কাপড় পড়িতে হইবে, আতপ চাউল খাইতে হইবে, মাছ মাংস ত্যাগ করিতে হইবে—এমন অর্থ করিলে চলিবে না। বীথ্যরক্ষাই ব্রহ্মচর্য্য শব্দের প্রকৃত অর্থ। কিন্তু আমরা এ অর্থ ভুলিয়াছি। বিধবার সাদা কাপড় পড়েন, এক বেলা আতপান ভোজন করেন—তাঁহাদিগকে নিরামিষ খাইতে হয়—সুতরাং তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন—ইহাতেই আমরা স্থির করিয়া লইয়াছি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলে বৃষ্টি ঐরূপ আচরণই করিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য উহা নহে, বাহ্যিক এবং মানসিক—সর্ব প্রকারে ইন্দ্রিয় সংযমের নামান্তরই হইল ব্রহ্মচর্য্য। অধুনা এ ব্রহ্মচর্য্য—দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে বলিলে অজ্ঞায় বলা হইবে না।

আগে পঠদশায় গুরুগৃহে অববহিত্তির বৈরূপ প্রথা ছিল, সেইরূপ শিক্ষণীয় বিষয় গুলিও ছিল ধর্ম্মমূলক। এখন সে গুরু

গৃহও নাই সে ধর্ম্মমূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা নাই। কলে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই সম্ভবদোষে অনেক বালকই অস্বাভাবিক উপায়ে গুরু ব্যয়ে অভ্যাস হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী বালকের দ্বাস্থ্য এমনই করিয়া যে নষ্ট হইয়া পড়িতেছে, তাহার জন্ত দেশের মনীষীরা চিন্তা করিতেছেন কি ?

“মরণং বিন্দু পাতেন

জীবনং বিন্দু ধারণাং ”

বিন্দু অর্থাৎ গুকের ব্যয়ই মরণের কারণ এবং গুরু সংরক্ষণই দীর্ঘায়ু লাভের প্রকৃত উপায়। বাঙ্গালী-বালককে এ কথা শিখাইবে কে ? বর্তমান না লজ্জা ছাড়িয়া দেশের কোমলমতি বালকদিগকে এ কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে—ততদিন যে আমাদের সমাজের মঙ্গল নাই—ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

বহুকালাবধি চিকিৎসা ব্যবসারে ব্রতী থাকিয়া বহুদূর বৃদ্ধিলাভ—তাহাতে বাল্যের এইরূপ অস্বাভাবিক অত্যাচারের ফলেই বহু সংখ্যক বাঙ্গালীকে জীবনান্ত করিয়া—ভুলিয়াছে। ইহার পরিণতি বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু। কলিকাতার যক্ষ্মা বা থাইসিসে যে বহু সংখ্যক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, কারণ অল্পসন্ধান করিলে তাহার মূলে বাংলা জীবনে অস্বাভাবিক গুরু ক্রম দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালীর ম্যালেরিয়া—কালাজরের মূলেও এই পাপ নিহিত। বাঙ্গালীর শিশু মৃত্যুর কারণেও আমরা এই শ্রেণীর অস্বাভাবিক গুরুব্যয়ী পুরুষদিগকে দ্বারী করিতে পারি।

গুরুই মানবের প্রাণ, গুরুই পুরুষের

পুরুষ। ভুক্ত পদার্থের রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র জন্মিয়া থাকে। ইহারায় শরীর ধারণের প্রধান উপকরণ বলিয়া ইহাদিগের নাম দাতু। ইহাদিগের মধ্যে আবার শুক্রদাতু শরীর ধারণের পক্ষে কতটা উপযোগী, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্రిয় পরিচালনার ফল মানুষের ধৃতি, স্মৃতি, শক্তি, সামর্থ্য, উৎসাহ, আধ্যাত্মিক সমস্তই লুপ্ত হইয়া মানুষকে অন্তঃসার শূন্য ও অকর্মণ্য করিয়া তুলে। এইরূপ অবস্থায় জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। পক্ষান্তরে এইরূপ অত্যাচারী পুরুষেরা শুধু যে নিজেদেরই সংসারের বাবতীর মুখেখর্চা বিসর্জন দিয়া থাকে এমন নহে, তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ পর্যন্ত তাহাদিগের অর্জিত কষ্টের ফলভোগী হইয়া থাকে। এখনকার দিনে ডিসপেনসটর বলিয়া যাহারা পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহাদের আন্তর্য ইতিহাসের পরিচয় লইলে তাহার মূলে অবৈধ উপায়ে শুক্রক্ষয়ই সর্বপ্রধান কারণ জানিতে পারা যায়। সমাজ হইতে এই ধোঁরতব সংক্রামক ব্যাধি বাহাতে সমূলে ধ্বংস হইতে পারে, তাহার উপায় নিধান করা প্রত্যেক সমাজ হিতৈষীর সর্বপ্রধান কর্তব্য। এই সর্বনাশকর ব্যাধি দূর করিতে হইলে দেশে আবার ব্রহ্মচর্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেই শুক্রগৃহে অবস্থিতি—সেই ধর্মগ্রন্থের অনুশীলন—সেই সর্বপ্রকারে চিত্ত সংযমের শ্রাব্যবস্থা—সেই বিলাস-বাসনার লেশ মাত্রও বাহাতে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্రిয় সকলকে

বিপর্যস্ত করিয়া না তুলে—তাহার উপায় সর্বতোভাবে করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের মঙ্গলাকাজী পুরুষগণ এই প্রধান প্রশ্নোত্তর জ্ঞান কর্তৃক হস্তক্ষেপ করিবেন কি ?

প্রকৃত কথা, আমাদের দেশের অধিবাসীদিগকে আবার কর্ম্ম করিয়া তুলিবার আবশ্যক হইলে আবার বাহাতে ছাত্রজীবনে সেকালের মত ব্রহ্মচর্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা করিতেই হইবে। এই ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা শুধু শারীরিক শাসন দ্বারা লাভ করা যায় না, মনের পবিত্রতা ইহার প্রধান অবলম্বন। মনের পবিত্রতা ভিন্ন ইন্দ্రిয় সংযম হইতে পারে না। এই ইন্দ্రిয় সংযম করিবার অভ্যাস—ছাত্রজীবনে শিক্ষা করিলে, তবে বিবাহিত জীবনে উদার করা করিতে সমর্থ হইবে। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য পালন কত কঠিন নহে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন বড়ই কঠিন। বাল্যে সহগমণ না পাইলে যৌবনে ব্রহ্মচর্য পালন করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। যদি বাল্যে মুশিক্ষা পাইয়া বিবাহিত জীবনে এই পবিত্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহার ফলে তিনি যে ভাবী সন্তানের কৃতজ্ঞতা ও সমাজের ধর্মবোধ ভাজন হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শুক্র ধারণই যখন ব্রহ্মচর্যের সর্বপ্রধান বিষয়, তখন শুক্র ভিনিসটা কি,—উহাদের স্থান কোথায় এবং উহার প্রকৃতি ও ক্রিয়া কি—সকলেরই জানিবারা কর্তব্য।

পুরুষের মুখ বা কোষের শুক্রোৎপত্তি স্থান। ঋতুচক্রণ বস্ত্রের সাহায্যে শুক্র পরীক্ষা করিলে ওষুঃ পদার্থে বেজাতির আকৃতি বিশিষ্ট বহু সংখ্যক জীবাণু

পরিবেষ্টিত রহিয়াছে দেখিতে পায়। ইহারা যে কেবল জীবনীশক্তি সম্পন্ন এমন নহে, অত্যন্ত বিচরণশীলতাও ইহাদের প্রকৃতির বিশেষত্ব। এই বিচরণশীলতারও আবার বিশেষত্ব যে, ইহারা রক্তপথে প্রবেশ করিতে ভাল বসিয়া থাকে। এই বিশেষত্বের ফলেই ইহারা যোনিদ্বার দিয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া সন্তানের জীবাত্মা সঞ্চার করে। পঁচিশ বৎসরের বয়সের পূর্বে পূর্ণ শক্তিশালী শুক্র উৎপন্ন হয় না বলিয়াই উহার পূর্বে জীলোকের সহিত সম্মিলিত হইতে আর্থাৎ যি নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। পঁচিশ বৎসরের পূর্বেকাল পর্য্যন্ত শরীরের গঠন ক্রিয়া—বিশেষত্ব অস্থি ও মস্তিষ্কের গঠন অতি ক্রিপাতার সহিত সম্পন্ন হইতে থাকে। ঐ সময় রক্ত এই গঠন কার্যে অতিশয় ব্যস্ত থাকার জন্য জননেক্রিয়ের দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। পঁচিশ বৎসরের পরে শরীরের গঠনের এই ক্রিপতা অপসারিত হয় এবং শরীরের অন্তর রক্তের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম হয় বলিয়া রক্ত যেন অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া জননেক্রিয়গুলির পুষ্টির প্রতি সমুচিত মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়। ইগাই হইল প্রকৃতির বিচিত্র নিয়ম, কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে চৌদ্ধ বা পনের বৎসর বয়সেও যৌবনে পদার্পণ করিতে পারা যায়। এই অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে ষোল্ল বৎসরের বাগকও সন্তানের পিতা হইতে পারে।

শুক্র-জীবাত্মার সহিত ডিম্বাণুর সম্মিলনই সন্তানের জীবন প্রতিষ্ঠার কারণ। ডিম্বাণুর উৎপত্তি হান মাতৃগর্ভ, এই মাতৃগর্ভস্থ ডিম্বাণু

হইতেই জীব শরীরের উৎপত্তি। এই ডিম্বাণুর জীবন অনেকটা উদ্ভিদ জীবনের অধূরূপ। এই ডিম্বাণুতে জীবন সঞ্চার করিতে বহু পরিমাণে শুক্র-জীবাত্মা প্রবেশের আবশ্যক। শুক্র-জীবাত্মাগুলি মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া এই ডিম্বাণুর সহিত যখন মিলিত হয়, তখনই ডিম্বাণু—উদ্ভিদের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া জীবপ্রকৃতি অবলম্বন করে। সংক্ষেপে ইহাই হইল জীবসৃষ্টির অপূর্ণ রহস্য।

এই রহস্য অবগত হইলে সহজেই প্রমাণিত হইবে যে, অসময়ে এবং অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রব্যয়ের পরিণতি যেমন স্বকীয় স্বাস্থ্যহানি, সেইরূপ উহার ফলে অনেক শুক্র-জীবাত্মারও ধ্বংস সাধন অনিবার্য। কিন্তু তাহা যখন হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না, তখন সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই সংযমহীনতার ফলে ঘুল ধরা বাঁশের মত বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অকালমৃত্যুকে বরণ করিয়া আনিতেছে ইহা অধিনংবাচিত কথা, ইহার প্রতিফল বলিবার কিছুই নাই।

আসল কথা, ব্রহ্মচর্যা হুঁশিয়া বাঙ্গালী অসংসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই অসংসারত জাতির পুনবার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আবার তাহাকে ব্রহ্মচর্যের শিক্ষার অভ্যস্ত হইতে হইবে। বাঙ্গালী-বালকই বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বংশধর। সেই বংশধরদিগকে বক্ষা করিবার জন্য—বাঙ্গালীর সমাজকে আবার কর্মদ্রুপে গড়িয়া তুলিবার জন্য—বাঙ্গালীর শরীরে আবার অদম্য শক্তি সঞ্চারের জন্য আবার বাঙ্গালীকে ইন্দ্রিয় সংযমের অপূর্ণ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে কালের মত শুকগৃহের ব্যবস্থা করিতে না পার,

বাকালী কন্যাপুত্র ! এমন বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা কর, যে বিদ্যালয়ে ভ্যাগের শিক্ষা ও ভ্যাগের বৈরাগ্য লাভ করিয়া জ্ঞানের উন্মেষ সহজেই হইতে পারে, যে বিদ্যালয়ে ধর্মের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ প্রকৃষ্টরূপে মতি বর্ধনসেই উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত কন্যা হইতে পারা যায় । এইরূপভাবে প্রাথমিক শিক্ষা

প্রদত্ত হইলে বাকালী-বালককে আর অক্ষত্বের সম্ভবতঃ শিক্ষাদানের আবশ্যক হইবে না, তাহার পরিণত বয়সে তাহাকে অনাস্রাত কুসুম বিবেচনা করিয়া তাহার অভিভাবকগণ তাহাকে দেবীর অর্থাৎ প্রমানে হটমনা হইতে পারিবেন ।

গর্ভাবস্থায় চিকিৎসা ।

(কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ ।)

—::—

প্রথম আসনে—যদি গর্ভিনীর রক্ত-স্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে, যষ্টিমধু, শাক বীজ, কীরকাকোলী ও দেবদারু—এই সকল দ্রব্যের কাথের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া খাইতে দিবে ।

দ্বিতীয়া আসনে,—রক্তস্রাব হইলে আমরুল, রুক্ষতিল, মস্তিষ্ঠা ও শতমূলী, এই এই সকল দ্রব্যের কাথ—দুগ্ধ সহ খাইতে দিবে ।

তৃতীয়া আসনে,—রক্তস্রাব হইলে অনন্তমূল, শ্যামালতা, বাঙ্গা, বামুনহাটা ও যষ্টিমধুর কাথের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া খাইতে দিবে ।

চতুর্থ আসনে—রক্তস্রাব হইলে, বৃহতী, কটকারী, গাস্তারীফল, বটাদি ফলের বৃক্কের বৃক্ক ও শুক, এই সকল দ্রব্যের কাথ দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে ।

অষ্টম আসনে,—রক্তস্রাব হইলে, চাকুলে,

বেড়োলা, সজিনাবীজ, গোক্ষুর, যষ্টিমধু—ইহাদের কাথ, দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে ।

সপ্তম আসনে,—রক্তস্রাব হইলে, পাণিফল, মৃণাল, কিসমিস, কেস্তুর ও যষ্টিমধু—এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া খাইতে দিবে ।

অষ্টম আসনে,—রক্তস্রাব হইলে, বয়েদ বেল, বেল, বহতী, ইক্ষু ও কটকারী—ইহাদের মূল এবং পলতা, এক পোয়া দুগ্ধ ও এক সেব জলসহ পাক করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে ।

নবম আসনে,—রক্তস্রাব হইলে, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কীরকাকোলী ও শ্যামালতা—এই সকল দ্রব্য পুরোক্ত প্রকারে দুগ্ধসহ—পাক করিয়া গৈঁঠি দুগ্ধপান করিতে দিবে ।

দশম আসনে,—রক্তস্রাব হইলে,

তৃতীয় সপ্তাহ—পূর্বোক্ত প্রকারে দুগ্ধ-পাক করিয়া খাইতে দিবে অথবা শুঠ, বস্তিযু ও দেবদারুর সহিত পূর্ববৎ দুগ্ধ পাক করিয়া খাইতে দিকে।

উপরি উক্ত পানন গুলি প্রস্তুতের নিয়ম পাননগুলির মিলিত পরিমাণ দুই তোলা, জল অর্দ্ধ সের। শেষ অর্দ্ধ পোয়া।

গর্ভ বেদনার প্রতীকার।

প্রথম আসে,—যদি গর্ভবতীর বেদনা উপান্ত হয়, তাহা হইলে, যেত চন্দন, তুলসী, চিনি ও ময়না জল সমপরিমাণে, চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে। অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ শালুক ও শালিতুল দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে গুস্তার পথ্য দিবে।

দ্বিতীয় আসে,—পদ্ম, পাণিফল ও কেশুর,—চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া পান করিতে দিবে।

তৃতীয় আসে,—গর্ভ বেদনার—ক্ষীর কাকোলী, কাকোলী ও আমলকী, পেষণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে। অথবা পদ্ম নীলোৎপল, কুড় ও শালুক সম পরিমাণে চিনির জলে বাটিয়া খাইতে দিবে। পথ্য—হস্তার।

চতুর্থ আসে,—গর্ভ বেদনার, উৎপল, শালুক, কণ্টকারী, গোক্ষুর অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎপল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে।

পঞ্চম আসে,—গর্ভ বেদনার, নীলোৎপল ও ক্ষীর কাকোলী দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুগ্ধ, স্রুত ও মধুসহ—অথবা নীলোৎপল, স্রুতকুমারী ও কাকোলী সম পরিমাণে পেষণ করিয়া শীতল জলসহ পান করিতে দিবে।

ষষ্ঠ আসে,—গর্ভ বেদনার, টাৰা নেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও উৎপল, দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অথবা পিয়াল বীজ, দ্রাক্ষা ও ঐষচূর্ণ, শীতল জলে সহিত পেষণ করিয়া খাইতে দিবে।

সপ্তম আসে,—গর্ভ বেদনার, শতমূলী ও পদ্মমূল বাটিয়া দুগ্ধসহ অথবা কয়েদ বেল, জুপার মূল, থৈ ও চিনি—শীতল জলে বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

অষ্টম আসে,—গর্ভ বেদনার ধনে বাটিয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত অথবা পলাশ পত্র শীতল জলে বাটিয়া পান করিতে দিবে।

নবম আসে,—গর্ভ বেদনার, একগু মূল ও কাকোলী, শীতল জলে বাটিয়া অথবা পলাশ বীজ, কাকোলী ও ঝাটিমূল, কাঁজির সহিত বাটিয়া খাইতে দিবে।

দশম আসে,—গর্ভ বেদনার, নীলোৎপল, বস্তিযু, মৃগ ও চিনি—জলে বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

গর্ভবতীর স্বরূপ চিকিৎসা।

গর্ভবতীর জ্বর বা অন্ত কোনো প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইলে, বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা উচিত। বাহ্যতে গর্ভের কোনোরূপ বাধা না জন্মায়, তাদৃশ মুহূ, মধুর, শিশির, সুখসেবা, প্রকুমারপ্রায় ঔষধ ও

অন্ন পানাদির ব্যবস্থা করিবে। বমন, বিরেচন ও শিরো বিরেচন কদাচ প্রয়োগ করিবে না।

গর্ভিণীর অন্ন নিবারণের জন্য যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা এখানে লিখিত হইতেছে, সে সকল নিঃশঙ্ক চিত্তে ব্যবহার করিতে পারা যায়, ইহাদের দ্বারা গর্ভিণীর কোনো প্রকার আশঙ্কা নাই।

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণার মূল, অনন্ত মূল, পদ্মকাষ্ঠ—এই সকল দ্রব্য মোট দুই তোলা পরিমাণে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া চিনি ও মধু সহ পান করিতে দিবে। ইহার দ্বারা গর্ভিণীর অন্ন শাস্তি হয়।

রক্ত চন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও ডাফা—ইহাদের মিলিত ওজন দুই তোলা অর্থাৎ প্রত্যেক দ্রব্যটি আধতোলা পরিমাণে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিবে। শেষ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লটবে। ঐ কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্ভিণীর অন্ন ভাল হইবে।

অতিসার চিকিৎসা।

১। তুঁঠ, আতইচ, সুতা অথবা ধনে ও তুঁঠ মিলিত দুই তোলা, আধসের জলে পাক করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা প্রবল অতিসার ও তৃষ্ণা, শূল প্রভৃতি উপসর্গ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা পাচক, অগ্নি উদ্বীপক ও লঘু।

২। শালপাণি, চাকুলে, ব্রহ্মী, কণ্টকারীও গোবর, বেড়েলা মূল, তুঁঠ, ধনে,

নীলোৎপল ও বেল-তুঁঠ—ইহাদের মিলিত ওজন দুই তোলা, জল একসের ও তত্র এক পোয়া পরিমাণে দিয়া পাক করিয়া এবং এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথি পান করিতে দিবে। ইহার দ্বারা বাত-প্রধান অতিসারের শাস্তি হয়।

৩। ককটক (কাঁচড়া পাতা), জামপাতা, দাড়িমপাতা, পানিকল পাতা, বেলতুঁঠ, বালা, সুতা ও তুঁঠ—প্রত্যেকটি চারি আনা পরিমাণে লইয়া বগারীতি কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহার কাথে প্রবল অতিসারের শাস্তি হইয়া থাকে।

৪। ইন্দ্রযব, দাড়িম ছাল, আকনাদি, বেলতুঁঠ এবং আম অথবা জামের কচিপাতা—ইহাদের মধ্যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, বাটিয়া, দধি ও চিনির সহিত, খাইলে গর্ভিণীর অতিসার ভাল হয়।

গ্রহণী চিকিৎসা।

আমছাল ও জামছালের কাথে ষৈ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহন করিলে অতি সত্ত্বর গর্ভিণীর গ্রহণী নিবারিত হয়।

খাস কাসাদি চিকিৎসা। দারুচিনি চূর্ণ এক ভাগ, বড় এলাইচ চূর্ণ ষট্ ভাগ। পিপুল চূর্ণ চারি ভাগ, বংশলোচন আট ভাগ—এবং চিনি ষোল ভাগ—একত্র মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই চূর্ণ সুত ও মধুর সহিত মিশ্রাইয়া লেহন করিলে খাস, কাস, অরুচি, মন্দাগ্নি প্রভৃতির শাস্তি হইয়া থাকে।

রোগতত্ত্ব ।

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরাজ শাস্ত্রী)

“তদুৎপত্তং সংযোগা ব্যাধয় ইতি”—সুশ্রুত ।

“বিকারো ষাণ্ডু বৈষম্যং, বিকারো

দুঃখ মেবচ”—চরক ।

রোগ কি ? ইহার স্থূল জ্ঞান প্রায় সকলের মনে নিহিত আছে । কেননা প্রায় সকল রোগেই কোন না কোন ঘটনা অনুভূত হয় । রোগ উপস্থিত হইয়াছে অথচ যন্ত্রণা বোধ নাই, এরূপ স্থল অতি বিরল । কখনও কোনো রোগ ভোগ করেন নাই—এরূপ লোকের সংখ্যাও অত্যধিক অল্প । সুতরাং রোগ বলিলেই প্রধানতঃ আমাদের প্রতীতি হয় যে, কোন প্রকার ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে । কিন্তু এতাদৃশ জ্ঞান সাধারণতঃ অল্পভূতি মাত্র । প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা দ্বারা কোন রোগেরই বার্থ্য্য তত্ত্ব নিরূপিত হয় না । যেহেতু রোগের বৈকল্য আকার, উদ্ভবের সূত্রপাত আকার নহে । উদ্ভবের বৈকল্য আকার, অর্শোরোগের সূত্রপাত আকার নহে । এক রোগও নানা আকার ধারণ করে । অনেক রোগও এক প্রকার আকারে আবির্ভূত হয় । কতকগুলি রোগের আকার আমাদের সুপটুভাবে প্রতিভাত হয় না । এই সকল কারণে রোগ নির্ণয় এত দুষ্কর ব্যাপার । এই হেতুবাদ নিবন্ধন চিকিৎসা শাস্ত্রেও অনেক মতভেদ লক্ষিত হয় ।

পরন্তু রোগের আকর্ষণগত পার্থক্যাদি

ধাকিলেও এমন অনেকগুলি ধর্ম আছে, সেগুলি প্রায়শঃ সকল রোগেই বিদ্যমান থাকে । সেই ধর্মগুলিকে সাধারণ ধর্ম বলিয়াই ঋষিগণ সমুদয় রোগের ব্যাপক লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । প্রস্তাবের শিরোনামে যে সূত্র দুইটি বিবৃত হইল, সেগুলি রোগের সাধারণ স্বরূপ বোধক । অথবা রোগের সাধারণ ধর্ম বা লক্ষণজ্ঞাপক । উচ্চাঙ্গের ব্যাধ্যা সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে আমরা ঋষিদিগের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হইব । উক্ত সূত্র দুইটির অর্থ এই যে যাহা দ্বারা পুরুষের ব্যক্তিগত দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাকেই রোগ বলে । সুতরাং দুঃখজনক দ্রব্যেই রোগ বলিয়া গণ্য । কথ্যটি সংক্ষেপে হইলেও ইহার অর্থ বহুদূর বিসর্গী, এমন কি অধ্যাত্ম প্রকরণ পর্যন্ত ইহার স্পর্শের আরম্ভ । কেননা জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ প্রভৃতি দেহের স্বাভাবিক সমগ্র ব্যাপারই রোগের অন্তর্ভুক্ত । যেহেতু ইহা দ্বারা পুরুষের যে দুঃখ উপস্থিত হয়, সে দুঃখের অভিঘাতে পুরুষ সর্বদাই অজ্ঞান, সর্বদাই ব্যাকুল । অধ্যাত্ম পণ্ডিতগণ ইহা দ্বিগের নিকট রোগ প্রভৃতি রোগ সমূহকে অতি সামান্যই মনে করেন । তাঁহারা বলেন, জরা দি রোগ লৌকিক চেষ্টাতেই প্রশমিত হইতে পারে ; কিন্তু জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি স্বাভাবিক রোগ সকল

সামান্য চেষ্টার আশ্রয় নহে। তুমি যত বড় পণ্ডিত—যত বড় বুদ্ধিমান, যত বড় চেষ্টাশীল হওনা কেন, স্বাভাবিক রোগের হস্ত হইতে কিছু তেই তোমার নিষ্কৃতি নাই। শৈশবের পশ্চাদ্ গামিনী অরা তোমাকে আক্রমণ করিবেই করিবে। জীবনের সহচর মৃত্যু নিশ্চয়ই তোমাকে গ্রাস করিবে। প্রকৃতির এই সকল স্বাভাবিক নিয়ম কর্মময় জীবনে মানবের অলঙ্ঘনীয়। বাহ্য হউক পূর্বোন্নিখিত সূত্রধরের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে,—মানবের যে কোনরূপ হঃখপ্রদ অবস্থা বিশেষ উপস্থিত হইলেই, ঋষিগণ তাছাকে ব্যাধি সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন। কিন্তু আমরা সংসারী বিবরী, ঐহিক সুখই আমাদেরিগেব সর্বস্ব। ঋষিগণের নিকট সংসার বিষময় হইলেও আমাদেরিগের পক্ষে ইহা সুখের প্রস্রবণ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁহাদিগের বৈবাগ্য বুদ্ধিতে রোগ বলিয়া গণ্য হইলেও আমাদেরিগের নিকট সর্বথা প্রার্থনীয় সুখ। সুতরাং ততদূর ব্যাপক লক্ষণ আমাদেরিগের মনঃপূত হয় না। তাই আমরা আর একটি সূত্র প্রথমোক্ত সূত্রধরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতেছি। উহার অর্থ এই যে,—খাতুগণের বৈবম্যই রোগ*। শরীরের বিধান, ধারণ বা পোষণের উপযুক্ত পদার্থ মাঝেই ধাতু। সুতরাং শরীরের উপা-দানে জীবক সমুদয় দ্রব্যকেই রস, রক্ত প্রভৃতি পদার্থ এবং যুক্ত প্রীহাদি অত্র মাঝকেই ধাতু বলা যায়। তাহাদের কোন বৈবম্য বা অত্রথা ভাব ঘটিলেই রোগ

বলা যাইতে পারে। জীবিত শরীরে যে সকল অত্র যে ভাবে থাকিয়া যে রূপ কাজ করিতেছে এবং যে যে পদার্থে যে পরিমাণে ও যে ভাবে থাকা আবশ্যক তাহার বিকৃতিকেই রোগ বলে।

বৈবম্য শব্দে উল্লিখিত পদার্থ সকলের দ্রবাগত, ঞ্ণগত ও ক্রিয়াগত হ্রাস অথবা বৃদ্ধি এবং অত্রাদির নিশাণগত অত্রথা ভাব বৃদ্ধিতে হইবে। কাহারও, কাহারও মতে অত্রথাভাব চারি প্রকার। ১ম প্রকোপ, ২য় আশ্রয়পকর্ষ কোম ভবল অথবা লঘু পদার্থ অর্থাৎ শরীর গত বায়ু, পিত্ত, বৃক, বস, রক্ত প্রভৃতি পদার্থের—কোন বলবান অত্র ধাতুর আকর্ষণে স্বকীয় আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া বিকৃত ভাবে অত্র আশ্রয়ে গমন করাকে বৃদ্ধিতে হইবে। হীনতা শব্দের দ্রবাগত হ্রাস এবং বৃদ্ধি শব্দের দ্রবাগত পরিমাণ আধিক্য।

আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, উল্লিখিত লক্ষণ দ্বারা শারীরিক রোগের কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র পাওয়া গেল। কিন্তু মানসিক রোগের বিষয় অস্পষ্ট রহিল। শারীরধাতুর বৈবম্য বশতঃ বেরূপ অত্র প্রভৃতি অয়ে, মানস ধাতুর বৈবম্য বশতঃ সেরূপ মূর্চ্ছা, কাম, ক্রোধাদি মনোবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। শারীর রোগের চিকিৎসা করাও আয়ুর্বেদের বেরূপ একটি লক্ষ্য, মানস রোগের চিকিৎসা করাও আর একটি লক্ষ্য। সুতরাং মানসিক রোগের বিষয়েও এখানে মূলতঃ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। পরন্তু ধাতু শব্দের আর একটি অর্থের প্রতি অভিনিবেশ করিলেই মানসিক রোগের স্বরূপতঃ সামান্য আকার জ্ঞান উপলব্ধি করা

* শারীরঃ দ্বাতি বিধন্তে ধারয়তি পুষ্কতি
৫ ইতি ধাতুঃ ।

বাইতে পারে।—ধাতু শব্দে যেমন শারীরিক ধাতু রস, প্রভৃতি বুঝায়, তেমনি মানসিক ধাতু বলিলে সম্বন্ধ প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। এই সম্বন্ধ প্রভৃতির বৈষম্য বশতঃ উদ্ভাদাদি মনোবিকার উপস্থিত হয়। সুতরাং ধাতু বৈষম্য বলিলে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ রোগেরই লক্ষণ যুগপৎ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসে।

উক্ত কথা, শুল্কির বিবৃতি এই—
আমাদিগের শরীরে আমাশয়ে (যে অস্ত্রে আহারীয় দ্রব্য প্রথমে উপস্থিত হয়) পাক্যশয়ে (ভুক্তদ্রব্যের অমার অংশগুলি যে অস্ত্রে মূত্র ও মলরূপে পরিণত হয়), বক্তশিরা প্রভৃতি অস্ত্র সকল নিয়ত আপন আপন কাজ করিতেছে। আহারীয় দ্রব্য হইতে রস, তাহা হইতে রক্ত এবং রক্ত হইতে মাংসাদি উৎপন্ন হইয়া শারীরিক পদার্থ সকলের ক্ষতিপূরণ ও পুষ্টি-সাধন করিতেছে। বাত, পিত্ত, কফ এই ত্রিবিধ শারীর পদার্থ এবং সমস্ত রক্তঃ তমঃ আপন আপন শিরা ধমনীপথে গত্যায়ত করিয়া জীবন ক্রিয়ার সহায়তা করিতেছে। এই নিমিত্ত আমরা স্বচ্ছন্দ শরীরে ও সুস্থ মনে সংসার যাত্রা, নির্বাহ করিতেছি। শৈশব হইতে বাল্যে, বাল্য হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ়তা হইতেই বার্ল্যকো উপনীত হইতেছি। এ সকল পদার্থের ও এ সকল কর্মের কোনরূপ অন্তথা ভাব ঘটিলেই আমরা পীড়িত বা রোগগ্রস্ত বলিয়া গণ্য হই। জগতে বাহ্য পদার্থের সহিত আমাদিগের শরীর ও মনের নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

জল, বায়ু, স্বর্বাধিকরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক

পদার্থ, আহার-বিহার-শয়ন উপবেশন প্রভৃতি দৈহিক ব্যাপার, বাগবিত্ততা প্রভৃতি বাচনিক কার্য, কাম-ক্রোধাদি মানসিক উত্তেজনা, অথবা চিন্তন, অনুধ্যান প্রভৃতি মনোবৃত্তি নিষ্ঠ কর্মের আমাদিগের আত্মা মনের সহিত ওতোপ্রোত ভাবে সম্বন্ধ রহিয়াছে। ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার ও ঘটনার অনুষ্ঠান বিবিধ কারণে প্রয়োজন মত হইয়া উঠে না। কখনও প্রয়োজনানুরিক কখনও বা প্রয়োজন অপেক্ষা ন্যূন হইয়া থাকে। উদ্যম হেতু বশতঃই আমাদিগের জীবিত শরীরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ঘটনাগুলির অন্তথাতাব ঘটয়া তাহা রোগ নামে আখ্যাত হয়। বিষমতা প্রাপ্ত বাত পিত্তাদি হইতেও কতকগুলি রোগের উৎপত্তি হয়। ঐ রোগগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—অমিশ্র ও মিশ্র। বাতের প্রকোপাদি জন্ত যে রোগ উৎপন্ন হয় তাহা দ্বিগকে বাতজন্ত অমিশ্র রোগ বলা যায়। পিত্তের প্রকোপাদি জন্ত যে রোগ জন্মে তাহা দ্বিগকে পিত্ত জন্ত অমিশ্ররোগ, শ্লেষ্মার প্রকোপাদি বশতঃ উৎপন্ন রোগগুলি শ্লেষ্মা জন্ত অবিমিশ্র রোগ বলায়া আখ্যাত হইতে পারে। আনুর্বেদ পণ্ডিতরা স্থির করিয়াছেন যে, বাত জন্ত নথ ভেদ (কোন স্থানে বিদারণ করিলে যে রূপ বেদনা অনুভব হয় সেইরূপ বেদনা) পানশূল (গোড়ালির নিয়ন্ত্রণে বেদনা) প্রভৃতি আশী প্রকার এবং পিত্ত জন্ত দোষ (পার্শ্বে অগ্নি থাকিলে যে রূপ তাপ অনুভব হয় সেইরূপ অনুভব) প্রোষ (কিঞ্চিদগ্ন করিলে যে রূপ ক্রেশ অনুভব হয় সেইরূপ

* ধাতবো বাতাদয়ো রসাদি বশত তথা
রক্তঃ প্রভৃতয়ঃ । চক্রপাণি ।

অহুত্ব) প্রভৃতি ৪০ (চল্লিশ) প্রকার । ও শ্লেষ জন্ম তৃণ্ডি (সর্বদা কুখ ও আহার প্রবৃত্তির অভাব বোধ) তন্না, শুকতা প্রভৃতি কুড়ি প্রকার অবিমিশ্র রোগ বলা যায় । এই রোগগুলির কোনটি বাত জন্ম কোন পিত্ত জন্ম ও কোনটা শ্লেষ জন্ম, তাহা বহুকালে বহু পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে । অবিমিশ্র রোগগুলির মিশ্রনে অপর কতকগুলি রোগ উৎপন্ন হয় । উহাদিগকে মিশ্র রোগ বলা বাইতে পারে । বধা জ্বর, গ্রহণী, অতি-সার, অর্শঃ প্রভৃতি যে সময়ে বাত পিত্তাদির বিষমতা হইতে জন্মিয়া থাকে, সেই সময়েই ঐ বাতদির বৈষম্য হইতে কম্প, দাহ, গাত্র গৌরব প্রভৃতি অপর কতকগুলি অবিমিশ্র রোগ উৎপন্ন হইয়া জ্বর প্রভৃতি রোগের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে ইহা স্থির কথা । শেযোক্ত রোগগুলিকে প্রথমোক্ত রোগের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বলে ।

জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগ সকল উৎপন্ন হইবার পর বোগীর অত্যাচার বা অন্ত কোন কারণ প্রযুক্ত বাতপিত্তাদি প্রকোপের আধিক্য হওয়াব অপর কতকগুলি অমিশ্র রোগের উদ্ভব হয় ও উহার প্রথমোক্ত রোগের সহিত মিলিত হইয়া যায় । শেযোক্ত রোগ গুলিকে প্রথমোক্ত রোগের উপজব বলে । কোন্ কোন্ রোগের সহিত কোন্ কোন্ রোগের উপজব ঘটিয়া থাকে—আয়ুর্বেদিক

পণ্ডিতরা তাহা এক প্রকার নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন : অপর এক শ্রেণী রোগ আছে, তাহাতে প্রথমে বাত, পিত্ত বা কফের প্রকোপাদি হয় না অথচ অন্তরূপে ধাতু বৈষম্য ঘটে । * পশ্চাৎ বাতাদি প্রকোপাদি উপস্থিত হয় । অনন্তর বেদনাদাহ প্রভৃতি অবিমিশ্র রোগ, তদনন্তর ত্রণ প্রভৃতি মিশ্র রোগ আবির্ভূত হয় । ইহাদিগকে আগন্তক রোগ বলে । তরবারী দ্বারা কোন ব্যক্তির শিরচ্ছেদ করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গ হানিরূপ ধাতু বৈষম্য ঘটিল । পরক্ষণেই আঘাত জন্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাত প্রকোপ এবং পরম্পরা সম্বন্ধে পিত্তাদির প্রকোপ । অনন্তর বেদনাদাহ প্রভৃতি ত্রণ ক্ষত রূপ রোগ ঘটিয়া থাকে । মানব শরীরে রোগের সংখ্যা কত তাহা স্থির করা কঠোর ও শক্তিসাধ্য নহে । রোগ অসংখ্য হইলেও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাহার কতগুলি পরিগণনা নির্দেশ করিয়া আমরা নিরে তাহারই কিছু উল্লেখ করিতেছি ।

প্রথমতঃ বাবতীয় রোগকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা যায় । ১ম আধ্যাত্মিক, ২য়

* ঔপসর্গিকো নাম যঃ পূর্কোৎপন্ন ব্যাধিঃ জ্বর কাল বাতো ব্যাধি রূপম্ভজতি, শতবুল এব উপজ্রাসংজ্ঞঃ । সুশ্রুত ।

বধাতু ধাতু বৈষম্য নিমিত্ত বিকার সম্ব বহবঃ শরীরে নতে পৃথক পিত্ত ককানি লেভ্য আগন্তবন্তেতু ততো বিশিষ্টাঃ । আগন্ত রম্বেতি নিজঃ বিকারঃ নিজ তথাগন্তমতি প্রবুদ্ধঃ (চরক) । তে পূর্কঃ কেবলাঃ পশ্চাৎ নির্জের্যামিশ্র লক্ষণা, হেত্বোযমি বিশি- টাশ্চ তৎস্বাগন্তবো জরাঃ । চরক

জ্ঞানার্থং বানি চোক্তানি ব্যাধি

লিঙ্গানি সংগ্রহে ।

ব্যাখ্যায়ন্তে তদ্বাস্তেহু লিঙ্গানীমানি

নামরা ॥ চরক ।

আধিতৌতিক, ৩য় আধিদৈবিক, এহুসে আত্মা বলিতে মন ও শরীর উভয়েই এক সঙ্গে বুঝিতে হইবে। হৃত শব্দে অন্ন পত্র প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ, দেব শব্দে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ প্রভৃতি এবং গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতু, রূপ, কাল ঘটতি প্রাকৃত নিয়ম। আত্মা অর্থাৎ মন ও শরীর ঘটতি যে সকল রোগ আহার বিহারাদিব অনিয়ম জন্ত উৎপন্ন হয়—তাহার নাম আধ্যাত্মিক। হৃত পদার্থ হইতে যে সকল বোগ জন্মে তাহাদিগের নাম আধিতৌতিক। দেব হইতে যে সকল বোগ জন্মে তাহাদিগের নাম আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, ১ম আদিবল প্রবৃত্ত, ২য় জন্মবল প্রবৃত্ত, ৩য় বোম্বল প্রবৃত্ত। মানব শরীরে আদি উপাদান স্বরূপ শুক্রে শোণিত বিকৃত থাকিলে তহুৎপন্ন শরীরে তজ্জন্ত যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগের নাম আদিবল প্রবৃত্ত। বথা, জাত কুষ্ঠ, সহজাত অর্শঃ, সহজাত প্রমেহ প্রভৃতি। আদিবল প্রবৃত্ত রোগ আবার দুই প্রকার, প্রথমতঃ মাতৃজাত, দ্বিতীয়তঃ পিতৃজাত। মাতৃ শরীরের রক্তো বিকৃতিতে সন্তানের যে রোগ জন্মে, তাহার নাম মাতৃজাত। পিতার শুক্রে দোষ জন্ত সন্তানের যে রোগ জন্মে তাহার নাম পিতৃজাত। অবি কৃত শুক্রে শোণিত হইতে মানবদেহের অকুরোৎপত্তি হইবার পূর্বে মাতৃ গর্ভস্থ তাহার ক্ষুদ্ররূপে পরিপোষণ কালে গর্ভস্থ শিশুর যে 'রোগ জন্মে তাহার নাম জন্মবল প্রবৃত্ত। জন্মবল প্রবৃত্ত রোগও দুই প্রকার, ১ম রস কৃত, ২য় দৌহদোষচর কৃত। জন্মস্থিত সন্তান মাতৃ শরীরে আহার জনিত রস দ্বারা জীবিত থাকে এবং পরিপুষ্ট হয়।

যদি তদবস্থার মাতার আহার বিহারাদির অত্যাচার ঘটে, তাহা হইলে রস দ্বার বিকৃতি জন্মে। তাদূশ বিকৃত রসের দ্বারা পরিপোষিত হইয়া উদরস্থিত সন্তানের রোগ জন্মিয়া থাকে। ঐ রোগকে রসকৃত রোগ বলে, বথা সন্তানের অতি ক্রীণতা প্রকৃতি। গর্ভ ৪র্থ মাসে উপনীত হইলে জন্মস্থিত সন্তানের কদম্বদেশের গঠন সম্পন্ন হয় এবং চেতনা দ্বারা ব্যক্ত হইয়া উঠে। তখনই সন্তানের আহারের প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, ঐ প্রবৃত্তি গর্ভিণীর মনোরথের দ্বারা প্রকাশ পায়। এইরূপে একাধারে ২টা কদম্বের অবস্থা প্রযুক্ত ঐ সময় গর্ভিণীকে দ্বিজদরা এবং গর্ভবতীর ঐক্য আহারাদির অভিলাসকে দৌহদ বলে। ঐ দৌহদের পূরণ না হইলে ক্ষোভ বশতঃ গর্ভিণীর বাত প্রকোপ হয়। তজ্জন্ত জন্মস্থিত সন্তান কুন্ড, পঙ্ক, মুক (বোবা) ইত্যাদি বিকৃতাবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ রোগকে দৌহদোষচরজনিত ব্যাধি বলে। *

* মাতৃস্থ থলু রস বহারাং নাড্যাং গর্ভবহা নাড়ী প্রতিবন্ধাসাত্তামাতুরাহার রসবীৰ্য্য মন্দি ভবতে। তেনোপ রেচে নাত্তাপ বৃদ্ধিভবতি। সূত্রতঃ।

সূত্রতের মতে ৪র্থ মাসে এবং চরকের মতে ৩ম মাসে দৌহদ উপস্থিত হয়।

দ্বিজদরাস্তনারীং দৌহদিনীমাচকতে।

সূত্রতঃ।

গর্ভোবাত প্রকোপেণ দৌহদোষচরজনিতঃ ভবেৎ কুন্ডঃ কুনিঃ পঙ্কঃ মুক্ মিন্ মিন্ এচ।

সূত্রতঃ।

শরীরস্থ বায়ু পিত্ত এবং কফ এবং মান-
সিক রক্তঃ, তন্ম এই পাচকটিকে বিকৃত অবস্থায়
দোষ বলে । *

এই দোষদিগের প্রবলতা প্রযুক্ত যে সকল
রোগ জন্মে তাহাদের দোষবল প্রযুক্ত রোগ
বলে । যথা অর, অতিসার, উন্মাদ ইত্যাদি ।
ঐ সকল দোষবল প্রযুক্ত রোগ ২টী শ্রেণীতে
পরিগণিত । ১ম শারীর, ২য় মানস । যে
রোগ মনকে আক্রমণ না করিয়া শরীরকে
অধিক মাত্রায় আক্রমণ করে তাহার নাম
শারীর । যথা অর, অতিসার প্রভৃতি । যে রোগ
শরীরকে অধিক মাত্রায় আক্রমণ না করিয়া
মনকে সমধিক রূপে আক্রমণ করে তাহার
নাম মানস । যথা উন্মাদ, মূর্ছা প্রভৃতি ।
শারীর রোগও দুইভেদে ২ শ্রেণীতে গণ্য হইয়া
থাকে । যথা ১ম আমাশ্যরোগপর, ২য়
পকাশরোগপর অর্থাৎ অগ্নিক বস্তুর পরিণামের
প্রাণাধার বলিয়া আমাশ্য বলিয়া থাকে । *

নাতির নিম্ন স্থানে অস্ত্রে পাচকারির দ্বারা
পরিণাম প্রাপ্ত বস্তুর অসারংশ গুলি যাহা
পরিণেবে পুরীষ মূত্র রূপে পরিগণিত হয়,

* বাতপিত্তকফঃ প্রোক্তঃ শরীরো দোষ
সংগ্রহঃ মানসঃ পুনরুদ্ভিষ্টে । রজশ্চ তন্ম এব চ
শরীরে দৃশ্যাং দোষঃ—বাগ্ভটঃ ।

নাভে: ত্বনাস্তরং কস্তোরামাশ্য ইতি দ্ব্যতঃ ।

ভাবপ্রকাশ

এই স্থানকে পকাশয় বলে । যে রোগে
আমাশয়স্থ রৈদক রেখা পাচকারির
বিকৃতি প্রযুক্ত প্রাহৃত হয় তাহার
নাম আমাশ্যরোগপর রোগ, যথা অর
বমন ইত্যাদি । পকাশয় দূষিত করিয়া যে
রোগ প্রাহৃত হয় তাহার নাম পকাশরোগপর,
যথা গ্রহণী অতিসার ইত্যাদি । অতি
বলিষ্ঠের সহিত দুর্বলের বাহু বুদ্ধাদিবলতঃ
শারীর বদ্ধাদির বিলোড়ন ক, অল্প প্রত্যক্ষের
বিনাশ বা অকর্মণ্যতা প্রভৃতি যে সমস্ত
আগন্তক পীড়া উপস্থিত হয় তাহাদিগকে
সংঘাতবল-প্রযুক্ত বলে । এই শ্রেণীর পীড়া
সমূহ আদিভৌতিক রোগ বলিয়া গণ্য ।
ইহাও দুইভেদে দুই প্রকার, ১ম শস্ত্রাদি কৃত, ২য়
ব্রাহ্মাদি প্রাণীকৃত । তরবারী বর্ষা প্রভৃতি
শস্ত্রঘাতীর গুলি, লাঠী প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা
আঘাত বা পর্ত্ত বুদ্ধাদি অত্যুচ্চ স্থান হইতে
নিম্নে পতন ইত্যাদি কারণে শারীর শস্ত্রাদি
অভিশয় আহত হওয়ার, আংশিক বিকৃতি
প্রাপ্ত বা বিপর্য্যস্ত এবং বাতাদি দোষ পদার্থের
প্রকৃতির অজ্ঞাভাব ঘটিলে তাহাকে শস্ত্রাদি-
কৃত আগন্তক রোগ বলে । ব্যাঘ্র, ভল্লুক,
কুকুর, সর্প প্রভৃতি জন্তুতে দংশন করিয়া
কোন স্থান কৃত বারিলে, তদ্বারা শরীরের
বিকৃতি এবং তাহাদিগের বিষ দ্বারা বেহের
যে অজ্ঞাভাব উপস্থিত হয়, তাহাকে এখানে
ব্যালাঘিকৃত আগন্তক রোগ বলা হইয়াছে ।

চুলের কলপ।

(কবিরাজ শ্রীজ্ঞানবল্লভ রায় কাব্যভীর্ণ)

: : :

শিয়ালদহ ট্রেনের ৩১নং প্রাটকর্সে—

অপরাহ্নের “রাণাঘাট লোকালে”, এক থানা দেড়া মানুষের পাড়ীতে বসিয়াছিলাম। কামরার ৬ খানি বেক—তাহাতে আরোহীর সংখ্যা ৫৮ জন। আমার ঠিক সম্মুখে—এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত বিনোদ বিহারী বিজ্ঞাবিনোদের বিরাট বসু। তিনি হতাশ দৃষ্টিতে চতুর্দিকে চাহিতেছিলেন এবং পৌষ সংক্রান্তির জড়তামরী হিমালীর মধ্যেও নিখিল হস্তে কপালের দাম মুষ্টিতে ছিলেন।

আমিই প্রথমে কথা আরম্ভ করিলাম। কথা—প্রত্নতত্ত্বের। ক্রমে বিজ্ঞাবিনোদের মুখে প্রকাশ পাইল—নৈহাটীর শাস্ত্রী নাকি বৃদ্ধ বয়সে হিন্দুর চির উপাস্ত শিব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাহার শুক পতীর পবেষণায় সপ্রমাণ হইয়াছে—মহা-যোগী মহাদেব সত্যদেবতার স্বাক্ষতি নছেন, তিনি একজন শক্তিশালী অনার্য পুরুষ। এক্ষণ অপূর্ণ সিদ্ধান্ত যে স্থবির ব্রহ্মণ শাস্ত্রীর লেখনী প্রবণ কবিত্তে পারে—এ ধারণা—আমার একেবারেই ছিল না। আমি কোনও তর্ক করিলাম না। ‘সম্ভব প্রোভার মত কেবল শুনিতেই লাগিলাম। একা বিজ্ঞাবিনোদ আর কতক্ষণ বকিবেন? সুতরাং তাহার আলোচনা—যুগ্ম শ্রুত বস্তার বারি-

কল্লোলের মত যক্ষীকৃত হইয়া পড়িল।

আমার পার্শ্বে বসিয়া এক তত্ত্বলোক বিকট হাড়ীমুক্ত মুখে “চীনা বাদাম” চিবাইতে ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গবাসী। আমাকে আয়ুর্কেন্দ্র কলেজের একজন অধ্যাপক জানিতে পারিয়া লোকটা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহার “হর্ষের ব্যারাম” আছে, বাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠান্ত্রি হয়—আমি এমন কোন মুষ্টিবোধ জানি কি না? তাহার চীনা-বাদাম চর্ষণের ক্রিয়তা দেখিয়াই আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম—এ ভাবে চীনাবাদামের জেলাপ লইলে “হর্ষের ব্যারাম”—বিবাদের ব্যারামে পরিণত হইবে। তখন তাহার অবস্থাটা কৌম্বনাথ হর্যোধ্যনের মত না হইয়া দাঁড়ায়।

এই সময় ট্রেন আগড়-পাড়া টেননে আসিয়া থামিল। ভাগ্যগুণে যে করজন আরোহী নামিয়া গেলেন, তাহার তিন গুণ লোক আমাদের কামরার উঠিল। আমি রেল কেম্পানীর নিয়ম নির্দেশের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাড়ীর গাত্রের কাঠফলকে গুলোজল-হরণে দেখা ছিল—৩০ জন বসিবে। এত ভিড়ও কেহ আইন অমান্ত করে নাই। ৩০ জন লোকই বসিয়াছিল, বাকী বাহারা উঠিয়াছিল—তাহারা বসিবার চেঁচা না করিয়া—একদ্বার

হইতে অস্ত্রধার পর্যন্ত 'ঠেল মারিয়া প্রেণীবদ্ধ' ভাবে 'ধাড়াইয়া' ছিল। এই মণ্ডারমান-মানব-মহা-মণ্ডলের ভিতর আমি একখানি পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলাম। কিন্তু এই বহু পুরাতন ও সনাতন পুরুষের সঙ্গে সহসা কথা কহিবার আমার সাহস হইল না। এইখানে—ইহার একটু পরিচয় দিব। ইনি আমাদের চুঁচুড়া সহরের একজন সম্ভ্রান্ত ধনী অধিবাসী। বয়স—বৎসর তিরিশী; দাদা বীননাথ ধরের ভাষায় বলিতে হইলে—ইহার দেহের অবস্থা—এখন "তীরে—আসি"। তিন বৎসর পূর্বে ইনি এক দাদনী পরিজ্ঞ বালিকার কর ক্রয় করিয়াছিলেন। তজ্জ লোকটার নাম আমি বলিব না। পাঠক! ইলারায় বুঝিয়া লউন। ইনি একজন প্রবীন লেখক। সমাজপতির "সাহিত্যে" ইহার রচনা একদিন মগোরবে স্থান পাইত। "সাহিত্যপরিষদের" ত্রৈমাসিক পত্রে—ঐহতবধিধরূপে এষ্ট বিশালকার বৃদ্ধের আবির্ভাব। আগন্তককে আমি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। তিনি চিনি করিয়াও যে চিনিতে পারি না—তুমি কে বট দে? তুমি কি আমাদের সেই? তবে কি আমি আজ আমার দীপ্ততার স্থির চক্ষুকেও অবিশ্বাস করিব? হায় বৃদ্ধ! তিন মাস পূর্বে আমি যে তোমার উত্তমাঙ্গে—পারদ-শোভন গুত্র কাণ-স্তবকের মত পককেণ দেখিয়াছিলাম,—কে তাহাতে আজ প্রাবৃত্ত—কাদম্বিনীর গাঢ়-কালিয়া ঢালিয়া দিয়াছে? বৃদ্ধ আমার মনেব তাব বুঝিলেন, তাহাব মুখে নিদাঘ-সন্ধ্যার দিকচক্রবালে—বিজ্ঞাৎ বিকাশের ন্যায়—হাস্য-রোমা ফুটিয়া উঠিল।

আমার কাণের কাছে মুখ, আনিয়া—বৃদ্ধ বলিয়া কেলিলেন—"আমি চুলে কলপ লাগাইয়াছি। অনেক কবিরাজের মরণাগত হইয়াছিলাম,—জলের মত টাকা খরচ করিয়াছিলাম,—কিন্তু কোন কবিরাজই আমার ভাল কলপ দিতে পারেন নাই। শেষে—একখানা ইংরাজী 'খবরের কাগজে'—এই কলপটির বিজ্ঞাপন পড়িয়া কিনিয়া আনাই। ইহাতেই আমার শাদা চুল কালো হইয়া গিয়াছে। এখন আমি বোধ হয় জোর গলায় বলিতে পারি—আয়ুর্কেদে এমন উৎকৃষ্ট কলপ নাই। এই বিলাতী কলপটির নাম—'মর্গিষ্টার, আপনি শিখিয়া রাখুন, অনেক সময় কাজে লাগিবে।"

আমি আজীবন আয়ুর্কেদের উপাসক, আয়ুর্কেদের অনন্ত মহিমায়—বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান আমার কাছে এক হইয়া গিয়াছে। আমার সেই সব মুখ চঃখ মৃদন ধন আয়ুর্কেদকে—এই স্বার্থমাক্ত বৃদ্ধ—আজ আমারই সম্মুখে উপহাস করিতেছে? মরনোন্মুখের মাথার শাদা চুল কাল হয় নাই বলিয়া—সনাতন আয়ুর্কেদের অপূর্ণতা দেখাইয়া দিতেছে? মৃত্যুর এতম্পর্ক! রোযে—কোডে—আমার জন্মের কাটিয়া গেল। দেশের উপর অভিনান হইল। কলপের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিল, যে কলপ অবিধাব করিয়াছে—তাহার প্রতিও মনে একটা বিলাতীর ঘৃণা আসিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—মাত্রবের জীবনে যে এত কুহক, এত মার, এত সৌন্দর্য, তাহার পরিণাম কি? মৃত্যু! মরণের সম্মুখে জীবনকে উৎসর্গ করিতে হইবে। আমরা হিন্দু।

মৃত্যু আমাদের পক্ষে ভয়াবহ নহে, হৃৎকূর্ণীর কোতুল লইয়া—হিন্দু বারম্বার জন্ম গ্রহণ করিতে চাহেন। হিন্দু চার—মৃত্যু, অনিত্যের রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া নিত্যের কোড়ে স্থান। হার। জীবনের আবর্তে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা যেন মরণের ভাবনা ভুলিয়া না যাই। কক্ষ হইতে যেন কক্ষান্তরে না নিকশিত হই। কেন্দ্রস্থ হইয়া যেন স্থির থাকিতে পারি। আমাদের বিজ্ঞান বতরণ ছিল—ততক্ষণই জীবন; মৃত্যু আসিলে, রাজি আসিলে। “জীব জগৎ” বলিয়া এই দ্বিঘাট বিধ প্রদর্শনী ক্ষেত্রে—বয়সের স্বতন্ত্র বিভাগ—ক্রমস্তর আছে। হিন্দু ইহা চিরদিন বুঝে,—এমন হিন্দুর ঘেঁষে—কোন সৃষ্টি কুশলী প্রতিভা কলপের আবিষ্কার করিবে? হিন্দুর কক্ষক্ষেত্রে—চুলের কলপে কাজ কি? মাহুয চুলে কলপ দেয় কেন? কলপের অর্থ কি শাদাকে কাল করা, বয়সকে গোপন করা, যৌবনভীতের পক্ষে যৌবনে ভগ্ন করা। অন্তএব কপটতাই কলপের মূল। পূর্বে—কিশোরী বধু বিবাহিতা, কুমার—যৌবনের সূত্র লালসা বর্তমান, অথচ বৃদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হয়; এই অন্তই চুলে কলপ দিবার কয়োজন। বয়স বাটের কাছাকাছি, লোকে যেন ত্রিশের বেশী বলিয়া ধরিতে না পারে। যৌবন নাই; যৌবনের উদ্যম ভেজ উদ্ভাদনাও নাই, তথাপি বার্ককা বীকারে অসম্মতি, এক্রপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই চুলে কলপ লাগাইবে। উপস্থিত জন্ম ত্যাগ করিয়া বিগত যৌবনের জন্ত লাগারিত—কলপ তাহারই বিকাশ মাত্র। সংসারের ছায়াঙ্ক-

কারে—আপনার সঙ্গেও লুকোচুরি খেলা!

দাঁত পড়িয়া গেলে—দাঁত ধাবাইবার কারণ কতকটা বুঝিতে পারা যায়। চর্ম্মণের স্রবিকা হয়, কথাবার্তা কহিবার ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু চুলে কলপ দিবার সার্থকতা কি? কেবল প্রবঞ্চনা! আপনাকে প্রবঞ্চনা, পরকেও প্রবঞ্চনা। কলপের একমাত্র উদ্দেশ্য—প্রবঞ্চনা। হার বৃদ্ধ! আত্ম তুমি পক্ষ কেশে কলপ মাখিয়াছ, কিন্তু যম তাহাতে ভুলিবে কি? যৌবন আর ফিরিবো কি? বয়স স্থির হইয়া থাকিবে কি? তবে শুভ কেশ দেবাইতে তুমি কুশিত হও কেন? শাদা-চুলে কি শোভা নাই? যেহেতু কি মোক্ষা ছীন? আমাদের ভাববোধে—প্রাচীন ব্যক্তি সকলেরই পূজনীয়। প্রাচীনের পরামর্শে—সংসারের সর্ববিষ বিনষ্ট হয়, প্রাচীনের পরামর্শে যুবক মাথা হেঁট করে,—আমাদের আবার পাকাচুল চাকিবার চেষ্টা কেন? এ দেশে কলপের আদর কখনই ছিল না। যযাতির উপাখ্যান পড়িয়া দেখ—চিরযৌবন চিরস্থখের উপায় নহে। যযাতি বৃদ্ধ হইলেও চুলে কলপ দেন নাই, লোল চর্মে—অজুলেপন মাখেন নাই, আত্ম গহ্বরে কৃত্রিম দস্ত ধারণ করেন নাই,—তবুও প্রকৃত যৌবন ফিরিয়া পাইয়া ছিলেন। সে যৌবন সহস্র বৎসর ধরিয়া ভোগ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। যৌবনে তৃপ্তি কোথায়? তৃষা—কখনওশান্ত হয় না, অকাজ্জা মিটে না। জরা—যৌবনের স্বাভাবিক নিবৃত্তি। যৌবনের সলত অশান্তি উপস্থাব অপনীত হইয়া বার্ককা শান্তি ও শৃঙ্খলা

আনিয়া দেয়। চাকল্য—স্বৈর্যে পরিণত হয়।
কালের নিয়ম কি কলশে ফিরিতে পারে ?

অগতে যখন সত্যের সমাধর ছিল, সরল-
তার সম্মান ছিল, তখন কেহ কেশে কলপ
দিত না। যৌবন গেলে তখন যৌবনের সুখ-
লালসাও তিরোহিত হইত, বার্ককোর সঙ্গে
অনাবিল শুচিতা দেখা দিত, বিশ্বব্যাপ্ত
হ্রতক্রিয়া প্রলোভন রাশির মধ্যে আপনার
পথ খুঁজিয়া লইবার অস্ত শাধা চুলে কেহ
কালি লেপিত না। পাকাচুল হাতুধকে
পরিপূর্ণ এবং পবিত্র করে। জীবনের সম্যক
কৃষ্টি ও বিকাশ আনিয়া দেয়। পাকা-
চুলে—জন্ম তাহার অক্ষ কক্ষ গৃহ হইতে
নিষ্কাশ হইয়া বিশ্ব চরাচরে ছড়াইয়া পড়ে।
সমস্ত সৃষ্টির ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া যায়। পাকা
চুলে—প্রেমের প্রগাঢ় নিবিড় অমৃতত্ব,
তাহাতে তাহাতে আড়ম্বর বা তলী নাই
পুণ্যের পবিত্রতার তাহা উজ্জ্বল উদার আনন্দ
বহু। কাঁচাচুলের শোভা মাধুর্য্য মদিরতার
মিশ্রিতঃ—বসন্তের উৎসব কোলাহলে রাস্ত।
পাকাচুলের সৌন্দর্য্যে সমস্ত শরতের ডোংলা
চাল, কামনা কয়ের আশ্রয় প্রকাশ! সমাজ
যখন স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইত, লোকে
তখন বরষ বা বার্কিকা গোপন করিবার কল-
নাও করিত না। বাণ্যে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে
সংসারপ্রব, বার্ককো বিশ্ব বুদ্ধির বিরাম, তখন
ছিলনা প্রবন্ধনার আবশ্যকতাই ছিল না।
ক্রমে সমাজ ও জীবন সঙ্গী হইয়া আসিল,
নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট কর্তব্যের প্রতি আহা
নিখিল হইতে লাগিল, ভোগ লালসা প্রবল
হইল, বোড়শোপচাবে পঞ্চবাণের পূজা আরম্ভ
হইল। বৃদ্ধ বালিকা ভার্য্যা গৃহে আনিল,

পলিতকেশ দেখাইতে লজ্জা বোধ করিল,
তাহার মনে প্রের উঠিল, শাধাচুল কি কাল
করা যায় না? যায় বই কি। চুলের কলপ
অমনি আবিষ্কৃত হইল। সংসারে ও সমাজে
কৃত্রিমতা ও কপটতা আসর জাঁকাইয়া বসিল।

তখন চুলের কলপ গোপনে বিক্রয় হইত।
অনেক অর্থব্যয় করিয়া শাধাকে কাল করিতে
হইত। এখন কাগজে কাগজে কলপের
প্রকৃত বিজ্ঞাপন, গলিতে গলিতে অনায়াস
লভ্য কলপের হোকান। ক্রেতা বিক্রেতা
কাহারও লজ্জা নাই! লোক বুঝিতে পারিল
যে দেশে বাহাতুরে বৃদ্ধার অস্ত বালিকা বধু
পাওয়া যায়—সেদেশে কলপ পাওয়া যাইবে না
কেন?

হঃখের বিষয়—যে সকল দেশের অল্প-
করণে, এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে এত বিলাসিতা
বাড়িয়াছে, সে সকল দেশে বার্ককো কেবল
যৌবনের ইঞ্জির প্রবণতাই নাই, আরও
অনেক জিনিস আছে। যৌবনের উত্তম আছে,
উৎসাহ আছে, একাগ্রতা আছে, বার্ষশূন্য
পরিশ্রমের আদর্শ দৃষ্টান্তও আছে। আমা-
দের দেশে কি আছে? কেবল পাকাচুলে
কলপ দেওয়ার প্রথা আর মিথ্যা প্রবন্ধনা
ভণ্ডারী ও কপটতা। হায় প্রতারণা পরায়ণ
প্রেম পিরাস্ত বৃদ্ধ! তোমরা শাধা চুলকে
যেমন কাল করিবার কৌশল শিখিয়াছ, কাল
মুখকে তেমনি শাধা করিতে শিখিলেনা কেন?
তাচ্ছ হইলে যে অনেক লাভ ছিল। কিন্তু
কৈ, সে যে, অসম্ভব; কত সাবান কত
পাউডার, কত ডারমেটোন মিক অক্সোজ
কিছুতেই তোঁ কাল মুখ শাধা হইল না।
ক্যালিডরও কোন কাজে আসিল না।

আমাদের এক জনের মুখ ও গোবির মুখের মত হইল না। হইবে কেন? এ মুখ যে আগুনে পুড়িয়া কাল হইয়াছে। শত্রুর সোণার লজা দখল করিয়া এ মুখ 'তো' কাল হয় নাই, আত্মগৃহদাহের কলক কালি এ মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। বল দেখি 'ভাই! চুলের কলপ মুখে মাখিলে কেমন হয়? তাহাতে কি আতীর প্রাচীনতা বজায় থাকে? :

আমার মনে অহঙ্কার আছে—আমরা অস্ত্রের চেয়ে সনাতন ও প্রাচীন। কিন্তু সে অহঙ্কার টুকুও বুঝি বুঢ়িয়া যায়। আমাদের মধ্যে ধারা বড়, তারা যে যৌবনের তাণ পরিরাছেন। শুভ্রকেশ লইয়া, বার্ককোর বিজ্ঞতা বহুদর্শিতায় তন্ময় হইয়া আর যে কেহ শেষ জীবন পাশ্বিতে কাটাইতে সম্মত নহেন। এখন যে দিকে বাই—সেই দিকেই দেখি গত যৌবনের অস্ত্র অহুশোচনা। যৌবন নাই, যৌবনের প্রাণশূন্য প্রতিমূর্তি আছে। যৌবনের বল নাই, বিভ্রম আছে। যৌবনের দৃঢ়তা নাই, চাঞ্চল্য আছে; যৌবনের উৎসাহ নাই, লালসা আছে। চারিদিকেই দেখি চুলের কলপ; সব ঝুটা, সব মিথ্যা, সব প্রবঞ্চনা, সব অসার। বিলুপ্ত দাস। যদি সময় থাকিতে একটু সতর্ক হইতে, যদি যৌবনের চিহ্ন থাকিতে থাকিতে আত্মকর্মেদের রসায়ন তত্ত্বের শরণ লইত, তাহা হইলে যে তোমার

যৌবন স্থির থাকিত, অকাল বার্ককোর দ্রবনও তুমি অবসর হইয়া পড়িতে না। শাধা বাধার কলপ মাখিয়া—দিনের আলোর সত্ত্ব সাক্ষিতে না। আত্মকর্মে এমন ঔষধ আছে—বাহার প্রসাদে তোমার দেহে জরা আক্রমণ করিত না। বিশ্বাসিত্বের ত্রিবিজ্ঞা সাধনের মত—অনায়াসেই তুমি ঘরের তৃতীয় পক্ষকে শাসন করিতে পারিতে।

যে ভ্রম করিয়াছ, ভাল তো সংশোধন করিতে চাও না। তবে চালাও। কলপ দিয়া শাধা চুলকে কালো কর, বীধানো দীপ্ত বাহির করিয়া—যুবকের মাঝে বসিয়া কৌতুক হাস্যো মত্ত হও, বর্ষায়নী বসিতার বিরোগান্তে—বংশধর বর্তমানেও বালিকা বিবাহ কর, সংসারের চ'খে ভেদী লাগাও, যমকেও কঁাকি দাও, কিন্তু তোমার তবিত্যৎ বড় ভ্রমসাজ্বর। কিছুতেই তোমার পরিজ্ঞাপ নাই! শমন তোমার ছাড়িবে না, প্রতারক বলিয়া আমরাও তোমার গালি দিব। অন্তের স্বর্ঘ্যে কি উদয়ের আলোক শোভা পায়? গোপন অপরাধের সঙ্কোচে নিজের কাছেই তুমি নিজে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। এই কি তোমার কলপের মহিমা? ঐ শুন করি তোমার সংশোধন করিয়া কি বলিতেছেন। “—ওরে স্ববির। হুঃখ কেন, এলো মা হয় জরা তেবে দেখ, বীচার চেয়ে কত সহজ মরা।”

আর্য চিকিৎসা ।

[শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, চট্টোপাধ্যায় বি-এল]

—:~::~:~:—

ভারতের এই ধোর অন্নব্যয়ের কষ্টের দিনেও মহার্ঘ্যতর দিনে চিকিৎসা বিভাগটি এক বিষম সমস্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ের প্রতীকারের বিশেষ কোন চেষ্টা হইতেছে না ।

রোগ আমাদের দেশে বড় বেশী বেশী হইয়াছে এমনকি আহাৰ্য্য সংগ্রহ যেমন দৈনিক কার্যের মধ্যে প্রয়োজন, চিকিৎসক দেখান ও ঔষধ সংগ্রহ করাও সেইরূপ বা তদপেক্ষা বেশী আবশ্যকীয় কার্য হইয়া পড়িয়াছে । আমাদের দেশে বেরূপ দরিদ্রতার চরম সীমার আসিয়াছে ও লোক বেরূপ স্বাস্থ্যহীন হইতেছে তাহাতে চিকিৎসা—বাহ্যের উপযোগী ও অন্নব্যয়ে প্রাপ্য না হইলে যে আমাদের জাতির লোপ অনিবার্য্য সে বিষয় কেহ চিন্তা করেন না । পূর্ব্বের স্থায় চিকিৎসক নিরীভী নন । এখন ভক্তার কবিরাজ হাকিমের কলিকাতার সৌখে বিলাস বাসের খরচ, মোটর গাড়ীর খরচ—সবই বোগীর উপর নানারূপে আসিয়া পড়িতেছে, সেই জন্য অনেক গরীব চিকিৎসা করাইতে না পারিয়া অকালে কালকবলে পড়িতেছে । গল্পীগ্রামেত চিকিৎসক নাই বলিলেই হয় । হাতুড়ে বৈজ্ঞানিক আরও ভাষণ, কালের দ্বিতীয় মূর্ত্তি ধরিয়া অকালে বহু লোককে বস মদনে প্রেরণ করিতেছে । এখনও অনেক স্মৃতিচিকিৎসকের আবশ্যক । সকলেরই ইংরাজী চিকিৎসার দিকে দৃষ্টি ।

কিন্তু সে শিক্ষা কোন্‌দ্বারা পাওয়া যায় । কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, কায়মাইকেল কলেজে, ক্যাথলিক স্কুল প্রভৃতিতে প্রবেশ করা কি ব্যাঘাত তাহা অনেকেই জানেন । বি, এস সি, এম, এম, সি, —তাল তাল মুকুনি, এখানে ওখানে দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতিতে অর্থ ব্যয়ে তাহার পর কাহারও ভাগ্যে প্রবেশ লাভ ঘটিল কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না । বাহ্যিক ঘটিল না তিনি হতাশ হইয়া চিকিৎসা শিক্ষা ত্যাগ করিলেন আর বাহ্যিক ভাগ্যে প্রবেশ লাভ ঘটিল তাহার বিপুল অর্থব্যয়, শারীরিক পরিশ্রম ও বৎসরের স্থানে কাহারও ৮ বৎসর কাল শিক্ষালাভ, ব্যাপারতো এই, তাহার পর কেহ পান হইয়া বাহির হইলেন, আর যিনি মধ্যেই বহিষ্কৃত হইলেন তিনি বাঁড়ের গোবর হইয়া আসিলেন ঐ সব দেখিয়া স্তম্ভিত ও আমাদের দেশের লোক ইংরাজী চিকিৎসার পক্ষপাতী । দেশের বড় লোকেরাও ছু চারটি আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় স্থাপনও তাহার সূচকরূপে সঞ্চালনও করিতেছেন না ও কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজগণ নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছাত্রগণকে সংশ্লিষ্টা নিজের অভিজ্ঞতার ফল জানানাইতেছেন না । ইহা অপেক্ষা আমাদের দুর্দ্দশা কি হইতে পারে । ধাহারা ইংরাজী চিকিৎসাগারে স্থান না পান তাহারা কেন যে আয়ুর্বেদোক্ত বা হাকিমী চিকিৎসা শিক্ষা করিতে

প্রয়াস পান না তাহা আমি এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। একজন কলিকাতা প্রবাসী আমেরিকান বলিয়াছেন যে, ভারতের অভ্যদয় দুইটি কার্যের দ্বারা হইবে ; প্রথম কৃষিকার্যের উন্নতি, দ্বিতীয় আয়ু-কর্ম্মীয় চিকিৎসার প্রচলন। আমাদের দেশে দুইটির প্রতিই লোকের দৃষ্টি নাই। তাহার নানা কারণ। চিকিৎসক পাইলেও ঠিক ঔষধ মিলে না, ঔষধ পাইলেও রোগী বা তাহার আত্মীয়স্বজন সহজপ্রাপ্য বহু মূল্য ঔষধ বরং দিবে কিন্তু একটু পরিশ্রম দ্বারা অল্প মূল্য বা বিনামূল্যে প্রাপ্য ঔষধ দিবে না। একবার আমার কোন বন্ধুর পুত্রের সর্দি কাশী হওয়ার আমি তাঁহাকে বলি যে, আপনার পুত্রকে বাসকপাতার রস মধু দিয়া শ্রোতে খাওয়ান, সর্দি কাশী ভাল হইয়া যাইবে। তিনি অত কষ্ট কে করে বলিয়া এক শিশি সিরাপ অফ্‌ বাকস্‌ ৫০ আনা দিয়া কিনিয়া আনিয়া পুত্রকে সেবন করাইতে লাগিলেন ; তাহাতে বড় ফল হইল না, কিন্তু আর একটি লোক এই কথা শুনিয়া বাকস পাতার রস ও মধু সেবন করাইয়া তাঁহার কঠোর সর্দি কাশীর উপশম কর্দ্দান। ফল কথা ; এ দোষ আমাদের খুব যে, আমরা দুই আনা পরস্য খরচ করিয়া ৭ দিনের পাঁচন সংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হই, কিন্তু দুই টাকা দিয়া শিশির তৈয়ারী ঔষধ কিনিতে কুণ্ঠিত নহি।

এখন দেখিতে হইবে কোন প্রকার চিকিৎসা আমাদের দেশের উপযোগী ? আমি যদি বলি যে, কবিরাজ* বা হাকিমী চিকিৎসাই ভাল, অমনি আমাকে অনেক লোক গালাগালি করিবেন, কিন্তু সেই গালা-

গালি দিবার পূর্বে একবার বিচার করিয়া পাঠক মহাশয় দেখুন দেখি, কোন্‌ চিকিৎসা আমাদের উপযোগী ? অনেক বলিবেন, ম্যালেরিয়া হইয়াছে কুইনাইন না দিলে কি করিবে ? আমি জিজ্ঞাসা করি, কুইনাইন দিয়া ম্যালেরিয়ার বিষ নষ্ট করিলেন, কিন্তু কুইনাইন দ্বারা শরীরের যে অনিষ্ট হইল, তাহা যায় কিসে ? কুইনাইন সেবনের অনিষ্টকারিতা কিঞ্চিৎ পাঁচন ভিন্ন নষ্ট হয় না ইহা বহুবার দেখা গিয়াছে ও অনেকের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও আছে, সেই জন্য এ বিষয় আর বেশী বলিলাম না। আমাদের শাস্ত্রে আছে :—

“বস্ত্র দেশস্ত যো জন্তু-তজ্জং তদৌষধম্‌ হিতম্‌”

যে ব্যক্তি যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সেই দেশ জাত ঔষধই তাঁহার পক্ষে হিতকর। ডাক্তারি ঔষধ অধিকাংশই ইয়োরোপে প্রস্তুত। তাহা শীতপ্রধান দেশে ও সেই দেশের লোকের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত। তাহার পরিমাণও সেই দেশের লোকের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত। কাজেই উহা আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকের নিকট উগ্রবীৰ্য্য হইয়া উঠে ও তাহাতে উপকারের সহিত অনিষ্ট সাধনও করে। মনে করুন, আপনার দেহে একটি দশক বসিয়া দংশন করিতেছে। আপনি তাহাকে তিন উপায়ে নষ্ট করিয়া আপনার দেহ দংশন জালা হইতে রক্ষা করিতে পারেন। একটি স্থিতি লইয়া তাহাকে সরাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু স্থিতিটি ঠিক না লাগিলে শরীরে আঘাত লাগিতে পারে। ইহার সহিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার তুলনা হইতে পারে, অনেক পড়িয়া অনেক ভাবিয়া ঠিক রোগ নির্ণয় করিয়া যে

ঔষধে এই সকল রোগের লক্ষণ মিলে তাহার প্রয়োগে এই রোগ উপশমিত হইতে পারে। এক বিন্দু ঔষধে মস্তকের জ্বর, রোগ সারিয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্ফুট লইয়া ক্ষুদ্র মশকের দেহ বিদ্ধ করা যেমন সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যিক সেই প্রকার রোগ নির্ণয় ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্বাচন করাও বিশেষ পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার আবশ্যিক। আবার ঔষধও ঠিক মত তৈয়ার ও ঠিক ক্রম ও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়াও আবশ্যিক। রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্বাচন আমার হাতে, কিন্তু উহার প্রস্তুত ও অবিকৃত অবস্থায় রাখা অন্যের হাতে ও সম্পূর্ণ আমার অজ্ঞাত। দ্বিতীয় উপায় মশককে এক চপেটাঘাত করা, উহাতে মশক ত মরিবেই, কিন্তু বাহার উপর এই চপেটাঘাত পড়িবে তাহারও মশক দংশন অপেক্ষা বাতনা অত্যধিক হইবে। মশকের দেহস্থ বিষও আমার শরীরে লাগিয়া লোমকূপদ্বারা শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবে। এই উপায়ের সহিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসার তুলনা হইতে পারে। এলোপ্যাথিক ঔষধ যদি বিজ্ঞ চিকিৎসক আমাদের দেশের লোকের উপযোগী মাত্রায় প্রয়োগ করেন, তবে অনেক ব্যাধির ভীষণ প্রকোপ অবস্থায় খুব ক্রিয়া করে, তবে সেই ক্রিয়ার স্থায়িত্ব বিবেচ্য। বিশেষতঃ এলোপ্যাথিক ইংজেক্সান-চিকিৎসা অত্যন্ত ধীরতা ও সতর্কতার সহিত প্রযুক্ত না হইলে অনেক সময় বিপরীত ফল প্রদান করে। তৃতীয় উপায় মশক নিধাকরণের জন্য কোন বিষাক্ত গব্য স্ত্যাক্ত তুলার গুলি দ্বারা মশককে

আবৃত করা, উহাতে মশকটি এই তুলার লাগিয়া যায় ও তুলার সহিত যে স্থত থাকে তাহাতে উহার দংশন জনিত আলা ও বিষ নিবারণ করে। আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধও সেই প্রকার রোগ নিরাময় করে এবং ঔষধ জনিত কষ্ট ও হয় না। তবে ইহাতেও বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা নির্ভর করে। রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্বাচন ও উপযুক্ত ঔষধও ইহাতে তদ্রূপই অত্যাৱশ্যক।

এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে রোগের প্রবলাবস্থায় হোমিওপ্যাথিক বা এলোপ্যাথিক ঔষধ ও ইংজেক্সান উপযোগী হইলেও কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসা যে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে সম্যক উপযোগী ও সম্ভা সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় উপযুক্ত ডাক্তারগণ তৎক্ষণাত উপযুক্ত ঔষধ না পাইলে কিছুই করিতে পারেন না। ঔষধের জন্য তাঁহারা অথের মুখাপেক্ষী ও ঔষধ ঠিক প্রস্তুত হইল কিনা ও তাহা পুরাতন হওয়ার হীন-বীর্ণ হইল কিনা, জানিবার উপায় একরকম নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কবিরাজ বা হাকিম-গণকে চিকিৎসা শিক্ষা কালেই গাছ গাছড়া চেনা ও ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা করিতে হয়। তাহার পর চিকিৎসা—শাস্ত্রমত অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তাঁহাকে নিজে কতকগুলি প্রচলিত ঔষধ তৈয়ার করিয়া চিকিৎসা করিতে বসিতে হয়। চিকিৎসার ঔষধের উপকারিতার হ্রাসবৃদ্ধি যেমন রোগীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তেমনি চিকিৎসকের রোগ

নিবারণের ইচ্ছা—শক্তির উপর নির্ভর করে।
 দ্রব্যগুণের সঙ্গে যে আর একটা আভ্যন্তরিক
 শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহা অনেকেই
 লক্ষ্য করেন না। যে ঔষধ দাতৃত্ব
 হইতে আরম্ভ করিয়া মসলাদি চূর্ণ করিয়া
 পাককার্য্য পর্য্যন্ত নিজ হস্তে শুদ্ধভাবে সম্পন্ন
 করিতে হয় তাহার ফল যে কত সুন্দর তাহা
 কি আর বলিতে হইবে? এম, এম, এম;
 এম, বি; এম ডি; পাশ করিয়া ডাক্তার
 বাবু হাটকোটী লাগাইয়া মোটরে চড়িয়া
 চিকিৎসা করিতে গেলেন। খুব আড়ম্বর
 করিয়া শরীরেও যথা স্থানে টেবেস্কোপ
 প্রভৃতি যন্ত্র গইয়া দেখিয়া রোগীর ক্ষত প্রেস-
 ক্রিপসান লিখিয়া দিলেন, কিন্তু এমন ঔষধ
 দিলেন যে সহজে বা বাথগেট ভিন্ন অস্ত্র
 পাওয়া গেল না বা কোথাও পাওয়া গেল না,
 কেহ বলিলেন,—উহা নূতন ঔষধ। বিলাত
 হইতে আসিতেছে, এখনও পৌছায় নাই,
 অমনি ডাক্তার বাবুর বাহাজিরির সুনাম পড়িয়া
 গেল, এ দিকে রোগী রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট
 করিতে লাগিলেন। আমাদের দেশের লোক
 এমনই মুর্থ যে, একজন বিজ্ঞ কবিরাজ
 বা হাকিমকে ডাকাইয়া তাঁহার নিকটে যে
 ঔষধ আছে বা ঘরের পাশে বাহা পাওয়া
 বাইতে পারে তাহা দিবার কোন চেষ্টা
 করিলেন না।

এ বিষয়ে একটি ঘটনা বলা বোধ হয়
 অব্যক্তিক হইবে না। আমাদের গ্রামের নিকট
 একটি গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের কবিরাম
 জ্বর হয়, সেই জ্বর ১৭ দিন ভোগ করার পর
 তাঁহার প্রসাব রোধ হইয়া যায়। একজন
 ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন। প্রসাব

রোধের পর সেই রোগী কতকটা অজান
 হইয়া পড়েন। ডাক্তার বাবু আসিয়া
 বলিলেন যে ক্যাথিটার দিয়া প্রসাব করাটতে
 হইবে, কিন্তু রোগী খুব ভয়ানক, জ্বরে প্রবল ও
 তাঁহার নিকট ভেতন ক্যাথিটার নাই, তখন
 রোগীকে অতিকষ্টে সামান্য মত ঔষধ খাওয়ান
 চলিতেছে। তিনি এক রকম জবাব দিয়া
 চলিয়া গেলে একজন কবিরাজকে ডাকা
 হইল। তিনি সব দেখিয়া শুনিয়া পুঙ্খ
 হইতে একটা ব্যাং ধরিয়া আনিতে বলিলেন,
 সেই ব্যাংটি রোগীর নাভির নীচে রাখিয়া
 তাহার উপর একটা বাটি চাপা দিয়া কবি
 রাজ মহাশয় বাথিলেন, কিছুক্ষণ পরে রোগী
 প্রচুর প্রসাব ত্যাগ করিয়া ফেলিল ও জ্ঞান
 আসিল ও ক্রমশঃ সেই কবিরাজের চিকিৎসার
 আরোগ্যলাভ করিল। এখন পাঠক মহাশয়
 বুঝিয়া দেখুন কোন্ চিকিৎসা আমাদের
 বিশেষ উপযোগী?

আমার একজন বন্ধু ডাক্তার এম, বি
 পাশ। খুব ভাল চিকিৎসক বলিয়া খ্যাত ও
 গডর্নমেন্ট পেন্সনার, তাঁহার পা মচকাইয়া
 যায়, তাহাতে খুব কষ্ট পান, আমার বাড়ীতে
 রোগী দেখিতে অতিকষ্টে আসেন, আমি
 বললাম, আমার নিকট মহাশয় তৈল আছে,
 আজ রাত্রে শুইবার সময় বেশ করিয়া মাশিশ
 করাইয়া আকন্দ পাতা দ্বারা সেক করাইয়া
 তুলা দিয়া বাধিয়া রাখিয়া দিবেন। তিনি
 তজ্জন করার বলিলেন যে “আমার পারের
 বাণা একদিনে অর্ধেক সারিয়া গিয়াছে। উক্ত
 তৈল for Superior to my Echthiol
 Belledona ointment মলম হইতে
 বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। ঐ তৈলে যে কেবল

আমার বেদনা নিবারণ হইতেছে তাহা নহে, শুইবার সময় আমার এত পা জালা করে ভিজা গামছা পারে জড়াইয়া শুইতে হয়। উক্ত তৈল পারে মালিশ করার বেদনার উপশম ও জ্বালার শান্তি উভয়ই হইয়াছে।

আমার আর একটি ডাক্তার বন্ধু এল, এম, এম ৩৪ দিন গৃধ্রনী-বাতে শয্যাশায়ী অবস্থায় নানা প্রকার ঔষধ ইন্জেক্সনাদিতে উপকার না পাইয়া আমার নিকট মহামাঘ তৈলের সন্ধান পাইয়া উহার কিঞ্চিৎ লইয়া কোমরে দুই দিন মালিশ ও সেকের পর এক মাইল পথ হাঁটিয়া বাইতে সক্ষম হন।

কবিরাজি তৈলের যে কি গুণ তাহা যিনি বধার্থ শাস্ত্রীয় মতে প্রস্তুত তৈল ব্যবহার করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন। তৈলে ও ঘূতে পাককৃত ঔষধের কিছু অংশও থাকে বলিয়া বোধ হয় না, কেবল সকল দ্রব্যের শক্তি গ্রহণ করিয়া লোমকূপ দ্বারা শরীরে প্রবেশ করিয়া অদ্বৃত উপকার হইয়া থাকে। এমন ঔষধ কি আর পাওয়া যায়?

আমাদের শরীরে অহরহঃ ক্ষয় কাণ্ড চলিতেছে, উহা পূরণ না হইলেই আমাদের আয়ুক্ষয় এবং অকালমৃত্যু হয়। সহজ শরীরে যে ক্ষয় সাধিত হয় রোগের দ্বাংস প্রায়াস দীর্ঘ ও ঘন ঘন হওয়ার ঐ ক্ষয় ক্রিয়া আরও বেশী হয়। সেই জন্য রোগের ঔষধের সঙ্গে ঐ ক্ষয় ক্রিয়ার দ্বাংস করার চেষ্টা না করিলে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা হয়। হোমিওপ্যাথিক বা অ্যালোপ্যাথিক ঔষধে উহার পূরণ হয় না বলিয়া ডাক্তারেরা নানা প্রকার ঔষধী ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাহাতে কখনও

কখনও অনিষ্টও হয়। রোগের সময় যেমন ঔষধের আবশ্যক, তেমনি শ্রমণ্যও আবশ্যক। আয়ুর্বেদীয় ঔষধে রোগ নিবারণের শক্তি ও আহার্য ক্রিয়া দ্বাংস শরীরের ক্ষয় পোষণের ক্রিয়া যুগপৎ সাধিত হয়। অধিকাংশ লোহ ঘটিত ঔষধ এই কার্য সাধন করে। ডাক্তারি লোহে—কোষ্ঠকাঠিন্য করে, কেবল ferration Albuminatedর বর্ণনা ততটা করে না, কিন্তু কবিরাজী শোধিত লোহ অমৃত তুল্য। উহাতে কোষ্ঠ কাঠিন্য না হইয়া কোষ্ঠ শুষ্ক হয়। তাহা ছাড়া স্বর্ণ ঘটিত ঔষধে, আয়ুর্বেদোক্ত ঘৃত তৈলে রোগ নিবারণ ও শরীরের পুষ্টিসাধন ও ক্ষয় নিবারণ যুগপৎ হইয়া থাকে। অনেক পাচনে খাত্তের কার্যও করিয়া থাকে। চ্যবনপ্রাশ, অমৃতপ্রাশ ঘৃত, অখণ্ডকাষ্যত বৃহচ্ছাগলাস্ত ঘৃত—গরম দুগ্ধ সহ সেবনে কি সুস্বাদু খাদ্যের সেবন করিয়াছেন তাহারাই বলেন এবং তাহাতে রোগ নিবারণ ও শরীরের পুষ্টিসাধন যে পৰিমাণে করে, তেমনিট বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন ঔষধে করিতে পারে না। কড়লিতার অগ্নে থাকিতে কত দুর্গন্ধ; তাহার সহিত চ্যবনপ্রাশের স্বাদের ও গুণের তুলনা হয় না।

ধনী-নিধন, রোগী-নী-রোগ—সকলের নিকট আমার প্রার্থনা যে, বাহাতে আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধের বহু প্রচলন হইয়া দেশকে দুঃখ দরিদ্রতা হইতে রক্ষা করে তাহার জন্য চেষ্টা করুন। বাহাতে আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে শব্দব্যবচ্ছেদ, শব্দ চিকিৎসা, শব্দ চিকিৎসা, ধাতবীকৃত, হাজারিগকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করুন। আর

মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিতে বাহারা স্থান না পাইয়া হতাশ হইরাছেন তাঁহারা আয়ুর্বেদ বিভাগেরে 'প্রবিষ্ট হইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ও চকিত দেশকে প্রাচ্য চিকিৎসা বিদ্যায় পুনরায় উন্নত করিয়া লুপ্ত বিদ্যায় পুনরুদ্ধার করুন। আমাদের যে সব বিদ্যা লোপ হইয়াছে পাশ্চাত্যশাস্ত্র হইতে তাহা লইয়া আমাদের আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানকে পূর্ণ করিয়া দেশের ভগ্নবাস্ত্য উদ্ধার করে ছাত্রগণ বধাসাধ্য চেষ্টা করুন। একলব্যের পণের দিকে লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্ত কলেজে প্রবেশে ভগ্নমনোরথ হইয়া আয়ুর্বেদ কলেজে

প্রবিষ্ট হইয়া দেশের মুখোচ্ছল করুন। ফল কথা যিনি যত রকমে পারেন, বাহাতে আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসা পূর্ণাঙ্গ হইয়া দেশেরোগ নিবারণে সক্ষম হয় তাহার চেষ্টা করুন। ব্রহ্মচর্য্য দক্ষা, গোপালন, গোসেবা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা জীবনকে স্মৃখী করিয়া "ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাণাং আরোগ্যমূলমুত্তমম্" এই বাক্যের মার্থকতা সম্পাদন করুন ও আপন আপন গৃহের নিকট বা বাগানে বা কলিকাতার ছাদের উপরে টবে টবে ভেষজ দ্রব্য সকল বধাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া রোপণ করিয়া রাখুন। করজোড়ে সকলের নিকট আমার এষ্ট অনুরোধ ।

মোদক রহস্য ।

(সম্পাদকীয়)

শ্রীমদনানন্দ মোদক নামক ঔষধি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অধুনা সর্বজন পরিচিত। বহু আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের বিজ্ঞাপন-পুস্তিকা খুলিলেই এই মোদকটির পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ চারি টাকা, তিন টাকা সেয়েও ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন, কলিকাতা সহরের রাজপথে, ফিরিওয়ালার কল্যাণে সাধারণে দুই চারিটি পরস্য দিয়াও ইহা কিনিতে পাইতেছেন। পানের দোকানে, মনিহারি দোকানেও ইহা দুই চারিটি পরস্য দিলে পাওয়া যায়। ফলে আয়ুর্বেদের একরূপ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ব্যবসায়ীদের পক্ষে বেক্রপ অর্থাগমের পথ পরিকৃত করিয়াছে,

অপরদিকে সেটরূপ উচ্চর আবাদ প্রচলনের জন্ত ইহা দ্বারা সাধারণের অনিষ্টও হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি, সেই জন্ত এই ঔষধটির সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব।

এই ঔষধটির প্রধান উপাদান হইল সিদ্ধিবীজ। এই ঔষধি প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির প্রয়োজন হয়—পারদ, গন্ধক ও শোহ—ইহাদের প্রত্যেকটি ১ তোলা, অল ৩ তোলা, কপূর, সৈন্ধবলবণ, জটামাঙ্গী, আমলকী, ছোট এলাইচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, জারফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বটিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামনহাটি, শুঠ, নাগেশ্বর,

কাঁকড়াশূরী, তালিশপত্র, কিসমিস, চিতামূল, দস্তাবেজ, বেড়োলা, গোরক্ষচাকুলে, দারু-
চিনি, ধনে, গজ পিপুল, শরী, বালা মুতা, গজ ভাঙ্গলে, ভূমি কুম্মাও, শতধূনী, আকন্দ
মূল, আলকুনী বীজ, গোক্ষুর বীজ বুদ্ধদারক
বীজ ও সিদ্ধি বীজ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১
তোলা। এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া
শতমূলীর রস দ্বারা বাটিয়া রোজে শুষ্ক করত
পুনর্বার চূর্ণ করিবে, তৎপর তাহার সহিত
শিমূল মূল চূর্ণ ১২৫০ তোলা এবং সিদ্ধি চূর্ণ
৩১৫০ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাগহস্ত দ্বারা
বাটিবে, তদনন্তর সমস্ত চূর্ণের বিশুদ্ধ পরিমাণ
চিনি লইয়া প্রথমতঃ ছাগহস্ত সহ উক্ত চিনি
বধা নিয়মে পাক করিয়া লইবে। তৎপরে
নামাইয়া উপরোক্ত চূর্ণ ঔষধ গুলি তাহার
সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পশ্চাৎ দারু-
চিনি, জেতপত্র, ছোট এলাইচ, নাগেশ্বর,
কপূর, সৈন্ধব লবণ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ
ইহাদের চূর্ণ এবং ঘৃত ও মধু অন্ন পরিমাণে
মিশ্রিত করতঃ মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে।

উপরে যে ব্যবস্থা গুলির ফর্দ দেওয়া হইল,
তাঁহার মূল্য কত পাঠক যদি বিবেচনা করেন,
তাহা হইলে এই মোদক তিনটাকা, চারি টাকা
সেরে এবং কিরিওয়ালার হাতে হুইচারি
পয়সার কিরূপ ভাবে বিক্রয় হইতে পারে তাহা
সহজেই বুঝিবেন। এখন অস্তান্ত জিনিসের
মত কবিরাজী জিনিসেরও যে দাম বাড়িয়াছে,
সে কথা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে।
সর্বাপেক্ষা এই মোদকের প্রধান উপাদান
সিদ্ধির মূল্য আগে ছিল তিনটাকা চারিটাকা
সের, এখন সেই সিদ্ধির মূল্য দাঁড়াইয়াছে
২০০ কুড়ি টাকা সের। এ অবস্থায় ইহা

কিরিওয়ালার নাই রাজ মুন্সে' কেমন করিয়া
বিক্রয় করিতে পারে তাহা পাঠকই অনুমান
করুন।

তা' ছাড়া এই মোদক প্রস্তুত করিবার
ব্যবহার শাস্ত্রে লিখিত আছে—

ভূতনাথে সুরপতো রতিনাথে তথৈবচ ।

হতভুক্তে গণনাথে মোদকাগ্রং নিবেদয়েৎ ।

মূলমন্ত্রঃ সমুচ্চা হতাননে সমর্পয়েৎ ॥

ততোহতিমস্রিতং । ওং হ্রীং শং সং অমৃতং

কুরু কুরু অমৃতে অমৃতোত্তরীর নমঃ হ্রীঃ

অমৃতং কুরুকুরু অমৃতেষ্বরায় স্বাহা ওং স্বাহা ।

ইতি মন্ত্রোপাতিমস্রিতং কৃত্বা পাত্ৰান্তরে

স্থাপয়েৎ ॥

অর্থাৎ ভূতনাথ, সুরনাথ, রতিনাথ এবং গণ-
নাথকে ইহার অগ্রভাগ নিবেদন করিয়া মূলমন্ত্র
উচ্চারণ করিয়া হতাননকে সমর্পণ করিবে।
সত্য করিয়া বলিলে, একপভাবে আভিমুখিত
করিয়া, কিরিওয়ালার হস্তে ইহা বিক্রয়ের
ব্যবস্থা কখনই হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু
আশ্চর্য্যের বিষয়, নেশা করিবার উদ্দেশ্যে ইহা
ক্রয় করিবার সময় সে সকল কথা বিচার
করিবার কাহারও আবশ্যক হয় না।

এই মোদককটি আবুর্কেদের রদায়ন ও
বালীকরণ অধিকারোক্ত ঔষধ। শাস্ত্র ইহার
কলশ্রুতিতে বলিয়াছেন,—

বিলাসার্থং প্রদোষে চ মোদকং পরিসেবয়েৎ ।

ত্রিসপ্তাহ প্রয়োগেন কামাকো'জায়েত নরঃ ।

কামতুলাং ভববেজ্রণং স্বরঃ পরভূতোপমঃ ।

খগতুলাং ভবেদৃষ্টি বুদ্ধেপ তরুণায়তে ॥

বীৰ্য্য বৃদ্ধি কর্তব্য শ্রেষ্ঠঃ জর। যুত্যা বিনাশরম্ ।

অপমার অরোম্মাদ ভয়ানিল গদাপহম্ ॥

কাসং খাসং সপৌখক ভগন্ধর শুদাময়ম্ ।
অগ্নিমান্দ্যমতীসারং বিবিধং গ্রহণী গমম্ ॥
বহুভূতং প্রমেহক শিরোরোগমরোচকম্ ।
হস্তি সর্কাম্ গদান্ ঘোরান্ বাতপিত্তবলাসজান্ ॥

অর্থাৎ ইহা দ্বারা জ্বর ও বার্কিকা জনিত
নানাবিধ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে ।
কথিত আছে, লঙ্কানাথ রাবণের মঙ্গল কামনার
দেবাদিদেব মহাদেব এই পরম কলাণকর
মহোষধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন । প্রকৃত
কথা বলিতে কি, যদি খাঁটি ভাবে এই মহোষধ
প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় কল
অনুযায়ী বহুবিধ ব্যাধিই ইহা দ্বারা আরোগ্য
হইয়া থাকে, কিন্তু যথাশাস্ত্র প্রস্তুত করিলে
ইহা যে স্বয়ং মলো—নাম মাত্র মল্যে, দুই
পয়সা চারিপয়সা করিয়া বিক্রয় করা যায় না,
তাহা অবিসংবাদিত সত্য ।

আয়ুর্বেদে শ্রীমদনানন্দ মোদক ভিন্ন
কামেশ্বর মোদক এবং আরও অনেক প্রকার
সিদ্ধি ঘটিত মোদক আছে । উহাদিগের
প্রস্তুতের ব্যয় শ্রীমদনানন্দ মোদক অপেক্ষা
অনেক কম । ঐ সকল মোদক প্রস্তুতে
পরিশ্রমও কম হইয়া থাকে । বাজারের
অনেক স্থলে কামেশ্বর মোদক বা ঐ জাতীয়

কোনো মোদক শ্রীমদনানন্দের নামেও
কেরিওয়ালাদের হস্তে বিক্রয় হইয়া থাকে—
এমন কথাও আমরা অবগত আছি ।
শ্রীমদনানন্দ মোদকের গুণের সহিত কামেশ্বর
বা অন্য মোদকের গুণেব যথেষ্ট পার্থক্যও
বিদ্যমান । শ্রীমদনানন্দ অপেক্ষা ঐ সকল
মোদকে মাদকতার শক্তি অনেক অধিক ।
সে ক্ষুণ্ণও বটে এবং ব্যয়ের সঙ্কোচের ক্ষুণ্ণও
বটে—অনেক ব্যবসায়ী কামেশ্বর বা ঐ জাতীয়
মোদককে শ্রীমদনানন্দ বলিয়া বিক্রয় করিয়া
থাকেন । ফলে ঐ সকল মোদকে সিদ্ধির
মাত্রা অধিক থাকায় আশাত মধুর সুখ বোধ
হইলেও ইহার পরিণতি স্বাস্থ্য হানি । সর্ব
সময়েই মনে রাখা উচিত, বাহ্য উত্তেজক তাহাই
পরিণতিতে অবসাদক হইয়া থাকে ! তা'ছাড়া
বিনাকারণে সাধ করিয়াও ঔষধ সেবন কর্তব্য
নহে । জ্বর এবং বার্কিকো যথাশাস্ত্র প্রস্তুত
শ্রীমদনানন্দ মোদক সেবন কর—যথেষ্ট কল
পাইবে, কিন্তু যুবা বয়সে সখ করিয়া নেশার
উদ্দেশ্যে ইহা কোনো ক্রমেই সেবন করা
সমীচীন নহে ; যিনি সে উদ্দেশ্যে ইহা
সেবন করিবেন—তাঁহাকে যে পরিণামে
অনুভূতাপ করিতে হইবে—সে কথা আমরা
জোর করিয়াই বলিয়া রাখিতেছি ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ ।

দেশীয়া চিকিৎসা ।—দেশীয়
চিকিৎসার উন্নতি করে, মাজার গবর্ণমেন্ট
তত্ত্বাবধায় বাবস্থাপক সভার সদস্য মহেশ্বর
ওসমান সাহেবের সভাপতিত্বে এক কমিটি

নিযুক্ত করিয়াছিলেন । সংপ্রতি ঐ কমিটির
রিপোর্ট বাহির হইয়াছে । কমিটির সভ্যগণ
ভারতের বিভিন্ন স্থান চাইতে তথ্য সকল
সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন

বে, ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিই ভারতবাসীগণের পক্ষে একান্ত উপযোগী। এই চিকিৎসা দ্বারা দরিদ্র ব্যক্তির বাহাতে অল্প মূল্যে ঔষধ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শল্য বিভাগেও বাহাতে ভারতীয় ঔষধ কার্য্যকারী হইতে পারে তজ্জন্ত কমিটি গবর্ণমেন্টকে চেষ্টাশীল হইতে বলিয়াছেন। কমিটির প্রস্তাব—লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে দেশীয় ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করুন।

ক্যানসারে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা।—হায়দারাবাদের শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র বিলাতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তিনি বিলাতের “বোরেন মাউথ ডেন একো” নামক পত্রে লিখিয়াছেন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার ক্যানসার রোগ অসাধ্য নহে, ইহা এই চিকিৎসার সহজ সাধ্য এবং কোনোরূপ ঔষধাদায়ক নহে। তিনি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা দ্বারা এই রোগে বহুস্থলে ফল পাইয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, যদি কোনো ডাক্তার আয়ুর্বেদ মতে এই রোগের ঔষধের তথ্য অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার শিক্ষা দানে প্রস্তুত আছেন।

সর্প দংশনের ঔষধ।—“হিতবাদীতে প্রকাশ, —রিঠা নামক যে ফল বাজারে কাপড় কাচিবার জন্য বিক্রীত হয়, সর্প দষ্ট রোগীকে সেই রিঠা খাওয়াইয়া দুমাইতে না দিলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত রিঠার আশ্বাদ মিষ্ট বলিয়া বোধ হইবে, সে পর্য্যন্ত শরীরে সর্পবিষ আছে বুঝিতে হইবে। রিঠার প্রস্তুত আশ্বাদ বোধ হইলেই

বুঝিতে হইবে, শরীরে আর সর্প বিষ নাই। একটা শিমূল ফুল বৃন্ত সহিত খাওয়াইলেও নাক সর্প বিষ নষ্ট হয়। যখন রোগী অচেতন হইয়া পড়ে, খাইবার সামর্থ্য থাকে না, তখনও যদি উক্ত শিমূল ফুল বৃন্ত সমেত কাটিরা মলদ্বার দিয়া বহু বোলে (Injection) শরীরে যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে রোগী অচিরে আরোগ্য লাভ করিবে।

দীর্ঘজীবী বাঙ্গালী।—বঙ্গের বারভূঁইয়ার অন্তর্গত বিক্রমপুরের স্বনামধন্য চাঁদরারের জনৈক বংশধর ঢাকা-তাজপুর নিবাসী অভ্যাসচরণ ভৌমিক মহাশয় ১১২ বৎসর বয়সে গত ২রা চৈত্র তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। এ দীর্ঘ বয়সেও তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্বে পর্য্যন্ত তিনি বসিয়া গীতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ বহু নরনারী এ দীর্ঘজীবীর শরণেই ঘেঁষিতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ভাগ্যে একরূপ সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করা প্রায়ই ঘটে না।—সাম্বলনী।

ছাত্রগণের সাহায্য।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের “চেষ্টায় ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলে প্রকাশ পাইয়াছে, শতকরা ৭১ জন ছাত্র কোনো না কোনো রোগে ভুগিতেছে। তাঁহারা কুটিশচার্জ, ইউনিভার্সিটি, সিটি, প্রেসিডেন্সী, বিভাগ-সাগর, সি, এম, এস এবং বঙ্গবাসী কলেজের ছয় হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পাঠকগণ ইহা হইতেই দেশের অবস্থা অনুমান করিয়া লউন।



আয়ুর্বেদ

৭ম বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল।

২ম সংখ্যা।

বসন্ত-প্রতিকার।

(কবিরাজ শ্রীমধুসূদন চন্দ্রসেন,
কাব্যভীষ, কবিচিন্তামণি)

—:0:—

(১) লক্ষণ ও প্রকার ভেদ

বসন্ত অতি ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগের প্রতিকার করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অর্থাৎ ঋষিদের যে সকল সহজলব্ধ নিরাময় ও অল্প ফলপ্রসূ মুষ্টিবোণ উপনিবদ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এখানে তাহা পাঠকবর্গের পরিজ্ঞানার্থ বিবৃত করা যাউতেছে। শরীরে যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটকের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহারই নাম বসন্ত বা মসুরিকা। হাম বা পুষ্টি এবং জল বা পানি বসন্তও এই ভীষণ বসন্তরোগেরই অধীক্ষর ভেদ মাত্র।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বসন্তরোগের উৎপত্তির কারণ বলিয়া যাহা বর্ণিত করা হইয়াছে, সেই কারণ পরস্পরায় যথো কক্ষ ও বায়ু অপেক্ষা পিত্তেরই অধিক প্রাধান্য সংঘটিত হইয়া থাকে। অধিকতর বসন্তের মিত্যাকার অস্তিত্ব সেই সেই পিত্তপ্রকোপকারক আহার ও ব্যবহার দ্বারা শরীরের রক্তেরও

প্রভৃতি ঘটনা থাকে। এই সকল আনবার্য কারণপ্রাচুর্য বশতই ভীষণ বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব-কালে পিত্ত ও রক্তদুষ্টিকারক আহার ও ব্যবহার হইতে সর্বতোভাবে প্রতি-নিবৃত্ত থাকা একান্ত কঠব্য।

পিত্ত বা রক্তদুষ্টি হইতে যে কলরোগ জন্মিয়া থাকে, সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গসেন প্রণীত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থে তাহা এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—

“পিত্তং শোণিতসংশ্লিষ্টং বদা হৃদয়তি ক্ষম্
তদা ক্লান্তস্তে পিড়কাঃ সর্ঙ্গগাজেষু দেহিনাম্”।

রক্তের সহিত মিশ্রিত পিত্ত স্বল্প হইলে তাহা সর্বদা শরীরে পিড়কা (ফোটক) প্রদীপ্ত থাকে ও তাহারই নাম বসন্ত বা মসুরিকা।

সামান্যের বসন্ত, ক্ষয়, জ্বর, বসন্ত ও সামান্যত ভেদে পাঁচ প্রকার বসন্তের প্রধানতঃ সমুদ্রণ করা হইয়াছে। রোগান্তি (হাম

বা সূত্র) কফ ও পিত্তজাত। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র সমাপ্তর করিয়া বাত, পিত্ত, ও কফ কর্তৃক বসন্তরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও সকল প্রকার বসন্তে পিত্ত বা রক্তের একোপই মুখ্য কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে এবং উপরে তাহার প্রমাণ ও সমুদ্রের করা গিয়াছে। এইরূপ রসকে সমাপ্তর করিয়া যে নাতিভর ও বসন্ত-প্রদ মুখসাধ্য বসন্তরোগ উৎপন্ন হয়, সাধারণ্যে তাহাই “পান বা জল বসন্ত” নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

উল্লিখিত সকল প্রকার বসন্তের মধ্যে রসপত, রক্তজ-পিত্তজ, রসেজ ও পিত্ত-রসেজ-জাত বসন্ত মুখসাধ্য বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। বাতজ, বাতপিত্তজ ও বাতরসেজ বসন্ত কষ্টসাধ্য অর্থাৎ কেবল সূচিকিৎসকের হাতে পড়িলেই এইরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা পাইতে পারে। বাত, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সরিষাত বশতঃ স্নাত বসন্ত এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্রজ বসন্তরোগ একেবারেই অসাধ্য—অর্থাৎ এই সকল বসন্তরোগে যথারীতি সূচিকিৎসা ও গুণগ্রহণ করিলেও কিছুতেই রোগের উপশম হয় না, প্রত্যুত রোগীর জীবনান্তই ঘটয়া থাকে।

বসন্ত অতি ভয়ানক জীবনহস্তারক ব্যাধি বলিয়া ইহার চিকিৎসা বিষয়ে প্রসিদ্ধ ভাব-প্রকাশ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

‘বহুবো ভিষজ্ঞো নাত্র ভেদজং যোজয়ন্তি হি।
কেচিৎ প্রযোজয়ন্ত্যেব..... ॥’

সাধ্য ও অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, বসন্ত রোগে ঔষধ প্রয়োগ বিষয়ে চিকিৎসকবৃন্দের মতবৈধ পারলক্ষিত হইয়া থাকে। একপ্রাণীয়

চিকিৎসক বলেন, এই রোগে কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। আবার অপর চিকিৎসকেরা বলেন, যখন ‘মনিবের’ মঙ্গল সাধন সমুদ্দেশ্যেই রোগে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রকটিত হইয়াছে, পরিণামে শুভ বা অশুভ—যেদুটি ঘটুক না কেন, রোগে অবশ্যই তাহার চিকিৎসা যথাবিধি করা আবশ্যক। এই মতই সর্বপ্রাণ অবলম্বনীয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে আরও সমুদ্রিত হইয়াছে,—

কশ্চিদ্ভিনাপি কন্তন সিদ্ধস্তাত্ত মন্থরিকাঃ।

দৃষ্টাঃ কজ্জ, তরাঃ কশ্চিৎ কশ্চিৎ

সিদ্ধিবিদা ন বা।

কশ্চিন্নৈব তু সিধ্যন্তি সাধ্যমানাঃ প্রযত্নতঃ ॥’

কোন কোন প্রকার বসন্ত বিনা চিকিৎসাতেও আপনি শীঘ্র উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কোন বসন্ত কখনও বা উপশম প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও বা কিছুতেই শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। আবার কোন কোন বসন্ত যথারীতি চিকিৎসিত হইলেও কিছুতেই উপশমিত হয় না।

শাস্ত্রে রোগের চিকিৎসা বিষয়ে যে প্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়াছে কাব্যভণ্ড সেই-রূপ বোধিতে পাওয়া যায়। কোন কোন চিকিৎসক বসন্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ বা ঐ রোগের নিকটে অবস্থিতি করাও বাহনীর মনে করেন না। অপরদিকেও দেখা যায়, অনেক বসন্তরোগ বিনা ঔষধে আপনি আপনিই অতি অল্প দিন মধ্যে উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাগা-ক্রমে এই প্রকার কোন বসন্ত রোগীকে

আপনার অধিকার মধ্যে পাইয়া, তাহার চিকিৎসক লোকসমাজ হইতে অতিরিক্ত ধন্যবাদ লাভ করিয়া আপনাকে বাস্তবিক কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন।

বসন্তরোগ আরোপ্য হওয়ার পরেও যদি সেই ব্যক্তির কুর্পার মণিবন্ধ গল্পবা অংশকলকে শোধ জন্মে, তবে তাহাও অসুখা বলিগাঠি পীরপণিত হইয়া থাকে।

এহলে মোটামুটিভাবে লক্ষণ ও সাধা-সাধার কথা উল্লেখ করিয়া যুষ্টিযোগ মতে সংক্ষেপে রোগের চিকিৎসা বিবৃত করা হইতেছে।

(২) অনাগত প্রতিবেদ

যে সকল ফ্রিয়ার অস্থিটান রোগ প্রকাশ হইবার পূর্বে করিলে আর শরীরে ব্যাধির (এহলে বসন্তরোগের) আক্রমণের সম্ভাবনা ঘূর হইয়া যায়, তাহারই নাম অনাগত প্রতিবেদ।

(ক) 'শিবাহি' ধারণ করা—এই প্রৌর উপদেশ। এহলে শিবাহি শব্দে কেহ কেহ বলেন, শিবা অর্থাৎ হরীতকী, তাহার অহি বা ঝাঁটি,—তাহাই ধারণ করা বিধেয়। বসন্তরোগের নিবারণ করলে হরীতকীর ঝাঁটি ধারণ করিতে বৃদ্ধ বৈদ্যগণের উপদেশ প্রসিদ্ধ আছে। আবার অত্র কেহ বলেন, শিবাহি শব্দে শৃগালের অহি। কৃত্রাকও বসন্ত-রোগের প্রতিষেধক, এই অত্র কেহ কেহ বলেন, শিবাহি নহে শিবাক অর্থাৎ কৃত্রাক, ইহার ধারণও বসন্তরোগের প্রতিষেধক। সুতরাং এইরূপ ব্যবহারও সঙ্গীতীন বলিগাঠি বোধ হয়।

(খ) ডাবের জলে ভাতপ চাউলের ভাত খুব বেগুতভাবে রান্না করিয়া—উহার হই তিন গ্রাস তিন বা সাত দিন কাল—আহার করিবার ব্যবস্থা। প্রথমে উহা খাইবার জন্য একটি সাধু গম্বীক তরু বর্জিত মহিলাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এইরূপ ব্যবহার সেই বংশে প্রচলিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

(গ) চৈত্র মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে একটি নূতন মাটির তলসীতে চূর্ণ মাখাইয়া রক্তবর্ণ পতাকার সহিত তাহাতে ঘূহী (মনসামিষ) বৃক্ষ রোপন করিয়া রাখিয়া দিলে, বসন্তরোগের বা অত্র সংক্রামক পীড়ার আক্রমণ নিবারিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এইরূপ ঘূহী বৃক্ষ রোপণ করিতে এখনও দেখা গিয়া থাকে। দ্রব্যোক্ত-নিহিত কি অলৌকিক শক্তি বর্তমান, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এইরূপ ব্যবহার যে হুপ্রাচীন ঋষিযুগেও বর্তমান ছিল, প্রসিদ্ধ চরকসংহিতার দ্রব্যের প্রভাব শক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ পাঠাই বৃষ্টিতে পারা যায়,—

‘বিষং বিষয়যুক্তং যৎ প্রভাবতন্ত্র কারণম্।

উক্তাভুলোমনঃ যচ্চ তৎ প্রাবতন্ত্রপ্রাবিতম্॥

ঋণীনাং ধারণীয়ানাং কশ্ব বদ্ বিবিধাশ্বকম্।

তৎপ্রভাবকৃতং তেষাং প্রভাবোহচিহ্ন্য উচ্যতে

কোন দ্রব্যের যে সকল গুণ বর্তমান আছে বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে অতিরিক্ত শক্তি সেই দ্রব্যের বা থাকিলেও যেখানে অচিহ্ন্য দ্রব্য-শক্তি বশতঃ সেইরূপ কার্যাস্তরের সংঘটন হইতে দেখা যায়, তাহাকেই ঐ দ্রব্যের ‘প্রভাব’ বলিয়া

শাঙ্কু অভিহিত করা হইয়াছে। এক বিধ বৈদ্যকি বলে অস্ত্রবিধ বিধের ফিলা কিস্টে করিতে সমর্থ হয় এক উদ্ভগামীও হয়, উহাট প্রকার প্রভাবকৃত বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। যদি বিশেষ ধারণ বশতঃ যে মানা বিধ অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাও প্রভাবের প্রভাব বশতই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(৩) সংশোধন ক্রিয়া

বসন্তরোগ উৎপন্ন হইলে, রোগীর ও রোগের কাবল বিবেচনা পূর্বক, অগ্রেই সংশোধন ক্রিয়া করা অবশ্য কর্তব্য। বসন্ত ও বিরচন প্রকৃতি ক্রিয়াকেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সংশোধন ক্রিয়া বলা হইয়া থাকে। রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বকও নিজ শরীরের অবস্থা ভালরূপে বুঝিয়া জোলাপ নিলে, আর রোগ হওয়ার ভয় থাকে না।

বসন্তের প্রথম অবস্থাতে পলতা, নিম্নস্থান বালক পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বচ, ইন্দ্রযব, ধূম্রমুখ ও ময়নাকল চূর্ণ মধোচিত মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে বসন্ত হইয়া শরীরের ঘোষ কমিয়া থাকে।

বসন্ত করাইলেও যদি এইরূপ বৃদ্ধি যায় যে, রোগীর শরীর হইতে ঘোষ সমূহ সম্পূর্ণরূপে নিঃসারিত হইয়া যায় নাই, সেট অবস্থাতেই তাহা হইলে তাহাকে যথোপযুক্ত বিরচন প্রদান করা কর্তব্য।

রোগী দুর্বল হইয়া পড়িলে, সংশোধক ঔষধ অর্থাৎ বসন্ত বিরচক ঔষধ না দিয়া, তাহাকে অবস্থা বিবেচনা পূর্বক ঘোষের অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফের শমনকারক ঔষধ প্রদান করিতে হইবে। সংশোধন ক্রিয়ায় দ্বারা ঘোষের লাঘব হইয়া পড়িলে,

বসন্তে কোলম্পন্ন রিকার থাকে না, বেবলার লাঘব হয়, তখন সমুদ্র শীতাই পার্থক্য উঠে তাহাতে অল্প পরিমাণ পুষ্কর্য্যাদি থাকে।

(৪) রোগের উপক্রমে

বসন্তরোগের প্রথম অবস্থাতে কুমরিয়া লতার কাথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে দুই আনা মাত্রাধঃ প্রক্ষেপ দিয়া পান করা কর্তব্য। শেয়াল কাঁটার মূল বাসি জল দ্বারা বাটুরা সেবন করাইলেও বসন্তের প্রতিকার হইয়া থাকে।

হলুদের পাতা যথোপযুক্ত মাত্রায় লইয়া বাটুরা শীতল জলের সহিত সেবন করাইলেও রোগের উপকার হয়।

(৫) রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা পরিহার—

শাস্ত্রকারগণ বলিয়া সিদ্ধান্ত, শরীরে সর্ব প্রথমে বসন্তরোগ উৎপন্ন হইয়া মাত্র, সেই অবস্থাতে যে কয়েকটি বসন্তের ফোটক ঘুট হইলে, পীড়িত ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্বক সেই কয়েকটি চামিরা পাতা ছিন্ন করিয়া ফোললে, আর বেশী ফোড়া হইবার আশঙ্কা থাকে না।

(৬) বসন্তে রস প্রয়োগ

শোষিত গন্ধক ত্রৈভাগ এবং শোষিত রস একভাগ দ্বারা কঙ্কণী প্রস্তুত করিয়া, তাহা যথোপযুক্ত মাত্রায় পানের রস সহ সেবন করাইলে বসন্তের প্রতিকার হইয়া থাকে।

(৭) বসন্তে দাহ নিবারণ

বসন্তরোগে নিবন্ধন শরীরের দাহ উপস্থিত হইলে, পানি ওলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, দাহ নিবারিত হইবে। অধিকন্তু এই মধু মিশ্রিত

কল পান দ্বারা। বসন্তরোগেরও উপশম হইয়া থাকে।

(৮) : কায় শোধন

চাণিত্যর ছাল দ্বারা শীতকষায় প্রস্তুত কবিয়া এই কাথ দ্বারা শরীর ধোত করিলে, বসন্তের রোগ বিমুক্তি হইবে। পাচন প্রস্তুত করার নিয়মে পূর্বদিনে কুমার প্রস্তুত কবিয়া রাবিয়া পর্বদিন, উহা ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপ কাথকেই আবুর্কেষ নামে শীতকষায় বলা হইয়া থাকে। এহলে বড়ক পানীয় বিধানই খোত করাইবার ক্ষম শীতকষায় প্রস্তুত করা বিধেয়।

(৯) ধূপ

কচ, বাণেশ নেলি, বব, বাসকমুলের ছাল, কাপাস বীজ, ব্রাহ্মীশাক, তুলসীপাতা, আশানীক, লাক্স ও শুভ-নগরোপে ধূপ প্রদান করিলে, সকল প্রকার বসন্ত ও অন্ত্রবিষ ত্বরোগেরও উপশম হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে এহলে ধূপদ্রব্যের সহিত বিব প্রদান করাও কর্তব্য;—কিন্তু বিজ্ঞ প্রবীণ আবুর্কেষদাত্তি ব্যক্তিগণ বসন্তরোগের সকল অবস্থাতেই কোন প্রকারে বিবের সম্পর্ক রাখা—খোসীর জীবনের এক চিত্তজনক নহে, এই কথা দৃঢ়তার সহিত বোঝা গিয়াছেন।

(১০) কণ্ঠ্যর ও পাচন ব্যবস্থা

নিমছাল, ক্ষেতপাঁপড়া, আকনাদি, কটকি, পাতা, বাসকমুলের ছাল, ঝালতা, আমলা, বেগুন মূল, রক্তচন্দন ও খেতচন্দন,—এই সকল দ্রব্য যথোপযুক্ত মাত্রার সমতাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, অর ও বিসংযুক্ত জিম্বার জাত বসন্তরোগেরও শান্তি হইয়া থাকে।

বসন্তের শুষ্ক বসিয়া গেলে, এই পাচন ব্যবহারে তাহা পুনরায় বাগিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এটি পাচনটি সকল প্রকার বসন্তরোগেই বিশেষ কলপ্রদ ও নিরাপদ বসিয়া আমাঙ্কের অদ্যাপক পুষ্টিপান মহামহোপাধ্যায় ৩৩৪৮কা-খি সেন কবিরাজ মহাশয় ইহা বিশেষরূপে ব্যবহার করাইতেন।

(১১) শীত পাকাইবার উপায়—

টাবা লেবুর কেশব কাঁজি দ্বারা বাটিয়া সেলেপ দিলে শীতই বসন্তের শুষ্কিকান্তালি পাকিয়া উঠে, এবং উহাতে দাহও নিবারণিত হইয়া থাকে।

(১২) পানিবাহ নিবারণ।

পঞ্চমের উৎপন্ন বসন্তসমূহ অন্ত্যস্ত দাহ জন্মাইয়া থাকে। চেলেনি কল দ্বারা বারংবার পা ধুইলে, সেই দাহ ঘূর হয়।

(১৩) পকাবেস্থায় ব্যবস্থা।

বসন্তের পকাবেস্থায় বায়ুর প্রকাশ অভি-শয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এইজন্য বসন্তের এই অবস্থাতে বিশোধন অর্থাৎ স্ফটিকীকরণ করা কোনমতেই এই রোগ নিশীড়িত ব্যক্তির পক্ষে শুভজনক হয় না;—প্রত্যুত এইরূপ অবস্থাতে সংবৃদ্ধ অর্থাৎ পুষ্টিকারক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই পীড়িত ব্যক্তির জীবন কামনার সৃষ্টিকিংসকের কর্তব্য।

এই পক অবস্থাতে গুলক, বটমধু, কিস-মিস ইকুমূল ও দাড়িমছালের কাথে উপযুক্ত-রূপে ইকুগুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে শীতই বসন্তের ফোটকগুলি পাকিয়া উঠে এবং বায়ুরও শান্তি হইয়া থাকে।

(১৪) বাৎসর্য ব্যবস্থা ।

বসন্তের পক্ষ অবস্থাতে কক্ষজিহ্না নিবন্ধন বায়ুর অভ্যন্তর প্রকোপ হইয়া পড়িলে, সেই অবস্থাতে পীড়িত ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়, আস্থান (গেট্‌কাপা) এবং কক্ষ প্রভৃতি বায়ুজাত উপদ্রবসমূহ জন্মিয়া থাকে । এই অবস্থাতে চাতক ও ভিত্তির প্রভৃতি পাণীয় বাৎসর্য অন্নমাত্রার সৈন্ধব সহযোগে প্রদান করা কর্তব্য ।

(১৫) অকচি ।

বসন্তরোগে অকচি হইলে, অন্নবাড়িমের রসের সহিত মৃগ, বা ময়ুরির ঘূ পান করিলে, বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । খয়ের এবং নীতলাল দ্বারা মাষিত নীতলাকাথ পানেও অকচি ঘূ হয় ।

(১৬) শৌচ ।

খয়ের কাঠ ও চামিলাছালের বড়কপানীর বিধানে অর্ধেক জন শুকাইয়া সেই কাথ বসন্তরোগে শৌচজিয়ার জন্য ব্যবহার করা কর্তব্য ।

(১৭) সুখ ও কঠরোগে ।

জাতোপত্র, মজিষ্ঠা, দাকহরিজা, স্মপারি, শরীকাঠ, আমলা ও বটীমধু দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া নীতল অবস্থাতে তাহার সহিত মধু মিশ্রিত কারয়া, সুখ ও কঠরোগে পুণ্য ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইবে ।

(১৮) চক্ষুঃ রোগে—

শুলক ও বটীমধু জলের সহিত বাটরা লইয়া, বস্ত্রদ্বারা পুটলি বাঁধিতে হইবে । ঐ পুটলি জ্বলন্ত নিপীড়িত করিয়া চক্ষুতে সেক দেওয়া কর্তব্য ।

বটীমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শূচমুখী, দাকহরিজা, নীলোৎপল (হুঁদি) বেণারুল, লোণ ও মজিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য মিলিতভাবে অথবা পৃথকভাবে এক একটির দ্বারা অভ্যন্তর গ্রহণ করিয়া প্রণেপ অথবা কাথ দ্বারা অভ্যন্তর কারলে নহনগত বসন্তের উপশম হয় এবং কোড়া গুলিয়া গিয়া চক্ষুর অনিষ্ট ঘটবার কোন আশঙ্কা হইতে পারে না ।

(১৯) পূর্ব হইলে তাহার প্রতিকার—

বসন্তের ফোটকে পূজা হইলে বট, অম্বপ, পাকুড়, বজ্রমূর ও বকুলের ছাল চূর্ণ তাহাতে ব্যবহার করা বিধেয় । ঘূঁটের ছাই অথবা শুক গোবর চূর্ণ পুরোক্তরূপে ক্রম বিবারণের জন্য প্রয়োগ করা বিহিত ।

(২০) ক্রিমি নিবারণ—

বসন্তের ফোটকে ক্রিমি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা নিবারণের জন্য সরল, অন্তর ও শুষ্ক-জলু প্রভৃতি দ্বারা বেশ ঘূণ প্রদান করা কর্তব্য । কারণ এইরূপ ঘূণ ব্যবহার দ্বারা আকুরের বেদনা ও দাহের শান্তি হয় এবং পূর্ব নির্মিত হইয়া ফোটকগুলিও বিলুপ্ত হয়, অধিকন্তু ক্রিমি ভক্ষিতে পারে না এবং শাশ্বত পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে ।

(২১) কঠুত্ব

এই রোগে গরার রেম্মার প্রকোপ বৃদ্ধি হইলে পিপ্পল ও হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে । কঠুত্বের জন্য অষ্টালাবলেহ অথবা আদার কবল ব্যবহার করাও বিহিত ।

(২২) মেহ প্রয়োগ

বসন্তরোগের পান, অভ্যন্তর ও ভোজ্য-দ্রব্যের সহিত পাকাত্ত দ্রব্য ব্যবহার করা

কর্তব্য। রোগরোগে অত্র যে সকল ঔষোগ বিহিত হইয়াছে। ইহাতে সে সকলও বিবেচনা পূর্বক ব্যবহার করা আবশ্যিক, কিন্তু বসন্ত রোগে তৈলের ব্যবহার সর্বথা দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রাচীন ও প্রবীণ বিচক্ষণ আয়ুর্বেদ আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যথা,—

‘পঞ্চতিত্ত্ব প্রযুক্ত পানাত্যক্তনভোজনে।
কৃত্যাদ্ ব্রণবিধানঞ্চ তৈলানীন্ বর্জয়েচ্চরম্ ॥’

অর্থকথ্য—

বাতঃ শ্বেদঃ শ্রমঃ তৈলং ওষধিঃ, ক্রোধমাতপম্।
কটুঃ বেগঃ রাগঞ্চ মসুরিগদবাংস্ত্যজেৎ ॥

মসুরিগাড়াক্রান্ত ব্যক্তি (বাহিরের) বাতাস বর্জন করিবে; কোনরূপ শ্বেদ (অগ্নির উত্তাপ) ও আতপ (রৌদ্র) গ্রহণ করিবে না; তৈল ব্যবহার করিবে না; ওষপাক, কটু (ঝাল) বা অন্নদ্রব্য আহার করিবে না; ক্রোধের বশীভূত হইবে না এবং মল ও মূত্রাদির বেগ ধারণ করিবে না।

(২৩) রক্ত মোক্ষণ।

বসন্তরোগে রক্তের বিকৃতি পরিলক্ষিত হইলে, অবস্থা বিশেষে রক্তমোক্ষণ করাও বিহিত।

(২৪) পাক্তের হর্গন্ধ নিবারণ।

হরিদ্রা, হারুহরিদ্রা, খেণারগুল, শিরিষ-পুল্প, মৃত্তা, লোধ, খেতচন্দন ও নাগকেশর— উপদ্রুত মাত্রায় সমান ভাগে গুইয়া বাটিয়া শরীরে মাখিলে বসন্তের হর্গন্ধ নিবারিত হয়।

এই ঔষোগটির দ্বারা বিস্ফোট, বিনশ, কুট, ও পাক্ত হর্গন্ধ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

(২৫) পথ্য ও অপথ্য

তাব প্রকাশ বলেন,—

‘মহাবিকার ভুক্তীত শালীন্ হৃদমসুরিকান্।

রগঃ মধুরমেবাভ্যং শৈন্ধবঃ চান্নমাত্রকম্ ॥’

বসন্তরোগে হৈমন্তিক ধাত্তের অন্ন, মুগ ও মসুর ডাইল, মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য সমূহ এবং অন্ন পরিমাণে শৈন্ধব লবণ সেবন করিবে।

অধিকন্তু বাত, পিত্ত ও ককের সংশ্রব অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত লক্ষ্য করিয়া নিরূপিত দ্রব্যগুলিও পথ্যস্বরূপে ব্যবহৃত হইলে, বসন্তরোগের উপশম হইয়া থাকে।

মুরাতন যেটে ধান, আমন ধান, বৎ, ছোলা, মুগ, মসুর ডাইল; প্রতুধ জাতীয় অর্ধাং পায়রা, ঘুঘু, চড়াই, জলকুটু ও ডাহক প্রভৃতির মাংস, করলা, উচ্ছে, নিম, কাকরোল, সন্নিয়া ও গটোল প্রভৃতি তরকারি কুল, কিদ্দিম্ ও ডালিম এবং এতদ্বিন্ন মেধাবর্জক ও পুষ্টিকারক অন্ন ও পানীয় অস্বাদ্য দ্রব্য বসন্তরোগে স্থপথ্য।

সংক্ষেপে বসন্তরোগের প্রতিকার কারক কতিপয় মুষ্টিযোগ এই প্রবন্ধে প্রকটিত করার জন্য চেষ্টা করা গিয়াছে। ইহা দ্বারা মানবের জীবন সুরক্ষিত হইলেই সেই প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করিবে। সর্বনিয়ন্তা ভগবান সকলেরই মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই প্রবন্ধ লেখকের আশ্বনিবেদন।

বৃশ্চিক দংশন চিকিৎসা।

(শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

পল্লীগ্রামে সর্পভয় যেমন, বৃশ্চিক দংশনের ভয়ও তরুণ আছে। কলিকাতা সহরেও বৃশ্চিক দংশনের ভয় অধিক পরিলক্ষিত হয়। বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসার জ্ঞাত করেকটি প্রত্যাক ফলপ্রসূ ঔষধ নিয়ে প্রকাশ করিতেছি।

বৃশ্চিকের বিষ প্রথমে অগ্নির দ্বারা দাহ এবং বিদ্যায়ণবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া দ্রুতবেগে উর্দ্ধে গমন করে। তৎপরে দষ্টস্থানে প্রত্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে।

সন্ধ্যাপ্রাণের বৃশ্চিকে দংশন করিলে, মানব-জন্মের নাসিকার ও জিহ্বার কার্য রহিত হয়। দষ্টস্থানের মাংস খসিয়া পড়ে।

“তেঁতুলে বিছা” কামড়াইলে হইট মাত্র দস্তচিহ্ন, “কাঁকড়া বিছা” কামড়াইলে একটি মাত্র দংশন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময় সর্পাবাত এবং বিছার দংশন প্রভেদ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সর্প ছোকল মারিয়া দংশন করে, বিছার ছোকল মারিতে পারে না, তবে কোন উচ্চস্থান হইতে পড়িয়াই কামড়াইতে পারে।

বিছা অত্যন্ত জোরে কামড়াইলে রক্ত পড়িতে পারে, সর্পদংশনে প্রায়ই রক্তপাত হয় না। বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে কোন প্রকার লালা লাগিয়া থাকিতে দেখা যায় না, সর্পদষ্ট স্থানের চতুঃপাশে সর্পমুখনিঃসৃত গোলা লাগিয়া থাকিতে পারে। সর্প বৃহৎ হইলে উহার দস্তকত যেক্রপ

বৃহৎ ও গভীর হয়, বৃশ্চিক দংশনাবাত তরুণ গভীর হওয়া অসম্ভব। বিছা কামড়াইলে দস্তাবাত অত্যন্তকাল মধ্যে মিলাইয়া যায়, সাপে কামড়াইলে দষ্ট স্থানের চারি পাশ নীলারক্ত হয় এবং তাহা অর্দ্ধ পরিমাণে ফুলিয়া উঠে। কিন্তু কিছুকণ পরে তাহা আবার কমিয়া যায়। বিছা কামড়াইলে নীড়ই সেই স্থান অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং তাহার চতুর্দিক লালায়ুক্ত হইয়া থাকে।

দষ্টস্থানে হল দিবিয়া থাকিলে নখ বা হস্তমুখ (সোঙ্গা) অথবা চাবিকাঠি বা লৌহ চোঙ্গ চাপ দ্বারা তাহা ফুলিয়া কেলিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

১। বৃশ্চিকদষ্টস্থানে অগ্রে গুণগুণুর খুল লাগাইয়া, পরে তাহাতে আকম্পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে কিংবা উহার আঠা লেপন করিবে।

২। কালকান্দুকার ডাটার নল নির্দোষ করিয়া কর্ণে ফুৎকার দিলে বৃশ্চিকবিষ শীঘ্র নিবারিত হয়।

৩। উষ্ণ পবাস্বত, সৈন্ধব লবণ ও গুড়ক মিশ্রিত করিয়া দষ্ট স্থানে লেপন করিলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

৪। কৃষ্ণ তুলসীর মূল বাটিয়া শুড়িকা করিবে। পবে সেই শুড়িকা দষ্টস্থানে বুলাইলে বিষ নষ্ট হয়।

৫। জীরা বাটিয়া দ্রুত ও সৈন্ধব দ্রবণের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মধুর সহিত দষ্টহানে প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়।

৬। হাতিতুঁড়া গাছের রস—বাছ ও আভাত্তর প্রয়োগে বিষ নিবারিত হয়। এক ছটাক সেব্য।

৭। হড়হড় গাছের পাতা মর্দন করিয়া তাহার আত্মাণ লইলে বুটিকদষ্ট ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নির্বিষ হয়।

৮। পাকা কাঁঠালি কলা চটকাইয়া দষ্ট হানে প্রলেপ দিলে অভাবে কাঁচাকাঁঠালি কলা বাটিয়া দষ্টহানে প্রলেপ দিলেও যন্ত্রণার উপশম হয়।

৯। বকুল বীজ—জলসহ পাথরে ঘর্ষণ করিয়া চন্দনবৎ হইলে দংশিত হানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ আলা-যন্ত্রণার নাশ হয়।

১০। শুষ্কী (তুঁঠ) পেষণ করিয়া নস্ত লইলে বুটিক বিষ নষ্ট হয়।

১১। আমড়া ছাল বা উহার কচিপাতা বাটিয়া দষ্টহানে প্রলেপ দিলে কিম্বা ঐ গাছের পাতার রস ছাঁচি শুড় সহ মিশ্রিত করিয়া দষ্টহানে লাগাইলে আলা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

১২। সাদা তৈরেণ্ডার আঠা দষ্ট হানে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে আলা নিবারিত হয়। উক্ত আঠা পুকুরিণীর কিল্লকে বা কাল করুণাতার রাখিবে, অন্ত পায়ে রাখিবেনা। ইহা পরীক্ষিত।

১৩। কাঁটা শাকের শিকড়ের রস পুনঃ পুনঃ লাগাইলে সঘর আলা উপশমিত হয়।

১৪। তামাকের শুক দষ্টহানে লাগাইলে আলা নিবারিত হয়।

১৫। বুড়িগোপন (মুবাফানী) পাণ্ডার রস দষ্ট হানে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে আলা নিবারিত হয়।

১৬। ছোট পেঁয়াজের রস দষ্টহানে বারবার লাগাইলে “বিছুর” দংশন জনিত আলা-যন্ত্রণা ও বিষ নষ্ট হয়।

১৭। আলকুশী বীজ জলে ঘসিয়া দষ্ট হানে দিলে “কাঁকড়া বিছার” কামড়ের আলা-যন্ত্রণা ও বিষ নষ্ট হয়।

১৮। হাঁকার কাঁইট (তামাক খাইলে নলিচার মধ্যে যে ময়লা হয়) দষ্টহানে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

১৯। তার্পিন তৈল দষ্টহানে বারবার লাগাইলে আলা নিবারিত হয়।

২০। হিং—জলে গুলিয়া চন্দনবৎ হইলে দষ্ট হানে বারবার লাগাইলে আলা উপশম হয়।

২১। ছাগল নাড়ি জলে গুলিয়া দষ্টহানে প্রলেপ দিলে আলা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২২। পাথুরিয়া করলা জল দিয়া ঘসিয়া চন্দনের মত হইলে দষ্টহানে লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২৩ গোমর (গোবর) উক করিয়া দষ্ট হানে প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয় ও আলা নিবারিত হয়।

২৪। লবণ—জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে কুটাইয়া ঐ জল দ্বারা প্রদাহিত হানে ফোমেণ্টেশন করিলে আলা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২৫। ফটকিরি ১ খণ্ড—চিমটা দ্বারা

অগ্নি নিধার বারণে গলিরা উঠিবে, সেই সময় দষ্টহানে ঐ উত্তপ্ত কটকিরি হাঁকা প্রদান করি। প্রাণ বিয়োগ সৃশী বাতনা হইলেও তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইবে, পুনঃ পুনঃ হাঁকা দিবে। ইহা পরীক্ষিত ; “কাকড়া বিছা” বংশের বজ্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয় ।

২৭। হরিদ্রা বাটা—দষ্টহানে প্রলেপ ও গাজে মাখিলে বিছার কামড়ানির জ্বালা নিবারিত হয় ।

২৮। কর্ক বা ছিশী তন্ন করিয়া তাহাতে চূণ মিশ্রিত করিয়া দষ্টহানে প্রলেপ দিলে বজ্রণা নিবারিত হয় ।

২৯। ধুনো—সরিষা তৈলের সহিত উত্তমরূপে কেনাইয়া দষ্টহানে লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয় ।

৩০। কালকচুর আঠা বা ঐ পাতার রস দষ্ট হানে দিলে জ্বালা নিবারিত হয় । বস্ত

ভলের পুশটিন লাগাইলে জ্বালার উপশম হয় ।

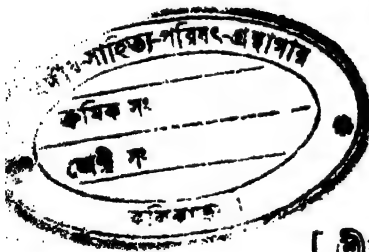
৩১। কৈচোর মাটি দষ্টহানে প্রলেপ দিলে বজ্রণা নিবারিত হয় ।

৩২। খাটি শুদ্ধক তামাক—অল্পে শুনিয়া হাঁকিয়া লইবে, পরে যোগীর যে অঙ্গে বিছা কামড়াইয়াছে সেই অঙ্গের বিপরীত কর্ণের মধ্যে উক্ত ত্রব্য গাএ কোটা দিলে জ্বালা-বজ্রণার নিবারণ হয় । ইহা পরীক্ষিত ।

৩৩। কচি কয়েতবেলের পাতা বাটিয়া দষ্টহানে প্রলেপ দিলে জ্বালা-বজ্রণা নিবারিত হয় ।

৩৪। পুকুরের বড় পানা বাটিয়া দষ্টহানে দিলে জ্বালা নিবারিত হয় ।

৩৫। ইংরাজী ১৮৪০ সালের রাণীমুখ টাকা—মুখের লালা (খুঁতু) দিয়া দষ্টহানে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে জ্বালা বজ্রণা ও বিব নিবারিত হইবে। ইহা পরীক্ষিত ।



বৈদ্যরাজ ।

[শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাত্ত্বরণ]

প্রবন্ধের শিরোভাগে নাম দেখিয়াই অনেকে হয়ত মনে করিবেন, আমি কোন বৈদ্যকুলশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবনী লিখিতেছি, কলে তাহা নহে। “বৈদ্যরাজ” নামে কোন বৃক্ষ আছে, তাহা অজ্ঞে অজ্ঞে বুদ্ধি পায়, ইহা

ঔষধ ও অস্ত্রপ্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ।

বনজ অনেক পদার্থ আছে—বাহার ব্যা-হার বা উপকারিতা আমরা অবগত নহি ।

বৈজ্ঞানিক নামক যে এক প্রকার গাছ আছে তাহা নাম 'ভেদে' সর্বত্র পরিচিত, 'কোথাও ইহা পৌত্তরাজ, রয়না, রণা প্রভৃতি নামে প্রদেশ-বিশেষে পরিচিত হইয়া থাকে। ইহা গ্রামের সাধারণ জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে, ইহা কেবল ক্ষুদ্র বৃক্ষ নহে, ইহার বড় গাছগুলি দ্বারা গৃহের সঁজাম, চৌকী, আলমারী, চেয়ার টেবল ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহার ছোট ছোট গাছ ও ডালপালা জালানী কাঠ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার এক প্রকার বীজ হয়, সেই বীজ দ্বারা তৈল প্রস্তুত হয়, এই তৈল কেরোসিনের আগমনের পূর্বে এ দেশে জালানীরূপে ব্যবহার হইত। এই তৈল কোন ঔষধ বা ঔষধরূপে ব্যবহারের কথা জানিনা। এই তৈল বেশ ঘন ও পরিষ্কার, আন্তে আন্ত জলে, ইহার আবাদ তিস্ত, এখন আর কোন গৃহস্থ ইহার বীজ সংগ্রহ করে না, বীজগুলি জমিতে পড়িয়া থাকে ও গাছের নীচে প্রচুর চারা জন্মে।

ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় সে কথা না জানিলেও ইহা জন্ত বিশেষের রোগ বিশেষে ব্যবহারের ফল দেখিয়াছি। একবার আমার একটা হাতীর পিঠে প্রকাণ্ড বা হয়, চিকিৎসক আনা ইয়া নিবৃত্ত করি। কিন্তু আমার কেমন এক খেয়াল হইল জানিনা, এই বীজের তৈল প্রস্তুত করিলাম, শ্রদ্ধের বস্ত্রের স্বর্গীর বিরাজচরণ গুণ্ড কবিরাজ মহাশয় আমাকে "বনৌষধি-দর্পণ" উপহার দিয়া ছিলেন, আমি তাহা দেখিয়া ইহার রোগ আরোগ্যের ক্ষমতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হই। বীজগুলি দিয়া তৈল প্রস্তুত হইলে

সর্বত্র আমি জালানী কার্যে ব্যবহার করি, পরে এই তৈল ও তৎসহ বিষকটু এবং আর একটা বনজ পদার্থ তাহাতে মিশাইয়া ঘারে ত্রাকড়া দ্বারা ভরিয়া দিতে থাকি, কয়েক দিন পর বা লাগ হইয়া তরিয়া শুকাইতে লাগিল, অবশেষে এই ঔষধেই হাতী আরোগ্য লাভ করিল। আমার বিশ্বাস, ঠিক এই তৈল অথবা ইহার অল্পবিধ সহকারী ঔষধেই হাতীটির রোগ আরোগ্য হইয়াছে। আমার একটা গাভীর শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা হয়, বোধ হয় তাহাই সংক্রামিত হইয়া ঘোড়াতেও আসে, আমি কেবল এই তৈল গরু ও ঘোড়াকে ব্যবহার করিতে দিরা ফল পাইয়াছিলাম। তাহার এই ঔষধে রোগমুক্ত হইল। উহাদের সকল স্থল ফুলিয়াছিল, তাহাতেও এই তৈল মালিস করিয়া দিতে লাগিলাম, অবশেষে ফুলা স্থানগুলিও আরোগ্য হইলে ফুলিলাম এই তৈলেরই এইরূপ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে।

অমিত এইরূপ ফল পাইয়াছি। মানুষের রোগে পরীক্ষা করিবার সাহস পাই নাই। আমার অভিজ্ঞতার সামান্য কথা বিবৃত করিলাম, আশা করি চিকিৎসকগণ ইহাকে ঔষধ রূপে ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। সর্বত্র প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। আর যদি কেহ ইহা ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে না চাহেন, তাহা হইলেও জালানী তৈলরূপে যদি ব্যবহার করেন, তবে নবাগত কেরোসিনকে নির্দোষ নও দিতে পারা যায়। তাহা হইলেও দেশের একটা কাজ হইল মনে করিতে পারিবেন।

পরীক্ষিত যুষ্টিযোগ ও টোটকা ।†

(কবিরাজ শ্রীহরিচরণ গুপ্ত)

কাটাকাটি বা ছেঁচিয়া রক্ত বাহির হইলে।—

শরীরের কোন স্থান কাটিয়া বা ছেঁচিয়া রক্ত বাহির হইলে তৎক্ষণাৎ কুকুমিমা পাতার রস সেইস্থানে দিলে রক্ত বন্ধ হইবে ও বেদনা ক্রমে ক্রমে নরম পড়িয়া যাইবে।

বৃশ্চিক দংশনে।—বৃশ্চিক দষ্টস্থানে মাছের খোল দিয়া ২৪ বার ধুইয়া ফেলিলে আলা-বস্ত্রণা নিবারিত হয়।

সর্দিতে।—

বুড়ি পান ও কাঁচামুপারির রস ২৪বার মন্তকে দিলে এবং খুদ-কেশুরিয়ার রস কর্ণের মধ্যে দিলে সর্দি নিবারিত হয়।

মূত্রক্লেদে।—(ক)

খুদেনোনা, মাখন ও সোরা সমপরিমাণে একত্র করিয়া তুলপেটের নিরুতাগে প্রলেপ দিলে যে কোন প্রকারের বন্ধপ্রস্রাব সরল হইবে।

(খ) তালু চূর্ণ, পচা আমপাতা এবং সোরা সমপরিমাণে লইয়া মর্দন করিয়া নাভি স্থলে প্রলেপ দিলে সরল প্রস্রাব হয়। কলেরা রোগের প্রস্রাব করাইবার জন্য ইহা অব্যর্থ ঔষধ।

স্বতিশক্তি বর্দ্ধনে।—হরিজা, বচ, কুড় (শোধিত) নিমূল, তুঁঠ, জীরা, বমনী, বষ্টি-মধু, ও সৈন্ধব প্রত্যেকের সম পরিমাণ চূর্ণ

লইয়া (১০ রতি) ঘূতের সহিত ২১ দিন সেবন করিলে স্বতি শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

পোড়া ঘা এবং অন্ত্রাত্ত ক্ষতে।—সর্বগ ৬৬ল ১/১০, কেলেকড়ার মূলের ছাল ২ তোলা।

অনন্তমূল ১ তোলা, অপাঙ্গার্মূল ১ তোলা। প্রথমে সর্বগতৈল একটী পিতলের বাটীতে আল দিয়া ফেনা রহিত হইলে, ঐ ত্রব্যগুলি ছেঁচিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং ভালরূপ ভক্ষিত হইলে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ছাকিয়া লইবে; ইহাতে পোড়া ঘা, বিবাক্ত ঘা ও ছুইত্রণ আদি শান্তি হয়।

নাসারোগে।—বাঁটি সরিসার তৈল ও কাঁচা ছুর্যার রস—সম পরিমাণ লইয়া ক্রমে ২৩ দিবস নাকে টানিলে বস্ত্রপাদ্যক পুরাতন নাসা রোগের আতঙ্কল হয়।

অগ্নিপিত্তে।—(ক) ত্রিকলা, পটোলপত্র (পলতা) কটকী সমান ভাগে লইয়া কাথ করিয়া সম পরিমাণ ইক্ষুচিনি দিয়া বাইলে পুরাতন অগ্নিপিত্ত আতঙ্কল বিনষ্ট হয়। কাথ করিবার নিয়ম —প্রত্যেক ত্রব্য ১১/১০, জল ১/১০ সেস শেষ ১/১০ গোয়া।

(খ) বাসক, ওলক ও কটিকারির কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অগ্নিপিত্ত নষ্ট হয়।

বায়ুবিকারে।—কেলেজীরা ১০ তোলা,

† এই পরীক্ষিত যুষ্টি যোগাদি বলরূপ নিবাসী বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীহরিচরণ গুপ্ত কবিরাজের বহুত লিখিত জীর্ণ পিণ্ড হস্তে সংগ্ৰহ করিয়াছি।—লেখক।

নিসিন্দার কচিপাতা ৮০, আনা ও পিণ্ডুলের মূল ১০, জল ১০ সের, শেব অধঃগোৱী এই কাথ প্রত্যহ হুঁবেলা পান করিলে বায়ুরোগ নষ্ট হয় ।

কোঁড়া বসান—মহা সমুদ্রের পাতা ২টা, গোলমরিচ ২টা, কটুঁকার জলে বাটিয়া কোঁড়ার উপর লাগাইলে কোঁড়া বসিয়া বাইবে ।

গোমে—শোধিত মিঠাবিষ, হুড়হুড়ের মূল ও ছাল, দুরীতকী, অনন্ত মূল ও তেঁতুলের বীজের শাঁস ও শিরিষ ছাল—সমান ভাগে লইয়া সিজের পাতার রসের সহিত মর্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইলে বহুদিনের গোদ রোগ ভাল হয় ।

গণ্ডমালা—কনকধূতুরার মূলের ছাল, এরণ্ডমূল, নিসিন্দার পাতা, খেত পুনর্ণবা ও সজিনার মূলের ছাল—সমভাগে লইয়া সরিষার তৈলের সহিত মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে গণ্ডমালা ভাল হয় ।

বহুমূত্রে ।—গেঁটেদুর্বা ১০ আনা, চৈচোর মূল, বজ্রধূতুর, আমলা, হরীতকী, ধনে ও গন্ধ মুখা, সমান ভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া ইকুচিনি এক্কেপ দিয়া ৭ দিন ছবেলা খাইলে সকল প্রকারের বহুমূত্রের বয়না ও মুহুমুহ প্রলাব নির্গত, নিশ্চয়ই আন্ত উপশমিত হইয়া থাকে । পাঠকগণের নিকট নিবেদন, এই মুষ্টিযোগটা তাঁহারা বেন অবত অবত পরীক্ষা করেন ।

সারিগাত অরে নস্ত—সৈন্ধব ১ ভাগ, সজিনা বীজ ১ ভাগ, সরিষা ১ ভাগ, কুড় ১ ভাগ—ছান্নি মুত্রে সহিত মাড়িয়া ঐ রসের নাস করিতে হইবে—এইটা বিশেষ পরীক্ষিত ।

শরীরের যে কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ যুতকুমারীর শাঁস ও রস সেই স্থানে দিলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা বয়না নিবারিত হয় ও ফোকা হয় না ।

ঘোর সন্নিপাতে অজ্ঞান—তেলাগোকার নাদি ৮০ আনা পরিমাণ লটরা মধুর সহিত বসিয়া চক্রে অজ্ঞান দিলে সারিগাতে চকু দৃষিত হইলে চকু ভাল হয় এবং ব্যারামও ক্রমশঃ কমিতে থাকে ।

ক্রিমি রোগে :—হাড়িম ছালের কাথ ৮০ একছটাক ও তিল তৈল ৮০ আনা (ওজন) মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে পান করিলে কোষ্টহ সমস্ত ক্রিমি নিঃসৃত হইয়া যায় ।

তমক শ্বাস কাসে পার্শ্ব বেদনার প্রলেপ—রায়া ১০ তোলা, হরিদ্রা ৮০ আনা, হারহরিদ্রা ৮০ আনা, শুল্ফা ৮০ আনা, দেবদারু ৮০ আনা, জীবন্তী ৮০ আনা, ও মিছরি ৮০ আনা একত্র জলে মর্দন করিতে হইবে, পরে পুরাতন যুত ও তিল তৈল ২ তোলা পরিমাণ দিশাইয়া ঈষৎ গরম করিয়া বেদনান্থলে পুরুভাবে প্রলেপ দিয়া কলার মাজপাতা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, এইরূপে ৩৪ দিন ব্যবহার করিলে পার্শ্ববেদনার বিশেষ শান্তি হইবে ।

মুখা, ক্ষেত্রপর্ণটী, কেতুর ও চন্দন সমভাগে গ্রহণ করিয়া জল দিয়া ১ প্রহর কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ঐ জল পান করিলে তৃষ্ণা রোগ নিবারিত হয় ।

মৃগী রোগে নাসিকা হইতে শোকা বাহির করিবার ব্যবস্থা :—

লাল বর্ণের পদ্মের মূল ও হিম্বুল সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিয়া চারি অঙ্গুলী প্রমাণ

বাতি প্রভৃত করিতে হইবে, পরে ঐ বাতিতে টাটকা গম্বুত মাখাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ২ নাকে ২টী বাতি আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইয়া দিলে ঐ বস্তিকার আকর্ষণে মাসারক্ত হইতে পোকা বাহির হইয়া ঐ বাতিতে কামড়াইয়া ধরিলে ঐ বাতি টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ করিলে মূগীরোগ শান্ত হয়।

মস্তান্তরে প্রদেয় ;—

কাল মূগীর ডিমের কুণ্ডল, জরদা, বেলে সিন্দুর, ও গম্বুত সম পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া একখানি নেকড়ার মাখাইয়া খাড়ে বাধিয়া দিতে হইবে—৫।৪ দিন ব্যবহার করিলে প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়।

অষ্টোক্ত আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ।

[কবিরাজ শ্রী বামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম, বি]

:o:

প্রতিষ্ঠার কথা ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের শ্রীনাথনকরে গত আট বৎসর পূর্বে করেকজন প্রথিত নামা কবিরাজের চেষ্টায় এই অষ্টোক্ত আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন।

উদ্দেশ্য ।

হিন্দু রাজত্বের পরে, এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নাই। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বড় বড় উত্তান-বাটিকার নানাবিধ ভেবজগুল্ল লতাদি উৎপন্ন করাইয়া সর্বদা পরীক্ষা করিতেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কতক সংখ্যক ব্যক্তিকে রাজা বিশিষ্ট চিকিৎসকদিগকে দান করিতেন। তাহারা উহাদের উপর বিধি প্রয়োগ এবং অজ্ঞেয় প্রভৃতি

যাৱা বৈজ্ঞানিক ভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ব্যবস্থা করিতেন। এ প্রথা হয় ত নিষ্ঠুর ছিল, কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের যে নানা দিক দিয়া উন্নতি সাধিত হইতেছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই। যে বিজ্ঞা উন্নতিশালিনী, তাহা কখনও বাহিরের বিরুদ্ধে অর্গল বদ্ধ করিয়া রাখে না। মহানদী, মহাসমুদ্র, পৃথিবীর যাবতীয় আবর্জনা বহন করিয়াও আশ্রয় বলে পুষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু কুপোষক পাছে নষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহাকে পক্ষাঘাত বাহির হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। আমাদের কবিরাজী শাস্ত্র এখন সেই কুপোষকে পরিণত হইয়াছে।

এদিকে প্রতীচ্য দেশ সমূহে, জীবন পণ করিয়া বিজ্ঞানবিদগণ নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। আমরা আমাদের চিকিৎসা

শাস্ত্রকে, তাঁহাদিগের নিকট হইতেও বাচাইয়া চলিতেছি। অধুনা শল্যবিজ্ঞা ও শারীর বিদ্যায় তাঁহারা প্রভূতরূপে অগ্রসর হইয়াছেন, হিন্দুরা এক সময়ে এই সকল বিদ্যার আবিষ্কার কর্তা হইলেও এখন নিত্য পশ্চাদ্গত হইয়া, নিয়ন্ত্রণের উপর ঐ বিদ্যার অতি সামান্য আলোচনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, সুতরাং স্বদেশের নানারূপ ক্ষয় অজ্ঞ ও ব্রাহ্মদিগের স্থলে এখন নরসুন্দরের নরুণই এক শাস্ত্র আশ্রয় স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আয়ুর্বেদ হিতৈষী ঈশ্বরি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের শারীর ও কল্পবিদ্যা বাহা এখন হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার উন্নতি সাধন একান্ত প্রয়োজন। অষ্টাদশ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণ ডাক্তারদিগের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের অর্গলবন্ধ না করিয়া, তাঁহাদিগকেও আমাদের আয়ুর্বেদের শ্রীসাধনের সাহায্যার্থ সমাদরে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের ছাত্রগণ এখন আর কত চিকিৎসার ভয়ে ডাক্তারকে ডাকিয়া নিজেরা সরিয়া পড়েন না। কবিরাজি ওষধাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করিয়া আমরা সাধ্যাঙ্গসারে নব আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছি। বিদ্যালয়ে শব্দচ্ছদের ব্যবহারও আরোজন চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত বহু চিকিৎসক জামাদের বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কর্মক্ষেত্রে বশস্বী হইয়াছেন। এলোপ্যাথি প্রভৃতির বাহা কিছু গৌরব,—আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র তাহা আরক্ত করিবে, অথচ আমাদের দেশীয় চিকিৎসার গৌরব ও বিশেষত্ব নষ্ট হইবে না—এই পণ করিয়া বিদ্যালয়ের, হৈতৈবগণ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন।

ইতিহাস ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, গত আট বৎসর পূর্বে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন ইহার ছাত্র সংখ্যা সামান্যই ছিল। অধ্যাপকও সেই হিসাবে অল্প সংখ্যকই ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণ নানারূপ ভেদজ্ঞ ও লভা ও জীব কল্যাণাদি এতদর্থে সংগ্রহ করিয়া পাঠার্থীদিগের কর্মক্ষেত্রে প্রসারণ করেন। অধুনা ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছে, অধ্যাপকও ১৭১৮ জন নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি ছাত্র আমাদের বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে আয়ুর্বেদীয় উপায়ে চিকিৎসার ক্ষমতা চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিয়া, মাসিক ৪৫ শত টাকা উপার্জন করিতেছেন। আমাদের ছাত্র বেক্রম বুদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এই বিদ্যালয় যে বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদচর্চার কেন্দ্র স্বরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে কাহারও অস্বাভাবিক সন্দেহ নাই। এই বিদ্যালয়ের গভী তত্ত্ব বঙ্গদেশে আবদ্ধ নহে। দিল্লী, লক্ষৌ, লাহোর এমন কি স্বাধীন নেপাল ও সুদূরস্থিত সিংহল প্রভৃতি স্থান হইতেও বস্ত্রার মত ছাত্র প্রবাহ এই বিদ্যালয়ে আসিতেছে। দিল্লী ও লাহোরের আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় সমূহের শেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া তাহাদের শিকা সমাধানের জন্য তদ্বিনীত ছাত্রগণ এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। আমাদের এই বিদ্যালয়ে—বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ এবং এম, এ, পাস করিয়া বহু কল্পবিদ্যা ছাত্র পড়িতেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই মিলন-বন্ধির, আয়ু-

কেন্দ্র বিদ্যা প্রভূত অশাণিনী হইয়া গৌরব লাভ করিয়াছেন। অশা করা বার, অচিরে এই বিদ্যাচর্চাসম্মত বহুসংখ্যক ভারতীয় যুবকের কর্মক্ষেত্রে তিস্তি ও জীবিকা উপার্জনের উপায় স্বরূপ হইবে।

প্রার্থনা ।

এ পর্যন্ত এই বিদ্যালয় লইয়া খুব জোরে ডেড়ি পিটান হইয়া নাই। কর্মিগণ অনেকটা নিঃশব্দেই কাজ করিয়া আসিতেছিলেন, এখন আমাদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। সুভার সাধারণের নিকট আমাদের উপস্থিত হইবারও সময় হইয়াছে। আমাদের মধ্যে কোনও সুবোধ উদ্যম হইলে, সাহায্য করিবার লোকের অভাব হয় না। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আমাদিগকে বাৎসরিক সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়া আসিতেছেন। সম্ভবতঃ এই দানের পরিমাণ তাঁহারা বাড়াইয়া দিবেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে বিদ্যুত ভ্রমবাহার পার্কের সম্মুখে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আমাদিগকে গৃহ নির্মাণের জন্য এক বিরাট এগারো কাঠা জমি দান করিয়াছেন, কয়েক দিবসেই আমাদের হিতৈষিণ হুইলক টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু আরও অনেক চাই, শুধু অধ্যয়ন ও ছাত্র নিবাসের জন্য নহে, আমরা বিদ্যুত ভাবে যে হাসপাতাল স্থাপন করার পরিকল্পনা করিয়াছি ও শারীর বিদ্যা চর্চায় জন্য কর্মশালায় আরোজন করিতেছি তাহাতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ সাহায্যের দরকার। মার্টিন কোম্পানি এতদর্থে প্রায়

তিন লক্ষ টাকার এটিনেট দিয়াছেন, এ শুধু বিভাগের জন্য। হাসপাতালাদির জন্য আরও ৫০ লক্ষ টাকার দরকার। আমরা তিনবার কুলি লইয়া এতদর্থে সাধারণের নিকট উপস্থিত হইতেছি। আমাদের কর্মে বিশ্বাস আছে ও সাধারণের অনুকম্পায়ও আশা আছে। আমরা নিশ্চয় বিশ্বাস করি, আমাদের নির্বাধ পরিশ্রম, এই কর্মক্ষেত্রে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া বাইবে এবং ইহার শুভ পরিণাম অব্যাহত থাকিবে। বিন্দু বিন্দু লইয়াই সমুদ্র। আমরা ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিব না। আমরা যেকোন রাস্তা মহারাজা ও অপরাপর বড়লোকদিগের দ্বারস্থ, সেইরূপ সামান্ত গৃহস্থের নিকটও সাহায্যপ্রার্থী। আশা করি, এই মহৎ অমুষ্ঠানে যিনি বাহা পাবেন, তিনি সাধ্যানুসারে তাহা দান করিয়া এই ভারতীয় বিদ্যালয়ের তিস্তি অক্ষুণ্ণ করিবেন।

আমাদের কাণ্ডারী ।

শ্রীযুক্ত অননবল স্যার আন্তোনি মুখো-পাধ্যায়, কে, টি, সি, এস, আই মহোদয় এই বিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাষ্টার এবং মহাসমো-পাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সম্বতী এম, এ, এল, এম, 'এস' মহোদয় কলেজ কাউন্সিলের সভাপতি। প্রত্যেক বাদালীর নিকট—প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট এই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ সাহায্যপ্রার্থী। সমুদ্র ভাবে অতি সামান্ত দানও আমরা কৃতার্থ হইয়া গ্রহণ করিব।

দুইটি বনৌষধি ।

পর্পট—ক্ষেৎপাঁপড়া, হিং—পীৎপাঁপড়া

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরাজ)

ক্ষেৎপাঁপড়া বর্ষা শেষে জন্মিয়া শরতকালে পুষ্ট হয় এবং গ্রীষ্মকালে মরিয়া যায়। ইহা কিকিং আত্রে ভূমিতে জন্মে। মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহার লতাগুলি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, জমির সহিত লতাগুলি সংলগ্ন থাকে, পত্রগুলির আকৃতি, তেঁতুলের পত্রের স্থায় তেঁতুল পত্র হইতে কিকিং লম্বা ও কোমল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্ঠেত বর্ণের পুষ্প হইয়া থাকে।

ক্ষেৎপাঁপড়া—পুরাতন জরের একটা মহৌষধ। বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে ইহা নানা প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাচন, স্বরস ঘূষড়া ও ঔষধের সহপানে প্রয়োজ্য।

ম্যালেরিয়া জ্বরে ক্ষেৎপাঁপড়া—ক্ষেৎপাঁপড়া, গুলঞ্চ, কটুকী ও হরীতকী সমভাগে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলে জাল দিবে, অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাণ্ড প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাঁপড়া, আদা, পান, সেকা-লিকা পত্র—প্রত্যেক সম পরিমাণে গ্রহণ করিয়া শিলায় কুট্টিত করিবে, একখান কলা পাতার উহা মোড়ক করিয়া কাঠকয়লার অগ্নির উত্তাপে সেকিয়া লইবে, ঐ পাতড়া খানি রাত্রিতে অনাবৃত স্থানে বাহিরে রাখিয়া দিবে, পর দিবস প্রত্যুষে ঐ কুট্টিত দ্রব্যগুলি পেষণ করিয়া উহার রস বহির্গত করতঃ ঐ রস

সহপানে অবস্থা দৃষ্টে “চন্দনাদি লোহ”, পুষ্ট পাক বিষম জরাস্তকলৌহ প্রভৃতি পুরাতন জরের ঔষধ প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন পুরাতন জরের উপশম হইয়া থাকে। ইহাকে “ঘূষড়া” সহপান বলে।

রক্তপিত্তে—ক্ষেৎপাঁপড়া

ক্ষেৎপাঁপড়ার কাথ, স্বরস, কক শীত কষায় রক্তপিত্ত রোগে বিশেষ উপকারী।

পিত্ত প্রধান জরে ক্ষেৎপাঁপড়া—পৈত্তিক জরে একমাত্র ক্ষেৎপাঁপড়ার কাথ জরনাশক।

বমন রোগে ক্ষেৎপাঁপড়া—জরে বমন হইলে ক্ষেৎপাঁপড়ার কাথ মধু সহযোগে পান করিলে বমন নিবৃত্তি হয়।

আকনাদি, হিং পাত,

অতিসারে আকনাদি.

গোহৃৎ জাত দধির সহিত আকনাদির মূল পেষণ করিয়া প্রাতে সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয়। আকনাদি মূলের পরিমাণ চারি আনা ওজন গ্রহণ করিবে।

অশ্বর্ষে আকনাদি—বালের সহিত আকনাদির মূল পেষণ করিয়া সেবন করিলে বায়ুর অহুলাম হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

লবণ মেহে আকনাদি—লবণ বাহার লবণ মেহ হইয়াছে তাহার পক্ষে আকনাদির মূল ও অণ্ডকর কাথ বিশেষ উপকারী।

আকনাশি অর রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা সুজকারক, অতিসার নাশক, মুত্রাশয়ের প্রদাহ নিবারক ।

অন্তর্বিব্রধির অগুরু অবস্থায় আকনাদির মূল মধুর সহিত পেষণ করিয়া আতপ চাউল খোত জলের সহিত সেবন করিলে অন্তর্বিব্রধি থাকিয়া বিলীন প্রাপ্ত হয় ।

সুখ প্রসবে আকনাদি—
গর্ভস্থ সন্তানের মৃতক যোনিমুখে আগত হইয়াও যদি অবিগল্যে প্রসব না হয়, তাহা হইলে আকনাদির মূল পেষণ করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে অনতিবিলম্বে সন্তান ভূমিষ্ট হইবে ।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্বক্কের বচন ।

[শ্রীকীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, বি-এ]

—:o:—

একদিকে গো রোগের আশায়,
অর্জুনিতে গরীব দেশ ;
অন্তরিকে ধর্মনীতি,
তুচ্ছসংখ্য নাহি লেশ ।
এই ত মোদের অকাল বিরোগ—
প্রবল কারণ দেখছি ভাই,—
কুজীভি করে মনটা নরক,
পচায় দেহ তব ছাই ।
নাখার খাটুনি বেড়ে গেছে
পূর্য্যাপেক্ষা অনেক গুণ,—
বল্যাহ'তে কদম্বাসে
কাঁচা বাঁশে লাগে ঘূণ ।
দেশে যে নাই ভাল খাবার,
দুত, দুধ, মৎস্ত, কল—
কি ক'রে হবে দীর্ঘ জীবন ?
কি ক'রে হ'বে বীৰ্য্যবল ?
পুঁজি মূলধন আমার খবর
রাখ'লি না রে মূঢ় মীন ।

তাইত তোরা স্বাস্থ্য শক্তি—
তেজস্বাশ্রি মেধাহীন !
আর বুকে না ক'রলে রে ব্যর
ক'দিন পুঁজি খা'ক্বে তোরা,
বেহ'স হ'য়ে খরচ করিস,
ঠিক বেন রে নেশাখোর ।
শক্তি বলের অপচয়টি
সইতে নায়েন ভগবান ;
তাইত তোদের অকাল মরণ—
এ যে তাঁরই শাস্তিদান ।
এরি খাওয়া পরার উপর
অতিরিক্ত খাবারের ব্যর ;—
অজপা যে ফুরিয়ে এল,
জীবন-কোবটা কিসে রয় ?
ঘোড়ার মুখেও দানা দেবে,
তবেই তো সে ছুটবে ভাই,
দেহবাজীর ফোয়ারা বিনা
দেহের স্বখটা কিসে চাই ?

হেঁকড়া গাড়ীর ঘোড়াও বার।
তারিঃ বিয়াস খানিক লর,
তোমার যে ভাই নাহিক বিয়াস
কিসে তোমার দেহ রয় ?

মাথার খাটুনি কনিষ্টে দিয়ে
দেহের দিকে নজর দাও,
জ্ঞানের মূলে প্রেমের বারি
চালো,—বদি স্বাস্থ্য চাও ।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ ।

হৃদযন্ত্রের কার্য ।

মানুষ যদি তাহার হৃদযন্ত্রের কার্য সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানিত ও বুঝিত তাহা হইলে মানুষের জীবন দীর্ঘ হইত । • প্রত্যেক মানুষের নিজের হস্তের মুষ্টি অপেক্ষা হৃদযন্ত্রের আকার বড় নহে । হৃদযন্ত্রের পার্শ্বে বৃক্কের সমুখ ভাগে দুইটি থলিয়ার মধ্যে হৃদযন্ত্র অবস্থিত ।

হৃদযন্ত্রের প্রায় সমস্ত অংশই আংশযুক্ত পেশী দ্বারা প্রস্তুত । কিন্তু ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, মধ্যে গহ্বর আছে । অন্তঃস্থ পেশীর দ্বারা ইহাও সমুচিত হয় কিন্তু এই পেশীর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে বাহার জন্ত ইহার নানা অংশ নিদিষ্ট সময়ে এবং ঠিক পরে পরে উহাদিগের সঙ্কোচন হয় । দেখা গিয়াছে যে যদি কোন জীবন্ত প্রাণীর হৃদযন্ত্র তাহার শরীর হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়, তবে কিয়ৎকালের জন্ত ঐ হৃদযন্ত্র শরীরের অভ্যন্তরে যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকে ।

এই নিয়মিত সঙ্কোচনের ফলে হৃদযন্ত্র হইতে চাপ প্রাপ্ত হইয়া দুই দিকে রক্ত প্রবাহিত হয় । একদিকের রক্ত বড় ধমনী সকলের দিকে যায় । তথায় ইহা বাধা প্রাপ্ত হয় এবং অপরদিকের রক্ত হৃদযন্ত্রের অপর ভাগে যায় ।

তথায় অল্পই বাধা পায় । তথা হইতে রক্ত সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয় এবং এইরূপে শরীরকে খাদ্য প্রদান ও পুষ্টি করে ।

যে সকল স্থিতিস্থাপক নল দিয়া রক্ত গমনাগমন করে তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ধমনী ও শিরা বলা হয় । উহার রক্তে পূর্ণ থাকার হৃদযন্ত্র যখন নূতন রক্ত তথায় প্রবাহিত করে তখন উহা তথায় প্রবাহিত করিবার জন্ত হৃদযন্ত্রকে জোরে চাপ দিতে হয় । এই রক্ত হৃদযন্ত্র কর্তৃক একবার চাপ পাইয়া বাধা পাইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে না । কারণ ধমনীতে রক্ত ফিরিয়া যাহাতে আসিতে না পারে সেজন্য বাধা দিবার যন্ত্র আছে । হাতের কড়ীর নাকীতে হাত দিলেই হৃদযন্ত্র কিরূপভাবে কার্য করিতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায় । এইখানে যে নাকী অস্থত হয় তাহা হৃদযন্ত্রের চাপের দ্বারা প্রবাহিত রক্তের জন্ত । হৃদযন্ত্র হইতে চাপ প্রাপ্ত রক্ত বহির্গত হইয়া ধমনী দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তের নলে যায় এবং তাহা হইতে শিরা বাহিয়া পুনরায় হৃদযন্ত্রে পৌছে । আমরা হৃদযন্ত্রের চলা এবং নাকীর গতি বুঝিতে পারি,

এমন কি গুলিতেও পাই। পরীক্ষা দ্বারা দেখা দিগাচ্ছে যে ঘোড়ার মত প্রাণীর শরীরে হৃদযন্ত্র হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বাহিরা পুনরায় হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করিতে অর্ধমিনিট সময় লাগে।

হৃদযন্ত্র বিরূপ আশ্চর্যজনক কার্য্য করে তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল। প্রত্যেক মানুষের বুকের অভ্যন্তরে গড় গড়তায় এই যন্ত্র মিনিটে ৭৫ বার চলে অর্থাৎ ঘণ্টায় ৪৫০০ বার চলে। হিসাব করিলেই দেখা যাইবে যে দৈনিক ১৮০০০ বার কিম্বা বৎসরে ৩২০০০০০ বার চলে এবং যদি মানুষ ৭০ বৎসর বাঁচে তবে ২০৭০০০০০০০ বার হৃদস্পন্দন হয়। পৃথিবীর মানুষের সমষ্টি ১,৭০০০০০০০ হইলে সমস্ত মানবগণের হৃদযন্ত্র প্রতি মিনিটে ১২৭০০০,০০০,০০০ বার চলে অর্থাৎ এই বৃহৎ মানবজাতির হৃদযন্ত্র সকল প্রতি সেকেন্ডে ২০০০০০০০০ বার চলে।

আমাদের হৃদযন্ত্র চারটি বিভাগে বিভক্ত। ইহার দুইটিতে রক্ত জমে, তাহা হইতে রক্ত বাহির হইয়া অপর দুই বিভাগে আসে, তথা হইতে চাপ পাইয়া রক্ত প্রবাহিত হয়। যখন এই দুইটি বিভাগ সঙ্কুচিত হয় তখন ইহার প্রথম বিভাগের অপরিষ্কৃত রক্ত চাপদ্বারা ক্রমক্রমে প্রবাহিত করে, তথায় অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিয়া রক্ত পরিষ্কৃত হয় এবং অপর বিভাগ এই পরিষ্কৃত রক্ত সমগ্র শরীরে প্রবাহিত করে। যখন হৃদযন্ত্র চলে তখন দশ

ঘন ইঞ্চি পরিমাণ রক্ত হৃদযন্ত্র কর্তৃক চাপ প্রাপ্ত হইয়া তীরবেগে বহির্ভূত হয়।

এই হিসাবে এক মিনিটে ৭৫ বার হৃদযন্ত্র চলিলে ৭৫০ ঘন ইঞ্চি পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত করে। অর্থাৎ প্রতিঘণ্টায় ৪৫০০০ ঘন ইঞ্চি প্রতিদিন ১,০০০,০০০ ঘন ইঞ্চি ও বৎসরে ২২৫০০০ ঘন ফুট পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃদযন্ত্র যদি জল তুলিবার জন্য পম্প হইত তাহা হইলে এক বৎসরে ১২৬০০০ মণ জল উপরে তুলিত। মাত্র মুষ্টির মত বড় একটি ক্ষুদ্র পেশীর দ্বারা এতটা কার্য্য হয় ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বৎসরে তিনটা রক্ত হৃদযন্ত্র কর্তৃক পাম্প করা হয়, তাহা যদি একটা জলাধারে রাখা যাইত তবে তাহা ৬১ ফুট লম্বা ৬১ ফুট চওড়া এবং ৬১ ফুট উচু হইত অথবা বৃত্তাকার কোন জলাধারে রক্ত রাখিবার ইচ্ছা করিলে ৫০ ফিট ব্যাস, ১১৫ ফিট উচ্চ জলাধারের প্রয়োজন হইত এবং তাহাতে ১,৭০০,০০০ গ্যালন জল ধরিত। (প্রতি গ্যালন প্রায় তিন সেত দশ ছটাক) পৃথিবীর সমস্ত মানুষের হৃদযন্ত্র একত্র করিলে ৪৮১ ফুট উচু হয়, ইঞ্জিনের পিরামিডও এত উচু। সকল মানবের হৃদযন্ত্র একবৎসর একত্রে যে কার্য্য করে তাহাতে ৭২'৯৪০ ফুট উচ্চ, ৭২৮৪০ ফুট লম্বা ও ৭২,৮৪০ ফুট চওড়া এক বৃহৎ পুষ্করিণী জলে পূর্ণ করা যায়। হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর ২৯০০০ ফুট উচ্চ, সেই হিসাবে ঐ পুষ্করিণী গৌরী শৃঙ্গের আড়াই গুণ বেশী উচ্চ হইবে। সঙ্গীতবানী।

বঙ্গে লোককয় ।

(১৩২১ সালের আদমশুমারী অনুসারে)

জেলায় নাম	জেলায় পরিমাপ বর্গমাইল হিসাবে	প্রতি বর্গ- মাইলে লোকের বসতি	প্রতি জেলায় গ্রামের সংখ্যা	প্রতি শত জীলোকের জন্মে পুরুষের জন্মের হার	প্রতি শত জীলোকের মৃত্যুতে পুরুষের মৃত্যুর সংখ্যা	প্রতি সহস্র লোকের মধ্যে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হারের আধিক্য
বর্ধমান	২৭০৬	৫২২ জন	২৮১৭	১০৭	১০২	৭'১
বীরভূম	১৭৫৩	৪৮৩ „	২৫০২	১০৬	১১১	৫'০
বাঁকুড়া	২৬২৫	৩৮৮ „	৪০০০	১০৬	১০৬	৬'৮
মেদিনীপুর	৫০৫৫	৫২৮ „	১০৩৫১	১০৫	১০৩	৪'৪
হুগলী	১১৮৮	২০২ „	২১২৭	১০২	১০৭	৬'০২
হাওড়া	৫৩০	১৮৮২ „	৮৬৩	১১১	১১২	২'২
২৪ পরগণা	৪৮৫৬	৫৪১ „	৩৪২৭	১১০	১১৭	৭'৩
কলিকাতা	২১	৪৩২৩১ „	১	১১৬	১০৭	১৪'৪
নদীয়া	২৭৭৮	৫৩৫ „	২৩৫৩	১০৬	১০২	১০'৫
মুর্শিদাবাদ	২১২১	৫২৫ „	১২৭৪	১০৬	১১০	×
যশোহর	২২০৪	৫৮৩ „	৩১১৩	১০৫	১০৮	১১'৭
খুলনা	৪৭৩০	৩০৭ „	২০১১	১০৭	১১১	×
স্বাক্ষসাহী	২৬২০	৫৬২ „	২৪৪৮৭	১০৫	১০৬	২'২
দিনাজপুর	৩২৪৬	৪৩২ „	৬৬১২	১০৬	১১১	×
জলপাইগুড়ি	২২৩১	৩১২ „	৭২২	১০৬	১১১	×
দার্জিলিং	১১৬৪	২৪৩ „	৩০৪	১০১	১০৮	১০'৫
রাজপুর	৩৪২৬	৭১৭ „	৪১০২	১০৪	১০৭	×
বগুড়া	১৫৪২	৭৬০ „	২৭৮০	১০২	১১০	২'৭
পাবনা	৬৭৮	৮২৮ „	২৫৩২	১০৫	১১৫	৬'৩
মালদহ	১৮১৩	৫৩৮ „	২২৩২	১০৪	১১২	×
ঢাকা	২৭২৩	১১৪৮ „	৪৭৩৭	১০৮	১০২	২'৮
ময়মনসিংহ	৬১৩৮	৭৭ „	৭৩৫৫	১০৮	১০২	×
ফরিদপুর	২৩৭১	২২২ „	৩৩৬৩	১০২	১০৬	৮'৪
বাথুরগঞ্জ	৩৪২০	৭৫২ „	২২২০	১০৮	১১৫	×
চট্টগ্রাম	২৪২৭	৬৪৫ „	৮৭০	১১০	১০৩	×
নেত্রাখালী	১৫১৫	২৭২ „	১৭১২	১১০	১০৫	×
জিপুরা	২৫৬০	১০৭২ „	৪০১৮	১০২	১১৩	×
সমগ্রবঙ্গ	৭১৭০৫	৬৪৮ „	৮৪৭২৪৮	১০৭	১১০	২'১

আয়ুর্বেদে হাতুড়িয়া।

(শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ)

অনেকেই দেখিয়া শুনিয়া কবিরাজ ;
তঁাহারাই হাতুড়িয়া নামে অভিহিত। আর
এক শ্রেণীর কবিরাজ আছেন তাঁহাদিগকে
“পাক্তভার কবিরাজ” বলিয়া থাকে, ইহার
কবিরাজের কাছে থাকিয়া কেবল পুঁথির
পাতা উন্টাইয়া থাকেন, ইহারা সংস্কৃত জানেন
না, বাঙ্গালা বা অন্তান্ত ভাষাও কিছু যে জানেন
তাঁহাও মনে হয় না। ইহারা পাড়াগাঁয় গিয়া
বীর বাক্য বলে দু'পয়সা রোজগার করিয়া
খান। আজকাল এইরূপ হোমিওপ্যাথিক
চিকিৎসক গ্রামে গ্রামে পাওয়া যায়। একটা
হোমিওপ্যাথিক বাস ও একখানা পুঁথি হইলেই
তাঁহারা ডাক্তার সাংগেন, পল্লীগ্রামে এইরূপ
চিকিৎসকের অভাব নাই। পুরোঁল্লিখিত
কবিরাজের স্থান তাঁহারা অধিকার করিয়া
বসিয়াছেন। চিকিৎসা একবারে না করিলে
যে সকল রোগী বাঁচে, ইহাদের চিকিৎসায় সেট
সকল রোগীই বাঁচে, কোন কোন স্থলে ব্যতি-
ক্রমও যে না হয় এমন নহে। কোন কোন
স্থলে এইরূপ ভীষণ বৃদ্ধি চিকিৎসকেরা এইরূপ
ভাবে সমাজ মধ্যে প্রতিভাশালী হইয়া উঠেন,
এদিকে একটা প্রাচীন গল্প মনে পড়িল :—

কোন কবিরাজের এক পুত্র। তাহাকে
পিতা শাস্ত্র পড়াইয়া কবিরাজ করিতে
পারিলেন না। অবশেষে মৃত্যুকালে তাহাকে
কিছু কিছু ঔষধ বলিয়া যাইবেন ভরসায়
কবিরাজ—পুত্রকে ডাকিলেন, কিন্তু তিনি
“কালা দানা ও দোণামুখী” বলিতেই উচ্চৈঃ

স্রাণ বিরোধ হইয়া গেল—অন্ত কিছু বলিতে
পারিলেন না। পুত্র মনে করিলেন আমি
মত্ত কবিরাজ হইয়াছি। বাবা এই ঔষধ
বাটিয়া দোগীকে খাইতে দিতেন। আমাকেও
তাঁহাই দিয়া গিয়াছেন।

কিছুদিন পরে আর কেহ তাহাকে ডাকে
না। একদা একব্যক্তি তাঁহাকে, গরু হারানর
অন্ত কবিরাজ পুত্রের নিকট উপায় করিতে
আসিল। কবিরাজ মহাশয় কোন কোন
স্থলে জ্যোতিষের কথা আলোচনা করিয়া
গিয়া অনেক কথা বলিতেন। কবিরাজ-
পুত্র তাহাকে কালাদানা ও দোণামুখী
খাইতে দিয়া কহিলেন “তোমার গরু পাইরে,
তোমার বাড়ীর পূর্ব দিকে গিয়াছে। সে বাড়ী
যাইতে না যাইতে এই ঔষধ খাইয়া তাহার
দান্ত হইল, সে বটী লইয়া মলত্যাগে বসিয়াই
দেখিতে পাইল তাহার গরু বেতাল ঝোপে
রশি জড়াইয়া আটক রহিয়াছে। গরু পাইয়া
গৃহস্থ মনে করিল কবিরাজ অপেক্ষা কবিরাজ
পুত্র ভাল, কবিরাজ পুত্রের অপূর্ব ক্ষমতা, কণ
বিলম্বেই ইহা সেই গ্রামে বাপ্ত হইয়া পড়িল।

ক্রমে এ সংবাদ রাজ বাড়ীতে পহঁছিল,
রাণীর স্বর্ণ হার সেই সময় হারাইয়াছে।
কবিরাজ পুত্রের নিকট সংবাদ পহঁছিলে তিনি
তাঁহার ঐ অপূর্ব ঔষধ খাইতে দিলেন, রাজা
সেই ঔষধ খাইয়া পাখ্যানার গেলেন, দোড়িয়া
যাইতে যাইতে ভৃত্যকে জল লইয়া আনিতে
কহিলেন কিন্তু ভৃত্ত জল আনিতে বিলম্ব করার

তিনি তাহাকে পাহারা দেখাইয়া ভয় দেখাইলেন। ভৃত্য মনে করিল “এইরে এইবার সেরেছে, আমি যে হার চুরী করিয়াছি তা বুকি আস্তে পেরেছে।” ভৃত্য প্রণিপাত করিয়া কহিল, “হুজুর এ যাত্রা মাফ করুন, আমি এখনই হার আনিয়া দিতেছি।” কবিরাজ পুত্রের নাম চারিদিকে বিস্তুত হইয়া পড়িল। চারি দিকেই তাঁর ডাক, তাঁর ঔষধও সেই একমাত্র সফল কালাদানা ও সোণামুখী—জোলাপের ঔষধ।

এক দিন সংবাদ আসিল, বৃক প্রয়াসী হইয়া রাজার রাজ্য দখল করিতে এক প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি আসিয়াছেন। সংবাদ পাঠিয়া রাজ্যের হৃদয়ল পড়িয়া গেল। রাজার ঐ কবিরাজ পুত্রের কথা মনে হইল, তিনি তাহাকে ডাকিলেন। কবিরাজ পুত্র আসিয়া তাহার ঐ অব্যর্থ মহৌষধের ব্যবস্থা করিলেন। গাড়ীগাড়ী কালাদানা ও সোণামুখী আসিয়া হাজির হইল, ঢেকিতে কুটিয়া তাহার সৈন্ত দিগকে খাওয়াইয়া দেওয়া হইল, প্রতিপক্ষকে বলিয়া দেওয়া হইল, আমাদের সৈন্তগণের প্রাণতঃকৃত্যাদি শেষ হইলেই যুদ্ধারম্ভ হইবে।

এদিকে এ পক্ষের অল্প সংখ্যক সৈন্ত হইলেও তাহার অতি প্রাণকাল হইতেই ক্রমে পান্থখানার বাটতে থাকিল, এবং দুই গ্রহর অভীত হইলেও তাহাদের এই কর্ম চলিতে লাগিল, অপর পক্ষের বহুসংখ্যক সৈন্ত হইলেও তাহারা ইহা দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল, তাবিল না জানি ইহাদের কত সৈন্ত। জোর কপালে থাকিলে এইরূপই হয়। লোকে বলে “ভাগ্যবানের বোঝা উগ্গবান বহন করুন।

আর এক শ্রেণীর হাতুড়িয়া আছেন, তাহার কবিরাজের নিকট থাকিয়া অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসক হইতে চাহেন। রোগীর বেরূপ অবস্থায় যে ঔষধ কবিরাজ দেয় বা বেরূপ অনুমান করিয়া ঔষধ দেন তাহারও সেইরূপ করেন।

আর একটা গল্প মনে পড়িল :—

একদা কোন কবিরাজের কোন রাজ বাড়ীতে ডাক পড়িল, সঙ্গে তাহার ছাত্র। কবিরাজ মহাশয় রোগীর নাড়ী টিপিয়া বলিলেন “আপনি কুণ্ধ্য করিয়াছেন।” রোগী বলিল “না কই ?” কবিরাজ ঘরের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন “আজ্ঞে আপনি কমলা খাইয়াছেন।” পরে রোগী বলিল, “হাঁ তাই।” রোগীর নিকট হইতে উঠিয়া আসিলে ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল “কেমন করিয়া নাড়ী ধরিয়াই বুঝিলেন যে রোগী কমলা খাইয়াছে ?” কবিরাজ বলিলেন “ইহা অনুমান চিকিৎসা, আমি রোগীর ঘরে কমলাব বাবল দেখিয়াই এইরূপ অনুমান করিয়াছি।” ছাত্র মনে করিল “তবে আমি অনুমান চিকিৎসার প্রাজ্ঞ হইয়াছি।” ইহার পর কবিরাজ সেই রোগী দেখিতে একদিন ছাত্রকে পাঠাইলেন। সেই দিন তরুণ ভাবে রোগীর নাড়ী টিপিয়া ছাত্র বলিলেন “আপনি কুণ্ধ্য করিয়াছেন।” রোগী বলিল “না কই ?” ছাত্র, রোগীর ঘরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া জুতা তির আর কিছু দেখিতে না পাইয়া কহিলেন— “আপনি জুতা খাইয়াছেন।” ইহার পর রোগীর গৃহ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। ফলে বুদ্ধি না থাকিলে সংসার ক্ষেত্রে কিছুতেই অগ্রগতি হওয়া যায় না।

আর এক প্রকার হাতুড়িয়া আছে। তাহার কেবলই শিক্ষা দাতার অনুকরণ করেন, বুদ্ধি না থাকিলে অনেক সময় গভ্র কুফল প্রদেয়। একদা এক চিকিৎসকের সঙ্গে ছাত্র চলিয়াছে, এক গ্রামে এক গৃহস্থের নিকট গিয়া কবিরাজ এক গলা ফুলা উঠি পাইলেন। গৃহস্থ কবিরাজকে দেখে উট দেখাইলে তিনি কহিলেন “আমি ভাল করিতে পারিব।” তার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “উট কাহা গিয়া?” গৃহস্থ উত্তর করিল “জলমে গিয়া।” কবিরাজ বলিলেন “ক্যা খায়া?” গৃহস্থ কহিল “কাটা ফুটা খায়া।” কবিরাজ বলিলেন “গ্যাও একটু শীল”, তখনই একটা শীল আনা হইল।

কবিরাজ খুব জোরে উটের গলার বা দেওয়ার অপরদিক দিয়া কাঁটা বাহির হইয়া গেলে উট ভাল হইল। ইহা দেখিয়া ছাত্র মনে করিল, “কবিরাজ মহাশয়ের এই চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছি।” এই ভাবিয়া ছাত্রটি এক গ্রামে গিয়া একটা গলা ফুলা জীলোক দেখিয়া মনে করিল, এই আমার উপযুক্ত সুযোগ হইয়াছে। “ছাত্র গৃহস্থকে বলিল “আমি এই রোগী আরাম করিতে পারিব, কতকগুলি মন্ত্র বলা বলির পর একটা শীল আনিয়া দিলাম। রোগী আরাম করিয়া দিব।” ইহার পর ঐরূপ মাত্র বলাবলি করিয়া যখন “গ্যাও একটো শীল”—বলিল, তখনই শীল আসিল, তাহার পর সঙ্গেতে আঘাত করিতেই রোগী পক্ষ পাইল। তার পর চিকিৎসকের উপর কি ব্যবস্থা হইল বুঝিতেই পারেন। বুদ্ধি না থাকিলে এইরূপ কবিরাজের অনুকরণ করিতে গেলে ঘোর বিপদ সর্বদাই ঘটে।

একদা এক চক্ষুরোগী কবিরাজের অনু-

পস্থিতিতে আসিয়া উপস্থিত, রোগী আসিলেই ছাত্র পুস্তক দেখিতে লাগিল এক স্থানে দেখিতে পাইল “চক্ষুরোগে সন্মুখপে কর্ণে দ্বিধা কটিং দহেৎ।” ইহা দেখিয়াই ছাত্র লাফাইয়া উঠিল, এইত আমার সুযোগ উপস্থিত, অধ্যাপক মহাশয় উপস্থিত থাকিলেই আর হইতে না, এই বেলা চিকিৎসা করিয়া ফেলি। ছাত্র ভৃত্যকে ডাকিয়া একটা কাঁচি আনিতে ও কয়েকটা টিকা আলাইয়া আনিতে কহিয়া দিধ। অল্পক্ষণ মত কাজ হইলে রোগীকে গৃহে নিয়া জোর করিয়া দুই কর্ণ কাটিয়া ফেলিল, রোগীর চীৎকারে গ্রামের সাদা পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কটি পোড়াইয়া দেওয়া হইল। এই কার্যের অব্যাহতির পরেই অধ্যাপক কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন হায়, কি সর্বনাশ করিয়াছিস্। ছাত্র কহিল, “আমি পুস্তকে ঐ বচন দেখিয়াই করিয়াছি।” কবিরাজ পুস্তক আনাইয়া পুস্তক দেখাইয়া বলিলেন, “অনু-ধাবন কর নাই বলিয়াই বিপদ ঘটয়াছে। বচনটির পরেই ক্ষুদ্রাক্ষরে “ইতি অথ চিকিৎসা” লিখা রহিয়াছে, তাহা না দেখাতেই সর্বনাশ হইয়াছে।” ফলে যে সকল ছাত্র কবিরাজী পড়িতে যান অনেকেই বচনের অর্থ বোধ করেন না আর ভাব শু বুঝেন না। সুতরাং তাহারাই এক করিতে আর করেন, শিব গড়িতে বানর গড়েন। এই সকল চিকিৎসকের সংখ্যা লোপ না পাইলে আয়ুর্বেদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। এসকলের জন্য ছাত্রেরা বত অপরাধী, দেশের লোক ও অধ্যাপকগণ ততোধিক অপরাধী। অতএব আয়ুর্বেদের মান রক্ষা করিতে হইলে সকলকেই সাবধান হইতে হইবে। ব্যবসারী লোকের দ্বীর্ণ ব্যবসার ক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ততোধিক সাবধান হইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্রকুমার দাশ ওপ্ত কাব্যতীর্থ কর্তৃক ২০২, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রিট, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ১৭১৯নং ভানবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্তৃক প্রকাশিত।



আয়ুর্বেদ

৭ম বর্ষ

আষাঢ় ১৩৩০ সাল।

১০ম সংখ্যা।

সোমরস ও তাহার সেবন বিধি।

—:০:—

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিলে “সোমরস” নামে একপ্রকার পদার্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের অতি প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে, আর আধুনিক তন্ত্র ও পুরাণ পর্যন্ত বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে “সোমরস” শব্দের ভূরি ব্যবহার দেখা যায়। এই সোমরস প্রাচীন ভারতে একরূপ আদৃত ও প্রচলিত ছিল যে, উপভাস লেখক, নাটককার, কবি, এমন কি ইতিহাসবেত্তা ও আলঙ্কারিকেরা পর্যন্ত ইহার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই সোমরস কি এবং কোথায় পাওয়া যায়—এ বিষয় লইয়া বহুদিন পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ সমাজে ঘোর তর আন্দোলন চলিতেছে। ইংলণ্ড, জার্মানি এবং কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে ৫৭ বৎসরকাল ক্রমিক তর্কবিতর্ক করেন এবং এই অজ্ঞাত পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় বহুস্থান পর্যটন করেন। কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা আসিয়া-

টিক সোসাইটির সভ্যেরা সোমরস সম্বন্ধে পুনরায় বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ইহারা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাহা ঐ সোসাইটির সাময়িক পত্রিকার প্রকাশিতও হইয়াছিল।

সে বাহা হউক আমরা বহুদিন হইতে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা এবং নানা স্থান পর্যটন করিয়া সোমরস সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই সুযোগে বর্তমান প্রস্তাবে তাহা বিশেষ করিয়া প্রতীপাঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বহুদিনের অপ্ৰতিহত পরিশ্রম ও অর্থ বলের পর সোমরস সম্বন্ধে আমরা বাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকগণ এবং আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যদিগের নিকটই উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে—এই ভরসায় আমরা এই গুরুতর প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

* Journal of the Asiatic Society of Bengal.

সোমরস, আর্বা ঋষিদিগের একপ্রকার পানীয় দ্রব্য। ইহা সকল শ্রেণীর লোক-দিগেরই সেব্য ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র—এই চারি বর্ণই ইহা পান করিত। সংসার ভাগী, যোগী, সন্ন্যাসীদিগেরও ইহা পান করিতে নিষেধ ছিলনা, বরং যোগসাধনে ইহার ব্যবহার ছিল, বখা—

“যুগে যুগেহপি কৰ্ত্তব্যে যোগিনো যোগ সাধনে। পিরেং সোমরসং তজ্জে আয়ুর্বেদা বলপ্রবং।” শিবসংহিতা।

পূর্বকালে সোমরস বজ্রহলে ব্যবহৃত হইত। সোমরস কাহারও গৃহে পান করিবার নিয়ম ছিল না। দেবতা মন্দিরে, কোন পীঠস্থানে না হয় বজ্রহলে ইহা পান করিতে হইত, তন্ত্রি অস্ত্রজে পান করিবার নিষিদ্ধ নিয়ম ছিল। যদি কেহ কোনস্থলে সোমরস পান করিবার জন্ত অভিলষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেইস্থলে দেবারাধনা করিয়া সেই স্থানটিকে পবিত্র করিয়া লইতে হইত। অথবা বজ্রের আরোহণ করিয়া লইতে হইত। বজ্রে সে সকল দ্রব্য দেবোদ্দেশে প্রদান করা হইত, তাহার মধ্যে সোমরস প্রধান ছিল। অগ্রে সোমরস প্রদান না করিলে বজ্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত না। সকল বজ্রেই যে সোমরস প্রদান করা হইত এমন নহে, কোন কোন বজ্রে দেওয়ার রীতি ছিল, তাহা পরে বলা বাইতেছে।

আর্বাদিগের মধ্যে নানাপ্রকার বজ্রানুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে ৬৭ প্রকার বজ্র ছিল। সেই সকল বজ্র আবার ১০০ ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহাদের নাম ছিল ব্রত। এই ৬৭ প্রকার

বজ্রানুষ্ঠানের জন্ত বিশেষ বিশেষ বেদী ছিল। সেই সকল বেদীর আকার মোটে ৬ প্রকার, বখা এক কোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী, অষ্ট কোণী, বৃত্তা এবং দ্বী। বেদীর আকার এই ৬ প্রকার। ইহার মধ্যে এক কোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী ও দ্বী—এই চারি প্রকার বেদী যে যে বজ্রে নির্মিত হইত, সেইগুলিতেই সোমরসের ব্যবহার ছিল। অন্য বজ্রে ইহা ব্যবহৃত হইত না। বেদীর মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড রাখা হইত। ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) বেদীর একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সর্ব প্রথমে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমধ্যে সোমরস নিক্ষেপ করিতেন। তৎপনস্তর সোমরসের পূজা ও সোম দেবতার আরাধনা করিবার জন্ত অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত। বজ্রানুষ্ঠান শেষ হইলে, আর্বাগণ সকলে মিলিয়া সোমরস পান করিতেন। সোমরস একটি পাত্রে ফেলিয়া তাহাতে বেদী মধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ডের কিঞ্চিৎ তন্দ্রাবশেষ মিশ্রিত করা হইত, তাহার পরে তাহা পান করা হইত।

বজ্রের পুরোহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডমধ্যে সোমরস নিক্ষিপ্ত করিয়া সোম দেবতার আরাধনা করিতেন এবং অপরাপর দেবতার নামোল্লেখ করিতেন। “কোন দেবতার উদ্দেশে—যে উপাধনা করা হইত, তাহার অর্থ এইরূপ “হে সোম, তুমি আমাদের রক্ষক, তুমি আমাদের প্রভু। তুমি বজ্রহলে দিব্যরশ্মি সহ উপস্থিত হও। আমরা সোমরস গ্রহণ করি ইত্যাদি।” এই সকল ছন্দোবদ্ধ ঋক বা উপাসনার শ্লোক ভক্তি রসার্চিতে উচ্চৈঃস্বরে গান করা হইত। উপনীতমান স্বর গ্রামের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

অতি শুদ্ধ স্বর সংযোগে 'উচ্চারণ' বৈষম্য সংঘটিত হইলে, তাঁহারা আপনাদিগকে প্রত্য-
বারগ্রস্ত ও প্রাণটনিত মনে করিতেন এবং
তৎক্ষণাৎ সোমরস পানে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত
না।* এই উপাসনার গানে তাঁহারা তিন
প্রকার বৈদিক স্বর ব্যবহার করিতেন, তাহা
এই,—উদাত্ত, অমুদাত্ত এবং স্বরিত। এখন-
কার উদারী, মূদারী ও তারাকে ইহাদের
প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।
উদাত্ত—নিওগ, অমুদাত্ত—ঋওগ এবং স্বরিত
কখন কখন বড়জ ও পঞ্চমের সহিত ঐক্য
হয়। এইরূপ একটি চিহ্ন (।) বেদের মন্ত্রের
উপরে থাকে, তাহা হইলে স্বরিত এবং যদি
নিম্নে থাকে তাহা হইলে অমুদাত্ত বুঝিতে
হইবে। আবার এই গান করিবার সময়
ব্যমোহ ও প্রচলন ছিল। তখন যদিও বিস্তৃত
বাড়ের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু ঋগ্বেদে দেখা
যায় তৎকালীন মহর্ষিরা সোমরস আরাধনা
কালীন এবং সোমরস পান কালীন পুলকিত
চিত্তে গীতবাণী করিতেন। বৈদিক বাড়ের
তালের কিছু নমুনা আমরা দিতেছি। যথা
হা, হী হী হা, হা হী হী হী হী হা, হাং হীং
বুহা। পম্পশো পাং পং হাং উং হং ইত্যাদি।
এই প্রকার গীতবাণী করিতে করিতে
আমোদে সোমরস পান করা হইত।

যাহা হউক এক্ষণে সোমরস জিনিসটা কি
এবং কোথায় পাওয়া যায়, দেখা আবশ্যক।
এ বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নানাপ্রকার
মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ ইউরোপীয়
কুল ও স্বভাবের বর্ণবর্তী হইয়া গতানুগতিক
পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেও ছাড়েন নাই।

* Mulrs Sanskrit text.

আবার কেহ কেহ বা একেবারে হাতকর
মতাবলীর সৃষ্টি করিয়া হস্তানুপদ হইয়াছেন।
যাহা হউক সোমরস সম্বন্ধে কতিপয় সংস্কৃত
শাস্ত্রবিৎ অগনিধাত পণ্ডিতের মত এখানে
কিঞ্চ পরিমাণে আলোচনা করিলে বোধ হয়
অযুক্তি সঙ্গত হইবে না।

পণ্ডিতবর সার উইলিয়ম জোন্স ও হোরেন্স
উইলশন সাহেব বলেন, সোমরস একপ্রকার
বৃক্ষের পাতার রস। সুপ্রসিদ্ধ রাজহান
ইতিহাস লেখক টড সাহেব নির্দেশ করেন
যে, ইহা একপ্রকার বৃক্ষের মূলের রস*।
মাত্রাজবাসী জনৈক তৈলঙ্গী পণ্ডিত বলিয়া-
ছেন—‘গুড়ুচী’—প্রাচীনকালে ‘সোমরস’
বলিয়া অভিহিত হইত। আয়ুর্বেদীয় দ্রব্য-
বিধান, ‘বামনহাটী’ অথবা ‘ব্রাহ্মীশাক’—
‘সোমলতা’ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কাহারও
মতে ‘সোমরস’ ফল বিশেষের রস মাত্র।
ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন, রত্নবর্গের এক
প্রকার লতা সোমলতা বলিয়া উল্লিখিত হয়।
ঐ লতার রস স্নিগ্ধ, সুগন্ধ এবং অন্ন মধুর†।

* ভারতীয় গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড—১৮
পৃষ্ঠা।

† The “some” Plant of vedas
was the Asclepias Acid of Rox-
burgh, now known as the twining
Plant with few leaves; and with
clusters of small and fragrant
flowers, It yields a mild acid
milky juice and grows in various
parts of India.” The Englishman,
23rd July 18/8. And also vide
Lecture on the Religious suts
of India” P 32 by R. N. Datta.
* * Greens vedie literature V. 1
P. 2.

অধ্যাপক গ্রিগ সাহেব গ্রীস দেশীয় সূর্যলতার (Sunplant) সহিত এই সোমলতা ও সোম রসের তুলনা করিয়াছেন। এই রসে মাদকতা শক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা উত্তেজক এবং প্রচণ্ড সুরার (Strong wine) ভার কার্য্য করে। এক জন অধ্যাপক বলিয়াছেন—সোমরস ক্লান্ত দ্রব্য মাত্র। আর একজন মহাত্মা বলেন,—সোমরস চন্দ্র কিরণ॥ বেদে লিখিত আছে, সোমলতার রস তৃপ্তিকর, মাদক, হর্ষ জনক, পুষ্টিকারক, রোগনাশক এবং সুমিষ্ট। যথা,—

(ক) প্রবোমিরন্ত ইহং বোমংগরা
মাদরিকবঃ। ত্রাসা মধ্বশ্চ সুবদঃ।

(খ) গরকানো অমিহা বহু বিং পুষ্টি-
বর্ধনঃ।

পণ্ডিত কালীকমল সর্কোভোম বলেন,—সোমলতা নামক লতা বিশেষের মূল হইতে সোমরস নির্গত হয়। ইহা হৃৎকের ভার খেঁত ও তরল। * * * ইহা রীতিমত সেবন করিলে মনুষ্য লাবণ্যযুক্ত ও দীর্ঘজীবি হয় এবং প্রচণ্ড ক্ষমতাপালী ও পুষ্টিকার হয়। অধ্যাপক ওয়েবর বলেন,—“রীতিমত ঔষধের ভার সোমরস সেবন করিলে শরীর কন্দর্পের ভার কান্দি ধারণ করে এবং শরীরে প্রকৃত বল হয়। একবার সোমরস সেবন করিয়া একদমে ৫০ কোশ যাওয়া যায়। * বেদ পাঠে জানা যায়, সোমরসের বর্ণ জলের ভার তরল এবং হৃৎকের ভার গাঢ়। বেদের “সন্তে পরাংসি সমুচ্চু রাজা এবং রাজ্যভূতে বরুণত ব্রতানি বৃহস্পতে বৎ তব সোমধাম”—প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা

ইহার হৃৎকের ভার গাঢ় এবং জলের ভার তরল প্রতাপ হইতেছে।

সোমরস যে সোম নামধের এক প্রকার লতার রস এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। এই লতা পার্শ্বত্যা প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। বেদেও ইহা পার্শ্বতীর বলিয়া কথিত আছে যথা,—“বৎসানোঃ সাহুয়াকহং তুর্বা স্পষ্ট কবঃ। তদিত্ত্বোর্থঃ চেততি বৃথেন বৃষ্টি রেকতি। এই সোমরস উজ্জল (Spraking) এবং দেখিতে সুন্দর। মহর্ষি বাসিকী রাম চন্দ্রের রূপ বর্ণনায় স্থলে বলিয়াছেন, সোম বৎ প্রিয় দর্শনঃ। অর্থাৎ সোমের ভার দেখিতে সুন্দর। এতদ্বারা সোমলতা ও সোমরসের সুন্দর জীব প্রতিপাত হইতেছে। হরিবংশ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখ আছে। অথর্ব বেদে লিখিত আছে, স্বর্গে যেরূপ অমৃত, মর্ত্যে সেইরূপ সোমরস। যোগ শাস্ত্রে আছে, “পবনাত্যাস যোগ সাধনা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, একবার সোমরস সেবন করিলে তদ্রূপ ফল পাওয়া যায়।”

কোন কোনও পণ্ডিত বলেন, ‘সোমলতা বা সোমরস এখন আর পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। সোমাতাবে পার্শ্ববাসুতকে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়।’ এই পার্শ্ববাসুত কি দেখা উচিত। পার্শ্ববাসুত শব্দে জল বলিয়া লিখিত আছে। অমর কোষে এবং ঋগ্বেদে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—(ক) “পরঃ কিলানসমুত বিতামর কোবঃ। (খ) অপস্বত্তর মৃতমপহু ভেবজ মপহু তেজঃ প্রশন্ত রে দেবঃ ভবভবানিনঃ। ঋগ্বেদ ১২৩।১৯ (গ) অপসমে সৌনো অত্রবীদন্ত বিধানি ভৈবজা অরিক বিখজদ্ববৎ

আপাত্ত বিশ্ব ভৈবকী: । '১২৩২০ ধর্মের।" তবে এত অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের পর সৌমলস কি জল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ইহা বিশ্বাস করিতে বুদ্ধি প্রতিহত হয়, হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। শাস্ত্রে, পার্শ্ববাস্যত অর্থে জল বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু সৌমলস যে জল তাহা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। "সোমাতাবে" জলের ব্যবহারের কথাও কোথাও দেখি নাই। অন্তএব এমনটি বিশ্বাস বা যুক্তি সঙ্গত নহে।

জর্জন দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত, Aseipas Acidia কেই সৌমলতা বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহা কতদূর বিশ্বাস যোগ্য বলিতে পারি না। অপর কেহ কেহ সৌমলতাকে পুঁইশাক বলিয়া নির্দেশ করেন। সামবেদের বড়বিশ্ব ব্রাহ্মণের এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে যে, সৌমলতা পৃথিবীতে আর উৎপন্ন হয় না। একত্র অত্র জব্যকে ইহার প্রতি-নিধি করিয়া বজ্রহলে আনয়ন করিতে হয়। ঋত্বিগ্রন্থে সোমাতাবে পুস্তিকা (পুঁই) শাকের বিধি আছে। বখা—"সোমাতাবে পুস্তিকা-মতি স্ত্রুহুয়াং।" বড়বিশ্ব ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সোমাতাবে পুস্তিকা বিশ্বাসের অনেক স্লোক আছে। অথর্ব-বেদের একস্থলে 'পুস্তিকরঞ্জলতা' সৌমলতা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। বেদে সৌমলতার আকার বৈকল্প বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পুঁইশাক বলিয়াই আপাততঃ বিশ্বাস জন্মে। পুস্তিকা শাকের বৈকল্প ভক্ত (ঐশ) থাকে, সৌমলতার তাহাই ছিল। ইহাকে সৌমতত্ত্ব কহে, বখা, "অপ্যায়বমলিতম সাম বিশ্বে তিরং ততিঃ। তবানঃ স্ত্রুহুবন্তনঃ" সম্বাদ্যবে।" (১৪ অধ্যায়। ১০ শ্লোক) অধ্যাপক হাগ্

সাহেব পুনা হইতে যে সৌমলতা আনিয়াছিলেন তাহার আকার পুস্তিকা শাকের সহিত অনেকটা ঐক্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহার আখ্যায় অতীব তিক্ত এবং দুর্গন্ধ যুক্ত। * আমাকে বলিয়াছেন, ইহা প্রকৃত বৈদিক কালীন সৌমলতা নহে * *।

সে যাহাহউক আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সৌমলতার আকার পুঁই শাকের দ্বার। কিছুদিন পূর্বে আমি কতিপয় পণ্ডিতের সহিত বেলেগেছিয়ার গিয়াছিলাম। তথায় সৌম-রসের উল্লেখ হওয়াতে বানিয়ালাল বাজি নামধের জনৈক পার্শ্বত্যা দেশীয় মোহান্ত আমাদিগকে এক লতা দেখাইয়া ছিলেন, তাহা আকৃতিতে কোমল পুস্তিকা শাকের মত। আমরা ৪৮ জনে উহা আখ্যায়ন করিয়া ছিলাম। তাহার স্বাদ, জীবৎ অন্ন মধুর বলিয়া বোধ হইল। উহার পত্র পুস্তিকা শাকের পাতার মত, কিন্তু তত বৃহৎ নহে। আমি ভ্রম বশতঃ উহাকে প্রথমে পুঁইশাক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহা পুঁই জাতীর বটে, বন পুরের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। * ঐ মোহান্ত প্রতিদিন উহার রস প্রায় এক ছটাক পরিমাণে পান করেন, তাহাতে উহার বেশা হয়। তিনি পূর্বে গাঁজা, চরস এবং অহির্কেন সেবন করিতেন, কিন্তু এই রস সেবন করা

* Aid Br val II P 439

* * Edinburgh Review val LX No IV.

* History of Thibet by colonel Rayse P. 86 and Buddha in Thibet P. 17.

অবধি তাঁহার এ সকলের আর প্রয়োজন হয় নাই । মোহান্ত আমাকে উহা উপঢৌকন দিয়াছিলেন আমি তাহা ভারতবর্ষীয় স্থানিকো-
হুতি সভার (* *) বিলাতই পৃষ্ট পোষক শ্রীযুক্ত মে জ্যোতিষ হইটলি বড় এবং কোম্পা-
নৌকে লগুনে পাঠাইয়াছিলাম । তাঁহারা বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা বলিয়াছেন, ইহা প্রকৃত বৈদিককালীন সোমলতা বটে । (* *) সংশ্রুতি পাণ্ডুরা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট-
বর্তী এদিনা মন্দিরের নিকট এক প্রকার লতা দৃষ্ট হইয়াছিল । ঐ লতা তিব্বৎ দেশীয় এক প্রকার লতার সহিত একা হয় । তিব্বৎ দেশীয় লোকেরা ঐ লতাকে বৈদিককালীন লতা বলিয়া বিশ্বাস করেন । তিব্বৎ দেশে ঐ লতার নাম “মানীর”

তত্ত্বাত্মক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা মানী-
রের বৈকল্পিক রূপ ও গুণ বর্ণনা করেন, পাণ্ডুরা প্রাপ্য লতা অনেকাংশে তদ্রূপ । ইষ্ট-
ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর জনৈক গার্ড উহা প্রাপ্ত হইয়া তদীয় রস আশ্বাদন করিয়া-
ছিলেন । উহার আকৃতি ও প্রকৃতি সোমরসের দ্বারা প্রতীত হয় । ইহার স্বাদ অন্ন মধুর । ইহা মানক, ক্ষুৎ পিপাসাদীপক, উদরের পীড়ানাশক বিষয় এবং তৃপ্তিজনক । ইউরোপীয়েরা ইহাকে *Semila Genia* কহিয়াছিলেন । বাস্তবিক তাহা নহে । আমি উহা রীতিমত আশ্বাদন এবং পরীক্ষা করিয়া উহাকে *Genus moilatee* বলিয়া প্রতিপন্ন

করিয়াছিলাম । আশ্চর্যের বিষয় এই ‘মানিবা লাল বাজির প্রদর্শিত সোমরসের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে । বাহা-
ইউক, সোমলতার আকার অনেকটা, যে বন পুঁইয়ের মত সে বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ নাই ।

পূর্বকালে নানা প্রকার সোমলতা ছিল । এক্ষণে বত দূর অমুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে তাহাতে দেখিয়াছি, এখনও ২৪ প্রকার সোমলতা পাওয়া যায় । অংগণ করিলে ইহা মিলিতে পারে । এই ২৪ প্রকারের নাম অংগমান, কুম্ভমান, চন্দ্রমা, রাজত প্রভা, হর্ষারীম, কবীরাম, বেতাক, কণক প্রভা, প্রোতানবান, জলবৃন্ত, করবীর, অংশ-
বান, সরস্বত, মহাসোম, গাড়ুরাহত, গায়-
ত্রাইষ্ট্রেউত, পাউক, আগড়, শবর, অগ্নিষ্টোম, রৈবত, ত্রিগদীযুক্তা, পায়ত্রী, উড়ুপাতি । এই সকল সোমলতার প্রত্যেকের ১৫টির অধিক পত্র হয় না । লতা ও আকারে বড় দীর্ঘ নহে, কিন্তু বড় হুল ও সরস । “মহাসোম” নামক সোমলতার বিংশতিটি পত্র দেখা গিয়াছে । এই সকল লতার পাতা, গুল্ল পক্ষে ভস্মে এবং কৃষ্ণ পক্ষে পতিত হয় । অমাবস্তাতে সমুদায় পত্র মট হইয়া কেবলমাত্র লতাবিশিষ্ট থাকে । এই সকল লতার পুত্তজ পরংকালে কিছু প্রথর হয় । *

শাস্ত্রে আছে, হিমালয়, সর্ব, মাহেন্দ্র, মলয়, জী, দেবগিরি, পারিপাট্র, বিদ্যা এবং বিত্ততা নারী নদীর উত্তরে যে সকল পর্বত আছে, তথায় সোমলতা পাওয়া যায় । সিদ্ধ নামক মহানর্দে কান্দীরের মানস সরোবরে, দেবহুচ্ছ নামক হ্রদে সোমলতা প্রাপ্ত হইবার

(* *) সোমপ্রকাশ ১ আশ্বিন ১২৮৪ ।

(* * *) ভারতীয় গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা ।

কথা অর্থক্স বেদে যেথা যায়। তরে আছে
দাক্ষিণাত্যের কোন কোন পার্বত্য প্রদেশে,
এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বিশেষ মহা-
বনে কিংবা কোন বনময় প্রদেশে ইহা
পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদে অছে, ভারত-
বর্ষের পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে সোম-

লতা জন্মায়। পশ্চিম ভারতে সোমতীর্থ
নামে একটি স্থানও প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু
তথায় অনুসন্ধান করিয়া সোমলতা পাওয়া
যায় নাই। ফলতঃ যতদূর জানা গিয়াছে,
তাহাতে বোধ হয় সোমলতা জল এবং স্থল
উভয় স্থানেই জন্মায়।

জ্বরের কথা ।

(.শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস.)

—:o:—

“জ্বর” কি? অনেকরই ধারণা আছে
যে, জ্বর একটা ব্যারাম। কিন্তু বাস্তবিক
কথা জ্বর ব্যারাম নয়। জ্বর একটা লক্ষণ
মাত্র। জ্বর তবে কিসের লক্ষণ? জ্বর দুইটা
জিনিষের লক্ষণ—প্রথমতঃ, শরীরের মধ্যে
কোনও বিজাতীয় বিষ প্রবেশের লক্ষণ।
দৃষ্টান্ত বথা,—হাতে যদি কিছু ফুটরা গেল ও
ও সে জ্বরগাটা পাকিল, ত অমনি জ্বর হইবে।
পেটের মধ্যে আমাশয় বা গর-হজম বা অপর
কোনও উপদ্রব উপস্থিত হইলেই জ্বর চর।
বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়া নিউমোনিয়া হইলেই জ্বর
হয়। দ্বিতীয়তঃ—শরীরে প্রবিষ্ট বিষের
প্রতিক্রিয়ার দরুণ যেমন জ্বর হয়, তেমনি
মানসিক উত্তেজনা বা উত্তেজনার ফলেও জ্বর
হইতে পারে। অত্যন্ত দুশ্চিন্তা, প্রবল ক্রোধ
বা হঃখ, ভয় প্রভৃতির ফলেও, জ্বর হইতে
পারে।

আমাদের দেহ সুস্থ অবস্থার সর্বদাই
একই উত্তাপ রক্ষা করিতেছে। অনেকের

ধারণা যে, সে উত্তাপটি ৯৮°৪ ফারেনহাইট।
দেশভেদে এই স্বাভাবিক উত্তাপের তারতম্য
ঘটিয়া থাকে। বাংলাদেশ অপেক্ষা বিলাত
অনেক উষ্ণে অবস্থিত;—কাজেই বিলাতের
উচ্চতা এবং তথাকার বায়ু চাপ বাংলাদেশের
উচ্চতা ও বায়ু-চাপের সঙ্গে সমান নহে।
এইজন্য বিলাতের লোকদের স্বাভাবিক
দৈনিক উত্তাপ ৯৮°৪ হইলেও, এদেশের
লোকদের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৬°৪ হইতে
৯৮° এই সংখ্যার মধ্যে। জ্বর হইলে, গা
গরম হয়; অথচ, সুস্থদেহে, আমাদের
সকলেরই দেহের উত্তাপ একটা নির্দিষ্ট
উত্তাপের বেনীও হয় না, কম ও হয় না—
৯৬°৪ হইতে ৯৮° এর মধ্যেই থাকে। তবে
জ্বরের সময়ে এ অতিরিক্ত উত্তাপ আসে
কোথা হইতে? ইহার উত্তরে বলিব—এই
নরদেহ আজব কারখানা। এখানে কত কি
যে কাজ হয়, কত কি যে সৃষ্ট হয়, তাহা
ভাবিলেও অজ্ঞান হইতে হয়। শরীর খুব

গরম বোধ হইলে, আমরা গা খুলিয়া দিই, এবং গায়ে অল্প বাম চইতে থাকে—যেন দেহের সমস্ত জলের কলের মুখগুলিকে এক সঙ্গে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে! আবার শীত বোধ হইলে, আমরা খুব মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকি; অথবা যদি জামা না জোটে, তবে খুব হাত পা নাড়িয়া বা খানিকটা দৌড়িয়া দেহকে গরম করি—অর্থাৎ যেন মাংসপেশী গুলিকে খুব খাটাইয়া উত্তাপের সৃষ্টি করি। এই যে ঘাম দ্বারা দৈনিক উত্তাপ হ্রাস ও মাংসপেশীকে খাটাইয়া উত্তাপের সৃষ্টি—এ সবই এই দেহের কাজ। সমস্ত দেহের তাবৎ কাজই মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের মস্তিষ্কে তিনটি জায়গা আছে—একটির কাজ, যে যে দৈনিক প্রক্রিয়ার উত্পাদনিক্রমের সৃষ্টি হয়, তাহা-দ্বিগতক খাটান; অপরটির কাজ হইতেছে, সেই সমস্ত উত্তাপকে বাহির করিবার চেষ্টা; তৃতীয়টির কাজ—উত্তাপের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটান। এই দুইয়ের মধ্যে (উত্তাপ জমা ও খরচের মধ্যে) তৃতীয়ংশটি তাপ-সামঞ্জস্য ঘটাইতেছে। এই উত্তাপ-সামঞ্জস্যের ফলে, আমাদের দেহের উত্তাপ সদাসর্বদাই একই থাকিয়া বাইতেছে। মস্তিষ্ক এই উত্তাপ-সামঞ্জস্য-বিধারিনী কেন্দ্রের গোলযোগ উপস্থিত হইলেই, জর হয়।

জরে কি কি বিপদ হইতে পারে—জনসাধারণের সেগুলি বেশ করিয়া জানা থাকা উচিত। জর হইলেই শরীরে উত্তাপ বাড়ে। অধিক উত্তাপের ফলে, দেহের স্বকুমার সকল জিনিসই ধ্বংস বা ধ্বংসপ্রায় বা অকর্মণ্য হইয়া পড়ে;—কাজেই জরের প্রথম কুফল—দেহ-কর্ম এবং দেহের সমস্ত বস্তুর বিকলতা

প্রাপ্তি। জর হইলেই-মাথা, বকুতে (লিভারে), বুকে অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়। মথার রক্ত “চড়ার” ফল—এলোমেলো বকুনি (বিকার); বুকে রক্ত জমার ফল, নিউমোনিয়া ইত্যাদি; লিভারে রক্ত জমার ফল—লিভার বড় হইয়া বাওয়া। এইগুলি জরের দ্বিতীয় কুফল। জরের তৃতীয় কুফল—দেহের কোনও কোনও বস্তুর কার্য ভার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়া; অথবা কিয়ৎকালের জন্য একরকম বন্ধ থাকা। জরে শরীরের কর্ম হয়; সেই ক্রত-করিত পদার্থগুলিকে দেহ হইতে বাহির করিতে বাইরা, প্রস্রাবের বস্ত্র (Kidney) অনেক সময়ে বিকল হইয়া পড়ে। প্রস্রাবের বস্ত্র বিকল হইলে, প্রাণনাশের ভয় থাকে। জরের চতুর্থ কুফল—হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা। প্লেগ, নিউমোনিয়া প্রভৃতি জরে, হৃৎপিণ্ড সহজেই ভীষণভাবে জর্জরিত হইয়াই প্রাণনাশ ঘটায়। একশো পাঁচের উপরে তাপ উঠিয়া বেশীক্ষণ থাকিলে হৃৎপিণ্ডের পক্ষে এই ভয়টি খুব বেশী। কচিছেলেদের ও দুর্বল লোকদের পক্ষে, পাঁচ ছয় ঘণ্টা স্থায়ী ১০৬° কি ১০৭° জর প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে। আমি দীর্ঘস্থায়ী প্রাণাত্যক ১০৮ ডিগ্রি জর পর্যন্ত দেখিয়াছি। ম্যালেরিয়া, বাতজর, প্লেগ প্রভৃতিতে, অকস্মাৎ ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রিজর হয়। আশ্চর্য্য নয়।

জরের “অপকারিতা” বলিলাম। জরের “উপকারিতা” কিছু আছে কি? আছে বৈ কি। জরই প্রকৃতির প্রধান চেষ্টা—দেহের মধ্যে আগন্তুক জীবাণুগুলিকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য। অধিকাংশস্থলেই, দেহের মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করিয়াই জরের উৎপত্তি ঘটায়।

উৎপত্তি ঘটান, অধিকাংশ জরই জীবাণু। জরের আলার জীবাণুরাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের দেহ-নিঃসৃত বিষও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভগবানের কি অনির্বচনীয় মহিমা! দেহকে বিষ মুক্ত করিবার জন্যই জরের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব জর দেখিলেই, তাড়াতাড়ি, তাহাকে কমাইতে সকল সময়ে চেষ্টা কর। উচিত নয়। কতকগুলি জর আবার “মেয়াদী”—অর্থাৎ নির্দিষ্টকাল স্থায়ী। ম্যালেরিয়া জর সাধারণতঃ ৮-১০ ঘণ্টার বেশী থাকে না; নিউমোনিয়া জর সাধারণতঃ ৫ম, ৭ম, ৯ম, অথবা ১১শ দিবসে আপনিই মগ্ন হয়। টাইফয়েড জর সাধারণতঃ ২১ দিনে ছাড়ে; ডেঙ্গু প্রভৃতি কতকগুলি জর আছে তাহারা কেহ ৩য়, কেহ ৭ম, কেহ ১০ম দিনে ছাড়ে। চিকিৎসা কর আর না কর, ঐ সকল “মেয়াদী” জর আপনার মেয়াদ লইবেই লইবে। জ্বরদস্তী করিয়া ছাড়াইতে যাইলে, অনিষ্ট হয়। এই জন্য, সূচিকিৎসকগণ সকল সময়ে ঔষধ দিবার জন্য ব্যস্ত হন না। তাহারা খালি নজর করিয়া বান—প্রকৃতি দেবী কোন পথে যাইতেছেন। জর আপনিই আপনার কারণ ধ্বংস করে—এই মূলমন্ত্র ধরিয়াই বর্তমান সূচিকিৎসকেরা যা-তা করিয়া বসেন না।

এক্ষণে জরে গৃহস্থের কর্তব্য কি? জর হইলেই প্রথম কর্তব্য—গোড়া হইতেই রোগীকে শয্যা গ্রহণ করান। জর-রোগী যত গোড়া হইতে শয্যার আশ্রয় লইবে, ততই তাহার জর অল্পকাল স্থায়ী হইবে, অবশ্য মেয়াদী জরের কথা স্মরণ। গোড়া হইতেই কাজকর্ম বন্ধ করিয়া, তাবনা চিন্তাকে ত্যাগ

করিয়া, বিছানায় শুইয়া থাকিলে, জরের প্রকোপ ও স্থায়ীত্ব যেমন কম হইবার কথা, উপসর্গাদি তেমন না হইবার কথা। জর গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইলে বা পরিশ্রম করিলে, জর ছাড়িতে চায় না। (করকাস রোগীর অবস্থাকে এই কথাটা খাটে)।

জরে গৃহস্থের দ্বিতীয় কর্তব্য—গোড়ার পথ্য লজ্জন দেওয়া। আমরা পুরাতন জরের কথা বলিতেছি না—তরুণ জরের কথাই বলিতেছি। জরে শরীরের ক্ষয় হয় বলিয়া, যদি রোগীকে ভোগসর্বস্ব ইংরাজের মতে তাড়াতাড়ি “পুষ্টিকর” খাদ্য দিতে যাই, তবে কুফল হইবে। কারণ, প্রথমতঃ, জরের প্রকৃতিই এই যে, রোগীর ক্ষুধা থাকে না; দ্বিতীয়তঃ, জরে পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়, এমন কি পরিপাক যন্ত্রের এত বৈকল্য ঘটে যে, রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হয়, ক্ষুধা নষ্ট হয়, জিহ্বা ময়লায় ঢাকিয়া যায়, গা-বমি করে। সে রকম অবস্থায়, পাছে রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে, এই অমূলক আশঙ্কায় তাহাকে কতকগুলি খাবার দেওয়া বড়ই ভুল। ডাক্তারেরা সে ভুল পদে পদে করেন। রোগীত দুর্বল হইবেই—সে দৌরল্য—জরের বিষক্রিয়ার ফল—শরীর ক্ষয়ের ফল নয়। এমন অবস্থায়, তুমি পুষ্টিকর খাদ্য দিলেও খাইবে কে, বা হজম করিবে কে? লাভের মধ্যে, গরহজম হইয়া বমি, দৌরল্য ও জর বাড়াইয়া দিবে। এ সম্বন্ধে আমাদের কবিরাজ মহাশয়দের পছন্দ বড়ই সূখ্যাতির যোগ্য। জরের অবস্থায়, রোগীরা আপনাপনিই দুধ পান করিতে চাহেনা, অথচ ডাক্তারেরা চক্ষু বুজিয়া দুধ দিবার ব্যবস্থা করেন। একটু ভাবিয়া

দেখিলে, বাহির হইতে দেখিলে দুধকে বত সহজপাচ্য, তরল ও লঘু পথ্য মনে করা যায়; দুধ ত তাহা নয়,—দুধ বেডেলা-ডেলা ছানার সমষ্টি। যদি কোন চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করা যায়—“জর হইয়াছে, রোগী ছানা খাইবে কি?” তখনই তিনি শিহরিয়া উঠিয়া, তাহা নিবেদন করিবেন, কিন্তু দুধ পান করিতে বলিবার সময়ে, চিকিৎসকও ভাবেন না, যে, দুধ ছানার সমষ্টি। তরুণ এবং প্রবল জরে দুধ বিববৎ। আসল কথা এই যে, ডাক্তারেরা যে পাশ্চাত্য-শুক্রর নিকট দুধ-পথ্যের গুণাগুণ শিক্ষা করেন, তাঁহারা প্রতি গ্রাসে মাংসপিণ্ড গলাধঃকরণ করেন এবং তিন বেলায় তাঁহাদের ভোজন পাত্রের কাছে ভাগাড়ের ক্ষুদ্র সংস্করণ জমায়েৎ হয়। কাজেই, সে জাতির পক্ষে, দুধ ও তাত অতি লঘু পথ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ এই ধানেই। পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে, দেশী পথ্যাপথ্যকে আমরা অসার মনে করিয়া প্রাণা অহুতব করি। দেশী পথ্যাপথ্যের দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা না থাকার লজ্জিত হই না এবং রন্ধন বিষয়ে সুখঁতা বশতঃ দেশী পথ্যকে উড়াইয়া দেওয়াই পরমার্থ জ্ঞান করি। ইংরাজী কেতাবে যে-যে পথ্যের কথা লেখা নাই, বা ইংরাজী কেতাবে যে-যে ভাবে পথ্যাপথ্য ইংরাজ তাহার নিজ দেশকালপাত্র হিসাবে বর্ণনা করিয়াছে, এ দেশীয় ডাক্তার মহাপ্রভুরা এদেশীয় হইলেও, সে-সে গভীর বাহিরে বাইতে পারেন না—অজ্ঞাতঃ, তাঁহাদের চিন্তা-শক্তি এত পল্প হইয়া যায়, বা মানব-প্রাণটাকে তাঁহারা এত ভুল সামগ্রী মনে করেন যে, বিনা চিন্তাতেই সকল জরেই “দুধ সাগুর”

ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তরুণ ও প্রবল জরে, দুধ না দেওয়াই উচিত। “জল সাগু, জল বালি, টাটকা অন্নমনি, বব, চিড়া বা থৈ-মগু, পাণিকলের বা শঠির পালো দৈএর ঘোল, জলের মিছরি হুটান জল, ডায়ের জল, গরমদুধে নেবুর রস দিয়া প্রস্তুত করা “ছানার জল” “চা” শুধু পট্টনীয় শীতল বা গরম জল, সোডা-লেমনেড প্রভৃতিই প্রবল ও তরুণ জরে উৎকৃষ্ট পথ্য। প্রবৃতি হইলে, বাসী বিলাতী “কুড” গুলিকে খুব পাতল করিয়া তৈয়ারি করিয়াও দেওয়া যায়। যে রোগীর জর তরুণ ও প্রবল নয়, দুধ পান করিলে বাহার পেট হুড় হুড় করে না, বা ফাঁপে না, বা তার বোধ হয় না, তাহাকে সাগু, বালি, এরোরট বা শঠির বা পাণিকলের পালোর সঙ্গে মিশাইয়া দুধ পান করিতে দিতে পারা যায়। জরে দুধ দিতে হইলে, কখনো খাঁটি দুধ দিতে নাই—জল অথবা সাগু, বালি, শঠি, এরোরট—ইহাদের মধ্যে যেটা হউক একটা মিশাইয়া দিতে হয়। খাদ্য হিসাবে, সাগু, বালি, এরোরট, পাণিকল বা শঠি প্রায় একই গুণাত্মক। জর যেমন-যেমন বাড়িতে থাকে, দুধের পরিমাণ সেই অনুপাতে কমান উচিত—আবার জর কম হইলে, দুধের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়ান যায়। ডালিম, বেদানা, আঙ্গুর আমরুল, গোলাপজাম, কমলালেবু, মিষ্ট বাতাবী লেবু, মিষ্ট আনারস, ইন্দু, নাশপাতি, কিস্মিস, খেজুর, মিছরি, বাতাসা এলাচদানা প্রভৃতিও জর বিস্তার দেওয়া যায়। প্রত্যেক ফলের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, উহার রস গ্রহণ করিয়া, “ছিঁড়কা” ফেলিয়া দিতে হইবে। টাইফয়েড্ জর সন্দেহ হইলে বা উল্লসার

বা পেট কাঁপা থাকিলে, অনোরস, নাশপাতি, কিসমিস, খেজুর দেওয়া উচিত নয়।

অরে তৃতীয় কর্তব্য,—রোগীর স্বচ্ছন্দতা বিধান করা। রোগীর গায়ের উপর দিয়া সজোরে হাওয়া না বহে, তাহা করা উচিত; কিন্তু তাই বলিয়া, সমস্ত ঘরদ্বার বন্ধ করা কোন মতেই উচিত নয়। তোমার—আমার শরন ঘরের চেয়ে, রোগীর ঘরে বেশী ভাল বাতাস বহা উচিত। “ঠাণ্ডা লাগা”—জ্বর ভয়ে, রোগীর ঘরের “অন্ধি—সন্ধি” বন্ধ করিও না। কুঁকু—কুঁকু জানালা বা দরজা না খুলিলে, ঘরে হাওয়া খেলিতে পার না। রোগীকে গলা পর্যন্ত ঢাকা দিয়া, অবোধে ঘরে হাওয়া খেলিতে দিতে হয়। রোগীর ঘরে ছাড়ান ফল, খাওয়ার—এঁটো বাসন, অভুক্ত দুধ ইত্যাদি, বা মল, মূত্র, খুখু—গায়ের জমাইয়া রাখা অস্তায়। বরফ রোগীর ঘরে অগন্ধ ফুল রাখা উচিত।

অরে চতুর্থ কর্তব্য—রোগীর মাথা ঠাণ্ডা রাখা। মাথার জল, অডিকলোন মিশ্রিত জল, নিশাদল বা শিকী মিশ্রিত জল বা বরফ দিয়া রোগীর মাথা ঠাণ্ডা রাখিবে। মাথা ঠাণ্ডা না রাখিলে, রোগী প্রলাপ বকে, বিনিদ্র হয়, কাঁকি মারিয়া উঠিতে চায় মাথার ব্যথা করি কষ্ট পায়। কচি, ছেল্লোদের মাথার রক্ত উঠিলে, তাহাদিগের “তড়ক্য” হয়। কাজেই অরে মাথা ঠাণ্ডা রাখার লাভ বেশী আনা, লোকসান মোটেই নাই। মাথার জল বা বরফ দিলে, বৃকে সন্ধি বসিবার কোনও আশঙ্কা নাই। এমন কি, নিউমোনিয়াতেও মাথার নিরাপদে বরফ দেওয়া চলে। বিজ্ঞের অথবা অজ্ঞ অরে, মাথার বরফ দিলে, রোগীর

কোনও অনিষ্ট হয় না। কাজেই, যে কোনও অরে (টেন্সাচারে), রোগীর মাথার বরফ দেওয়া যায়। ১৭৪ এর উপরে অর উঠিলে, বরফ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং সাধারণতঃ অর ১০১ নামিলে বরফ তুলিয়া লওয়া বাইতে পারে। কখনো বরফ দিতে দিতে, তাহা মাঝে মাঝে উঠাইয়া লইতে নাই—তাহা করিলে, হঠাৎ খুব বেশী রক্ত মাথার চড়ে—কাজেই, রোগী বেশী কষ্ট পায় বা প্রলাপ বকে। মাথা না কাশাইয়া বরফ দিলে, তেমন কাজ হয় না—যত বেশী চুলের উপরে বরফ দেওয়া যায় ততই তাহা দেওয়া বুঝা হয়। মাথার বরফ দিতে হইলে, থলি বা ব্যাগে করিয়া তাহা দেওয়াই ভাল—নতুবা বিছানা বালিশ ভিজিয়া যায় এবং বেশীক্ষণ ভিজা বালিশে শুইলে ঘাড়ে ব্যাথা হইতে পারে। কচিছেলেদের মাথার বরফের ব্যাগ বসাইতে হইলে, প্রথমে খানিকক্ষণের জন্য ২১৪ পাট কাপড়ের উপরেই তাহা বসান উচিত—নতুবা অত্যন্ত ঠাণ্ডার মাথা জ্বালাকরে। খানিকক্ষণ কাপড় বা তোয়ালের উপরে ব্যাগটিকে ধরিয়া, পরে তোয়ালে তুলিয়া ফেলিতে হয়। কাপড়ের টুকুরায় বরফ জড়াইয়া, তাহা মাথার দিলে, মাথার চুল, বালিশ প্রভৃতি ভিজিয়া যায় এবং মাথার অতি সামান্য অংশেই বরফ লাগে। এই জন্য, মাথার “চাঁদর” উপরে একটা বড় ব্যাগ এবং ঘাড়ের পিছনে (যেখানে চুল বেশ হইয়াছে, সেখানে) ছোট একটি ব্যাগে করিয়া—এই দুই ব্যাগের, একত্রে বরফ দেওয়া উচিত। শুধু জলের চেয়ে, নিশাদ, শিকী বা স্পিরিট বা অডিকলোন মিশ্রিত

জল এবং তাহার চেয়ে বরফ জল, এবং সব চেয়ে শুধু বরফ বেশী মাথা ঠাণ্ডা করে। কপালে জলের পটি দিলে মন বুঝান হয় বটে কিন্তু কোনও বিশেষ উপকার করেনা। “জল পটি” দিতে হইলে, খুব পাতলা এবং একপুরু কাপড়ের টুকরা দিতে হয়, এবং অনবরত তাহাকে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। জ্বর রোগীর মাথার জল বা বরফ, পৌষমাসের মাঝরাত্রেও দিতে বাধা নাই।

জ্বরে পঞ্চম কর্তব্য—বাহাতে ঘাম হয়, তাহা করা মল মূত্র ও বর্ষ, এই তিনটির সাহায্যে আমাদের দেহ হইতে অতিরিক্ত উত্তাপ বাহির হইয়া যায়। বারংবার, অতিমাত্রায় দাউ হইলে, রোগী কাঁবু হইয়া পড়ে;—কাজেই দাউ করাইয়া কেহ জ্বর কমাইতে খুঁজে না। ঔষধের দ্বারা অধিক প্রস্রাব করানও নিরাপদ কাজ নয়—বিশেষতঃ যে যন্ত্রটি প্রস্রাব সৃষ্টি করে—সেটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র বিধায়ে তাহাকেও পর্য্যুদস্ত বা জখম করা বোকামী। দেহের সে যন্ত্রটি জ্বরের আগায় সহজেই জখম হইয়া আছে, এবং সে যন্ত্রটিরই উপরে শরীরের ক্ষয়িত পদার্থ নিষ্কাশনের প্রধান ভার, অতএব প্রস্রাবকারক ঔষধের দ্বারা ‘চাবুক মারিয়া’ তাহার নিকট হইতে, তদবস্থায়, বেশী কাজ আদায় করার চেয়ে, রোগীকে প্রচুর পরিমাণে শীতল বা উষ্ণ জল, চা, ডাবের জল; বালি, মিছরির জল, সোডা, লেমনেড, ডালিম, বেদানা, প্রভৃতি খাওয়াইয়া প্রস্রাবকে বাড়াইয়া, শরীরের ক্ষয়িত পদার্থকে পাতলা করিয়া বাহির করানর চেষ্টাই সমীচীন। ম্যালেরিয়ার, অথবা শীত করে এমন জ্বরে কশ্মের সময়ে গরমজল পান করাইলে শীত ও

কশ্ম কমিয়া যায়। রোগীর বহিঃশীত বা কশ্ম না থাকে, এবং গলার ব্যথা না থাকে, তবে যে রোগেই হউক না কেন, দিনে রাত্রে শীত গ্রীষ্মে, সকল সময়েই জ্বর-রোগীকে শীতল পানীয় দিতে পারা যায়। শীতকালে বা রাত্রে ঠাণ্ডা জল বা ডাবের জল পান করিলে, রোগীর স্নেহা বৃদ্ধি হয় বলিয়া যে ধারণাটা আছে, তাহার মূলে সত্য নাই। শীতল পানীয় পাইলে রোগীর তৃপ্তি হয় বলিয়া জ্বরে বারংবার বরফ খাইতে নাই। দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে সামান্য বরফ দেওয়া জল এক-আধবার দেওয়া যায়, কিন্তু শীতল পানীয় অপেক্ষা গরম জল বা চা পান করিলে বর্ষ ও বাড়ে এবং তৃষ্ণাও কমে। জ্বর রোগীকে একেবারে অনেকটা জল দিতে নাই। জ্বরে গা-বমি করিলে, এক-পেট কুহুম কুহুম গরম জল বা সোডাওয়াটার খাইলে বিষমিষা দূর হয় এবং সমস্ত পেট ধুইয়া “ঝাড়িয়া” বমি হওয়ার বোগী ও স্নহ বোধ করে।

প্রস্রাব ও মল বাদ দিলে, ঘাম করান বাকী থাকে। ঘাম করাইলে রোগীর জ্বরও কমে, এবং সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। অথচ অধিকাংশ জ্বর রোগেই রোগীর ঘর্ম প্রায় হয় না, গাভ চর্ম শুক ও ক্রম্ভ হয়। সাধারণের বোধ হয় জানা নাই যে, পৌষ মাসেও স্নহ শরীরে সকলেরই ঘাম হয়—যদিও সে ঘাম আমরা দেখিতে পাই না। এইজন্য দৃশ্যতঃ ঘাম দেখা না বাইলেও, যে “অদৃশ্য ঘাম” হয়, তাহাকেও বাড়ান উচিত। গায়ের ঘামে বাতাস লাগিয়া সে ঘাম উপরিয়া যাইলে, তবে শরীর ঠাণ্ডা হয়। অতএব ঘাম হইতে আরম্ভ হইলে, সেই ঘামকে উপিষ্টা বাইবার অবসর

সেওয়া চাই। যান ওকাইতে যাইয়া বেন ঠাণ্ডা লাগান না হয়, সে দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অর রোগীর পক্ষে, এই নিয়মগুলি খাটাইয়া চলিলে রোগীর যথেষ্ট উপকার হয়। প্রথমতঃ রোগীকে বহু জামা কাপড় জড়াইয়া, বরষার খুব বন্ধ করিয়া না রাখিয়া, এমন ভাবে জামা কাপড় পরাইয়া রাখা উচিত, বাহাতে তাহার “গায়ের গরম” গায়ে লাগিয়া না থাকে, গাঠাণ্ডা হইবার অবসর পায়— বাহাতে অদৃশ্য ঘাম সহজে উপিয়া যাইবার অবসর পায়, তাহাই করা কর্তব্য। ঠাণ্ডা লাগায় তবে, অনেকে জামার উপরে জামা জড়াইয়া রাখেন—ভুলিয়া যান যে, তাহার রোগীর গায়ের উত্তাপ “তাড়াইতে” চান— গায়ের উত্তাপকে গায়ে “জড়াইয়া” রাখার ঠিক উল্টাই করিতে চান। অথচ কথায় ও কাজে এমন উল্টা ভাব ঘরে ঘরে দেখা যায়। রোগীর গাত্রদ্বাৰ উপস্থিত, সে বেচারী এতটুকু ঠাণ্ডা হাওয়া চায়—আর তাহার আত্মীয় স্বজনরা বরষার বন্ধ করিয়া, পাখার হাওয়াটুকু পর্যন্ত না দিয়া, রোগীকে গাএদফা জামা কাপড়ে জড়াইয়া রাখেন—বাহাতে রোগীর গায়ের অদৃশ্য ও দৃশ্য ঘাম মুহু মুহু উপিয়া যাইতে পারে, সে ব্যবস্থা করাই উচিত। দ্বিতীয়তঃ আবশ্যক হইলে, শীতল জলের সাহায্যে রোগীর দেহের উত্তাপ কমান উচিত। যেখানে অর ১০৫ হইতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, এমন অবস্থায় এবং ১০৬ বা তদ্বন্ধে অর উঠিলে “আইস-প্যাকিং” করা উচিত। ১০১ হইতে ১০৫ এর মধ্যে অর থাকিলে, “স্পঞ্জ” করানই বিধেয়। এই দুইটি কেসম করিয়া করিতে

হয়, তাহা পরে বলিতেছি। সাধারণের মধ্যে ধারণা আছে যে, স্পঞ্জ করান, শুধু অর কমান হইবারই ক্ষমতা। কিন্তু অর কমান ছাড়াও, উহার অপর একটি উদ্দেশ্য আছে; সেটি— রোগীর দেহে আরাম আনার ক্ষমতা। “শরীর গরম,” “মাথা গরম” বিনিদ্র অবস্থা, প্রকৃতি উপসর্গের শাস্তি বিধান করাও স্পঞ্জ করার উদ্দেশ্য।

“আইস প্যাকিং”—একখানি ওয়েল ক্লথ পাতিয়া, তাহার উপরে রোগীকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া শোয়াইতে হইবে। ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া, ঘরে আলো জালিয়া লইবে। মাথার বরফের খাল বসাইয়া দিবে। আবশ্যক বইলে (অর্থাৎ রোগী দুর্বল হইলে) পূর্বেই কতকটা ব্রাণ্ডি সেবন করাইয়া লইবে। বরফ জলে একখানা প্রমাণ বিছানার চাদর নিংড়াইয়া গলা হইতে পা পর্যন্ত তাহার দ্বারা রোগীকে জড়াইয়া দিবে—দেহের উঁচু-নীচু, খাঁজে খাঁজে চাদরখানিকে চাপিয়া বসাইয়া দিবে। ঐ চাদরের উপর একখানা মোটা কব্জল জড়াইয়া দিয়া, দশ পনের মিনিট অন্তর রোগীর অর কত নামিল, তাহা পরীক্ষা করিবে। ১০২ কি ১০৩ ডিগ্রী পর্যন্ত অর নামিলে, তাড়া-তাড়ি ভিজা চাদর ও কব্জল খুলিয়া লইয়া, চার পাঁচজনে মিলিয়া শুকনা তোয়ালে দিয়া, বেশ করিয়া ঘরিয়া সমস্ত গা মুছাইয়া শুকাইয়া দিবে। যদি তেমন জোরে হাওয়া না বহিতে থাকে, তবে আইস-প্যাকিং করিবার সময়ে আদৌ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না।

“স্পঞ্জ করা।”—এই জিনিষগুলি প্রথমেই হাতের কাছে আনিয়া রাখিবে।—খার্কো-

মিটার, ২।০ খানা শুকনা তোরালে, গামছা বা নেকড়া ; ২।৩ খানা, ভিজা গামছা ; এক প্রহ জামা কাপড় ; লেপ-ক্লাধা ; এক ঘটি গরম জল ও এক ঘটি ঠাণ্ডা জল ; টয়লেট ভিনিগার ; একটা আলো ; বরফ পূর্ণ থলি ; ব্রাশি ১ মাত্রা । সমস্ত যোগাড় হইয়া গেলে সেদিন বাহিরে হাওয়ার জোর থাকুক আর না থাকুক বরের জানালা দরজা সমস্ত বন্ধ করিয়া দিবে ও বাতি জালিবে । রোগীর সাধার বরকের থলি বসাইয়া দিবে এবং এক-মাত্রা ব্রাশিও খাওয়াইয়া দিবে । শীত শীত তাহার সমস্ত জামা কাপড় ছাড়াইয়া লইয়া একজন একটা হাত, অপর জন অপর হাত কেহ একটা পা, অপর আর একজন অপর পা—এই রকমে রোগীরসর্ব্বাঙ্গ ভাগ করিয়া লইয়া, অল্প গরম জলে গামছা নিংড়াইয়া ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বারবার ঘষিবে - যতক্ষণ না সেগুলি কতক পরিমাণে ঠাণ্ডা হইয়া আসে । বুক, পিঠ, পাজর ও পেট অতি অল্প সময়ের জন্য ঘষা উচিত—রোগীর গায়ের উত্তাপ যদি ১০৪ হয় তবে প্রথমে ১০২ ডিগ্রী উত্তাপের জলে গামছা ভিজাইয়া গা মুছিতে আরম্ভ করিতে হয় এবং বার বার ঐ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা করা জলে গামছাটিকে এমন ভাবে নিংড়াইতে হয়, যেন তাহা হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়ে না, অথচ রোগীর গা কিছু কিছু ভিজিয়া যায় । এই ভাবে ৫।৭।১০ মিনিট গা মোছার পরে, রোগীর অঙ্গ কত কমিল, তাহা দেখা উচিত । অল্প ২।৭।৪ ডিগ্রী কমিয়াছে বুঝিলে, সকলে মিলিয়া শুকনা তোরালে দিয়া তাড়াতাড়ি বেণ করিয়া থসিয়া গা শুকাইয়া, গরম করিয়া নিবে ; এবং শুষ্কপাং গলা পর্য্যন্ত স্নানপার প্রভৃতি

যায়া চাকিরা বরের দরজা জানালা খুলিয়া দিবে ।

অল্প হইলেই সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া রোগীর গারে জামা ছোড়ার বাহ্যিক করা তুল—বরং তাহার উন্টা করিয়াই সুঁফল পাওয়া যায় । যথাক্রমে যেমন শুষ্ক জল, অডিকটোন মিশ্রিত জল, বরফ জল ও বরফ—শীতল হইতে শীতলতর ; তেমনি অল্প রোগীকে অল্প হাওয়া খাইতে দেওয়া (অবশ্য আবশ্যমত জামা ছোড়া পরাইয়া—বেশী বেশী পরাইয়া নয়), স্পঞ্জ করা, ও আইস প্যাকিং করা, সামান্য হইতে গুরুতর শীতলতা আনয়নের উপায় । এই সহজ কথা গুলি স্মরণ যোগ্য ।

অল্পে বর্ষ কর্তব্য—রোগীর বেহ পরিষ্কার রাখিবে । স্নানমত ধোয়ান, চুল আঁচড়ান নথ কাটা, চুল দাড়ি কাটা বা কামান, দাঁত মাজা, হাত-পা পরিষ্কার রাখা চাই । নাপিত-সাবান দিয়া হাত ধোয়াইয়া, কামাইতে প্রত্যাহার নাই । প্রত্যাহ বিছানা শেব ও কাপড়-চোপড় বদলান উচিত । আমাদের দেশে একটা প্রথা আছে যে, ব্যাধীয়ে ধোপার বাড়ী কাপড় দিতে নাই ও কোরকর্ষ করিতে নাই । নাপিত ও ধোপা নানা রকম লোকের বাড়ী নিত্য যাতায়াত করে বলিয়া, ছোঁরাচে কোনও যোগ হইলে, ঐ নিয়ম পালন করা উচিত । কিন্তু যদি নিজের রোগটি ছোঁরাচে না হয়, যদি নাপিত বেণ পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরিয়া থাকে, যদি নিজ নিজ স্মর, কাঁচি, সাবান, বুক, নরুণ প্রভৃতি ব্যবহার করা যায় এবং যদি নাপিতকে বেণ করিয়া সাবান দিয়া হাত

ধোয়াইয়া লগ্না হয়, তবৎক্ষণে কপর্ষে কোনও ভাব্য বাধা থাকিতে পারে না। ঐ রকমে হোয়াচে ব্যারাম না হইলে, ধোপার বাড়ী কাপড় দিতেও বাধা নাই। এই সংক্রান্ত দুইটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; প্রথমটি এই যে, একটি রোগী হইতে অপর বাড়ীতে ব্যারাম সংক্রামিত ঘাহাতে না হয়, তাহা

সকলেরই কর্তব্য। এবং দ্বিতীয় কথাটি এই যে,—সুস্থ শরীরে, অনেক সময় হোয়াচে ব্যারাম ঘটিলেও রোগ ধরে না বটে, কিন্তু “অরগারে” যে কোনও অপর ব্যারাম সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। এই দুইটি মূল কথা মনে রাখিয়া বাহিরের জন সাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়।

বাহা, আবাচ, ১৩০.

হাঁপানির কতিপয় মুষ্টিযোগ ।

(শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়)

আজকাল অধিকাংশ লোকে হাঁপকাশ রোগে জর্জরিত দেখিয়া কতকগুলি মুষ্টিযোগ নিয়ে প্রকাশ করিলাম। যদি ইহা কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দয়া করিয়া ইহার ফলাফল আমাকে জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। আমি যতদূর জানি, এবং অল্পে বাহা জানেন তাহা জানাইতে সততই প্রস্তুত আছি। আমার নিকট পত্র আসিলে উত্তর দিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইবে না। তাঁহারও আমার প্রতি এ অমুগ্রহ রাখিবেন।

১। পুষ্করীতে যে কাঁকড়া জন্মায় তাহাকে ভেলো কাঁকড়া বলে। ঐ কাঁকড়া এটা খেঁতো করিয়া যে রস নির্গত হইবে, তাকড়া দ্বারা ছোকিয়া লইবে এবং উহার সহিত গোলাপ জল কিছু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে, উপরিউক্ত নিয়মে তিন দিন সেবন করিলে, বদ্যপি

অস্ত্রখের কিছু ছিট থাকে, তাহা হইলে ২।১ দিবস ঐ ঔষধ সেবন করিতে হইবে। ঔষধ সেবন কালীন শাক, অম্বল, কলাইয়ের ডাইল খাওয়া নিষেধ। ইহাক পরীক্ষিত।

২। খাঁটি গব্য ঘৃত ১।০ একপোরা লইবে এবং ৫টা কালধুতুরার ফল বিচি ফেলিয়া দিয়া ঐ খোসা ঢাকা ঢাকা করিয়া কাটিয়া লইবে, পরে ঘূঁটের জালে ঘৃত চড়াইবে ঘূতের গাঁজলা মরিয়া আসিলে উহাতে ঐ খোসাগুলি উত্তমরূপে ভাজিয়া ঘৃত জাল হইতে নামাইবে। ঐ ঘৃত প্রত্যহ একবার প্রাতে সেবন করিবে। মাত্রা ৮০ দুই আনা হইতে ১০০ অল্প ভোলা পর্যন্ত সেবন কালীন শাক অম্বল, কলাইয়ের ডাইল খাওয়ানিষেধ।

৩। কালকান্দুলে (কাসমর্দ) ইহার বীজের চূর্ণ অর্দ্ধ আনা ওজন মধুসহ মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া থাইলে শ্বাস কাসে উপকার হয়।

৪। বেলপাতার, রস বাসক পাতার রস, খেত ডানকুনী পাতার রস মোট ২ তোলা খাঁটি সরিষা তৈলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে খাস রোগ ধ্বংস হয়। এক কুঁচ ডানকুনির শিকড়—পানের ভিতর ক'রে খাইলে হাঁপানি সারিয়া যায়।

৫। শুঠ, আকুল কাঁটান'টের মূল ও বামুন হাটা—সমপরিমাণ অর্কসের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১/১০ অর্কপোয়া থাকিতে জাল হইতে নামাইয়া ঈষদ্ভূত থাকিতে সেবন করিলে খাস দূরীভূত হয়।

৬। একটা সম্পূর্ণ কুশের শিকড় দুই ভাগ করিয়া ১ ভাগ খাঁটি সরিষা তৈলে প্রস্তর পাत्रে বসিয়া প্রত্যহ দুইবার বন্ধঃস্থলে মালিশ করিবে, এবং অপর অর্দ্ধাংশ জলে বাটিয়া তরল পদার্থটা প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান করিবে এইরূপ নিয়মে দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে। হাঁপ কাশ আরোগ্য হইবে। কুশের মূল গলায় ধারণ করিলে ও গীড়া আরোগ্য হয়। শাক, অম্বল, কলাইয়ের ডাইল খাওয়া নিবেদ।

৭। পুরাতন ইক্ষুগুড় খাঁটি সর্বপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাস বৃদ্ধির সময় চাটিয়া খাইলে হাঁপের উপশম হয়।

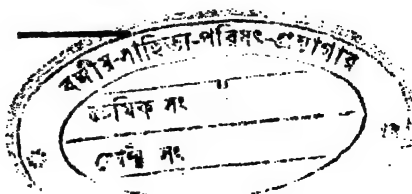
৮। তুলসী গাছে গুটি পোকা হয়, ঐ গুটিপোকা সংগ্রহ করিয়া তামার মাছলিতে ঐ গুটিপোকা পুরিয়া কঠে ধারণ করিলে হাঁপানি নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। শাক, অম্বল, কলাইয়ের ডাইল খাওয়া নিবেদ।

৯। আরলোলা (ভেলাধোকা) ৮১০ টা লইয়া একসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া একপোয়া জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ জল সমস্ত দিন রাখে অন্ন সেবন করিবে। উপরিউক্ত নিয়মে প্রত্যহ প্রস্তুত করিয়া লইবে। এইরূপে সপ্তাহ কাল সেবন করিলে হাঁপানি আরোগ্য হয়।

১০। লাল লবণ ১/১০ আনা, আদার রস ১১/১০ আনা, মধু ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে খাস রোগ আরোগ্য হয়।

১১। কালধুতরার পাতা শুক করিবে, পরে গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া মিহি সোরার গুঁড়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশিতে ছিপি বদ্ধ করিয়া রাখিবে। হাঁপ বৃদ্ধি হইলে একটি পাत्रে ঐ গুঁড়া রাখিয়া অগ্নি-সংযোগ করিবে। যখন উহা হইতে ধূম নির্গত হইবে তখন নাক ও মুখ দ্বারা ঐ ধূমের খাস টানিয়া লইবে, তৎক্ষণাৎ হাঁপ নিবারণ হইবে।

১২। যে কোন কলার মোচা লইয়া খেবড়াইয়া (খেঁতো) করিয়া রস বাহির করিবে, ইহার রস ১ তোলা, আকন্দর আঠা ২ ফোঁটা, বাসক পত্রের রস ১ তোলা, এই কয়টি দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া হাঁপানি রোগীকে খাইতে দিলে ২০।২৫ মিনিট মধ্যে নিশ্চয় হাঁপানি বন্ধ হইবে। ইহা পরীক্ষিত।



বঙ্গ লোক সংখ্যা, জন্ম ও মৃত্যু।

(১৯২১ সালে আদমশুমারী অনুসারে)

জিলার নাম	লোকসংখ্যা	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক
বর্ধমান	৭৩২৩৬৯	৭০৬৫৫৭
বীরভূম	৪২২৯৮৬	৪২৪৫৮৪
বাঁকুড়া	৫০৯৩৪	৫১০৬৭
মেদিনীপুর	১৫৩৯৬৫২	১৩২৭০০৮
হুগলী	৫৬১২৬৮	৫১৮৮৭৪
হাবড়া	৪৫৩৫১৫১	৪৬২২৫২
২৪ পরগণা	১৪৩০৭৪৮	১১৯৭৪৮৭
কলিকাতা	৬১৭৫৯০	২৯০২৬১
নদীয়া	৭৬১৩৪৫	৭২৬২২৭
মুর্শিদাবাদ	৬২৮৭৪২	৬৩১৭৭২
যশোহর	৮৯৩৫৯৩	৮২৮৬২৭
খুলনা	৭৫৭৫২৪	৬৯৫৫১০
রাজশাহী	৭৬৭৩৭০	৭২২৩০৫
দিনাজপুর	৮৯৬৪০০	৮০৮৯৫৩
জলপাইগুড়ি	৫০৬৩৩৭	৪৩২৮৭২
দার্জিলিং	১৪৯০৯৪	১৩৩৬৫৪
রঙ্গপুর	১৩১৬৮৪০	১১৯১০১৪
বগুড়া	৫৩৮৭২৭	৫০৯৮৭৯
পাবনা	৭০৬৭০২	৬৮২৭৯২
মালদহ	৪৯২৮২২	৪৯২৮৪৩
ঢাকা	১৫৭২২২০	১৫৫৩৭৪৭
ময়মনসিংহ	২৫১০৪৫	২৩৭২৮০
করিমপুর	১১৪৭৭৪২	১১০২১১৬
বাখরগঞ্জ	১৩৪১১৬৩	১২৮০৫৯৩
চট্টগ্রাম	৭৭৭৮৮২	৮৩৩৫৪০
নোয়াখালী	৭৩৮৭২২	৭৩৪০৬২
ত্রিপুরা	১৪০৬১৩৪	১৩৩৬৯৬৯
সমগ্রবঙ্গ	২৪০৫৭৯৩৬	২২৪৬৪৩৫৭

জিলার নাম	জন্ম	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক
বর্ধমান	২০৪৭৫	১৮৯৬৫
বীরভূম	১৪৬০৮	১৩৭৩৪
বাঁকুড়া	১৬২০৫	১৫৫২৩
মেদিনীপুর	৩৪২৭৪	৩৪৫৮১
হুগলী	১৪৩৯৩	১৩১৫০
হাবড়া	১৩৯৫৯	১২৫৫৯
২ পরগণা	২৮০০৫	২৫৩৮২
কলিকাতা	৯৩২৬	৭৯৮২
নদীয়া	২৪০৩৬	২২৪৯৫
মুর্শিদাবাদ	২৫৬০৫	২৩৯৪২
যশোহর	২২৭৪৬	২৬৫৯০
খুলনা	২২৪৮১	২০৮৪৬
রাজশাহী	২৫৩৭৪	২৪০৪৩
দিনাজপুর	৩২৯৯৮	৩১১২২
জলপাইগুড়ি	১৫৫৪০	১৪৫৭৫
দার্জিলিং	৪২১৩	৪১৫৫
রঙ্গপুর	৩৯৬৫২	৩৮০৯০
বগুড়া	১২৫৪৮	১১৪৪০
পাবনা	১৭৪৭৮	১৬৫৪৯
মালদহ	১৮১৬৩	১৬৭৩২
ঢাকা	৪১৪৫০	৩৮৪৫৪
ময়মনসিংহ	৬৮৬১	৬৩৭২৫
করিমপুর	৬১০৫	২৩০৭৭
বাখরগঞ্জ	৪২২৮২	৩৮৪৫৯
চট্টগ্রাম	২৬৩৮৯	২৩৯৪২
নোয়াখালী	২২৬৭৬	২০৫০৮
ত্রিপুরা	৩২৫৪৯	২৯৬৮৫
সমগ্রবঙ্গ	৬৭৪৭৯১	৬২৬২১০

জিলার নাম	হিন্দুর মৃত্যুসংখ্যা		জিলার নাম	মুসলমানের মৃত্যুসংখ্যা	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক		পুরুষ	স্ত্রীলোক
বর্ধমান	২১০৫২	১২৪৫১	বর্ধমান	৫১৭২	৪২৫৬
বীরভূম	১১২১৩	১০৭৩০	বীরভূম	৩৭৪০	৩৪৪৩
বাঁকুড়া	১৭৫৬৪	১৬৫৩২	বাঁকুড়া	২০২	৮৬৬
মেদিনীপুর	৩৭০৫৩	৩৬১৭২	মেদিনীপুর	২৬৫২	২৪৬৪
হুগলী	১৪৫৮২	১৭৪৬৩	হুগলী	২৮২২	২৭২১
হাবড়া	১২১৪৫	১০৬৬৮	হাবড়া	৩০৪৬	১৪৪৪
২৪ পরগণা	২৩৭৩০	১২২৫৪	২৪ পরগণা	১৪২২৭	১৩১৮১
কলিকাতা	১২৬৬০	২০৮৪	কলিকাতা	৪২৭০	৩১২১
নদীয়া	১২৪৫১	১১৩৪১	নদীয়া	১২৭৪৪	১৮২৪৬
মুর্শিদাবাদ	১১৭১৩	১০৫৩৩	মুর্শিদাবাদ	১৩৮৪৮	১২৪২৮
যশোহর	১১২২৩	১১৬২৪	যশোহর	২১৫৬৩	১৯১৮২
খুলনা	২০৫৩	৮০৮৫	খুলনা	১০৬৫২	২৬২২
রাজসাহী	৫৪৩৮	৫০০৩	রাজসাহী	২৬২৮৭	২৫০৩১
দিনাজপুর	১৩৫২৩	১১২২৫	দিনাজপুর	১৫২২২	১৪৮৪২
জলপাইগুড়ি	৭০৫৮	৫২২৫	জলপাইগুড়ি	৪৩৫৫	৪০৭৮
দার্জিলিং	৪৮৪২	৪৩৬২	দার্জিলিং	২২৪২	১২৫
রঙ্গপুর	১১২২৩	১০৪২৭	রঙ্গপুর	২৩৩৪৬	২১৮৮১
বগুড়া	২৬২৭	২০৭১	বগুড়া	১৫০১৮	১৩৫৭১
পাবনা	৫২৬৪	৪৮৫১	পাবনা	১৭৫৮২	১৫০১৩
মালদহ	৬৬২৫	৫৪০০	মালদহ	৭৫৪০	৬৬০৪
ঢাকা	১৬৩৩৩	১৫৩৪২	ঢাকা	২২৭৭৪	২৬২২৫
ময়মনসিংহ	১৭৬২৫	১৬০৬৪	ময়মনসিংহ	৫৭৭২২	৪৩৭০৮
ফরিদপুর	১৭৮০০	১০২৫৮	ফরিদপুর	২৩৫৬৪	২২৩৪৭
বাথরগঞ্জ	২২৬৮	৮৪৫৭	বাথরগঞ্জ	২৮৭৩৩	২৫১৬১
চট্টগ্রাম	৪১২১	৪২২২	চট্টগ্রাম	১৪৭১৬	১৪৮০
নোয়াখালী	৩৭৪৮	৩৫৬৪	নোয়াখালী	১৪২২৪	১৩৫২০
জিপুরা	৭৩৬৬	৬৭৭৮	জিপুরা	১০৮৭২	১৫৪১৪
সমগ্রবঙ্গ	৩২৩৪২৪	২২১৪৫৪	সমগ্রবঙ্গ	৩২০৫৬১	৩৫৪৩২৪

জিলার নাম	মৃত্যু.	পুরুষ	স্ত্রীলোক	দিনাজপুর	৩২২৫৮	২৯০৪২
বর্ধমান	২৭৪২০	২৫২১২	১৫৬৯৩	জলপাইগুড়ি	১৫১৭৩	১৪৬৪৮
বীরভূম	১৭১৫৫	১৫৬৯৩	১৮২১৯	দাঙ্গিলিঙ্গ	৬৩৫১	৫৮৪১
বাঁকুড়া	২০১০৬	১৮২১৯	১৮২১৯	রঙ্গপুর	৩৪৯৫০	৩২৫৩৭
মেদিনীপুর	৪২০১০	৪০৪৪২	১৮২১৯	বগুড়া	১৭২৭৩	১৬২১৭
হুগলী	১৮১১৬	১৬৮৮৩	১৮২১৯	পাবনা	২২৮৫২	১৯৮৬২
ইণ্ডা	১৫২০৬	১৪৮৮৩	১৮২১৯	মালদহ	১৫৫৮৪	১৩০৮৬
২৪ পরগণা	৩৯০৫২	৩৩৩৬০	১৮২১৯	ঢাকা	৪৬২৭৭	৪২৪৮২
কলিকাতা	১৭৫৮৮	১২৮০২	১৮২১৯	ময়মনসিংহ	৬৬২১৩	৬০৩৭৫
নদীয়া	৩২৩২৭	২৯৭১২	১৮২১৯	ফরিদপুর	৩৫৪২২	৩৩৩৫৩
মুর্শিদাবাদ	২৫২৭৪	২৩৪০৪	১৮২১৯	বাথুরগঞ্জ	৩৮৮২৯	৩৩৭১৪
যশোহর	৩৩৫১৯	৩০৮২০	১৮২১৯	চট্টগ্রাম	১৯৬৫৬	১৮২২৪
খুলনা	১২৭৪৬	১৭৭২২	১৮২১৯	নোয়াখালী	১৭৯৮৮	১৭০৯৩
রাজশাহী	৩২১৫৯	৩০৬৮১	১৮২১৯	ত্রিপুরা	২৫২৫৪	২২২০৩
				সমগ্রবঙ্গ	৭৩৫৬৩৮	৬৬৭৩২২

স্বর্ণবঙ্গ ।

(শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ)

—:০:—

স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করিতে কি কি উপাদানের প্রয়োজন তাহা কবিরাজ মাত্রেই জানা থাকিলেও সর্বসাধারণের এ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা অস্বাভাবিক নহে। কবিরাজেরা স্থান বিশেষে কেহ কেহ কৃত্রিমতা করিয়া ঔষধ নষ্ট তো করেনই, অধিকন্তু সাধারণের নিকট বিশ্বাস হীন হইয়াও পড়েন, আয়ুর্বেদের মর্যাদা এইরূপ ভাবেই অত্যন্তে ক্ষতি করিয়া বসেন। ইহা আয়ুর্বেদের দোষ নহে, ব্যবসায়ীর চাতুরী মাত্র। প্রবঞ্চক কবিরাজ দ্বারা আয়ুর্বেদেরই যে কুবল মর্যাদা নষ্ট হয় এমন নহে, সর্বসাধারণে ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাননা অথবা ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিপরীত ফল প্রাপ্ত হন। হাতুড়িয়াগণ এবিধি কার্য করিতে যত সাহস না পান, শিক্ষিত বঞ্চক

কবিরাজেরা এ বিষয়ে সাহসী ও সিদ্ধহস্ত হইয়া আয়ুর্বেদ ও রোগীর সর্বনাশ করেন।

স্বর্ণবঙ্গ নাম বলিয়া সাধারণে মনে করিতে পারেন, ইহাতে অবশ্যই স্বর্ণের পরিমাণ বেশীই পড়ে অথবা স্বর্ণ ও বঙ্গ সমপরিমাণে পড়ে বলিয়াই স্বর্ণ বঙ্গ নাম রাখা হইয়াছে। আর এই স্বর্ণবঙ্গের চেহারা দেখিলে কে ইহাকে খাটা কাঁচা সোণা না কহিবে? ইহার রং এত উজ্জ্বল ও হরিত্রাত যে, ইহাকে দেখিলেই খাটা স্বর্ণচূর্ণ বলিয়াই ধারণা হইবে। অথচ ইহাতে বিন্দু বা পরমাত্ম মাত্রও স্বর্ণ পড়ে না। ইহার উপকারিতা যথেষ্ট থাকিলেও ইহা একটা সাধারণ ঔষধ—ইহা মূলত মূল্যের ঔষধ। প্রমেহাধিকারে অবস্থা বিশেষে ইহার আশ্চর্য-রূপ রোগারোগ্যকারী ক্ষমতা দেখা যায়।

একদা আমি পীড়িত হইলে কোন এক উচ্চ আয়ুর্কেদ শিক্ষিত কবিরাজকে ভ্রম দিই, তিনি আসিয়া স্বর্ণবজ্র ব্যবস্থা করেন ও সঙ্গে যে স্বর্ণবজ্র আনিয়াছিলেন তাহা দেখাইলেন। দেখিয়া মনে করিলাম, না জানি কত স্বর্ণ দিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। সে কবিরাজ যে রাজবাটিতে বাতায়ন করেন তাঁহার জন্ত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমাকে দেখাইতে আনিয়াছেন, আরও বলিলেন “বহুমূল্য ঔষধ বলিয়া সর্বদা ইহা প্রস্তুত থাকে না। আমার কাছে একটি পুরাতন উৎকৃষ্ট মোহর বা ৩২ টাকা আপাততঃ দাবি করিলেন। মদীয় পিতৃব্য তৎক্ষণাৎ ৩২ টাকা দেওয়ার আদেশ করিলেন কিন্তু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নানা আপত্তি করিয়া পরদিন দেওয়ার কথা বলিয়া দিল। ঘটনা বশতঃ সেই সময়ই একজন বিজ্ঞ কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে স্বর্ণবজ্র প্রস্তুত করিতে কত স্বর্ণের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন “স্বর্ণবজ্র প্রস্তুত করিতে স্বর্ণের মোটেই দরকার নাই। আমরা বলিলাম—“অমুক কবিরাজ ইহা প্রস্তুত করিতে এক মোহর স্বর্ণ দাবি করিয়াছেন।” তিনি শুনিয়া লজ্জায় জিহ্বা কাটিলেন ও কহিলেন—“হায় এত বড় কবিরাজের এট কণ্ঠ! এই সকল কবিরাজেরাই আয়ুর্কেদের সর্বনাশ করিতেছেন।” তখন তিনি তাঁহার গৃহ হইতে মুক্তি ভৈরব্যভক্ত আনাইয়া স্বর্ণবজ্র প্রস্তুত কি কি জিনিস দরকার তাহা দেখাইয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মাইলেন যে, স্বর্ণবজ্র মোটেই সোণার দরকার নাই। সে দিন তাঁহার পুস্তক খানা রাখিয়া দিলাম। পরদিন

ঐ কবিরাজ মহাশয় প্রাতেই তাঁহার একজন ছাত্র পাঠাইয়া টাকা চাহিলেন। আমরা বলিয়া দিলাম—“কবিরাজ মহাশয়কে আসিতে বলিবেন, আরও প্রয়োজন আছে।” টাকার লোভে কবিরাজ মহাশয় তাড়াতাড়ি আসিলেন, আমরা কহিলাম—স্বর্ণবজ্র ত স্বর্ণ পড়ে না, এই দেখুন আয়ুর্কেদের পুস্তকে কি লিখা আছে?” তিনি নানা কথায় আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, আমরা বুঝিলাম না বা টাকা দিলাম না। ইহার পর হইতে (প্রায় ত্রিশবৎসর) উক্ত কবিরাজের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি, আমাদের পরিচিত মত কেহ তাঁহার নিকট ঔষধার্থে যার না। বিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়া তাঁহার নিকট ব্যবস্থা লইয়া থাকে। তিনি যে প্রকার বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ, তিনি যদি সংপথে থাকিতেন তবে তিনি বহুলাভবান হইতেন। এখন তাঁহার এই ব্যবহারে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ব্যবসায়ের ভিত্তি কৃত্রিমতার উপর স্থাপিত হইলে ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়, ঔষধ কাটে না, কেবল এই সকল প্রবঞ্চক কবিরাজ কখনই আয়ুর্কেদের ক্ষতি করিতে বা তাহার মর্যাদা নষ্ট করিতে পারিবেনা কিন্তু তাঁহাদের নিজেদেরই সর্বনাশ করিবেন, এই সকল ব্যাপারে কবিরাজদের হুণাম হইয়া থাকে। আমার বিবেচনায় আয়ুর্কেদ ব্যবসায়ী মাঝেই এইরূপ কৃত্রিম ব্যবসায়ীকে শাসন ও একঘরে করিলে আয়ুর্কেদ ও আয়ুর্কেদ ব্যবসায়ীর মর্যাদা রক্ষা হইবে। উপযুক্ত ও শাস্ত্রোক্ত বিস্তৃত ঔষধ না হইলে ঔষধ ফলোৎপাদক হয় না, সুতরাং ঔষধে ফল না পাইয়া লোকে আয়ুর্কেদেরই নিন্দা করিয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ ।

—:—

দৃষ্টিশক্তি ও শ্রাবণশক্তির জন্ম

স্বাদের তারতম্য ।

কোন জিনিসের আশ্বাদন গ্রহণ করা স্বভাবের সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি আসলে তাহা অতি জটিল ব্যাপার। কেবলমাত্র আশ্বাদনের শক্তির দ্বারা আমরা চাষি প্রকার রস বুঝিতে পারি, যথা—মিষ্ট, অন্ন, তিক্ত ও লবণ। ইহা চাড়া অগ্রাগ্রহ স্বভাবের রকমের স্বাদ সকল আমরা শ্রাবণশক্তির জন্মই সেই সকল স্বাদের ব্যতিক্রম বুঝিতে পারি। কোন রকম মিষ্ট চাটুনি অথবা জ্যাম খাইবার সময় আমরা নাসিকা বন্ধ করিয়া রাখিলে বুঝিতে পারি যে, চাটুনির আসল স্বাদ আমরা পাইতেছি না। এই রকম অবস্থায় ফলের স্বাদেরও কোন বিশেষত্ব আমরা বুঝিতে পারি না।

কিন্তু আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, কোন জিনিসের ভাল করিয়া স্বাদ পাইতে হইলে দৃষ্টি শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। অনেক লোক আছেন যাহারা চক্ষু সুজিত করিয়া পান করিলে চা কি কফি খাইতেছেন—বলিতে পারেন না। ধূমপায়ীগণ অন্ধকারে বসিয়া ধূমপান করিয়া সুখ পান না। যে সকল ধূমপায়ী গত যুদ্ধে অন্ধ হইয়াছে তাহারা বলে যে, ধূমপান করিয়া আর তাহারা তামাকের আশ্বাদন পায় না। তামাকের ধূম দেখার সহিত ধূমপায়ীর তামাকের আশ্বাদনের সম্পর্ক আছে। এই সকল দ্বারাই প্রমাণ

হয় যে, দৃষ্টি ও শ্রাবণশক্তির জন্ম স্বাদের তারতম্যে হইয়া থাকে।

মর্দনের ফলে রোগ আরাম ।

যাহারা কসরত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একটা কথা আছে যে, ব্যায়াম করিয়া যত না শক্তি বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্টি হয়, তাহার বিপুল হয় শরীর মর্দন করিয়া। ইহাও সকলে জানেন যে, শরীরের নানাস্থানের রোগ অনেক সময় কেবল মর্দন করিয়া উপশম ও আরাম হয়। সম্প্রতি চিকিৎসকগণ শরীরের নানাস্থানে মর্দন বা চাপ প্রদান করিয়া রোগ আরাম করিতেছেন। এই অদ্ভুত উপায় যদিও আশ্চর্যজনক* তথাপি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাতে স্থায়ী উপকার হইতেছে এবং সেইজন্য এইরূপ চিকিৎসা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।

গোড়া চিকিৎসকগণ এই উপায় অবলম্বন করিতে রাজী নহেন। অনেকেই এঁই চিকিৎসাকে উপহাস করিয়া থাকেন কিন্তু

* এই প্রবন্ধের লেখক মহাশয় মর্দনের ফলে রোগ আরোগ্য হয় জানিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন কেন বুঝিলাম না। তিনি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থগুলি ভাল করিয়া পড়িলে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই বুঝিবেন। আয়ুর্বেদে তৈলাদি মর্দনের চিকিৎসা যথেষ্ট আছে। “স্বতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দনাৎ নতু ভক্ষণাৎ” ইহা আয়ুর্বেদে বহুকাল পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আং সং ।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,—অনেক রোগীর এই চিকিৎসায় অতি আশ্চর্যজনক উপকার হইয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পুরাতন রকম চিকিৎসার দ্বারা কোন কোন রোগের যখন উপকার হয় নাই তখন এই উপায়ে সেই সকল রোগ দূর হইয়াছে।

এই চিকিৎসা প্রথমে ডাক্তার ফিজিগোরাল্ড আরম্ভ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই চিকিৎসায় মানুষের শরীরস্থ বিদ্যুতের জন্ত এই উপকার হয়। কি প্রকারে এই উপকার হইয়া থাকে তাহা ঠিক নির্দেশ করিয়া তিনি বলিতে পারেন না। তবু তিনি ইহা বুঝিতে পারেন যে এই, বিদ্যুৎ শরীরের মধ্য দিয়া কোন প্রকারে যায়, কারণ প্রত্যহই তিনি ঐ বিদ্যুতের সাহায্যে চিকিৎসা করিতেছেন, তবে চিহ্ন মানুষের কার্য্য নহে। বদ্বিও তর্ক হিসাবে ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, ইহা মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয় কিন্তু তাহা ধরিয়া লইলে ইহা কোন মানুষের দ্বারা হয় তাহা মানুষের এখনও অজানিত। এখনও বুঝা যায় নাই কেন শরীরের এক অংশ শরীরের অপর প্রান্তের কার্য্য সকলের উপর কর্তৃত্ব করে। শরীরে কতকগুলি কেন্দ্র আছে, সেট সকল কেন্দ্রে চাপ দিলে বা মর্দন করিলে অপর স্থানের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

দেখা গিয়াছে যে, শরীরের কোন কোন স্থানে চাপ দিলে, বসিলে, মর্দন করিলে কিম্বা আঘাত করিলে শরীরের অপর স্থানে কোন কোন রূপ নির্দিষ্ট ও স্থির নিশ্চয় ফল দেখিতে পাওয়া যায় বা অস্বস্থি বটে। কি জন্ত এরূপ বটে তাহা জানা কোতূহলপ্রদ বটে কিন্তু তাহাপেক্ষাও কোতূহলপ্রদ কোথায় এবং

কিরূপভাবে চাপ দিতে হইবে বা বসিতে হইবে তাহা জানা থাকা। একদিন উক্ত চিকিৎসকের কাছে একজন বালিকাকে আনা হইয়াছিল। তাহার দক্ষিণ বাহু বৈকিয়া পৃষ্ঠের দিকে চলিয়া গিয়াছিল এবং সেই বালিকাকে তাহার হাত খুলিতে পারিত না। তাহার পার্শ্বদেশে মেরুদণ্ডের দিকে মুহু আঘাত করিবার ফলে তাহার শক্ত হাত ক্রমে নরম হইয়া আসিল এবং ক্রমে সে যথেষ্টমাত্র হাত নাড়িতে আরম্ভ করিল। এই চিকিৎসায় যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয় তাহার নিজের গৃহেও করা সম্ভব।

হুই হাতের আট আঙ্গুল একসঙ্গে বসিলে কেশ দীর্ঘ হয়, কিন্তু টাক সারে না। যে স্থান হইতে চুল একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, তৎস্থানে নূতন চুল উঠান অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এমন কি কখন নূতন কেশ আর হয় না।

এই নূতন উপায়ে যে রোগ আরাম হইয়া থাকে কেবল তাহাষ্ট নহে, ইহা দ্বারা রোগাক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়। ফুসফুসের বন্ধ্যারোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এই চিকিৎসাক্রমবিধি অনুসারে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, পেট সঙ্কুচন করিতে হইবে। এই অবস্থায় ফুসফুস ও হৃদযন্ত্র উপরে উঠিয়া পড়ে ও পাকস্থলীস্থ ভুক্তাবশিষ্ট চাপের জন্ত নিম্নগামী হয়; ইহাতে সমগ্র শরীরের রক্ত চলাচল ভাল করিয়া হয়। এই অবস্থায় থাকিলে ফুসফুসের উপর অংশ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস জরূপ করিতে রোগী বাধ্য হয়। এই উপরিভাগেই বন্ধ্যারোগ প্রায়ই আরম্ভ, কারণ ফুসফুসের এই অংশ অধিক ব্যবহৃত

হয় না। আমাদের মধ্য প্রায় সকলেই পাকস্থলী ও কুস্তকসং মধ্য যে পর্দা আছে, তাহার সাহায্যেই শ্বাসপ্রশ্বাস চালাই এবং তাহার ফলে আমাদের কুস্তক বেষ্ট্র ব্যবহৃত হয় না ও উজ্জ্বল উহাতে রোগ সৃষ্টি হওয়ার সুবিধা হইয়া পড়িয়া থাকে। যে ব্যক্তি কুস্তকসং সমস্ত অংশ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য করে, তাহার শ্বাসরোগের আক্রমণ হইবেই না একথা প্রায় নিশ্চিত করিয়া বলা যায়, কারণ সেই ব্যক্তি যখনই ঐ রোগ দ্বারা

আক্রান্ত হয় তখনই উক্ত রোগ কর্তৃক ভাল করিয়া আক্রমিত হইবার পূর্বেই ঐ রোগের বীজ বাহির করিয়া দেয়। ইহা শুধু চিকিৎসা নহে, ইহা দ্বারা রোগাক্রমণের বাধা প্রদান করা হয়।

পাখের শিরা ফুলিয়া উঠা ও দড়ীর মত পাক্কাইয়া যাওয়ার এক রোগ আছে, উহাকে vericose veins বলে, কোমরের পেশী সঙ্কুচন করিলে ঐ রোগ হয় না এবং হইলেও ঐ রোগও পদ প্রভৃতির নানারূপ রোগ দূর হয়।

সঙ্গীবনী।

সমালোচনা।

রোগ বিজ্ঞান। - বৈষ্ণুচাঁদ্য কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় এম বি (Gold medalist Homoeopath) কাব্যতীর্থ ব্যাখ্যাকরণতীর্থ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক বিরচিত। মূল্য এক টাকা। ৮৫ নং বিডন ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। এই পুস্তকের কিয়দংশ ‘আয়ুর্বেদে’ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয় রোগোৎপত্তির মূলীভূত কারণে জীবাণুতত্ত্ব। অধুনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—জীবাণুই রোগের কারণ নির্ণয় করিলেও প্রাচীন যুগের ঋষিবৃন্দই যে ইহার প্রথম আবিষ্কারক—গ্রন্থকার তাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার সে চেষ্টা সফলও হইয়াছে। এই পুস্তক হইতে অনেক গবেষণা মূলক তথ্য জানিতে পারা যাইবে। চিকিৎসক সমাজে ইহা সমাদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

সলর কবিরাজী চিকিৎসা। কবিরাজ শ্রীগিরিজা ভূষণ রায় প্রণীত। মূল্য ১১ টাকা ২০৩২ মনো-পোহন লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। খুব সোজা কথায় এবং বাঙ্গালার সকল রোগের নিদান ও চিকিৎসা পদ্ধতি এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। পুস্তক খানির প্রণয়নে গ্রন্থকার খাটিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থগণও ইহা ঘরে রাখিলে উপকার পাইবেন।

মর্দবাবী। - ত্রীকানাটাদ দালাল প্রণীত

শান্তিপুর - প্রেম নিকেতন হইতে ত্রীচিদানন্দ দালাল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এখানি কবিতাপুস্তক, কিন্তু মলয় বাতাস, চাঁদের কিরণ, ফুটন্ত জোছনা লইয়া লিখিত নহে, সবগুলিই ধর্ম্মমূলক, পড়িলে প্রাণে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা হয়। সোজা কথায়, সরল ভাবে প্রাণের উচ্ছ্বাস ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই কবিতা প্রাবিত বঙ্গে অল্প কবিতা ফেলিয়া একুশ কবিতাই তো প্রিয় জনের হাতে তুলিয়া দেওয়া কর্তব্য, কিন্তু সে কর্তব্য পালনে পাঠকেরাও অবুধ্য, লেখক-দিগের তো কথাই নাই। যুবান কথায় অর্থ চাপিয়া ভাবের অন্তর্ভুক্তি বা অব্যক্তি, রাখিতে না পারিলে আজকালকার দিনে কবিতাই হইবেনা—ইহাই হইয়াছে বর্ত্তমান বাঙ্গালার কবিতার প্রকৃতি। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে কাণাটাদ বাবু যে সে রীতি অবলম্বন করেন নাই, ইহা দোষিয়া আমরা পরম পুনর্জিত হইয়াছি। কাব্যমোদী বাঙ্গালীকে আমরা এ গ্রন্থ পাঠ করিতে পরামর্শ প্রদান করিতে পারি।

বিবিধ প্রসঙ্গ ।

কবিরাজ রাজেন্দ্র নাথ । — কলিকাতার অল্পতম শ্রেষ্ঠ কবিরাজ রাজেন্দ্র নাথ সেন শাস্ত্রী মহাশয় আর ইহলোকে নাই । হার্ট ফেল করিয়া সংপ্রতি তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে । কবিরাজ রাজেন্দ্র নাথ প্রায়ঃ-স্বদীয় গজাধরের শেষ ছাত্র ছিলেন । তাঁহার বিরোগে কলিকাতার গজাধরের শিষ্য বলিতে কেহই আর রহিলনা । ইহার অভাবে খাঁটী আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক বমাজের চুড়া খসিয়া পড়িল বলা যাইতেও পারে । আমরা কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথকে হারাইয়া বিশেষ মর্শ্ববাথা পাইয়াছি । ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি সেচন করুন ।

পণ্ডিত উমেশচন্দ্র । — পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিচারজ্ঞ ও আর ইহ জগতে নাই । বৈজ্ঞানিকের অসাধারণ প্রতিভাশালী — সমগ্র বেদের পরম পণ্ডিত উমেশচন্দ্র ও অমরধামে গমন করিয়াছেন । ইহার মত বাগ্মী এ্যুগে খুব কমই দেখা যাইত । ইহার প্রণীত “মানবের আদি জন্ম ভূমি” আতিতত্ত্ব বারিধি প্রভৃতি পুস্তকে ইহার চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল সাধন করুন ।

বাক্সালার পল্লী । — বাক্সালার পল্লীগুলিতে কিরূপ লোকসংখ্যা হইতেছে, তাহা ১৯২১ সালের সরকারি রিপোর্ট পড়িলেই অল্পমিত হইতে পারে । উহাতে প্রকাশ, এই সালে বঙ্গের পল্লীগ্রাম সমূহে

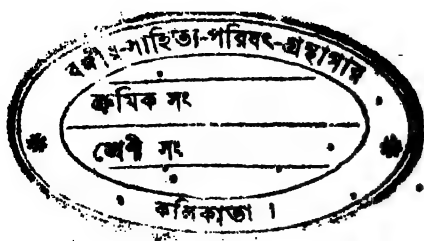
কলকাতার মরিয়াছে	৭৩,৯৪৩ জন ।
বঙ্গভুক্ত	৭,৮০৫ জন ।
কালিকাতায়	২,২৬ জন ।
ম্যাঙ্গেরিয়ায়	৭,৩৭,৩২৩ জন ।
সর্ববিধজন্মে	১০,৪৬,৬৬১ জন ।
আম্রাণ	১৩,৭,৪৮ জন ।
ইন্দ্র দেবীজন্মে	২,৮,০২ জন ।
নিউমোনিয়ায়	৫,৭,৬১ জন ।
বকার	১,৩,৯৫ জন ।

সমগ্র পল্লী সমূহে ১৯২১ সালে মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত ৮৭ জন । এই হিসাবে বাক্সালার পল্লীগুলির লোকসংখ্যা ঐকরূপ হইতেছে তাহা অল্পমান করা যাইতে পারে । ফলে বাক্সালার পল্লীগুলির অবস্থা বৈরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে অচিরে ধ্বংসসাধন অবশ্যজ্ঞাবী বলিয়া মনে হয় ।

অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিভাগ । — অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিভাগের নূতন সেশন আরম্ভ হইতেছে ! ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রদেশ এবং সিংহ ও ব্রহ্মদেশ হইতেও বহুসংখ্যক ছাত্র আসিয়া ভর্তি হইতেছে । এখানে ছাত্র গ্রহণ করা হইতেছে, কিন্তু বৈরূপ অবস্থা তাহাতে গতবর্ষের ত্রায় এবারও বোধ হয় অনেককে ভর্তি হইতে আসিয়া বিকল মনোরথ হইতে হইবে । গত বৎসর ৬০ জনকে ভর্তি করার পর ১৩ জনকে স্থান দিতে পারা যায় নাই, এবারও নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, যাহারা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন আর একদিনও দেরী না করেন ।

আয়ুর্বেদীয় হাসপাতাল । — ভারতের নানা স্থানে আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হইতেছে দেখিয়া আমরা পরম স্তুতি হইয়াছি । আমাদের পাঠকগণ জানেন, ভারতের বিভিন্ন স্থানের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি আয়ুর্বেদের প্রচার কামনার অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিভাগের বৃত্তি বা স্কলারশিপ দিয়া ছাত্রগণকে পড়াইয়া থাকেন । অনেক স্থানের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি সেই সকল স্থানে আয়ুর্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ও খুলিয়াছেন । অষ্টাদ আয়ুর্বেদ বিভাগের চরম পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকেই তাহারা চিকিৎসালয়ের ভার দিয়া থাকেন । ভারতের প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষগণকে যেদিন আমরা একাধো ম এসর দেখিব, সেইদিন বৃষ্টিব আয়ুর্বেদের লুপ্ত স্বাবিযুগ ভারতে কিরিয়া আসিল ।

কবিরাজ, অমরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্তৃক ২০২, কর্ণওয়ালীশ স্ট্রীট, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ১৭১৯নং ভ্রাম্যাকার ব্রিঙ্ক মোড়, হইতে মুদ্রাকর কর্তৃক প্রকাশিত ।



আয়ুর্বেদ

৭ম বর্ষ

শ্রাবণ ১৩৩০ সাল।

১১শ সংখ্যা।

ইন্ফুয়েঞ্জা।

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ]

বৎসরের মধ্যে এমন এক একটা সময় আইসে, যখন কোন একটা বিশিষ্ট রোগ সমাজে ব্যাপকভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়া অধিকাংশ নর নারীকে পীড়া দান করে। আমাদের আলোচ্য ইন্ফুয়েঞ্জা নামক রোগটাও এই ধর্মাবলম্বী। ইহা সাধারণতঃ ঠাণ্ডার সময় প্রাদুর্ভূত হয়। বিশিষ্ট কালে ইহাদের উৎপত্তি এবং কালস্বভাবেই ইহারা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'কালকৃত ব্যাধি' ধরা হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ এই সকল রোগের কারণ সম্বন্ধে বলেন যে, বিশিষ্ট বিশিষ্ট বীজাণু এই সকল রোগের হেতু।

তাহারা শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে যদি শরীরের ভিতর যে রোগ প্রতিরোধক শক্তি (Immunity) বিद्यমান আছে তাহা

যদি রোগ বীজাণুর শক্তি অপেক্ষা দুর্বল হয় অর্থাৎ শরীর যদি এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে যে অবস্থায় তজ্জাতীয় বীজাণু শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে তাহারা রোগ প্রতিরোধক শক্তিকে পরাভূত করিয়া নিজেদের বংশ বিস্তার সাধন করিতে পারে— তাহা হইলে তাহারা রোগোৎপাদনে সমর্থ হয়। আমাদের কিন্তু এ মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার এখনও যথেষ্ট কারণ বিद्यমান রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই এই সকল রোগ কোন একটা নির্দিষ্ট কালে উৎপন্ন হয়, অন্য সময় হয় না।

ইহা দ্বারা আমরা এই বুঝি যে, প্রাকৃতিক অবস্থা বিপর্যয়ে এমন এক একটা সময় আইসে যখন কোন একজাতীয় রোগ উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে আমরা এই বুঝিতে পারি

যে, দুই কালই ব্যাধি উৎপাদন করিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই কালের দুইটি কি প্রকারে হয়? অযোগ, অতির্যোগ ও মিথ্যা যোগযুক্ত শীতোষ্ণবর্ষ লক্ষণ কালের দুটির প্রতি হেতু কাল নিরপেক্ষ হইয়া কোন পদার্থই থাকিতে পারে না। সুতরাং সেই দুই কাল সংস্পর্শে আসিয়া সকল পদার্থই দুই হয়, এবং সেই সকল দুই পদার্থের অন্মায় পান ভোজনাদি জন্ত মনুষ্যের শরীরও দুই হয়। তখন শরীরে তৎকাল কৃত বিশিষ্ট রোগ উৎপন্ন হয়। অগ্নিবেশ মহর্ষি পুনর্কহু আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—“মানব দিগের প্রকৃতি, আহার, দেহ, বল, সাত্ব্য ও বয়স ভিন্ন ভিন্ন হইলেও—একই ব্যাধি যুগপৎ জনপদে উৎপন্ন হইয়া বহু নারীর পীড়া দানে কি প্রকারে সমর্থ হয়?” তদুত্তরে ভগবান পুনর্কহু আত্রেয় বলিতেছেন, “মনুষ্যের প্রকৃতিাদি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদিগের কতকগুলি ভাবের তুল্যতা আছে। এই সকল ভাবের তুল্যতা হেতু তুল্যকালে তুল্য লক্ষণযুক্ত ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়। বায়ু, জল, দেশ ও কাল এই গুলি সকলের পক্ষেই সমতুল্য। কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিলে প্রথমতঃ কাল দুই হয়, দুইকাল সংস্পর্শে বায়ু, জল ভূমি ও ঔষধি সকল বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। তখন সেই বিকৃত বায়ু, সলিল ও ঔষধির অন্মায় স্পর্শ ও পান ভোজন হেতু শরীরও দোষ দ্বারা দুই হইলে, এই প্রকার কোন বিশিষ্ট রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।” বীজাণু রোগের কারণ হইলে কাল নিরপেক্ষ হইয়া রোগোৎপাদন করিতে পারিত, কিন্তু

তাহা যখন পারে না, তখন কি করিয়া বীজাণুকে যোগ-কারণ বলা যাইতে পারে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—জীবন ধারণার অল্পকাল অবস্থা না পাইলে জীবাণুগণ বাচিতে পারে না। কালাদি দ্বারা শরীরের যখন রোগ প্রতিরোধক শক্তি নষ্ট হয়, সেই সময় বীজাণু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বংশ বিস্তার পূর্বক রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। আমরা কিন্তু ইহা অতিশুল দর্শীর কথা বলিয়া মনে করি। কারণ আমরা দেখিতে পাই, এমন একএকটা সময় আইসে—যখন বায়ু জগতে মশক, মক্ষিকা, পিপীলিকা বন্য কীট ছারপোকা প্রভৃতি বিশিষ্ট এক জাতীয় ফীটের আবির্ভাব হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে জাতীয় জীবের বংশ বৃদ্ধির অল্পকাল ব্যবস্থা জন্মে, সেই জাতীয় জীব সেই সময় বংশ বিস্তার করিয়া থাকে। বায়ু জগতে যেমন এই ব্যাপার সংঘটিত হয়, আভ্যন্তর জগতেও সেই প্রকার কালাদি দ্বারা শরীরে দোষ প্রকুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিয়া থাকে। তখন যে জাতীয় জীবের (তথা কথিত রোগ-বীজাণু) বংশ বিস্তারের অল্পকাল হয়, তজ্জাতীয় জীব শরীরে প্রবেশ করিয়া বংশ বিস্তার করে মাত্র। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কাল দুই হইলে বায়ু, জল, ভূমি ও ঔষধি দুই হয়। তখন সেই সকলের অন্মায় স্পর্শ ও পান ভোজন জন্ত দেহে দোষ প্রকুপিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে। ইহাই সকল প্রকার রোগের নিদান।

ইন্দ্ৰিয়ের রোগের আয়ুর্বেদীয় নাম লইয়া অনেক মতভেদ বিদ্যমান আছে।

কিন্তু তাহাতেও কিছু জ্বালায় না। কারণ রোগের নাম না জান্য থাকিলেও স্বরূপ বুঝিতে পারিলে চিকিৎসা আটকাইবে না। “বিকার নামা কুশলো নঃ জিত্বীয়াং কদম্বচন। নহি সর্ক বিকারাণাং নামতো হস্তি ধ্রুব স্থিতি ॥

রোগের স্বরূপ বুঝিয়া দোষের বলাবল নির্ধারণ পূর্বক চিকিৎসা করিতে পারিলেই সাধ্য রোগ আরাম করিতে পারা যায়। এই জ্ঞাত ইন্দ্রযেজ্ঞা রোগে লক্ষণাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইন্দ্রযেজ্ঞা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা যে সকল ক্ষেত্রেই তুল্য লক্ষণ বিশিষ্ট, এমত নহে। অনেক সময় ইহা বিভিন্ন রোগ বলিয়াই মনে হয়। আমরা যখন ইন্দ্রযেজ্ঞার বিবরণ বর্ণন করিতেছি, তখন ইন্দ্রযেজ্ঞা বলিতে যাহা সাধারণতঃ বুঝায় তাহাই বলিব।

১। সাধারণতঃ ইন্দ্রযেজ্ঞাতে বিশেষ কোন উপসর্গ থাকেনা, মাত্র সামান্য জ্বর, সর্দি, মস্তকে ও গাত্রে বেদনা এবং সামান্য কাসি বিद्यমান থাকে। একরূপ অবস্থায় লঘু পথ্যের সহিত ২বেলা ২টা মহালক্ষী-বিলাস-আদার রস ও মধু অল্পপানে প্রয়োগ করিলেই সারিয়া যায়।

২। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ নীত হইয়া জ্বর হয়, রোগীর নাসারন্ধ্রে অত্যধিক শুষ্কতা অনুভূত হয়, সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি ও শুষ্ক কাসি থাকে, গলা বেদনা, চোখ জ্বালা ও চোখ দিয়া অনবরত জল পড়া ইত্যাদি আন্তঃসঙ্গিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এখানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বায়ু শ্লেষ্মাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া শ্রোতো-

নিরোধ জ্ঞাত শুষ্কতা অনুভূত হইতেছে। একরূপ ক্ষেত্রে আম^১ পাচনার্থ ও শ্রোত-বিশোধনার্থ পঞ্চকোল পাচন প্রয়োজ্য।

শ্লেষ্মাকে তরল করিয়া উঠাইয়া দিবার জ্ঞাত এবং গলা-বেদনাদির উপশম জ্ঞাত মহালক্ষী বিলাস—আদার রস ও সৈন্ধব সহযোগে প্রয়োজ্য। জ্বরের বেগাধিক্য না থাকিলে, জ্বরয় ঔষধ দিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বেগাধিক্যে তুলসী পাতার রস মধু সহযোগে মৃত্যুঞ্জয় রস দেওয়া যায়। যদিও নবজ্বরের প্রথমাবস্থায় দুগ্ধ নিষিদ্ধ, তথাপি এ ক্ষেত্রে দুগ্ধ প্রয়োগ করিলে, শ্লেষ্মাকে বাড়াইয়া নাসারন্ধ্রের ও কাসির শুষ্কতা নষ্ট করিয়া দেয়। নিম্ন লিখিত ভাবে দুগ্ধ প্রয়োগ করিতে হয়।

দুগ্ধ— / এক পোয়া

পিপুল } প্রতিদ্রব্য ॥০ তোলা
যষ্টিমধু }
তেজপত্র }

তালমিশ্রি—২ তোলা

জল— / ১০ আধসের

দুগ্ধ শেষে ছাকিয়া ঈষৎকাবস্থায় প্রয়োজ্য। এতদ্ভিন্ন খইএর মণ্ড, মুগের মুষ ও মিশ্রি দেওয়া যায়।

রোগীর মুখে তালমিশ্রি রাখিয়া চুষিতে দেওয়া ভাল।

কাসির বেগের জ্ঞাত খুব কষ্ট বোধ করিতে থাকিলে, তালীশাদি চূর্ণ বা তাল মিশ্রির সহিত ‘চন্দ্রামৃত রস’ চুষিতে দেওয়া কর্তব্য। এইরূপ শুষ্ক কাসির শান্তির নিমিত্ত গরম জলের সহিত ‘কাস ভৈরব’ ব্যবস্থেয়। প্রথম হইতে এই অবস্থা

উপেক্ষা করিলে Pneumonia হইবার আশঙ্কা থাকে ।

৩। সর্কাক বেদনা, অসহ্য শিরঃপীড়া, অত্যধিক দুর্বলতা এবং তৎসহ জ্বর দেখা যায়। অনেক সময় এই অবস্থায় রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে। কখন কখন জ্বর বৈশী না থাকিলেও প্রলাপ দেখা যায়। শিশুদের এই প্রকার ইনসুম্মেঞ্জা হইলে তড়কা হইতে দেখা যায় এবং অনেক সময় Meningitis পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ইহাতে বায়ুর প্রকোপেরই আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জন্ত ইহাতে জ্বর বেগের ও নাড়ীর বৈষম্য বিদ্যমান থাকে। একরূপ অবস্থায় মাথার যন্ত্রণার শাস্তির নিমিত্ত কুড়ু—চন্দনের ত্রায় ঘষিয়া কপালে প্রলেপ দিতে হয়। মাথার যন্ত্রণার শাস্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা নিরন্তর প্রয়োজ্য। আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের নিমিত্ত দশমূল পাচন এবং নিম্ন লিখিত ষোগটী প্রয়োজ্য।

(বহু পরীক্ষিত)

মকরক্ষত্ৰ	১ রতি
মহালক্ষ্মীবীলাস	১ বটী
মৃত্যুঞ্জয় রস	১ বটী
কপূর	১ রতি ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩ মাত্রা করিয়া দিবসে ৩ বার পানের রস ও মধুসহ প্রয়োজ্য।

শিরঃ এবং গাত্র বেদনার আধিক্য থাকিলে কিম্বা Meningitis এর আশঙ্কা থাকিলে পঞ্চরস্তু রস আদার রস ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে ব্যবহ্যেয়। রোগী অত্যন্ত

দুর্বল হইয়া পড়িলে চন্দ্রোদয় মকরক্ষত্ৰ ১টী বেদনার রস ও মধু সহ প্রয়োজ্য।

এই রোগে খইএর মণ্ড, মূগের যুষ্মাণ্ড। দুধ এ ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নহে। রোগীর দৌর্বল্য নাশের নিমিত্ত বরং মংসরস (Broth) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পুর্কৌই বলা হইয়াছে যে, ঠাণ্ডা হইতেই এ রোগের উদ্ভব। কোনও প্রকারের ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি পাচকাগ্নি ব্যাহত হয়, তাহা হইলে জ্বরের সহিত অগ্নিমান্দ্যের নানা-প্রকার উপসর্গ দেখা যায়। যেমন গা বমি বমি করা, অনেক সময় পাতলা দাণ্ড, প্রবাহিকা (আম আসা) উদরাগান এবং তজ্জনিত শরীরের উপর বিবক্রিয়া (Toxemia) ইত্যাদি। একরূপ অবস্থা উপেক্ষিত হইলে রোগীর শ্বাসের গতি দ্রুত হয় এবং নাড়ী লোপ পাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়।

একরূপ অবস্থায় বিবিম্বা থাকিলে রোগীকে বৃহদাতচিন্তমণি—বড়এলাচ চূর্ণ ২ রতি, কপূর ১ রতি ও মোরী ভিজান জল সহ দিতে হয়। মলভেদ শাস্তির নিমিত্ত সর্কাক জ্বন্দর—কপূর ১ রতি চালুনী জল সহ প্রয়োগ করিতে হয়। উদরাগান শাস্তির জন্ত মকরক্ষত্ৰ ১ রতি, যবক্ষার ১/০ এলাচ চূর্ণ ২ রতি ও কপূর ১ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া মোরীর জল সহ প্রয়োজ্য। একরূপ অবস্থায় যাহাতে রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তজ্জন জলীয় পথ্য অধিক মাত্রায় দিতে হয় মোরী ও মিশ্রি ভিজান জল, লেবুর রস ত্রিশ্রিত বালির জল এবং ছানার জল ইত্যাদি।

নাড়ী লোপ পাইবার অশঙ্ক্য উপস্থিত হইলে চক্ষোদয় মকরধ্বজ—বেদনোর রস সহ এক্ষণে অগ্নিতুলী কর্পূর ২ রতি পানের রস ও মধু সহ দিতে হইবে। উদরে অসহ্য বেদনা থাকিলে তর্পিন ও সর্ষপতৈল একত্র করিয়া পেটে মালিস এবং ভুবনেশ্বর—মরিচ চূর্ণ ২ রতি চালুনি জল সহ কাঁটানটের শিকড় ছেঁচিয়া যে রস পাওয়া যায় সেই রসের সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিজে বিশেষ মারাত্মক না হইলেও অচিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে; সম্যক চিকিৎসা না করিলে ইহা হইতে Pneumonia, pluresy, Heart disease, Kidney disease ও নানাপ্রকার শিরোরোগ হইতে পারে। এই কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জা চিকিৎসায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। নড়াচড়া করিতে কিম্বা উঠা বসা করিতে দেওয়া উচিত নহে। রোগী যেক্রপ তাপ বা শৈত্যের আকাজক্ষা করে, তদুপযোগী তাপ বা শৈত্য প্রয়োগ করা উচিত। মাথার যন্ত্রণা অত্যধিক হইলে বরফ দেওয়া শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে যদি তজ্জন্তু রোগী অশান্তি বোধ করে, তবে আরধ্বজ পানচন ভিন্ন অল্প কোন বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। তীক্ষ্ণ বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনেক সময় হিতের পরিবর্তে অহিত সাধিত হইয়া থাকে। রোগীর ঘরে আলোক ও বায়ু বাহাতে সম্যক চলাচল করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত, কিন্তু রোগী যদি

তাহাতে অশান্তি বোধ করে, তবে ঘর বন্ধ করিয়া রাখাই ভাল। রোগ সারিয়া গেলেও রোগীর দুর্বলতা অকিঞ্চিৎ ও অগ্নিমান্দ্য এবং কখন কখন কাসি অন্তর্দর্শন করে। একপ স্থলে মকরধ্বজ—বেদনোর রস সহ এবং অগ্নি তুলী-ছোয়ান ও মোরী ভিজ্ঞান জল সহ কিছুকাল প্রয়োজ্য। কাসি থাকিলে শঙ্করাভ পিণ্ডল চূর্ণ ও মধু সহ প্রয়োগ করিতে হয়।

মহর্ষি পুনর্কল্প আত্রেয় বলেন, “পঞ্চকর্ম ও রসায়ন ঔষধ, সত্য্যচরণ, সর্কভূতে দয়া, দান, বলি, দেবার্চন, সমৃদ্ধির অনুষ্ঠান, প্রশম, আত্মগুপ্তি (মন্ত্রাদির দ্বারা আত্মরক্ষা) পুণ্য বান জনপদ সমূহের উপসেবন (স্থান পরি-বর্তন) ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচারী, জিতাশ্রা, মহর্ষি, ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, ধার্মিক ও সাত্বিকগুণের সহিত সহবাস করিলে সর্কপ্রকাব “কালকৃত ব্যাধি”র হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পাওয়া যায়। অধুনা, এই সকল নিয়ম পালন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নাও হইতে পারে। তাহার যদি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

- ১। ক্ষুধা না লাগিলে আহার করিবেন না।
- ২। অত্যধিক আহার করিবেন না।
- ৩। প্রত্যহ তৈলাভ্যঙ্গ সেবন করিবেন।
- ৪। সর্ষপ তৈলে নম্র গ্রহণ করিবেন। ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জার একটা উৎকৃষ্ট প্রতি-ষেধক (বহু পরীক্ষিত)।
- ৫। প্রাকৃতিক এবং শারীরিক অবস্থা

বিবেচনা করিয়া প্রত্যহ স্নান করিয়া জলে স্নান বা গাজমার্জন করা উচিত ।

৬। রাত্রি জাগরণ ও দিবানিদ্রা পরিহার করিবেন ।

৭। বহুবায়ু পরিত্যজ্য ।

৮। অজ্ঞাতচরিত্র বহুলোকের সহিত একত্র আহার ও উপবেশনাদি পরিহার্য্য ।

৯। দস্ত ও মুখ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ সর্ষপ তৈলের কবল ধারণ করিবেন ।

১০। অগ্নিবর্ধক ও বলকারক রসায়ন ঔষধ সেবন করা উচিত ।

আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই রোগের প্রতিষেধকরূপে এক প্রকার vaccine এর subcutaneous injection দিয়া থাকেন, আমাদের বিবেচনায় এরূপ injection না লওয়াই ভাল । কারণ, যে বিষকে vaccine দ্বারা নষ্ট করিতে হইবে তাহা তখন শরীরের মধ্যে উপস্থিত নাই অথচ অপর একটি বিষ শরীরে প্রবেশ করিল ; তাহার বিষ ক্রিয়ায় শরীরের অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা অধিক ।

কতিপয় ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ।

[শ্রীশ্রীশ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়]

১। সর্পদষ্ট ব্যক্তির দষ্ট স্থানের চতুর্দিকে উত্তমরূপে আকন্দর দুগ্ধ বা রস প্রলেপ দিবে । পরে ৩ ফোটা আকন্দ দুগ্ধ কিছু ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে ঐ বটিকা জল সহ ১ বার সেবন করিবে । যদি রোগীর জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে, ঐ আকন্দ দুগ্ধ ৬ ফোটা ও ডিষ্টিল ওয়াটার (চোয়ান জল) ৫৪ ফোটা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া শিরার মধ্যে ইন্জেক্সন করিবে । ইন্জেক্সন একবারের বেশী করিবে না । উপরোক্ত নিয়মে এষ্ট

ঔষধ ব্যবহারে গোখুরা সর্প প্রভৃতির বিষ নষ্ট হয় ।

২। কলা গাছের এঁটে বা খোলার জল, অভাবে খোলাকে খেঁতো করিয়া উহা হইতে জল বহিষ্কৃত করিয়া ঐ জল অর্দ্ধপোয়া, তুলসী পত্রের রস, এক তোলা উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সেবন, অঙ্গন, নস্ত এবং সর্কাকে মাখাইবে ও মস্তকে দিবে, এইরূপ করিলে সর্প বিষ নষ্ট হয় ।

৩। উন্নত-কুহুরাদির দংশনে—পুনর্নবার মূল ১০ আনা ও ধতুরার মূল ১০ আনা উভয়

দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া কাঁচা গাখী দুগ্ধ বা শীতল জলের সহিত ক্ষিপ্ত-কুকুর ও শূগলাদি কর্তৃক দৃষ্ট ব্যক্তিকে সেবন করাইলে বিষ নষ্ট হয় ।

৪। ক্ষিপ্ত-কুকুর-দংশনে গরম জলের সহিত ২ মাষা পরিমাণ কালজীরা গিলিয়া খাইলে কুকুর দংশনের বিষ নষ্ট হয় । •

৫। নিসিন্দা বৃক্ষের মূলের কাঁচা ছাল ২ রতি ও আতপ চাউল ১ তোলা উভয় দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া কিছু দিন সেবন করিলে হাঁপানি ও কাস আরোগ্য হয় ।

৬। কাটা ঘার রক্ত বন্ধ ।—কচুর ডাঁটার টাটকা রসে কাটা ঘার রক্ত বন্ধ ও কাটা ঘা দ্রোড়া লাগে ।

কচুর পাতার নীচে যে সরু ডাঁটার মত দৃষ্ট হয় ঐগুলির রস নিষ্পেষণ করিয়া লাগাইলে রক্তের আব-আশু রুদ্ধ হয় । ইহার রস প্রয়োগ করিবার পর ক্ষত স্থানে পুণ্যাদি কিছু না হইয়া একবারে বিচ্ছিন্ন চর্ম সত্ত্বই সংযুক্ত হইয়া যায় ।

৭। কলাপাতা পোড়ান ছাই ১ তোলা, পুরাতন তেঁতুল গাছের ছাল (যে ছাল শুক হইয়া চটা উঠিয়া গাছের সহিত লাগিয়া থাকে) পোড়ান ছাই ১ তোলা, সৈন্ধব লবণ ৩ রতি, এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া বৈকালে খাইলে অল্পপীড়া আরোগ্য হয় । ঐহার অল্পপীড়ার জন্য বৈকালে সোভা খাইয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে এই দ্রব্য খাইতে অহরোধ করি । ইহা ব্যবহারে প্রাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে ।

৮। ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক ।—চিরতা, কটকী, মূতা, ক্ষেপাপাড়া, গুলঞ্চ—সর্বসমেত ২ ভরি, জল ৮০, সের, শেষ ৮০ পোয়া, থাকিতে নামাইয়া উক্ত কাথ প্রাতে ও বৈকালে পান করিবে । যে ম্যালেরিয়া জ্বর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে ইহা সেবনে তাহা নিবারিত হয় ।

৯। পারা দোষ নাশক ।—ধল আঁকড়ার মূল ৮০ আনা, অনন্তমূল ৮০ আনা, ছাতিম ছাল ৮০ আনা, গুগগুল ৮০ আনা, জল ৮০ সের শেষ ৮০ এক ছটাক । ইহা সেবনে রক্ত দোষ, পারাদোষ, বাত, শূল, বাতরক্ত এবং কুষ্ঠ পর্য্যন্ত ভাল হয় ।

১০। বাতরোগ নাশক ।—ধল আঁকড়ার পাতা বা ছাল বাটীয়া বাতের ফোলা, বেদনা কনকনানি প্রভৃতিতে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয় ।

১১। স্বরভঙ্গ নাশক ।—অপরাজিতার শিকড়, পাতা, লতা সমস্ত একত্র শিক করিয়া সেই জল গরম গরম আকণ্ঠ মুখমধ্যে ধারণ করিলে গলার ঘা ও স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয় ।

১২। কুলের পাতা পেষণ করিয়া ৭ ঘুতে ভাজিয়া সৈন্ধব সহ সেবন করিলে স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয় ।

১৩। শিশুদিগের দুধতোলা নাশ ।—টাটকা সরিষার তৈল প্রত্যহ তিন চারিবার করিয়া পেটে মালিস করিলে অথবা একটুকরা ম্যানেল শিশুর পেটে জড়াইয়া রাখিলে দুধতোলা নিবারিত হয় ।

১৪। মূতাস্রের বীচি, আতপ চাউপ ধোয়া জলের সহিত বাটীয়া ৩ তিন রতি

মাত্রায় কিঞ্চিৎ শুনদ্রুপের সহিত সেবন করাইলে, শিশুদিগের দুধতোলা নিবারিত হয় ।

১৫। আকনাদি (নিম্বী) পাতার মন্ডন পৃষ্ঠাটি গব্যযুত মাখাইয়া ফোড়ার ঘায়ে লাগাইলে ঐ ঘা ক্রমে শুকাইয়া যায় ।

(ক) আকনাদির পাতার অপর পৃষ্ঠা অর্থাৎ শিরার দিক গব্যযুত মাখাইয়া ফোড়ার উপর লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায় ।

(খ) আকনাদির পাতায় যুত মাখাইয়া প্রদীপ শিখায় কাজল করিয়া শিশুর চোখে দিলে তাহাদের চক্ষুঃপীড়া ভাল হয় ।

(গ) আকনাদির পাতা গরম করিয়া অশের উপরে স্বেদ দিলে টাঁটানি নিবারণ হয় ।

(ঘ) আকনাদির পাতা হেঁচিয়া তাহার রস ২ ছই তোলা মিশ্রিচূর্ণ বা চিনি সহ সেবন করিলে আমাশয় ও রক্তাতিসার আব্রু্যগ্য হয় ।

(ঙ) আকনাদির পাতা ও কুকসিয়ার পাতা একত্র সমভাগে লইয়া একত্র হেঁচিয়া তাহার রস অর্দ্ধ ছটাক কুরিয়া দিনে ৩৪ বার সেবন করিলে সপুষ্প রক্ত বিবাক্ত মেহ অতিশীঘ্র উপশমিত হয় । ইহাতে রক্তপিত্ত এবং অশ ও সারিয়া থাকে ।

শিশুচিকিৎসা ।

চোখ ঝটায়।—(১) সেওড়ার আটায়া কাজল পাড়িয়া সেই কাজলের অঙ্গন দিবে ।

২) ছাগ দুগ্ধের সহিত দাক হরিদ্রা, মূতা ও গেরিমাটি পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিবে । (৩) ১ রতি পরিমিত তুঁতে একছটাক পরিষ্কার জলে গুলিয়া একটি শিশিতে রাখিবে এবং ঐ জল লইয়া প্রত্যহ ২৩ বার চক্ষুতে ছাট দিবে ।

দুধ তোলায় । (১) দুগ্ধের সহিত চুণের জল মিশাইয়া পান করিতে দিবে । ইহাতে উপশম না হইলে দুগ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া অল্পে অল্পে মাংস রস পান করাইবে । (২) বৃহত্তী ও কণ্টকারী ফলের রস কিংবা পিপুল,

পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঠ—ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশাইয়া মধুর সহিত চাটিতে দিবে । (৩) আত্র কেশী, খই ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত খাইতে দিবে । (৪) টাটকা সরিষার তৈল দিবসে ৩৪ বার পেটে মালিশ করিতে দিবে এবং একটুকরা ফ্যানেল শিশুর পেটে জড়াইয়া রাখিবে ।

তড়কায়া । ইলুদ—অগ্নিতে পোড়াইয়া কপালে অল্প অল্প তাপ দিবে । হলুদের পরিবর্তে লৌহ শলাকারও তাপ দেওয়া যাইতে পারে । চোঁখে মুখে নীতল জলের ছাট দিবে । এইরূপ প্রক্রিয়ায় মুর্ছা ভঙ্গ না হইলে নিশাকিল ও চূণ একত্র মিশাইয়া শিশুর

নাকের নিকট ধরিবে। শিশুর 'তড়কা' নানা কারণে হইয়া থাকে। অতিরিক্ত অন্ন-সন্তাপ অথবা তড়কা হইলে চোখে মুখে ও মাথায় শীতল জলের ছাট দিবে; পিঠের শির দাঁড়ায় ও মস্তকের পশ্চাৎভাগে জলের ছাট দিবে এবং জল ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্কাদে মাখাইবে। হৃৎকণতায় অল্প তড়কা হইলে রাই সরিষার গুঁড়া মিশ্রিত গরম জল একটি পায়ে রাখিয়া তাহাতে হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবাইয়া রাখিবে। রাই সরিষার গুঁড়া ও ময়দা একত্র মিশাইয়া শিশুর দুই পায়ের ভিমে পটি বসাইয়া দিবে। বগলে, হাতে ও পায়ে অগ্নির সেক দিবে। ক্রিমি

অল্প তড়কার হাতে সহ্য হয় একপ গরম জল একটি পায়ে রাখিয়া তাহাতে শিশুর গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া বসাইবে এবং আঁধ হাত উঠু হইতে ধারণী করিয়া শীতল জল তাহার মস্তকে ঢালিবে। ৫।৭ মিনিট পর্যন্ত এইরূপ করিয়া তাহার গা মোছাইয়া দিবে। সকল প্রকার তড়কাতেই এই সকল প্রক্রিয়ার পর দান্ত করান উচিত। পরিকৃত এরও তৈলের দ্বারা দান্ত করান সর্কোপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

ক্রিমিতে।—(১) পালিদা মাদারের পাতার রস ও মধু (২) বিড়ল চূর্ণ ও মধু (৩) তাঁটি পাতার রস ও মধু সেবন করান উত্তম ব্যবস্থা।

পাশ্চাত্যমতে নাড়ীতত্ত্ব ।

[ভাঃ আর, এল, সূর, এল, এম, এস, এম, ডি]*



"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদা রোগ্যায় কল্পতে ।
সট্টেব ভিষজ্যং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো।

যঃ প্রমোচয়েৎ ।

যে জব্য—রোগ, আরোগ্য করে তাহাই
প্রকৃত ঔষধ ।

যিনি রোগ হইতে মুক্ত করেন তিনিই
শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ।

That alone is the right medicine
which can remove disease.

He alone is the true physician
who can restore health.

প্রাৰণ—২

যে শাস্ত্র (এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজি, হাকিমি, বাইওকেমিক প্রভৃতি যে কোন শাস্ত্র) অধ্যয়ন করিলে সহজে রোগ নিরূপণ ও নিরাকরণ করা যায় তাহারই নাম রোগ নিরূপণ তত্ত্ব। রোগ নিরূপণ তত্ত্বে পারদর্শিতা লাভ করিতে না পারিলে পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। য কোন শাস্ত্র-মতের চিকিৎসকের দেখা উচিত, কোথায়

* এবং লেখক ডাক্তার হর অনীতিগর বৃদ্ধ ও প্রবীণ চিকিৎসক। ইনি কলিকাতা C. H. Medical College এর প্রিন্সিপ্যাল। আঃ সং।

কোন স্থলে, কিরূপে রোগের উৎপত্তি হয়, কি উপায়েই বা তাহা নিবারণিত হইতে পারে, এ সকল বিষয়ের বিনি প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন তিনিই সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হইবেন।

স্বাস্থ্যের বিপরীত অবস্থাকেই রোগ বলা যায়, সেই রোগ কোথা হইতে কি স্থলে উৎপন্ন হইল, তাহাই চিকিৎসকের দেখা কর্তব্য।

যে রোগ শারীরিক গঠনোপাদানের বিপর্যয়বশতঃ উৎপন্ন হয় তাহাকে যান্ত্রিক (organic) পীড়া বলে।

যে রোগ শরীরের কোন যন্ত্রের ক্রিয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তন জনিত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্রিয়া সংক্রান্ত (functional) পীড়া বলে।

নাড়ী পরীক্ষার হৃৎপিণ্ড, শোণিত এবং রক্তাবহানালী সমূহের অবস্থা জানিতে পারা যায়, এই বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে অনেক স্থলে শরীরের সাধারণ অবস্থা এবং সময়ে সময়ে পীড়ার প্রকৃতিও অবগত হওয়া যায়। নাড়ী—হাতের বজীর নিকট ধমনীর উপর অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে সহজে অনুভব হয়, যেন কি একটি তেজ ধমনীকে বিক্ষারিত করিয়া থাকিয়া থাকিয়া আঘাত করিতেছে। ধমনীর এই বিক্ষারণকে নাড়ী (pulse) বলে।

এই বিক্ষারণ হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের সহিত প্রায় সমকালেই সংঘটিত হইয়া থাকে, হৃৎপিণ্ডের প্রতি সঙ্কোচনে ইহার গহ্বর হইতে সতেজে রক্তনিসারিত হইয়া ধমনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। যে তেজে ধমনীর ভিতর রক্ত প্রবেশ করিবে, সেই তেজের পরিমাণানুসারে

তাহার অভ্যন্তরে একটি তরঙ্গ উৎপাদিত হইয়া থাকে।

এই শোণিত তরঙ্গ প্রবাহিত হইবার সময় ক্রমান্বয়ে সমগ্র ধমনী মণ্ডলের বিক্ষারণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনে যে রক্ত তরঙ্গ ধমনীর মধ্যে চালিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত (pulse) নাড়ী।

ধমনীর উপর অঙ্গুলির চাপ দিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলে—

ভূমিষ্ঠের পর নাড়ী এক মিনিটে ১০০ হইতে ১৪০ বার দপ দপ করে।

প্রথম বৎসরে নাড়ী ১১৫ হইতে ১৩০ বার দপ দপ করে।

দ্বিতীয় বৎসরে নাড়ী এক মিনিটে ১০০ হইতে ১০৫ বার দপ দপ করে।

তৃতীয় বৎসরে নাড়ী এক মিনিটে ৯০ হইতে ১০০ বার দপ দপ করে।

৫ম বৎসর পর্যন্ত নাড়ী এক মিনিটে ৮৫ হইতে ৯০ বার দপ দপ করে।

চতুর্দশ বৎসর পর্যন্ত নাড়ী এক মিনিটে ৮০ হইতে ৮৫ বার দপ দপ করে।

যুবা পুরুষদিগের নাড়ী এক মিনিটে ৭০ হইতে ৭৫ দপ দপ করে।

বৃদ্ধদিগের নাড়ী এক মিনিটে ৫০ হইতে ৬৫ বার দপ দপ করে।

শায়িত অবস্থায় নাড়ীর দপ দপ সংখ্যা বত থাকে, বসিলে তদপেক্ষা অধিক এবং দাঁড়াইলে আরও অধিক হইয়া থাকে।

নাড়ীর এই গতির কোনরূপে ব্যতিক্রম ঘটিলে রোগের লক্ষণ বুঝিতে হইবে। স্বর্জন অবস্থায় সময়ের সময় অঙ্গুলিতে আর একটি

ঘাত অঙ্কুত হইয়া থাকে, ইহাকে, দ্বিঘাত (dicrotic) নাড়ী বলে।

দ্বিঘাত নাড়ীর উৎপত্তি বধা ধমনী সকল সতত রক্তপূর্ণ থাকে; এই অবস্থায় ক্লংপিণ্ডের প্রতি-সঙ্কোচনে ধমনী মধ্যে আবার শোণিত প্রবিষ্ট হয়, এই রক্ত এককালে সমগ্র ধমনীতে বাইতে পারে না, এওটা (aorta) ও ইহার বৈ সকল বড় বড় শাখা ক্লংপিণ্ডের নিকট আছে, রক্ত বেগে তৎসমুদায়কে বিক্ষাচিত করিয়া প্রবেশ করে, পরে ক্লংপিণ্ডের বিক্ষারণ কালে এই সকল বিক্ষারিত ধমনী সঙ্কুচিত হইয়া শোণিতের উপর চাপিয়া আসে, সেই সেই চাপে সম্মুখে ও পশ্চাতে উভয়দিকেই রক্ত ধাবিত হয়, কিন্তু তখন রক্ত পশ্চাভাগে ভেন্টিকলে (venticle) পুনঃ প্রবেশ করিতে পারে না, সঙ্কোচন বলে সম্মুখ ভাগেই কার্য করে, ইহাতে রক্ত প্রবাহে আর একটা তরঙ্গ উৎপাদিত হয়, সেই রক্ত তরঙ্গ সমস্ত ধমনীতে আবার ক্রমান্বয়ে বিক্ষারিত হইয়া যায়। এই বিক্ষারণকেই দ্বিঘাত নাড়ী বলা হইয়া থাকে, যে তরঙ্গে দ্বিঘাত নাড়ী উৎপাদিত হয়, তাহা নাড়ী উৎপাদক তরঙ্গের পশ্চাতে থাকে, সুস্থ অবস্থায় ইহা সাধারণ পরীক্ষায় অসুভূত হয় না।

দ্রুত অবস্থায় কোন কোন স্থলে ইহা অঙ্কুলি স্পর্শে ও অসুভূত হয়, নাড়ীর স্বভাব বুঝিতে না পারিলে বিকৃত নাড়ীকে প্রকৃত নাড়ী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু ক্লংপিণ্ডের সঙ্কোচনের ঘনতা পরীক্ষা করিলে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না।

ক্লংপিণ্ড কোন কারণে উত্তেজিত হইলে ইহার সঙ্কোচনের ঘনতায় নাড়ীর গতি সংখ্যা

বর্দ্ধিত হয়, এই সঙ্কোচনের ঘনতায় বৃদ্ধি সহিত ইহার ক্রততাও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, একত্র ঘন নাড়ীর গতি প্রায়ই দ্রুত হয়। সুস্থ অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনায় নাড়ীর গতি সংখ্যা বাড়িয়া উঠে।

ক্লংপিণ্ডের সঙ্কোচনে যে রক্ত-তরঙ্গ ধমনী মধ্যে চালিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত নাড়ী, এই নাড়ীর সাহায্যে সকল প্রকার পীড়া নির্ণয় করিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন রোগের আক্রমণে নাড়ীও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে : বধা—স্বন্দা, বলবতী, পুষ্টা, ক্রতা ও মন্দগতি ইত্যাদি। জরের সময় নাড়ী ক্রত চলে, অথচ পুষ্ট থাকে, দ্রুতলে নাড়ী স্বন্দা, বিকারে নাড়ী স্বন্দা, পুষ্ট, কখন বলবতী আবার কখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। দ্রুত অবস্থায় নাড়ী বলবতী হইলে মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ বুঝায়।

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির জরে নাড়ীর গতি সংখ্যা ১০০বার অতিক্রম করিয়া যত বাড়িতে থাকে তত আশঙ্কার কারণ ও রোগের অবস্থা সাতিশয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে।

নাড়ীর স্পন্দন স্বাভাবিক অপেক্ষা ৮১০ সংখ্যার কম হইলে বুঝিতে হইবে যে জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

নাড়ীর গতি সর্পের গতির ত্রায় বক্র হইলে—বাত রোগের লক্ষণ বুঝায়।

নাড়ীর গতি পারাবত ও রাজহংস প্রভৃতির গতির ত্রায় হইলে কফের লক্ষণ জানা যায়।

নাড়ীর গতি কাক ও ভেকের ত্রায় ধারণ করিলে পিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

নাড়ীর গতি ক্রত বলিলে—ক্লংপিণ্ডের সঙ্কোচন কার্য অল্পকণে সম্পন্ন হওয়াতে রক্ত

সকালন ক্রম ভাবে হইতেছে বুঝিতে হইবে ।

নাড়ীর গতি ঘন বলিলে—অল্পশিথিল
নাড়ীর গতি ঘন . ঘন অল্পভূত হইতেছে জানিবে ।

নাড়ীর গতি ঘন ঘন ও ক্রমতঃ বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হইলে—মূহ মন্দগতি বলিয়া জানা যায় ।

অরে দেহের সাধারণ উত্তেজনার স্থংগিত ও উত্তেজিত হইয়া থাকে । তাহাতে নাড়ীর গতি সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় । রক্ত সকালনের ঘনতা বৃদ্ধিতে শ্বাস প্রশ্বাসের ঘনতা স্বাভাবিক অল্পপাতে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ তাপমান বস্ত্রের এক এক ডিগ্রী পারদ উঠিলে প্রত্যেক ডিগ্রীর জন্য দশবার করিয়া নাড়ীর স্পন্দন বৃদ্ধি হয় ।

নিশ্বাস ও প্রশ্বাস প্রত্যেক মিনিটে ১৬ হইতে ২০ বার, কিন্তু প্রত্যেকবার নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত ৪ বার করিয়া নাড়ীর স্পন্দন হয় ।

আরক্ত (scarlet) অরে নাড়ীর গতি সংখ্যা বহু বর্দ্ধিত হয়, অতিসারিক typhoid অরে তত হয় না ।

জরায়, মুচ্ছা (Hysterical) প্রভৃতি স্নায়বিক পীড়ায় নাড়ীর গতি বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় ।

অরে (fever) পীড়ার ঘনতার বৃদ্ধি হয় । যে পরিমাণে রক্তের ঘূষিত জ্বাষ ও শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে নাড়ীর গতি সংখ্যা বাড়িয়া থাকে ।

নাড়ীর গতি সংখ্যা ১০০ বার অতিক্রম করিলে ভয়ের কারণ দেখা যায়, নাড়ীর গতি সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ১৬০ বার পর্যন্ত উঠিলে রোগীর অবস্থা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় ।

ব্রম বিরাম (remittent) অরে নাড়ীর গতি সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, বাত (rheumatism) অরে নাড়ীর গতি সংখ্যা সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না ।

অতিসারিক বিকাব ও বাত জবে নাড়ীর গতি সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অধিক ভয়ের আশঙ্কা হয়, কিন্তু আরক্ত (scarlet) ও ব্রম বিরাম জবে নাড়ীর গতি সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় ।

মূত্রগ্রস্তির পুরাতন পীড়ার ধমনীর স্পন্দন প্রধান বৃদ্ধি এবং নাড়ীর কাঠিন্য দৃষ্ট হয় ।

সন্ধবাত (gout), পাণ্ডু (jaundice) রোগে এবং স্নায়ুমণ্ডলের (nervous system) যে কোন পীড়ায় নাড়ীর কঠিনতা দেখিতে পাওয়া যায় ।

রোগীর পথ্য ।

(কবিবাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি.)

আজকাল আমাদের দেশে পুরাতন প্রথার আহার ও আচার ত্যাগ করায় বহু বয়সে রোগী। কাজে কাজেই ঔষধ ও পথ্যের দরকার। ঔষধের কথা “আয়ুর্বেদ পত্রিকার” অনেক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি আজ পথ্য সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। রোগী-বহায় ঔষধের অপেক্ষা পথ্যের প্রয়োজনীয়তা অধিক।

“বিনাপি ভেষজৈ বর্গাধিঃ পথ্যাদেব

নিবর্ততে ।

নতু পথ্য বিহীনস্য ভেষজানাং

শতৈরপি ।”

সকল পীড়ার যে ঔষধ খাইতে হয়, এমন নহে। তবে সুপথ্যে থাকা সকল রোগেই উচিত। পীড়িতাবস্থায় কুপথ্য করিয়া কত হতভাগ্য সামান্য পীড়া হইতে অসাধ্য পীড়ার আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছে।

একটা কথা অনেকেই মনে করিতে পারেন, যে সাণ্ড, বাগি, এরোকট, সকল প্রকার কুড় (মেলিকুড়, কর্লিকুড়, ইত্যাদি) প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে এবং রোগীরাও খাইতেছেন, ইহা অপেক্ষা পথ্য সম্বন্ধে আর কি জানিবার আছে? কিন্তু তা নয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সাণ্ড, এরোকট প্রভৃতির নাম ও নাই। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কি আছে তাই বলিবার অন্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

সুস্থাবস্থায় আমরা অন্ন খাট, উগ্ধ খাত্ত হইতেই উৎপন্ন, সেই অন্তই পীড়িতাবস্থায় সেই খাত্ত হইতে উৎপন্ন বস্ত্র জাত পথ্যই প্রশস্ত। কারণ যে ব্যক্তি, যে বস্ত্রতে অভ্যস্ত, তাহার শরীরে সেই জাতীয় বস্ত্রই অধিকতর ফলদায়ক হয়। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ নব জরাবস্থার (যে সময় খাত্ত সম্যক পরিণাক হয় না) থৈ এর মণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চিকিৎসক শিরোমণি শ্রীমচরুপাণি দত্ত সাধারণ জরে প্রথম অবস্থায় ঔষধানির ব্যবস্থা না করিয়া, পিপ্পল ও শুঠ দিয়া জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলে থৈ এর মণ্ড প্রস্তুত করিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেইরূপ অতিসারের প্রথম অবস্থার বেলশুঠ দিয়া জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয়া থৈএর মণ্ড করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। জর না থাকিলে উদরাময়ে চিড়ার মণ্ড একটা উৎকৃষ্ট পথ্য, ইহা একাধারে ঔষধ ও পথ্য। বেলশুঠ দিয়া ছাগ দুগ্ধ অভাবে গোহৃদ জাল দিয়া খাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে খাত্তই প্রধান উপজীবী, রোগের অবস্থার সেই ধান হইতে প্রস্তুত থৈ, থৈ এর মণ্ড, চিড়া এবং চিড়ার মণ্ড পথ্য হইয়াছে। যে রোগীর দান্ত পরিকার হইতেছে না, তাহার থৈ খাইলে দান্ত পরিকারের সহায়তা করিবে।

যাহাদিগের থৈ (আন্ত থৈ) খাইলে পেট

কামড়ার, তাঁহারি থৈ এর মণ্ড করিয়া থাকিলে, থৈ এর কণা (বা কণিকা) বাদ দেওয়ার দরুন পেষ্ট ব্যথা করিবে না। বাহারি বিলাতী ফুডের পক্ষপাতী, তাঁহারিগকে বলি, অধিক দামে পুরাতন খাত্ত জিনিষ খাওয়া অপেক্ষা টাটকা থৈএর মণ্ড একটু কমিয়া লইতে আপত্তি কি ? দামও সস্তা, উপকারিতাও অধিক এবং টাটকা। বাহারদের বিশ্বাস, সাহেবরা এমন ভাবে প্যাক করিয়াছেন, যে, ৬ মাসেও টাটকা থাকিবে, তাঁহারি একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে, প্রথম দিন কোঁটার ঢাকনী খুলিলেই এখানকার জল মিশ্রিত বায়ু প্রবেশ করিয়াই পচাইয়া দিবে। থৈএর মণ্ড তৈয়ারী করিতেও কষ্টকর নহে। পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ডে থৈ বাঁধিয়া গরম জলে ৫ মিনিট ডুবাইয়া রাখিলে খুব নরম হইবে, তাহার পর চট্কাইয়া উক্ত গরম জল মিছরি মিশাইয়া উক্ত বস্ত্র খণ্ডে বর্ষণ করিলেই মণ্ড নির্গত হইবে।

জল গরম করিবার সময় উহাতে শুঁঠ, পিপুল, বা বেলশুঁঠ যে রোগে যাহা প্রয়োজ্য তাহা দিলে, ঔষধ পথ্য একত্রেই হইল। সামান্ত সামান্ত পীড়ার তাহার উপর নির্ভর করিলে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে রোগমুক্ত হইতে পারিবেন। কি কি রোগে কোন দ্রব্য দিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে কিছু লিখিলাম,—

(১) নবজন্মে অগ্নিমান্দ্য বা কফাধিক্য থাকিলে এবং সামান্ত ক্ষুধা থাকিলে শুঁঠ ও পিপুল দিয়া সিদ্ধ জলে থৈএর মণ্ড করিয়া থাকিবেন। মাত্রা—শুঁঠ ও পিপুল প্রত্যেক ১০ তোলা জল ১/২ সের শেষ ১/১ সের।

ছাঁকিয়া লইয়া, উক্ত এক সের জলে থৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন। নবজন্মে—পিত্তাধিক্য বা গা বমি বমি থাকিলে ক্ষেৎ-পাঁপড়া—এক তোলা জল ১/২ সের, শেষ ১/১ সের ছাঁকিয়া লইয়া উক্ত জলে থৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিবেন। নবজন্মে কোষ্ঠ কাঠিলে মনেকা বা কিসমিস ২ তোলা জলে ১/২ সের শেষ ১/১ সের উক্ত জলে থৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিবেন।

(২) অতিসার বা জ্বরাতীসারে ধনে ও শুঁঠ প্রত্যেক ১০ তোলা জল ১/২ সের, শেষ ১/১ সের, উক্ত জলে থৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিবেন। জ্বর না থাকিলে চিড়ার মণ্ডও দিতে পারেন। পেটে আন্দের জন্ম বয়না থাকিলে বেল শুঁঠ—১ তোলা জল ১/২ সের, শেষ ১/১ সের; উক্ত জলে থৈএর মণ্ড করিবেন। জ্বর না থাকিলে চিড়ার মণ্ডও দিতে পারেন। রক্তাতিসারে (অবশ্য প্রথম অবস্থায় নহে) কুড়চির ছাল—এক তোলা জল ১/২ সের, শেষ ১/১ সের, উক্ত জলে মণ্ড প্রস্তুত করিবেন।

প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতির আশঙ্কার অস্তিত্ব রোগের যে যে দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লিখিলাম না। তবে এ প্রবন্ধ পাঠক মহাশয়গণের অনুমত হইলে পরবর্তী সংখ্যায় অধিকতর বিস্তৃত ভাবে লিখিব এবং প্রত্যেক রোগের পথ্যপাঁপড়া লিখিব।

থৈএর মণ্ড এবং চিড়ার মণ্ড ভিন্ন আরও একটা পথ্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বহুল রূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। উহার নাম “ববাপু”। আজ কাল আর উহার বড় প্রচলন নাই। সেজন্য বিস্তারিত ভাবে লিখিলাম না।

অব ত্যাগ হইলে এবং শরীর হালকা হইলে

খৈএর মণ্ড বন্ধ করিয়া আন্ত খৈ, পলতার
ঝোল বা মুগের যুষ দেওয়া যায়। অন্ন ত্যাগের
পর হৃৎ দিতে ইচ্ছা করিলে হৃৎ ৮/১০ সের
এক খানি আন্ত পিপ্পল দিয়া সিদ্ধ করিয়া,
হৃৎবিশেষ থাকিতে নামাইতে হয়, সেই হৃৎই
খৈএর সঙ্গে দিতে হয়। অন্নের প্রথম অব-
স্থায় হৃৎ দেওয়া অনুচিত। অনেকস্থলে দেখা
যায় অন্ন হওয়ার দিনেই বা তৎপর দিবসে
ডাক্তার বাবু হৃৎ খাইতে বলেন। তাঁহারা
কেন এরূপ ব্যবস্থা করেন, সে সম্বন্ধে আমার
মনে হয়, তাঁহারা বিলাতী পুস্তক পড়িয়া
চিকিৎসা বিজ্ঞা শিক্ষা করেন। সেখানকার
লোকেরা সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে মাংস
খাইতে অভ্যস্ত। তাঁহাদের অন্ন হইলে
হৃৎ ও রুটী লঘু পথ্য। তাই বলিয়া যে
দেশের লোকেরা খাত্তকে ২৩ বার সিদ্ধ করিয়া
চাউল প্রস্তুত করিয়া, সেই চাউল প্রচুর জলে
অনেকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া, তাহার ফেন বা মাড়
(যাহাতে অনেক পুষ্টিকর পদার্থ থাকে)
ফেলিয়া নিত্য আহার করে; তাহাদিগকে
অন্ন হইলে কি হৃৎ ও রুটী দেওয়া যায়?

অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রোগীর
অন্ন ত্যাগের পর অন্ন পথ্য দিবার পূর্বে রুটী
পথ্য দেওয়া হয়। ইহাও সমীচীন বলিয়া
বোধ হয় না। কারণ গম গুড়া করিয়া জলে
মাখাইয়া এক মিনিট বা দুই মিনিট কাল অগ্নি
সংযুক্ত করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়, তাহা কখনও
ভাত অপেক্ষা লঘু হইতে পারে? এদেশীয়
শাস্ত্র-কারগণ রুটীর বিষয় যে জানিতেন না,
তাহা নহে। কারণ ‘ভাব প্রকাশে’ আছে।

তৎ গোথুম চূর্ণেন কিঞ্চিৎ পুষ্টাঃ

‘চ পেলিকাং ।

তথকে স্বদেশেৎ কৃষা ভূষ্য-গারে

২ পিতাং পচেৎ ॥

সিদ্ধেবা রোটিকা প্রোক্তা, গুর্ণান্

তস্যঃ প্রচক্ষহে ।

রোটিকা বালকং বুধ্যা বুংহণী ধাতুবর্জন ॥

• বাতগ্রী, কককং, গুর্বী, দৌণ্ডাঘিনাঃ

প্রপূজিতা ॥

অর্থাৎ শুদ্ধ গম চূর্ণ করিয়া জল দিয়া
মাখিয়া লেটী পাকাইয়া চাটুতে গরম করিয়া
অগ্নিতে দিয়া সেকিয়া লইবে। রুটী—কক
জনক এবং গুরুপাক, এজন্ত প্রবলঅগ্নি ব্যক্তি
দিগেরই ইহা সুখাত্ত। যাহারা রুটী খাইয়া হজম
করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে রুটী শুভ্র,
বৃদ্ধি ও ধাতুপুষ্টি করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন
করে এবং বায়ু নষ্ট করে। সেই জন্যই পশ্চিম
দেশীয় দৌণ্ডাঘি ব্যক্তিরাই রুটীই খান। তাঁহারা
বলেন যে, কেবল লঘুপাচ্য ভাত খাইলে, তাঁহারা
হুর্জল হইয়া পড়েন। এ হেন রুটী, রোগীকে
ভাত দিবার পূর্বে যে দিতে দেখা যায়
তাহার কারণ কি? সাহেবী কেতাবের অন্নের
পথ্যের হৃৎ ও রুটীর অনুরূপ অজ্ঞাতসারে
সমাজে প্রবেশ করিয়াছে।

পূর্বে এরূপ ছিলনা, খৈ, বেগুন পোড়া,
তারপর মুগের যুষ দিয়া খৈ তারপর “ওগরা”
দেওয়া হইত। দুইভাগ সোনামুগের ডাল,
এক ভাগ খুব পুরাতন চাউল, হলুদবাটা, আদা
বাটা, মোরি বাটা” দুই একটা পটোল দিয়া
সিদ্ধ করিয়া, রোগীর শরীরের অবস্থা বুঝিয়া
সিদ্ধ করিবার সময় সামান্য পরিমাণ গব্য
যুত দেওয়া হইত। এবং উহাই গরম খাইতে
দেওয়া হইত, এই ‘ওগরা’ সহ হইলে তৎপর
দিবস ভাত দেওয়া হইত।

পথ্য সেবনের পর রোগী দিব নিদ্রা না
সেবন করেন, তদ্ব্যবস্থায় দৃষ্টি রাখা হইত।
অরের প্রথম দিন হইতেই জল অর্ধেক সিদ্ধ
করিয়া শীতল হইলে পান করিতে দেওয়া
উচিত। উক্ত সিদ্ধ জল যেন পর্যাপ্তিত বা
বাগী না হয়।

আমরা যদি প্রাচীন প্রথার পথ্য ব্যবহার
করি, তাহা হইলে রোগ অপেক্ষাকৃত অল্প
সময়ে দূর হইবে।

অল্প প্রবন্ধে অর সর্বাঙ্গেই কিঞ্চিৎ লেণা
হইল। অন্ত্যস্ত রোগের পথ্য বিধান পরে
লিখিব।

বাক্সালী ছেলদের স্বাস্থ্য।

(কবিরাজ শ্রীমত্যাচরণ পেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

—:—

বাক্সালী ছেলেরাই বাক্সালীর ভবিষ্যৎ
বংশধর। এই বংশধরদিগকে সুশিক্ষিত
করিবার জন্য—বিভাগলয়ের বি এ, এম এ পাশ
করাইবার জন্য বাক্সালী অভিভাবকেরা বেক্রপ
মনোযোগী, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য
তাঁহারা যে সেরূপ মনোযোগী নহেন, তাহা
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের
নিয়োজিত স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির রিপোর্ট
হইতেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ গত তিন বৎসর হইতে
ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার মনোযোগ প্রদান
করিয়াছেন এবং তাহার ফলে ছয় হাজার
ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে
উপনীত হইয়াছেন যে, কোনো কোনো
কলেজে শত করা দশ জন ছাত্র গ্রীষ্ম বৃদ্ধি
রোগে ভুগিতেছে, কোনো কোনো কলেজে
শত করা এক জন ছাত্রের দৃষ্টিশক্তি কম
হইয়াছে। অনেক ছাত্রের দাঁতের পীড়া
প্রভৃতি আছে। তদ্বিষয় বহু সংখ্যক

ছাত্রকে প্রকৃত প্রস্তাবে রোগগ্রস্থ বলিয়া
তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন কিন্তু
তাঁহারা যে কি ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছে,
তাঁহা তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারেন নাই।
মোটের উপর তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্কটিশ চার্লস,
ইউনিভার্সিটির সিটি, সিটি, প্রেসিডেন্সী, সি,
এম, এস, এবং বঙ্গবাসী—এই কলেজ
গুলির মধ্যে শতকরা ৭১ জন ছাত্র নীরোগী
নহে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির রিপোর্ট হইতে
আরও জানিতে পারা যায়, কলেজের
ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন সোজা
হইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম নহে। একুশ বৎসর
বয়সের পর হইতেই অধিকাংশ ছাত্রেরই স্বাস্থ্য
হানি ঘটয়া থাকে কিন্তু ১৬ বৎসর হইতেই
চক্ষুরোগ, কর্ণ রোগ ও দন্ত রোগের হুতলা
হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক ছাত্রের অঙ্গীর্ণ
রোগের মূল কারণ দন্তরোগ, কারণ তাহার
জন্ত তাঁহারা ভাল করিয়া চিবাঁইয়া খাইতে

পারে না। কলকথা স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির অমুসন্ধানের কল অতীব শোচনীয়, বাঙ্গালী বালকের এই শোচনীয় স্বাস্থ্য হানির ফলে বাঙ্গালী জাতি যে ধ্বংসের পথে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখন ইহার কারণ কি তাহা স্থির করা বাউক। স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতি বহুসংখ্যক ছাত্রকে যে রোগগ্রস্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অথচ তাহারা কি রোগে ভুগিতেছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, সে সম্বন্ধে তাহাদের কি রোগ—তাহা আমরা বলিয়া দিতে পারি। সে রোগের মূল কারণ বাঙ্গালী ছাত্রের ব্রহ্মচর্য্য হানি। আগে পঠদশার আমাদের দেশের ছাত্রকে যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত, আধুনিক শিক্ষা-সমিতির নিয়মে তাহা আর করিতে হয় না। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ অর্থকরী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। শিক্ষকের সহিত ছাত্রগণের সম্বন্ধ মূল কলেজে যতটুকু আবশ্যক—তাহার অধিক হইবার উপার নাই। আমরা বাল্যকালে পণ্ডিত মহাশয়কে পথিমধ্যে দেখিলে ভয়ে কাঁপিতাম—বিশ হাত দূরে পলায়ন করিতাম। এখন ছাত্র সমাজে সে ভীতি উৎপাদনের কোনো কারণই নাই। শিক্ষক বেতন ভোগী, ছাত্র নিয়মিত বেতন ভোগাইয়া তাঁহার জীবিকার নিরীহার উপার করিয়া দেয়, সুতরাং বর্তমান সভ্য যুগের ছাত্রগণ শিক্ষকের শাসনগতীর মধ্যে থাকিতে একান্তই নারাজ। মেসে এবং হোষ্টেলে যে সকল ছাত্র অপরিস্থিতি করিয়া থাকে, তাহাদের অস্তিত্বাকগণ প্রতিমাসে নিয়মিত অর্থ প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের কর্তব্য

সম্পন্ন করেন মাত্র, ছাত্র কলিকাতায় কি ভাবে কাটাইতেছে, তাহার চিন্তা করিবার অনেকেই অবসর নাই। কলে, মেসে এবং হোষ্টেলে রাখিয়া ছাত্রদিগকে যে যথেষ্ট চারিতার প্রেরণ দেওয়া হইতেছে, তাহা হইতেই যে সকল ছাত্রের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে, স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির অমুসন্ধিত অজ্ঞাত রোগের কারণ তাহারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতিও কতকগুলি ছাত্রকে অজীর্ণ রোগগ্রস্ত বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন এবং ইহাও অবিসম্বাদিত সভ্য যে, তাঁহাদের পরীক্ষিত ছাত্র তির্য্য দেশের বহু সংখ্যক ছাত্রই এখন অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছে। ইহার মূখ্য কারণ—বাঙ্গালী ছাত্রের একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। যে সকল কারণে অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে, বাঙ্গালী ছাত্র সমাজে তাহার কারণ যে যথেষ্ট বিস্তারিত তাহা জোর করিয়াই বলা বাইতে পাবে। আবুর্কোবে অজীর্ণ রোগের কারণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

অত্যধিক পান্যদ্রব্যমাশ্রয়

সংখ্যারপাং স্বপ্ন বিপর্য্যয়।

কালে হপি সামান্য লঘুগণি

ভুক্তময়ন পাকন্তজতে নরত ॥

অর্থাৎ অধিক জল পান, বিষম ভোজন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, দিবানিত্রা ও রাত্রি জাগরণ এই সকল কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। এই রোগ উপস্থিত হইলে তখন উপযুক্ত সময়ে দেহাশুকুল লঘু আহারও পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

ইহা ভিন্ন ছাত্র সমাজে বিষমজীর্ণ ও বিষ্টজীর্ণের প্রকোপ বাহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রথমটির কারণ হইল

অত্যাচারের ফলে পিতৃ প্রকোপের কারণ সংঘটন এবং দ্বিতীয়টির কারণ হইল অত্যাচারের ফলে বায়ু প্রকোপের কারণ সংঘটন। অজীর্ণ উৎপত্তির কারণে যে সকল কথা আর্ধ্যাষি বলিয়া গিয়াছেন, যদি চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক-টির কারণ যে মিলান যাইতে পারে তাহাও প্রমাণ করা যায়। আমরাই সে প্রমাণ করিয়া দিতেছি।

অধিক জল পান—কলিকাতা সহরে চা, সোডা, সোমোনেড, বরফ, সবতের বিক্রয়-দিক্য দেখিলে এবং এগুলি কাহারও অধিক ব্যবহার করে তাহার হিসাব করিলে বাঙ্গালী ছাত্রদিগের মধ্যেই ইহা যে অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহা অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালী ছাত্রদিগের মধ্যে অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্য জন্মবার সর্বপ্রথম কারণ হইল এইটিই। দ্বিতীয় কারণ বিষম ভোজন। ইহাও বাঙ্গালী ছাত্র জীবনে যথেষ্ট ঘটিতেছে। কলিকাতার রেটরেট গুলিব প্রধান ক্রেতা কাহারও—যাহারা তাহার খোজ রাখেন, তাঁহারা যে এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি। তৃতীয় কারণ—মলমুত্রাদির বেগ ধারণ। ইহাও ছাত্র-জীবনে অনেক সময় অনেক কারণে অনিবার্য হইয়া থাকে। ৪র্থ কারণ—দীর্ঘ নিদ্রা না থাকুক, রাত্রি আগবণ যে কারণেই হউক বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে অপ্রতিহত প্রভাব পিষ্টার লাভ করিয়াছে। পরীক্ষার প্রতিযোগিতার জন্য বাঙ্গালী ছাত্র রাত্রি জাগিয়া চক্ষু রোগেরও কারণ ঘটাইতেছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অজীর্ণ

এবং অগ্নিমান্দ্যকেও সাদরে ডাকিয়া আনিতেছে।

শুধু লেখাপড়ার খাতিরেই মহে, কলিকাতার খিচোর-বায়ুস্বেপ দেখিবার জন্যও বাঙ্গালী ছাত্রের ভিড় শনি রবিবারে বড় কম দেখা যায় না। ইহার ফলে রাত্রিজাগরণে স্বাস্থ্যের অপচয় তো করা হয়ই, তা' ছাড়া হাবভাবশালিনী বারবানিতা দিগের কুটিল কটাক্ষ এবং অল্প বিদ্যাসেও যে অনেকে অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন তাহাও বলা যাইতে পারে। প্রক্কে, ধাতুদৌর্বল্য, স্বপ্নবিকার প্রভৃতি ব্যাধি সকল কুসুম সূকুমার ছাত্র জীবনে এমনট করিয়াই তো প্রবেশ করিয়া থাকে। হায়, সুদূর মক্কা-বাসী বাঙ্গালী অভভাবক এ সকল কথা একবারও চিন্তা করেন কি না তাহা আমরা জানি না।

মেসে এবং হোটেলে যে সকল ছাত্র অপরিস্রব করিয়া থাকে, নিশ্চয়ই তাহারা মক্কা হইতে সমাগত হইয়াছে। এখানে ইলেকট্রিকের পাখার চাওয়াই সেবন করুক, আব অর্দ্ধপোয়া পথ পর্যটনে ট্রাম ফোম্পানীকে সাতট পয়সা না দিলে পথ চলিতেই কষ্ট বোধই করুক, তাহারা জন্মিয়াছে এবং লাগিত পাগিত হইয়াছে কিন্তু সেই জামল-শস্ত-পরিপুষ্টিত আত্ম জন্মব নিষ্ঠ ছাত্র শীতলিত ষড়মুখ প্রবাহিত পল্লীগ্রামে। সেই পল্লীগ্রামে তাহারা জন্মিয়াছে, দুঃখকষ্টের ভিতর তাহারা প্রতিপালিত হইয়াছে। তখন তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে ডালমাছ-বাজন দিয়া এক পাখর ভাত খাইতে পারিত, মুড়ি চালা-ভাজা-চিড়া, ছোলাভাজা—তেল ছন মাখিয়া

ছ'বেলা ছ'কোঁড় খাইয়া হজম করিত।
আম কাঁটালের সময় একসঙ্গে ৫০ গণ্ডা আম,
একটা আন্ত কাঁটালু ভাঙ্গিয়া খাইয়া জীর্ণ
করিবার শক্তি রাখিত। কিন্তু যেই
তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য সহরে
ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সেই তাহাদের হজম
শক্তি কমিয়া আসিল, মেসে হোষ্টেলে কথেষ্ট
অর্থ ব্যয়িত হইলেও বার্ক ছটাক চাউলের
অন্নও তাহার হজম করিবার শক্তি থাকিল না,
কোনা দিন কেমনো কারণে একটু বেশী
আহার করিলেই ক্ষুদ্রতমসনের ছ'বোতল
সোডা পান না করিলে তাহার ভক্ষিত অন্ন
জীর্ণ হইবার উপায় থাকিল না,—এই
দাঁড়াইয়াছে বাঙ্গালী প্রবাসী ছাত্রদিগের
অবস্থা। এই অবস্থার জন্যই তো স্বাস্থ্য
পরীক্ষক সমিতি বহু সংখ্যক ছাত্রকে অজ্ঞাত
রোগাক্রান্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

এখন ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা কি?
বহুকালাবধি চিকিৎসা ব্যবসারে ত্রুটি থাকিয়া
আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে সত্যই
বাঙ্গালী ছাত্র দিগের অধিকাংশই নানারূপ
ব্যধিগ্রস্ত। সর্কাপেক্ষা এই সমাজের প্রবল
ব্যধি শুক্র সঞ্চয়ী পীড়া। শুক্র সঞ্চয়ী
পীড়া বলিলেই যে তাহার গণ্যায়িত্রাস্ত
বুঝিতে হইবে—তাহার কোনো কারণ নাই।
যাহারা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন
তাঁহারা জানেন, আয়ুর্বেদে প্রমেহ বিংশতি
প্রকার। ছাত্রজীবনে যে অজীর্ণের কথা
বলিয়াছি, বিশেষ প্রাণধান করিয়া দেখিলে—
সেই অজীর্ণ নিজে একটি স্বতন্ত্র রোগ না
হইয়া এই প্রমেহেরই অন্তর্গত হইতে পারে।
আয়ুর্বেদে কফজ মেহে—আহারের অগরি-

পাক, অর্কটি, বমি এ কয়টি বিশেষ উপসর্গ।
যাতজ মেহে উদাবর্ত একটি বিশেষ উপসর্গ।
কাজেই ছাত্রজীবনে কাহারও অজীর্ণ হইয়াছে
শুনিলে তাহার মূল কারণ প্রমেহ কিনা
তাহা চিন্তার বিষয়। তাহার পর স্বপ্নবিকার—
যৌবন স্বভাবমূলত ব্যাধি হইলেও জীর্ণাতির
চিন্তনে এই রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।
আমাদের যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে
শতকরা অর্দ্ধেকের উপর ছাত্র এই রোগে
গ্রস্ত। ফলকথা সহরের বিলাস সম্ভারের
মধ্যে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা বড়ই সম্ভার কণা।
তাহার পরে অভিভাবক শূভাবস্থায় ইচ্ছা-
শক্তিকে প্রতিহত করিবার কেহই নাই।
এইজন্য বাঙ্গালী বালককে বাচাইতে হইলে
বাঙ্গালী অভিভাবককে শুধু অর্থ পাঠাইয়া
নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, যে পর্যন্ত
কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার প্রতিনিধি
স্বরূপ না রাখিয়া ছাত্রের কার্য কলাপের
প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করা না হইবে—
সে পর্যন্ত যে ক্ষুলের আশা করা যাইবে না
— তাহা স্থনিশ্চিত।

বাঙ্গালী ছাত্র সমাজে স্বাস্থ্যহানির আর
একটি কারণ, এখনকার উপজ্ঞাস বা নভেল
পাঠ। এই নভেলে শুধু ছাত্র সমাজ নহে,
বাঙ্গালী মহিলা সমাজেরও বিশেষ অনিষ্ট
ঘটিতেছে। বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যহানির
যতগুলি কারণ অধুনা বিস্তারিত, তন্মধ্যে এই
নভেল পাঠে নভেলিয়ানা ভাবে অভ্যস্ত হওয়া
তাহার অন্ততম। এই নভেল কথা কহিয়া
বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্য হীনতার কথা বুঝাইতে
হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়, সুতরাং সে
কথা আপাততঃ আর অধিক না বলিয়া

আমরা এ সবকে একটু ইকোঁত করিয়া
রাখিলাম মাত্র, সে বিষয়ের সমালোচনা
আমরা বতর প্রবন্ধে করিব। ফলকথা
বাঙ্গালী ছাত্র দিগের অভিভাবক দিগকে
আমরা সনির্বন্ধ অসুরোধ কবিত্তেছি,
ঐহাদের বংশধর দিগকে স্বাস্থ্য সুখ প্রদানের
অভিগম রাখিলে, তাহাদিগকে নীরোগী ও
দীর্ঘায়ু দেখিয়া আনন্দ বর্ধনের কামনা
রাখিলে তাহাদিগের দুর্ভল চিত্ত বাহাতে

নিলাসিতার মুহূমান হইরা না পড়ে, তাহার
ব্যবস্থা আগে করিতে হইবে? কলেজ
শিক্ষা দিতে হইলে সহরে না রাখিলে উপায়
নাই—ইহা সত্য কথা, কিন্তু তাহার কলে
বাহাতে তাহার স্বাস্থ্যের অপচয় না ঘটে তাহা
তো সর্বাগ্রে কর্তব্য। সে কর্তব্য পালনের
জন্য বাঙ্গালী অভিভাবক চিন্তা করুন ইহাই
আমাদের বক্তব্য।

কলের জিনিস—নমস্কার।

শ্রীকীর্ত্তীদল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, বি, এ,

পল্লী হ'তে পাঠাই যোরা

খোয়া, বাছা, ঝাড়া গম—

সোণার বরণ, পরিশাটী,

কাঁকরশূভ, মনোরম।

কিন্তু যখন কলে গিয়ে

মগদারূপে মেন গো দেখা,—

বস্তাবন্দী সে যে কি চীৎ,

বলতে নারি, না যার লেখা।

এক, দুই, তিন মার্কী আবার—

যার বা খুসী লওরে ভাই;

(কিন্তু) সবার ভিতর অন্ন অধিক

আছে ভেজাল—ভয় ছাই।

‘ভাল কুটিখাও’ বলেন ধারা

বাঙ্গালীকে ক'রতে বীর;

একটিবার কি ভাবেন তাঁরা

হ'রে মুহু, ঠাণ্ডা, বীর।

ভাল থাকে কি গরীব লোকে—

তাত কুটেনা পেটভরা;

মলিন মিশ্র পচা ময়দা

ঘোবনেতে আনে জরা।

বুকজালা যে কেন এত,

পাখুরি, অর্শ, আমাশয়,—

দেশটা হ'ল হাসপাতাল গো,

ভাবছেন কি কেউ মহাশয়?

এর প্রতিকার ক'রলে তবে

বাঙ্গালী হবে মুহু—সবল;

(নহিলে) বুদ্ধিজীবী বায়স চতুর

চিররোগী রইবে ক্লেবল।

বেহশুভ আত্মরাম,

পায় কি কেহ বীরের মান?

আজিকার এই কলের যুগে

মিছরী বাবুর নাহি স্থান।

মুচি ভাজার গন্ধ পেলে

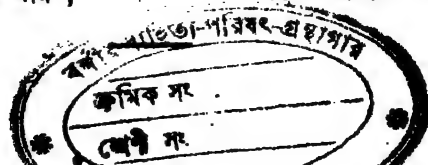
উঠত প্রাণটা লাকিয়ে নেচে;

গব্যমুতে, ময়দা খাটি—

আঁহা! পেলে বাই গো বেঁচে।

এখন কিন্তু পচা বি-তেলে,
 ভেজাল-মরদা সহযোগে,
 মড়াপোড়া গন্ধ ছাড়ে
 বুচি, কচুরি, মোহন ভোগে !!
 কেমন খাসা কাজলি আকের
 শুদ্ধ—আহা কি মধুর তার !
 মধু ফেলে খাই যে শুধু
 স্নেহশও গো মানে হার !
 এ শুদ্ধ বধন 'শুদ্ধ' হ'রে
 কপের করাল কবল থেকে
 বাহির হন গো চিনিকপে
 শাদা ফরসা রঙে ঢেকে ;
 সে স্ততার আর নাই ত তখন,
 কেমন যেন বেরসিক ;—
 শাদার ভিতর এত গলদ ।
 ধবল শুভ্রে শত দিক !
 এ সত্যতার মাকাল শোভা,
 চোখভুলান ফকিরার ;
 অন্তরেতে গরল রাশি—
 বাহ্যটক খুশ বাহার ।
 যমদূত ওগো ভেজাল দ্বন্দ্ব,
 অগণিত ব্যাধির মূল ;—
 শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ
 বক্ররোগের হেতুর মূল ।
 কলের আটার রূপে মজ্জা
 কি বকমারি করেছি তাই ।
 (এখন) বল্ গো কোথা যাভা ভাঙ্গা
 মোটা মিঠা মরদা পাই ?
 ভেজাল নোংরা পচা খাবার —
 রোগের আকর খাবনু আর ;

প্রাণের দ্বারে সব ছেড়ে গো
 শাক চর্চরী করেছি লায় ।
 কল কারখানার দেশে যে তাই
 নৈতিক হাওরা পচে গেছে ;—
 • জী পুরুষের অবাধ মিলন
 শাস্ত্রে নিষেধ ক'রে দেছে ।
 সত্যযুগের আলোর মাঝে
 লুকিয়ে আছে অন্ধকার ;—
 স্বার্থ ল'য়ে কাটাকাটি,
 কামড়াকামড়ি অনিবার ।
 কিরে আশ্রক প্রাচীন যুগের
 মোটা কাপড় মোটা ভাত ;
 প্রেমে করব গলাগলি
 ঘুচে যাবে রক্তপাত ।
 হাল চালাব নির হাতে—
 বুনব কাপড় আপনার ;
 পূতপল্লী-তপোবনে
 লুট'ব কত স্তরের ধার ।
 স্বাবলম্ব হারিয়ে ফেলে
 কলের অধীন হইছি তাই ;—
 উঠতে বসতে হাঁচ-তে সদা
 কলের অমুগ্ধ চাই ।
 কলে হাসি, কলে কাঁদি
 কলে রাঁধি, কলে খাই ;
 জীবন মরণ কাঠি যে কল—
 এই আছি আর এই গো নাই ।
 সত্যযুগের সাদা, মিহি,
 ফরসা, সফ, পরিষ্কার,
 বিষ থেকে যে জলে মরি—
 কলের জিনিস—নমস্কার ।



পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচন ।

(শ্রীআশুতোষ রায়এল-এম-এস,)

এ্যালেক্জেড্রিয়ার শিক্ষা মন্দির (Alexandrian School.)

খ্রীষ্টীয় জন্মবার ৩৩১ বৎসর পূর্বে সম্রাট এ্যালেকজান্ডার (Alexander) নিজ নামে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত স্থানে মিশর প্রদেশে এ্যালেক্জেড্রিয়া নামক নতুন নগর স্থাপন করেন। গ্রীক সভ্যতার অবনতির (declive Greek culture) পর এই নতুন নগরে সর্ববিধ শাস্ত্রের চর্চা ও উন্নতিসাধন হয়। কস্ (cos) হইতে হিরোফিলাস্ (Herophilus) এবং সিনিডাস্ (cniidos) হইতে ইরাসিস্ট্রেটাস্ (Erasistratus) মিশর দেশের নতুন নগরে আগমন করতঃ চিকিৎসা-শাস্ত্রাগার স্থাপন করেন। এইরূপে চিকিৎসার দুই মতই মিশর দেশে প্রচারিত হয়।

এ্যালেক্জেড্রিয়ার শিক্ষা মন্দিরে (Alexanderian school) শব ব্যবচ্ছেদের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় ও ক্রমে অনেক উন্নতি হয়। শল্য চিকিৎসা (Surgery) এবং ধাত্রী বিদ্যা (obstetrics) এত উন্নতি হয় যে তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের এই সব বিষয়ের প্রায় সমকক্ষ।

আমাদের আয়ুর্বেদে বৃদ্ধ সূত্রত ইহার বহু পূর্বে শব ব্যবচ্ছেদের আবশ্যকতা, শরীরের অবয়বের বর্ণনা শল্য চিকিৎসা ধাত্রী কৌমার বিদ্যা সম্বন্ধে বাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এ্যালেক্জেড্রিয়েন্ স্কুলের অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।

ডাক্তার হরনলি (Dr. Hournle) তাঁহার হিন্দু অষ্ট্রিয়লজি (ostriology) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হিন্দুরা শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া কিরূপে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। (Probably it will

come as a surprise to many, as it did to myself, to discover the amount of anatomical knowledge which is disclosed in the earlier medical works of India. Its extent accuracy and are surprising, when we allow for their early age.

ডাক্তার ওয়াইস্ (Dr. wise) তাঁহার Commenetary on the Hindu system of medicine এ লিখিয়া গিয়াছেন যে হিন্দু চিকিৎসকগণ শব ব্যবচ্ছেদের আবশ্যকতা সম্যক্ উপলব্ধি করেন ও তজ্জন্ত শরীরের সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেন। (Hindu Philosophers deserve the credit of having entertained sound and philosophical views respecting the uses of the dead to the living were the first scientific & successful cultivators of the most important and essential of all department of medical knowledge viz Practical Anatomy)।

একগুণে আমরা হিরোফিলাস্ এবং ইরাসিস্ট্রেটাস সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব।

হিরোফিলাস্ (Herophilus — B: 335 to 280) পাশ্চাত্য চিকিৎসা জগতে ইনি এ্যানাটমি (Anatomy) শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন জন্ত বিখ্যাত।

ইহার বিশ্বাস চতুর্থমণ্ডলে (4th ventricle of the brain) আত্মার (Soul) স্থান সম্বন্ধে বাহা বিবরণ লিখিত আছে নিয়ে সংক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইল।

“সহস্রদল কমলেরঃ” (Brain with its innumerable folds) • “মূলদেশে” (medulla oblongata) যেখান হইতে “স্নায়ু নাড়ীর (Spinal cord) আৰম্ভ তাহার উপরে একটি ত্রিকোণ বিশিষ্ট “বোনি মণ্ডল” (Pons varolii) অবস্থিত। এই বোনি মণ্ডলের ভিতরে “চক্ষু-কলা” (choroid Plexus) হইতে “অমৃতধারা” (cerebro spinal fluid) স্ফা স্রব্দা নির্গত হইয়া শরীরকে স্নিগ্ধ করিতেছে। এই চক্ষু কলা যেখানে অবস্থিত তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানের নাম “চক্ষু-মণ্ডল” (4th ventricle covered by optic thalamus, corpus striatum and other basal ganglia of the Brain). এই চক্ষু মণ্ডলের (optic thalamus) ভিতর “নির্দীপ-কলা” অবস্থিত, যাহাকে “নির্দীপ-শক্তি” অন্বনির্দিত আছে। যোগিগণ যোগ সাধন পূর্বক এই শক্তি লাভ করেন। তখন উহার ভিতর “শিবস্থান” নামক শক্তি স্থান (centre) সাধকের মস্তিষ্কের ভিতর উদ্ভিত হয়। সাধক তখন মুক্তিলাভ করেন। সাধকের আত্মা পরমাশ্রয় বিনীত হইয়া যায়।

২। ইরাসিস্ট্রাস (Erasistratus Bc. ২৪১) হিপোক্রেটাসের সম সাময়িক ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন না। ইনি দোষ (Humour) রোগোৎপত্তির কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। ইনি এম্ পিরিক মতাবলম্বী অগ্রণী। ইহার মতে রোগোৎপত্তির কারণ শরীরের পরমাণুগণ (atoms) শাস্ত্রে এক প্রকারে মিলিত ও রোগে অন্তরূপে মিলিত হয় (the particular way in which the ultimately indivisible mol ues come together) ইংরাজিতে ইহাকে Atomistic or mechanical Theory of the causation of disease Roman Medicine.

এ্যাপেকজিক্রিয়াব অবনতির পর রোমক চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি আরম্ভ হয়। রোম যখন গ্রীসকে পরাজয় করিল, গ্রীক জ্ঞানা-

লোক ধীরে ধীরে রোমকের মধ্যে প্রবেশ করিল। গ্রীক পণ্ডিতগণ রোমে আসিয়া জ্ঞানালোক প্রকাশ করিলেন।

এসক্লিপিয়ডাস (Asclepiadus of Prusa Bc. ১২৭) বোমের প্রথম গ্রীক ডাক্তার। ইনি হিপোক্রেটাসের “হিউমারাল” প্যাথলজি বিশ্বাস করিতেন না। ইনি “এম্ পিরিক” মতাবলম্বী ছিলেন ও তাঁহাদের “এ্যাটমিস্টিক” (Atomistic theory) থিয়রি আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

ইহার মতে শরীরের পরমাণু (atoms indivisible moluculers) সংখ্যাতে (number) অবয়বে (size) ব্যবস্থার (arrange ment) গতিতে (move-ment) পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়া রোগোৎপাদন করে। ইহার মতে স্বাভাবিক ক্রিয়া (Nature) অপেক্ষা চিকিৎসা রোগ নিবারণের অধিক সক্ষম।

আমরা এ পর্যন্ত দুইটা ভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসকের দলের কথা উল্লেখ করিয়াছি।

১। ডগম্যাটিক, লজিকেল বা রাস্যমাত্রাল Dog matists Logical or Rational).

২। এম্ পিরিক (Empirics).

বোমের আরও তিনটা ভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়।

৩। মেথিডিস্ট (methodist.)

৪। নিউম্যাটিক (numaticist)

৫। এক্লেকটিক (Eclectics)

৩। মেথিডিস্ট (Methodist.

এসক্লিপিয়ডাসের শিষ্য থেমিসস (The misor of Loadicea B. C. ১৫০) মেথিডিস্ট সম্প্রদায়ের প্রথম। ইনি এম্ পিরিক্সদের এ্যাটমিস্টিক থিয়রির আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। ইহার মতে ইহার গুরুত্ব আর রোগোৎপত্তির কারণ শরীরের পরমাণুব পরিবর্তন। ইনি বলেন পরমাণু সংযোগে দৈহিক উপাদান (Tissue) গঠিত হয়, কিন্তু দৈহিক উপাদান গুলি ছিদ্র বিশিষ্ট (full of pores) এই ছিদ্র গুলির তিনরূপে পরিবর্তন হইয়া রোগোৎপাদন করে।

১। ছিঃগুলি শিথিল হইয়া (Relaxation or Flex)

২. সঙ্কীর্ণ হইয়া (Contraction or Stasis)

৩। মধ্যবস্থা) Mixed state, some contracted, some relaxed)

ইহার কলে ছিঃ হইতে যে রস (secretion) নির্গত হয় তাহা রোগোৎপাদনের করেন ।

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই মত একেবারে বিস্মরণ হইতে পারেন নাহি । তাঁহারা কতকগুলি রোগের অবস্থার কারণ রক্তবাহিনী শিরার প্রসারণ ও সঙ্কুচন (vaso-dilatation and vaso constiction) বলিয়া নির্দেশ করেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেদনা ও দাহ সংযুক্ত ক্ষীতি-জনিত রোগ (inflammatory disease) বলা বাইতে পারে ।

দৈহিক উপাদান গুলি পরমাণুর দ্বারা গঠিত বলিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ স্বীকার করেন । খেমিসন্ সে গুলিকে পরমাণু (indivisible molecules or atoms) বলিয়াছেন, আজকাল উহাকে প্রোটোপ্লাজমিক সেল (Protoplasmic cell) কহে ।

৪। নিউম্যাটিষ্ট (Pneumatist)

এথেনিয়াস (Athenius of celicea A. D 69) সম্প্রদায়ের প্রথম । ইহার মতে নিউমা (বায়ু—Pneuma) সকল রোগের কারণ । ইহাদের মতে রক্ত চলাচলের শিরার (artery) প্রসারণ ও সঙ্কুচনে বায়ু বিভিন্ন দিকে যাইয়া রোগোৎপাদন করে ।

ইহাদের শাস্ত্রে তিন প্রকারের নিউমার বর্ণনা আছে :—

১। vital spirit—বাহা বায়ু প্রাণাসের সহিত শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সর্ব-শরীর ব্যাপ্ত করে (Inspired air) । বাহা আধুনিক শাস্ত্রে অক্সিজেন (oxygen) নামে খ্যাত । ইহার বলেন ইহা আরটারির (artery) ভিতর দিয়া গমন করে ।

Natural Spirit—ইহা “ভেনের (vein) ভিতর দিয়া সর্বশরীর অবস্থার (Subconscious state) ক্রিয়ার কর্তা ।”

৩। Animal Spirit—ইহা নার্ভের (Nerve) ভিতর দিয়া গমনাগমন করে এবং জাগ্রত অবস্থার (conscious states) ক্রিয়ার কারক ।

Natural Spirit আধুনিক পাশ্চাত্য সিম্প্যাথেটিক্ নার্ভের (Sympathetic Nerve) ক্রিয়ার সহিত এবং vital Spirit সেরিব্রো স্পাইন্ডাল নার্ভের (cerebro Spinal Nerve) ক্রিয়ার সহিত তুলনা করা বাইতে পারে ।

ইহা ব্যতীত ইহাদের মতে প্রত্যেক অঙ্গ (Element) ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট । চারি প্রকার গুণের উল্লেখ আছে—উষ্ণ (Hot) শীতল (cold) দ্রব (moist) ও শুষ্ক (dry) । অঙ্গগুলি বিভিন্ন বা বিরোধী গুণ বিশিষ্ট হইলে শরীরকে অস্বাভাবিক অবস্থার পরিণত করে অর্থাৎ রোগের উৎপাদন করে ।

১। উষ্ণ ও শুষ্ক গুণ অগুণে মিলিত হইয়া তরুণ রোগ (acute disease) উৎপাদন করে ।

২। শীতল ও দ্রব বায়ু রোগ (chronic disease) উৎপাদন করে ।

৩। শীতল ও শুষ্ক মানসিক দৌর্বল্য, মৃত্যু পর্যন্ত আনয়ন করে ।

৫। এক্লেক্টিস্ম (Eclectics)

এই সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ পূর্বলিখিত ৪টি বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিয়া বাহার যেটী সত্য মনে করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করতঃ এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন । ইহাদের মধ্যে গ্যালেন বা ক্লডিয়াস (claudias Gale-nus) শীর্ষস্থানীয় । গ্যালেনের সময় পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নতির চরম অবস্থার পরিণত হয় । গ্যালেনের পুস্তক গুলি পাঠে পুরাতন চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়া যায় । (crytillation of Greek and Roman medicine.)

আয়ুর্বেদ

৭ম বর্ষ

ভাদ্র ১৩৩০ সাল।

১২শ সংখ্যা।

স্বাস্থ্যদর্পণ।

(বৈষ্ণব কবিরাজ ডাক্তারবিশ্বনাথ বিদ্যাসুধন)



স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্যকরূপে অভিজ্ঞতা লাভ না করিতে পারিলে শরীরকে ভাল রাখা বড়ই কঠিন। পীড়িত হইয়া শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার না করিয়া পূর্ন ইহাতে সাবধান হওয়া বুদ্ধিমানদিগের একান্ত কর্তব্য। বর্তমান সময়ে প্লেগ, ওলা-উঠা, বম্বা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বহু রোগের প্রাদুর্ভাব দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। কখন কখন রোগ কাহাকে, আক্রমণ করে, তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু পূর্ন হইতে দেশ, কাল ও দেহের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া হিত বস্তু সেবন ও অহিত বস্তুকে পরিবর্জন করিলে রোগজন্য বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। শীত প্রধান দেশে যাহা হিতকর, উষ্ণ প্রধান দেশে তাহাই অহিতকর। সুতরাং দেশভেদে আহার ও আচারের পার্থক্য হইয়া থাকে।

ঋতুভেদেও আবার ঐ আচারের তারতম্য করিতে হয়। আমাদের দেশে ছয় ঋতুর বৈকুণ্ঠ প্রাদুর্ভাব ঘেষিতে পাওয়া যায়, এরূপ ছয় প্রকার ঋতু কৃত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। একত্র শীতোক বর্ষা ভেদে আহার বিহারেরও পার্থক্য করা উচিত। আবার দেহও সকলের একরূপ নহে, একজনের মেহে বিলক্ষণ শৈত্য (শীতল ক্রিয়া) সহ হয়, অন্য মেহে ঠাণ্ডা একেবারেই সহ হয় না। সুতরাং কোন দেহ কি ভাবে উষ্ণ, তাহাও নির্ণয় করিতে হইবে। সুতরাং দেশ, কাল ও দেহ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সেই আয়ুর্বেদ হইতে স্বাস্থ্যোপযোগী করিয়া সরলভাবে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রকাশ করিব। ধন, মান, খ্যাতি লাভ করিয়া স্বাস্থ্যহরণে

বঞ্চিত হইলে জীবন অশান্তিময় হয়, আয়ুষ্কথা হত স্বাস্থ্যলাভের পর ধনিমানাদি লাভ বিপুল শান্তিপ্রদ হইয়া থাকে । আয়ুর্বেদ এই শান্তির চিরপক্ষপাতী । আমরা আয়ুর্বেদ হইতে সেই শান্তিপ্রদ উপদেশগুলি পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই বাহাতে সেই শান্তিলাভ করিতে পারেন, তাহার জ্ঞান যত্ববান হইয়াছি । মহাশয় বাক্য বধা—

প্রেমভাষে পুলকিত হৃদয় মন,
নিজানন্দ দিতে পরে ব্যাকুল এখন ।
মিটেছে বুভুক্ষা বাহ, প্রফুল্ল আনন্দ তার,
পর ক্ষুধা মিটাইতে সে পারে তখন,
ভিক্ষকের ঘরে কোথা ধন বিতরণ ?

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কর্তব্য ।

প্রত্যহ প্রত্যবে অর্থাৎ (সূর্যোদয়ের প্রায় ষেড় ঘণ্টা পূর্বে) শয্যাভ্যাগ করা উচিত । কারণ ঐ সময়ে ত্রাস্ত মুহূর্ত্ত হইতে আমাদের মানসিক বৃত্তির সম্যক বিকাশ হয়, সে সময় নিজাভিত্ত হইলে সে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে বাধা জন্মে, একত্র প্রাতে নিজা বাগা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ, এবং শরীরের জড়তা সম্পাদক । ইহা বোধ করি অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে প্রত্যবে অধ্যয়নে যেসকল মনঃসংলেশ হয়, অধিক বেলা হইলে সেসকল হয় না । তবে অনেকে অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া প্রাতঃকালে নিজা সেবন করেন । ইহা স্বাস্থ্যবিধি বিরুদ্ধ হইলেও চিরাত্যাস বশতঃ আপাততঃ ক্ষতিকর না হইলেও পরিণামে অনিষ্টদায়ক হইয়া থাকে ।

শয্যাভ্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল শারীরিক ভাবের পর্যালোচনা করা উচিত । অর্থাৎ আমার শরীর কিরূপ অর্থাৎ কোনরূপ ভাব

বোধ, অকীর্ণ বা সর্দি প্রভৃতি হইয়াছে কিনা পর্যালোচনা করিলে বহু সময় নষ্টকর ও ক্লেশকর রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় । একত্র মনে করুন—কোন ব্যক্তি মধ্যাহ্নে অন্নাহারের পর অরাজক হইলেন ; কিন্তু যদি তিনি প্রাতে শারীরিক ভাব পর্যালোচনা করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতেন যে, অন্ন আমার শরীর ভাঙ্গি হইয়াছে, অন্ন নান ও আহারাদি করা উচিত নহে ।

নিত্য শরীরের বিষয় পর্যালোচনা করিলে একরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে যে, তাহার ফলে অনেকে পীড়া হইবার পূর্বেই জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি কারে যত্ববান হইতে পারেন । কোন ব্যক্তি যদি নিত্য মেঘের বিষয় পর্যালোচনা করেন, তাহা হইলে এক বৎসরের পর তাঁহার একরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিবে যে, তিনি মেঘ দেখিয়া জল হইবে কিনা—ইহা নিরূপণে প্রায়শঃ কৃতকার্য হইবেন—ইহা দেখা গিয়াছে । শারীরিক পর্যালোচনার পর দস্তধাবন করা কর্তব্য । দস্তকাঠ অর্থাৎ দাঁতের দ্বারা নিষ, আম, সেওড়া, ভেরাণ্ডা প্রভৃতি গাছের দাঁতন লইবেন । মুখধাবন করা প্রথম । কারণ দস্তকাঠের সাহায্যে দস্তমার্জন করিলে দস্তকাঠ চর্ষণে জ্ঞাত দস্তের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় । অনুশীলন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের উন্নতি হয় না । পূর্বকালে সকলে দস্তকাঠ ব্যবহার ও চাণডাজা প্রভৃতি চর্ষণ করিতেন, একত্র বৃদ্ধ বয়সেও দস্ত দ্বারা চর্ষণ করিতে পারিতেন । অধুনা প্রায় সকলেই অতি ব্যস্ত হাঙ্গামে ভোজন করেন, ভালরূপে দস্ত চর্ষণ করেন না, একত্র দস্ত দৃঢ় হয় না এবং বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই চঞ্চল হইয়া থাকেন ।

তবে ধাহাদের দস্ত বেঠেনী অর্থাৎ দাঁতের মাড়ীতে কোন কত আছে বা রক্ত পড়ে, তাঁহারা মজ্জা দ্বারা মুখ ধাবন করিবেন। যৌগা, তাত্র, পিত্তগ্ন নির্মিত জিহ্বা-নিগ্ধেনী দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করা উচিত।

তদন্তর মল মুত্রাদি ত্যাগ করা উচিত। শৌচাঙ্গির পর ব্যায়াম করা উচিত। নিত্য ব্যায়াম করিলে শরীরের পেশী সকল দৃঢ় হয়, কৰ্ম-সামর্থ্য জন্মে। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির পরিপাক বৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ জীব মাত্রেই দুর্বল হইরা পড়ে। এক্ষণে অতি-মৃদু ব্যায়াম অথবা ব্যায়াম না করা উচিত।

ব্যায়ামের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তৈল মর্দন প্রশস্ত। নিত্য তৈল মর্দন করিলে স্বকের চিকণতা ও শরীরে দৃঢ়তা জন্মে। তদন্তর স্নান করিবেন। মধ্যাহ্নে স্নান অপেক্ষা প্রাতে স্নানই শরীরের পক্ষে হিতকর। কারণ মধ্যাহ্নে সূর্য্যের উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জীব মাত্রেরই শরীর উষ্ণ হয়; সে সময় স্নান করিলে উষ্ণের পর শীত সেবন করা হয়। উহা স্বাস্থ্য বিধি বিরুদ্ধ।

অত্যন্ত রোজের উত্তাপ হইতে আসিয়াই স্নান করিলে রক্ত দূষিত হয়। কারণ রক্ত—উষ্ণ প্রাকৃতিক, উত্তাপে উহার উষ্ণতা আরও বাড়িয়া যায় এবং সেই সময় সহসা শীতল জল দ্বারা স্নান করিলে রক্তের গতির বাধা জন্মে। সেই আবদ্ধ রক্ত শীতল হওয়াতে উহা দূষিত হইরা পড়ে।

সেইরূপ মধ্যাহ্নে শরীরে রক্তের উষ্ণতা বাড়ে, এক্ষণে স্নান হিতকর নহে। দিবাকে তিন অংশে বিভাগ করিয়া প্রথমার্ধকে পূর্নাহ্ন,

দ্বিতীয়ার্ধকে মধ্যাহ্ন এবং শেষ অর্ধকে সায়াহ্ন বলা হয়। তোকুন—মধ্যাহ্নেই প্রশস্ত। পূর্নাহ্নেই কথিত হইয়াছে যে, মধ্যাহ্নে মানব-দেহের উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, এক্ষণে এ সময় পরিপাক শক্তির বৃদ্ধিভাব ঘটে, সেই সময় ভোজন করিলে খাদ্য শীঘ্র জীর্ণ হয়। পূর্নাহ্নে আহার করা উচিত নয়।

অধুনা কিন্তু কার্যানুরোধে অনেককেই ৯টা বা তাহার পূর্বেও আহার করিতে হয়। তাঁহারা অভ্যাস বশতঃ পূর্নাহ্নে ভোজন করেন, তাঁহাদের ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না, কারণ যে বিষয়ে বহুদিন অভ্যস্ত, তাহা অভ্যাস বশতঃ সহ্য হইরা যায়। মধ্যাহ্ন আহারের অনূন ২ ঘণ্টা পূর্বে জলযোগ করা উচিত নহে। একটা খাদ্য ভোজনান্তর জীর্ণ না হইলে ভোজন করা অসুচিত। ২ ঘণ্টার একটা খাদ্য সম্পূর্ণ জীর্ণ হইতে পারে না। পূর্নাহ্ন ও সায়াহ্ন—ভোজন কাল নহে। তবে ধাহারা প্রাতে ও বৈকালে জলযোগ করেন, উহা চির অভ্যাসের ফল। আজন্ম ঐ সময় ভোজন করেন বলিয়া ক্ষুধার্ত হন এবং ভোজনাভ্যে বিশেষ অজীর্ণ হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষ উষ্ণ প্রধান দেশ, এখানে ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ। এখানে মধ্যাহ্নে ১ বার ও রাত্রে ১ বার প্রত্যহ ২ বার ভোজনই প্রশস্ত।

পূর্নাহ্নে ব্রহ্মবারীগণ উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য ভোগ করিতেন। তাঁহাদের ভোজনবিধি দিবাস-রাত্রির মধ্যে একবার কেবল মধ্যাহ্নকালে নির্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা একাহারী ছিলেন। আয়ুর্বেদ মতে আহারই দেহের স্বাস্থ্য দায়ক।

বারংবার অল্প মাত্রার ভোজন করা উচিত—

এ শিক্ষা পাশ্চাত্য জাতিগণের নিকট হইতে
এখানে আসিয়াছে। তাঁহারা বহু পরীক্ষাতে
এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা
আয়ুর্বেদ সন্দেহ নহে কেন ?

ভারতবর্ষ উষ্ণ প্রধান দেশ এবং
প্রাকৃতিক বিভিন্নতা হেতু ইউরোপীয়গণের
পক্ষে বাহ্য হিতকর আমাদের সম্বন্ধে
তাহাই হিতকর হইতে পারে না। মৃত্ত
উষ্ণকর বলিয়া ইউরোপীয়গণের নিত্য সেবা,
কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে তদ্বিপরীত অর্থাৎ
শৈত্যকর ভাব হিতকর।

আয়ুর্বেদেও আছে যে, শীতকালে
সাধারণতঃ সকলেই অধিক পরিমাণে বস্ত্রাদির
দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া শরীরের তাপ
রক্ষা করিবেন। গাত্রাবরণাদির দ্বারা তাপ
নিরুদ্ধ হওয়ার শীতল বায়ুর সংস্পর্শবশতঃ
শারীরিক তাপ বহির্গত না হইয়া শরীরেই
অবস্থান করে বলিয়া পরিপাক শক্তি সমধিক
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্রই জীর্ণ হয়।
জীর্ণান্তে যদি পুনর্বার ঋতু না পায়, তাহা
হইলে দৈনিক অপরাপর দ্রব্যকে ক্ষয় করে,
একত্র শীতকালে গুরুদ্রব্য ভোজন ও অধিক
বার ভোজন হিতকর। ইউরোপে অধিক
সময়ই প্রবল শীত থাকে। একত্র সেখানে
অধিকবার ভোজন আবশ্যক।

এখানে বৎসরের মধ্যে প্রায় ২১০ মাস
কাল উষ্ণতা অনুভূত হয়, এখানে বারংবার
ভোজন করিলে হিতকর হইবে? আয়ুর্বেদ
বলেন যে, শিশু ও বালক গণের পক্ষে ও
যতপারীদগের পক্ষে বারংবার ভোজন
হিতকর।

আমাদের দেশে শীতকালে প্রাকৃতিক

নিয়ম অনুসারে, গুরুপাক দ্রব্য সকল সেই
সময়েই উৎপন্ন হয়। বৃথা, নূতনচাঁউল, কপি,
পিঠক, পুলি, প্রভৃতি। গুরুপাক দ্রব্য এই
সময়েই আমাদের দেশে খাইবারও ব্যবস্থা
আছে।

ঋতুকালে ঈষদ্ভক্ষ্য খাওয়া উচিত। ঈষ-
দ্ভক্ষ্য খাওয়া পাকস্থলী গত হইয়া শীঘ্রই অগ্নিকে
উদ্বীর্ণিত করে, একত্র উহা শীঘ্র পরিপাক
প্রাপ্ত হয়। অথচ ঋতু ঈষদ্ভক্ষ্য হইলে খাইতেও
ভাল লাগে, দ্রব্যও রসনার তৃপ্তি সাধক
হয়।

শিথ ভোজ্য আহাৰ করা উচিত। শিথ
দ্রব্য শরীরের পুষ্টিকারক ও বলবর্ধক। ইহা
শীঘ্র জীর্ণ হয়। স্নেহ বিশিষ্ট দ্রব্য এবং তৈল
দ্রব্যাদি সম্পর্ক বিশিষ্ট ভোগ্যকে শিথ বলা
যায়।

দেশী চাঁউল স্বভাবতই শিথ এবং বালাম
চাঁউল রুক্ষ, মংস্তাদি শিথ, আবার রুক্ষ।
দ্রব্যকে স্নেহাদিমুক্ত করিলে উহাকে শিথ বলা
যায়, বৃথা—দ্রব্যাদি পক্ষব্যঞ্জন। মাষকলাই
স্বভাবতই শিথ, একত্র উহাতে দ্রবের প্রয়োজন
হয় না। অরহর, মুগ প্রভৃতি রুক্ষ, একত্র
উহাদিগকে পরিমিত দ্রব্যাদির সহ পাক
করিলে শীঘ্র পরিপাক হয়।

ঋতুকালে আহাৰের মাত্রা বিষয়ে বিশেষ
পর্যালোচনা করা উচিত, কারণ ঋতুরই
মাত্রাধিক্য ও কাল বিপর্যয়ই অগ্নিমান্দ্যের
অন্ততম প্রধান কারণ রূপে পরিগণিত
হয়। আহাৰের মাত্রার নিয়ম পরিমার্ণের
দ্বারা নির্দেশ হয় না, কারণ প্রত্যেক
মহত্ত্বের প্রকৃতির বিভিন্নতা বশতঃ একই পরি-
মাণের ঋতু ষ্ট্রু তিন লোকের শরীরে পৃথক

পৃথক কল দান করে। বৈকল্প আহার কুরিলে, উদরের গুরুতা, বশতঃ বলিতে উঠিতে বা চলিতে ক্লেশ অনুভব হয় না, ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, নির্দিষ্ট সময়েই অর্থাৎ বৈকালের মধ্যেই সম্যক জীর্ণ হয়, দান্ত পরিষ্কার হয়, নিত্য শরীরের পুষ্টি সঞ্চিত হয়, তাহাই আহার করা উচিত। খাণ্ডকালে পূর্ণ খাণ্ড জীর্ণ হইয়াছে কি না লক্ষ্য করিতে হয়। যদি পূর্ণ খাদ্য পরিপাক না হইয়া থাকে, তাহার উপর পুনরায় খাদ্য খাইলে, পূর্ণ ভুক্ত খাদ্যের সহ নূতন খাদ্য মিশ্রিত হইয়া আরও হ্রাসাচ্য হইয়া পড়ে এবং অজীর্ণ জন্ম নানা রোগ জন্মায়। এজন্য খাদ্য কালে দেখিতে হয় যে, উপহারের সহ পূর্ণ ভুক্ত খাদ্যের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে কিনা? বেশ ক্ষুধা হইয়াছে কি না? মল মূত্রাদি নিঃসারিত হইয়া শরীর বেশ চাক্ষু হইতেছে কি না?

বিকল্প বীৰ্য্য দ্রব্য একত্র ভোজনই নানা রোগের হেতু।

মৎস্য ও দুগ্ধ একত্র করিয়া আহার করিলে নানা রোগ—এমন কি কুষ্ঠ রোগও হয়। আমরা বাহ্য কিছু খাদ্যদ্রব্য দেখিতে পাই—সে সমস্ত হইভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। কতকগুলি শীতবীৰ্য্য ও কতকগুলি উষ্ণ বীৰ্য্য। সাধারণতঃ শীতবীৰ্য্য বিশিষ্ট দ্রব্য সকল শরীরের পুষ্টি সাধক, মল মূত্রাদি পরিষ্কারক, বল বর্ধক এবং গুরুপাক অর্থাৎ পরিপাক হইতে কিছু অধিক সময় লাগে। ইহা অজীর্ণ ও জ্বরাদি রোগগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রায়শঃ হিতকর নহে; যথা কদলী, আতা, পেয়ারা, পেঁপে, নূতন চাউল, কচ্ছপ প্রভৃতি জল জন্মের মাংস, দুগ্ধ।

উষ্ণ বীৰ্য্য দ্রব্য সকল শীত পরিপাক হয় এবং মল মূত্রাদির কণক্ষিপ্ত অবরোধ জন্মায়। ইহা অগ্নিবর্ধক ও শরীরের লঘুতা সম্পাদক। যথা লণ্ডন, মাষকলাই, তিল, বেগুন, তেঁতুল, লবণ, আমড়া, মৎস্য প্রভৃতি।

• মৎস্ত উষ্ণবীৰ্য্য এবং দুগ্ধ শীতবীৰ্য্য। এজন্য মৎস্ত ও দুগ্ধ একত্র ভোজন নিষিদ্ধ। কিন্তু দধি উষ্ণবীৰ্য্য বলিয়া আমাদের দেশে দধি ও মৎস্ত একত্র খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

যেখানে ঘৃণা উপস্থিত হয় অথবা অল্প কোন প্রকারে খাণ্ডকালে বিয় উপস্থিত হইতে পারে—এরূপ স্থানে আহার করা উচিত নহে। যেরূপ তাড়াতাড়ি খাওয়া বিধি বিরুদ্ধ, সেইরূপ অত্যন্ত আন্তে আন্তে খাওয়াও ঠিক নহে। অত্যন্ত আন্তে আন্তে খাইলে অধিক খাওয়া হয় এবং খাণ্ড জুড়াইয়া যায়, তজ্জন্য খাণ্ড জীর্ণ হইতে অত্যন্ত সময় লাগে, কখনও বা অজীর্ণ হয়।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাইলে খাণ্ড সকল উপযুক্তরূপ চর্মিত হয় না, খাণ্ডগুলি উপর দিকে উঠিতে থাকে। শরীরের অবসন্নতা হয়, এবং রীতিমত ভাবে পাকস্থলীতে গমন করেনা। অপিচ খাণ্ডেব দোষগুণ সকল সময় উপলব্ধি হয় না। খাণ্ডকালে হাস্ত করা বা গল্ল করা উচিত নহে। খাণ্ড কালে হাস্ত বা গল্ল করিলে খাণ্ডগুলি রীতিমত ভাবে পাকস্থলী গত হয় না, যেন উপরে উঠিতে থাকে। গল্ল বা হাস্তে চিত রত থাকার দরূপ অনেক সময় যদি খাণ্ড কোন প্রকারে দূষিত হয়, তাহা অনুভব করা যায় না। এজন্য পরিণামদর্শী ব্যক্তিগণ খাণ্ডকালে হাস্ত বা গল্ল বিরত হয়েন।

যদি খাণ্ডকালে ভোজন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করা হয়, তাহা হইলে কোন্ খাণ্ড খীর শরীরের উপযোগী এবং কোন্ খাণ্ড অসুপযোগী তাহা বুঝিতে পারা যায় ।

যদিও পাশ্চাত্য-রীতি খাণ্ডকালে গল্প করা, কিন্তু তাহাতে অন্নাদি দ্রব্যের কোন অংশে প্রবেশ করিলে বিময় ভাবে অবস্থিত করিতে দেখা যায়, ইহাকে চলিত ভাষায় ‘বেশন’ খাণ্ডা বলে । ইহা কখনও কখনও জীবন নাশকও হইতে দেখা গিয়াছে । ভোজনান্তে সুখাদি প্রকালনপূর্বক তাবুল চর্চন কর্তব্য । পরিমিত তাবুল সেবন রুচিকর, মুখের দোর্বল নাশক, অগ্নির উদ্বীপক ।

কিন্তু অধিক তাবুল চর্চন করিলে অগ্নি মান্দ্য ও দন্তস্বচ্ছীয় পীড়া হইবার সম্ভাবনা ।

ভোজনের পর শতপদ গমনান্তর সুখোপবেশন কর্তব্য । ভোজনের অব্যবহিত পরেই উপবেশন বা শয়ন করিলে অন্ন সকল কোঠে

সম্যক রূপে নীত না হইয়া একত্র অবস্থিত করে এবং জীর্ণ হইতে বিলম্ব হয় ।

দিবানিত্রা কক বর্জক, অজীর্ণকর ও শরীরের অড়তা সম্পাদক । দিবাভাগে শরীরের প্রত্যেক দ্রব্য সম্যক বিকশিত হয়, আবার উহা রাত্রে সঞ্চিত হয় ।

নিত্রাতে শরীরের অড়তা আসে এবং অড়তা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে প্রকর করিয়া রাখে, এজন্য দিবা নিত্রাতে শরীরের বহু ও তাবৎ ইন্দ্রিয় সকল অলস ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে ।

আহারের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ।

সুখ্যাণ্ডের তিন চারি ঘণ্টা পরে রাত্রি-কালীন ভোজন করা কর্তব্য । রাত্রি ভোজনের পর আশ্বষটী বিশ্রাম করিয়া শয়ন করা কর্তব্য । রাত্রি ভোজনের পর অধিককাল জাগরণ করিলে তুচ্ছ খাণ্ড অজীর্ণ হয় না ।

বায়ুপিত্ত কফ ।*

(কবিরাজ শ্রীশরচ্ছন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ)

—:—:—

যখন সমস্ত চিকিৎসা-জগত গাঢ় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষীণতম রশ্মিও পৃথিবীর কোন প্রদেশে পতিত হয় নাই, তখন এই বৃদ্ধ আয়ুর্বেদই রোগ তাপদগ্ধ দেশবাসীর ভীষণ রোগধ্বংসী নিবারণ করিয়াছিল, এই

আয়ুর্বেদই যে সমস্ত জাতিবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি, এ কথা আমরা, ভূতত্বের সহিত উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি, আমরা বর্তমানে যে সমস্ত চিকিৎসাবিজ্ঞান দেখিতে পাই, তাহারা কেহই আয়ুর্বেদের মূল তত্ত্ব-উল্লেখন করিতে পারে নাই—এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি যাজেই

স্বীকার করিবেন। আয়ুর্বেদ—অর্থর্ববেদের অন্তর্গত, অতএব ইহা যে নিত্যসত্তা—তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, এই আয়ুর্বেদ যে দেশে কবে প্রচারিত হইয়াছিল—তাহা কেহই বলিতে পারে না, তবে ইহা যে অতি প্রাচীন, তাহা স্থনিশ্চিত।

অনাদি প্রবহমান নিত্য সত্তা এই আয়ুর্বেদের ভিত্তি বায়ু পিত্ত ও কফ—এই ত্রয়্যত্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই বায়ুপিত্ত কফের স্থান-গুণ-কর্ম প্রকোপ-প্রশমন তৎ লইয়াই আয়ুর্বেদের অস্তিত্ব বা স্বরূপ।

সম্বন্ধঃতম—এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া যেমন জগতে কোন পদার্থের অবস্থিতি নাই; তেমন বায়ুপিত্ত ও কফ ব্যতিরিক্ত আয়ুর্বেদ মতে কোন রোগেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। এই বিশাল জগতে যত প্রকার রোগ দেখা যাইতেছে বা দেখা যাইবে, তৎসমস্তই বায়ুপিত্ত কফের প্রকোপসত্ত্ব। তাই হুস্ত হস্তস্থানে “আতুরোপক্রমলী” অধ্যায়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—“নাস্তিরোগো বিনা দোষৈর্ষাৎ তন্মাদ্ বিচক্ষণঃ।” “অনুক্রমপি দোষানাং লিঙ্গৈর্বাধিসূচরেৎ”।

ভবিষ্যৎ ব্যাধিও যে বায়ুপিত্ত কফের ভিত্তি লক্ষ্য করিবে না, হুস্তত তাহারও ভবিষ্যৎবাণী করিতে বিন্দুত্ব হন নাই। আধুনিক জীবাণু বাদী চিকিৎসকগণ রোগ ক্ষেত্রে জীবাণু ভেদ করিয়া অনন্ত জীবাণু রোগের মুখ্য কারণ বলিয়া অস্বীকার যত্নে লক্ষণ করিতেছেন, তাহাদের মতে ম্যালেরিয়া জ্বর, কাল জ্বর প্রভৃতি রোগের পরীক্ষা করিলে বিভিন্ন বৃষ্টি জীবাণু দেখা যায়, টাইফয়েড রোগীর ও কলেরা রোগীর পুরীষ এবং ফলিয়া ও হীপানী

প্রভৃতি রোগীর কফ পরীক্ষা করিলে বিবিধ প্রকার জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা এখন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রচলিত ‘রোগের’ ও জীবাণু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই।

অপরিসমাপ্ত কার্যের সমীচীনতা হিন্দু শাস্ত্রের বহির্ভূত, জীবাণুগণের আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয়ভূত নহে; তথাপি কারণতা সাধার্থে জীবাণুগণ সৰ্ব্বদে সজ্ঞেপে কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম, ত্রিকালদণী মহাবিশ্বের মতে আশু বচন ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না, যে কোন দিন ‘চন্দ্র’ সৰ্বদে উপদেশ পায় নাই, সে সহস্রবার চন্দ্র দর্শন করিলেও চন্দ্র প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। “এম প্রমাদ রাহিত্যং আশুভঃ” ইহাই আশু শব্দের দার্শনিক লক্ষণ, জীবাণুবাদী বৈজ্ঞানিক গণ যে পর্য্যন্ত সমস্ত রোগের জীবাণু দর্শন করিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগের সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত—এ কথা বলা যায় না। তারপর জীবাণুবাদী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, দূষিত বাষ্পাদি হইতে এক প্রকার বিব-মশক শরীরে প্রসিষ্ট হয়, এবং সেই বিষাক্ত মশক যদি মানব শরীরে দংশন করে—তাহা হইলে মানবের রক্তে সেই বিষ সংক্রামিত হইয়া ম্যালেরিয়া জ্বর জন্মাইয়া থাকে, এ তথ্য শুনিলে আমাদের মহান সন্দেহ উপস্থিত হয়, কারণ যে মশক মনুষ্য শরীরে ম্যালেরিয়া বিষ বপন করে, সে মশক কি মনুষ্য হইতে ক্ষীণতর প্রাণীদিগকে দংশন করে না? কিন্তু ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবের ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা যায় না। তবে যদি মানব-রক্তে কোন বিশিষ্ট শক্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই শক্তি কি? ইহার উত্তর কি জীবাণু

বাদীর আছে? আয়ুর্বেদেও জীবাণু তত্ত্ব আছে—যদি কেহ একথা প্রচার করিতে চাহেন; তহুতরে আমরা বলিধ—পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান জীবাণুকে সাক্ষাৎ রোগজনক বলিয়া যে ভাবে ঘোষণা করিতেছে, আয়ুর্বেদ—বায়ুপিত্ত কফ ভিন্ন অত্র কাহাকেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রোগ জনক বলিয়া কোথায়ও সেভাবে নির্দেশ করে নাই, বস্তুতঃ যদি আয়ুর্বেদ আধুনিক জীবাণুবাদী হইত, তাহা হইলে নবীন জীবাণুবাদীর জীবাণু ধ্বংসের জায় আয়ুর্বেদেও জীবাণুর সমলোচ্ছেদের উপায় বিহিত থাকিত। আয়ুর্বেদ কিন্তু স্বপনেও বায়ুপিত্ত কফ ভিন্ন অত্র কাহারও চিকিৎসার উল্লেখ করে নাই। আয়ুর্বেদেও জীবাণুবাদ আছে—ইহা স্বীকার করিয়া আয়ুর্বেদের গৌরব বৃদ্ধি করিতে কেহ কেহ কুঠেককর্মা রক্তজ ক্রিমির প্রমাণ উল্লেখ করেন, আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত সে তত্ত্বে একমত হইতে পারি নাই, কারণ রক্তজ ক্রিমি জনিত কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাদৃশ কোন বিবরণ দেখিতে পাই না, তবে সূক্ষ্মতের কুষ্ঠ নিদানে দেখিতে পাই যে, পিত্তজ কুষ্ঠরোগে ক্রিমি উৎপন্ন হয়। আবার দেখি, মেদ আশ্রিত কুষ্ঠে ক্রিমির সম্ভব হয়, অথচ রক্তজ ক্রিমি জনিত কুষ্ঠের কোন পৃথক লক্ষণ দেখিতে পাই না, অতএব আমাদের মনে হয়, দোষ-বিকৃতিই রক্তজ ক্রিমির কারণ, কুষ্ঠজনক দোষ স্বকারণে কুপিত হইয়া দূষ্য সমূহ আশ্রয় করতঃ যথা কুষ্ঠ রোগ উৎপাদন করে, তথা রক্তেও ক্রিমি জন্মাইয়া থাকে, যেমন ত্রিদোষজনিত হৃদ রোগে তিল-গুড় ক্ষীরাদি সেবিত হইলে ক্রিমিজ হৃদরোগ জন্মিয়া থাকে, তথাচ চরক বলিয়াছেন—“ত্রিদোষজৈতু হৃদ

রোগে জো. দ্রুমাণা নিষেবতে। তিলক্ষীর গুড়াদীংশ্চ। দ্রাক্ষতন্ত্রোপ জায়তে ॥ মর্শ্বক দেশে সংক্লেদো রসশ্চাপ্যপি গচ্ছতি। সংক্লেদাৎ ক্রিমিরশ্চাত্ত ভবন্ত্যপি ইত্যম্বনঃ। রক্ত ক্রিমিজ কুষ্ঠ রোগ ও তেমনি দোষ বিকৃতি ও জন্ম বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কুষ্ঠ রোগের জ্বর ক্রিমিজ হৃদরোগ সংক্রামক বলিয়া প্রোচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কেহই স্বীকার করে নাই। অতএব সংক্রামক ব্যাধি সমূহের সংক্রমণ উপায় যে জীবাণু—একথা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। বাহাইউক আয়ুর্বেদ যখন বায়ুপিত্ত কফকে রোগের মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে এবং তাহাদেরই উপশম বা সামান্য উপায়কে চিকিৎসা বলিয়া কীর্তন করিয়াছে, তখন আমরা সেই বায়ুপিত্ত কফকেই রোগের মূখ্য কারণ বলিব, এবং জীবাণু প্রভৃতি অন্যান্য কারণ কুটকে দোষপ্রকোপ কারণ বলিয়া স্বীকার করিব।

আয়ুর্বেদ মতে বিকৃত দোষই সমস্ত রোগের অব্যভিচারী কারণ;—তাই বাগ্‌ডট বলিয়াছেন, “বিকারো দোষ বৈষম্যং”। বিকৃত বায়ু পিত্তকফকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দোষ বলে। কারণ দোষ শব্দের অর্থ যথা—“শরীরঃ দূষ্য-ভীতি দোষঃ”। অর্থাৎ শরীরকে যে দূষিত করে তাকে দোষ কহে, আবার দূষিত বায়ুপিত্ত কফকে “মল”ও বলে, যে হেতুক দূষিত বা বিকৃত বায়ুপিত্ত কফ দেহের মলিনতা উৎপাদন করে, কিন্তু অবিকৃত বায়ুপিত্ত কফ “ধাতু” নামে অভিহিত হয়, কারণ তখন উহারা দেহকে রক্ষা করে, তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “শরীরঃ ধারণাচ্ছাতবঃ” রসরক্ষাধি ধাতু

ও বাত পিত্ত কফ শরীরকে ধারণ করে বলিয়া খাত্ত নামে অভিহিত হয় ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে রোগ তত্ত্ব ও চিকিৎসাদি বর্ণিতস্থানে বায়ুপিত্ত কফকে সর্বত্রই “দোষ ও মল নামে অভিহিত করিয়াছে ।

ঐষ্ট্যক আয়ুর্বেদের প্রাপ্ত স্বরূপ বায়ুপিত্ত কফের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্মতম ও যোগজ জ্ঞান গম্য, তাৎক্ষণিক আমার জ্ঞান নগণ্য ক্ষুদ্র জ্ঞানবের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওরাই যুক্ততা মাত্র ; তথাপি গুরু পরমনার ও সামান্য জ্ঞানদ্বারা শাস্ত্রার্থ বাহা বুঝিয়াছি তাহাই বিবৃত করিব ।

বায়ু ।

বায়ুপিত্ত কফ ত্রয়ের মধ্যে বায়ুই প্রধান ; বায়ু ভিন্ন দৃশ্যমান জাগতিক কোন ক্রিয়াই যেমন সম্পন্ন হয় না, তেমনি শারীরিক কোন কার্যই বায়ু ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হইতে পারে না, তাই ভগবান্ ধরতরী বলিয়াছেন — স্বরস্বরেশ ভগবান্ বায়ুরিত্যভিশালিতঃ ॥ ইত্যাদি । এই বায়ুর মৌলিকতা অল্পসন্ধান করিলে বুঝিতে পারি যে, পঞ্চভূতাস্তর্গত বায়ু আর এই শরীর বায়ু একই পদার্থ, তবে সূক্ষ্ম ও স্থল ভেদে বায়ু দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ; —যথা পরমাণুরূপ বায়ু ও পরমাণু সমূহ রূপ বায়ু, পরমাণুরূপ বায়ু সূক্ষ্ম বায়ু এবং পরমাণু সমূহরূপ বায়ু স্থল বায়ু, ইহাই বৈশেষিক দর্শনের কথা । উক্ত সূক্ষ্ম বায়ু নিত্য এবং পরমাণু সমূহরূপ স্থল বায়ু অনিত্য, এইপ্রকার ক্রিতি-অপ্তভেদঃ-ব্যোমকে ও বায়ুর জ্ঞান স্থলও সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত করিয়াছে । স্তত্রাং আমাদের স্থল স্ত্রের আরম্ভক পঞ্চ মহাত্ত ও পরমাণু সমূহরূপ স্থল, অতএব বায়ুও যে স্থলবায়ু তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । সোমশুণ দ্বারা, চন্দ্র, শোষণ

শুণ দ্বারা স্বর্বা এবং বিক্ষেপন দ্বারা বায়ু যেমন জগৎ ধারণ করিয়া আছে, তেমনি কফ আমাদের দেহে সোমশুণ দান, পিত্ত প্রবৃত্ত জলীয় খাত্ত শোষণ এবং বায়ু শরীরের অল্পপযোগী মগাদি পদার্থে বহিঃগমন দ্বারা দেহকে রক্ষা করিতেছে, তাই সূক্ষ্মত বলিয়া ছেন “বিসর্গাদান বিক্ষেপেঃ সোম স্বর্বাণিলা যথা, ধারয়ান্তি জগদেহং কফ পিত্তানিলা স্তথা” । চন্দ্রস্বর্ঘ্যের বিসর্গ ও আদান কার্যের প্রবর্তক বায়ু, কারণ রজোশুণই সমস্ত কার্যের প্রবর্তক, যথাহ সূত্রতঃ “সহি রজোহুর্নিঃ রজস্য প্রবর্তকং সর্বভাবানং” । অর্থাৎ সেই বায়ু রজোশুণ বহুল, কারণ রজোশুণই সমস্ত জ্বয়ের চালক, সেই রজোশুণ ভূরিষ্ট বায়ুই যে আমাদের রোগারম্ভক বায়ু তাহাতে আর সন্দেহ নাই, আয়ুর্বেদ মতে যত প্রকার রোগ আছে তাহাদের উৎপত্তির প্রতি বায়ুরই প্রধান কর্তৃত্ব ; পিত্ত-কফ সহস্র দূষিত হইলে ও বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া আমাশ-রাদি স্থানে আশ্রয় না করিলে কোন রোগেরই উৎপত্তি হইতে পারে না, তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—“পিত্তং পশু কফঃ পশুঃ পদবোমল ধাতবো, বায়ুনা যত নীরস্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ” ॥

আবার চরক বলিয়াছেন “যোগবাহঃ পরং বায়ুঃ সংযোগাদুত্তরার্থকং । ভেজঃ কৃত পিত্তসংযুক্তঃ শীত কৃৎ সোমসংপ্রসারঃ” ॥ অর্থাৎ বায়ু যোগবাহী যখন পিত্ত সংসর্গে থাকে তখন পিত্তের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং যখন কফের সহিত সংযুক্ত থাকে তখন কফের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিয়া থাকে । চরকোক্ত এই শ্লোক দ্বারা আমরা বুঝিতে

পানি বে, বল ও ককজ ব্যাধি মাঝেই বায়ুর
সংসর্গ থাকে। তাই বলিয়া সর্বত্র বসন্ত
ব্যাধির আশঙ্কা, করিবার কারণ নাই। বসন্ত
ব্যাধির চিকিৎসায় দোষদ্বয়েরই চিকিৎসা
হইয়া থাকে, কিন্তু এখানে পিত্তককের

চিকিৎসা করিলেই বায়ু বহুঃ প্রশমিত হয়,
সুতরাং সম্বলে বায়ুর বোগ অনেক দূরীকৃত
না করিয়া দোষ চালকর দূরীকৃত করাই
যথেষ্ট মনে হয়।

ক্রমঃ

বসন্ত রোগে নিষেধ প্রভাব।

কবিরাজ শ্রীম্বরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিরত্ন।

সাধবীর মনে স্থান না পাইলেও গুড়ুচীর
কচি চিরদিনই সমান চিরকালই গুড়ুচীগণী
তাহার স্বয়ং রাজাকে বাহবেষ্টনে আবদ্ধ
রাখিয়া পতিত্বভোর প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান
করে--শত্রু সংহারে স্বামীর সহায়তা করিয়া
সুধর্শিনীর গুরু গৌরব রক্ষা করে, এতেন
গুড়ুচীবল্লভ নিষ বৃদ্ধই আমাদের অস্ত্রকার
আলোচ্য, নবাভিনয়ের দীপোদা নাগক।
এমন একটা পরম ভিক্তপদার্থের পর্যালোচনা
অস্ত্রকার অধী শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণকূহরে মধু
বর্ষণ করিতে পারিবে না ইহা আমি জানিয়াও
কেবল গুড়ুচীর গুণের লোভ সঞ্চার করিতে
না পারিয়াই আজ তাহাকে এখানে উপস্থিত
করিয়া ফেলিয়াছি।

এই অসাধারণ শক্তিশালী বৃদ্ধ কণ্ঠকগুলি
রোগের উপর স্বতন্ত্রভাবে এবং কণ্ঠকগুলি
রোগের উপর পরস্পরঃ আপন প্রত্যাব
বিত্তার করিয়া থাকে, ইহা একাই বাহাদুরগকে
শাসন করে, একমাত্র এই নিষবৃক্ষেরই শক্তি
বেশকল রোগকে একেবারে নির্মূল করিয়া

দেয় যে সকল রোগকে আমি পৃথক করিয়া
ক্রমঃ আলোচনার ইচ্ছা করিয়াছি আজ
কেবল কলিকাতার কৃতান্ততুল্য বসন্ত রোগকে
নিষ কতখানি আয়ত্তে রাখিতে পারে তাহাই
দেখাইতেছি।

আলোচ্য বসন্ত রোগের আয়ুর্বেদীয় নাম
মহুরিকা, মহুরীর ডালের মত চ্যাপটা অথচ
গোলাকৃতি এবং দেখিতে প্রায় সেই পরিমাণ
বর্ণিয়াই ইহার মহুরিকা নামকরণ হইয়াছে।
অত্যধিক বসন্ত ঋতুতেই তাহার প্রকোপ
অধিক বলিয়া ব্যবহারিক বাঙ্গালা ভাষায়
তাহাকে বসন্ত রোগে অভিহিত করা হয়।
আয়ুর্বেদমতে উৎপাদক কারণ বর্তমান
ধাকিলে উহা যে কোম ঋতুতেই হইতে পারে,
বাত্তবিক আমরা গরম গ্রীষ্ম ঋতুতেও বসন্ত
রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইতেছি তবে
বসন্ত ঋতুতে যে ইহার প্রকোপ অত্যধিক
এ কথা অবিসংবাদিত সত্য সুতরাং আমিও
আজ মহুরিকাকে বসন্ত রোগ বলিয়া উল্লেখ
করিতেছি।

বসন্ত রোগের উৎপাদক কারণগুলি সাধারণতঃ ছইশ্রেণীতে বিভক্ত, কতকগুলি রোগিগত এবং কতকগুলি প্রকৃতগত। রোগিগত কারণগুলি রোগীর আহার বৈষম্য জাত-আর প্রকৃতিগত কারণগুলি জলবায়ুর বৈষম্য বশতঃ প্রকৃতির পরিবর্তনের দ্বারা ঘটিয়া থাকে, সাধারণতঃ প্রকৃতির পরিবর্তন না হইলে কেবল খাদ্য বৈষম্যে এই রোগের উৎপত্তি দেখা যায় না। আয়ুর্কোষেও “প্রহুই পবনোদষ্টকঃ” বলিয়া বায়ু ও জলের পরিবর্তনকে বিশেষ কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে, সুতরাং প্রকৃতি বৈষম্যই বসন্ত রোগোৎপত্তির প্রকৃত কাল ইহা একরূপ বলা যাইতে পারে, বায়ু ও জলের পরিবর্তনের হেতু নির্দেশ করিতে যাইয়া আয়ুর্কোষের টীকাকার বলিতেছেন “নিষকুসুমাদি সংস্পর্শাৎ প্রহুইঃ পবনঃ তথা উদকঞ্চ তৈঃ”। অর্থাৎ সেই সময়ে এমন কোন বিষাক্ত পুষ্पाদি প্রস্তুত হয় বাহার সংস্পর্শে বায়ু এবং বায়ু প্রাচীরে ফলে জল দূষিত হইয়া প্রকৃতিতে রোগপ্রবণ পরিবর্তন আনিয়া দেয়, বাস্তবিক বাহার গুণাগুণ জানা নাই এমন কুসুমগুচ্ছ হাতে করিয়া অনেক সময় আমরা হস্তকণ্ঠে বিন্ধিত হইয়া থাকি, রূপের মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া স্বাসের আশায় অনেক ফুলকেই আদরে আমরা নাসিকার নিকট ধরিয়া বমনবেগ ও শিরোগূর্ণনে প্রতারিত হইয়াছি। ঋতুবিশেষে স্নেহকল ফুল কোটে এবং তাহারাই পূর্বোক্ত বিষকুসুমের অন্তর্গত। সঞ্চিত সংহিতার কলহানে করষ মহাকরষ বলীজ প্রভৃতি বিষ পুষ্ণের নিষ্পত্ত বর্ণনা আছে, তাহাদের গন্ধগ্রহণে “কিত্তিলচ শিরো-

হঃখং বারিপূর্ণেচ লোচনে” এই বলিয়া বিষম অনিষ্টের উল্লেখ সূত্রতঃ ধরিয়াছেন।

আয়ুর্কোষে বলা হইয়াছে বসন্তরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে জ্বর, গাত্র বেদনা, অস্থির চিন্ততা, স্বপ্নের বিবর্ণতা ও ঈষৎ ক্ষীণ কখনো বা কণ্ঠরূপ এবং নেত্রদ্বয়ের রক্তবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ গুলি সাধারণতঃ দেখা যায়। এখন আমরা নিষেধ সাধারণ শুধু কি এবং এই রোগের উপর কতখানি প্রভাব বিচার করিয়া দেখি, আয়ুর্কোষে নিষকে নিষ মহানিষ ও কৈডর্য ভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিষ বহুদেশের সর্বত্র সুপরিচিত বৃক্ষ, গ্রামে গ্রামে অবস্থান সন্নিবিষ্ট ও স্বয়ং বর্জিত হইয়া মানবমণ্ডলীর অপেক্ষ উপকার করিবার ক্ষমতা যেন ঋতু বিশেষে পত্র পুষ্প ফল লইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার নিষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে মহানিষ অর্থাৎ ঘোড়া নিষ বলে, কৈডর্য নিষ এই ঘোড়া নিষের প্রকার ভেদ মাত্র। মহানিষের পত্র নিষের পত্র অপেক্ষ অপেক্ষা একটু ছোট, অনেকটা নিষের পত্রাবলীর অগ্রভাগে যে পাতাটি থাকে তাহারই মত, অলোচ্য বিষয় পূর্বোক্ত বৃহৎপত্র নিষকে লইয়াই সুতরাং ঘোড়া নিষের বিশেষ বর্ণন অনতিপ্রোত।

নিষের স্বাদ তিক্ত কিন্তু তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া কটু অর্থাৎ বালরসে পরিণত হয় এবং ইহা আভ্যন্তরীণ শীতল ক্রিয়া সম্পাদক ইহার পত্র, পুষ্প, কল, কাণ্ডমূল ও মূলমূলক ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ভাব-প্রকাশের মতে বাতনাশক, শ্রম নাশক ও জ্বর নিবারক, সূত্রভেদে মতে দাহ জ্বর নাশক,

রাজ নিষট্ট ও ধ্বস্তরীয়নিষট্ট এই কার্যের মধ্যে শোধ নাশক এবং কণ্ডু প্রভৃতি পিত্তজনিত বিবিধ বিকৃতি নাশক, ইহার রস বীৰ্যের শক্তি পিত্ত ও কঁক নাশ করিলেও রাজবল্লভ ও ভাব প্রকাশ ইহাকে “বাত-কুষ্ঠমুৎ” অথবা “বাতমুৎ” প্রভৃতি বাক্য বাতপ্রশমক বলায় ইহার প্রভাব শক্তি বাত নাশ করে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বাহা ইউক বসন্ত রোগের সূচনার অর গাত্র-বেদনা প্রভৃতি যেহেতু লক্ষণ পূর্বে বলা হইয়াছে। সে সকলকে নিষের স্বাধীন শক্তি নাশ করে ইহা উপরি উক্ত গ্রন্থ সকলের অভিমত লইয়া অসংশয়ে বলা বাইতে পারে।

নিষ বায়ুর বিগুহতা সম্পাদক, দূষিত ও বিষাক্ত বায়ুকে সংশোধন করিতে ইহার শক্তি অপরিণীম, গ্রন্থকার হারীত কেবল ইহার ফলকে বিবক্ষিয়া প্রশমক বলিয়া কাস্ত হইয়াছেন কিন্তু ভাবমিশ্র “নিষপত্রং পরং নেত্র্যং ক্রিমিপিত্ত বিবগ্রন্থং” এই বাক্য দ্বারা ইহার পত্রে প্রভূত বিষনাশক শক্তি রহিয়াছে বলিতেছেন। বৃদ্ধ বৈজ্ঞগণ দাহজনক অর, বিষপ, বিস্ফোট প্রভৃতিতে পত্রযুক্ত নিমের ডালের বাতাস দেওয়ার এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি হুঃসাধ্য ব্রণ রোগীকে নিমের ছায়ার উপবেশন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে বসন্ত রোগোৎপাদক হই বায়ুকে বিগুহ করিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

বসন্ত রোগ অধিকাংশ স্থলে ৩য় দিন হইতে প্রকাশ পাইয়া ৫ম হইতে ৭ম দিনের মধ্যে সর্বশরীরে ব্যাণ্ড ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, তৎপরে ১ম সপ্তাহের শেষ হইতে ৮ম ৯ম দিন পর্যন্ত থাকিয়া পুনঃপুষ্ট হইতে দেখা যায়,

উক্ত উভয় অবস্থার নিষের প্রভাব সম্বন্ধে আয়ুর্বেদের অভিমত দেখা বাইতেছে। ধ্বস্তরীয় নিষট্টকার বলে—“অপকং শোধয়েৎ, শোকে ব্রণং পক বিশোধয়েৎ” ইহার তাৎপৰ্য্য এই—যেহা কলোয়ুক্ত অপক ব্রণকে নিষ পাকাইয়া দেয় এবং পকা-বস্তু তাহাকে শোধিত অর্থাৎ ক্রোধানি রহিত করিয়া শুষ্কভিত্তি মুখ করিয়া থাকে, মহামতি বাগ্ভট চিকিৎসা স্থানে বলিতেছেন—“নিষ-পত্রাণি সংলিপ্য মধুনা ব্রণ শোধনং।” (চিঃ ৩৫ অঃ) অর্থাৎ মধুর সহিত নিষপত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে ক্ষতের পুষ্টি দূরীভূত হইয়া ক্ষত শোধিত হইয়া থাকে, আরও বলিতেছেন কাঞ্জিকেন চ সংলিপ্য পিচুমর্দ-বলানিচ লেপনং পশ্যতে তস্যা ব্রণ পূর প্রশান্তয়ে” (চিঃ ২৫ অঃ) এবার তিনি ধাত্মায়ে পেষিত নিষ পত্রের প্রলেপের কথা বলিতেছেন, খুব সম্ভব তাহার এই দ্বিতীয় উক্তি জালাকর তীব্র বাতনা দায়ক ক্ষতে ব্যবহারের জন্যই কারণ ধাত্মায়ে ব্রণের রোপণ শক্তি মার্কিকের অপেক্ষা অনেক কম। ব্রণবিশারদ অশ্রুত বসন্ত চিকিৎসার কেবল এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে “মুহুরিকায়ঃ কুষ্ঠয় লেপনাদি ক্রিয়াহিতা” অর্থাৎ কুষ্ঠনাশ প্রলেপ ও কবায়পানাদিই বসন্তরোগের শ্রেষ্ঠ ভেষজ, এই একটা কথার নিষের প্রতি তাহার কতখানি ইঙ্গিত তাহা কুষ্ঠ চিকিৎসার নিষের প্রয়োগবাহুল্য পাঠ করিয়া চিকিৎসক মাত্রেই অবগত হইতে পারিয়াছেন। নিমের একটি নাম পিচুমর্দ, পিচু শব্দের অর্থ কুষ্ঠ, তাহাকে মর্দিত অর্থাৎ ধ্বংস করে বলিয়াই এই নাম, শাধর্ষ্য বলেন “লেপানিষদৈঃ ককঃ

ত্রণ শোধন রোপণঃ (মধ্যঃ ৭ঃঃম অঃ) ইহার মতে নিষ ত্রণের রোপণ ক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পন্ন করি।

এই সময়ের মধ্যে চক্ষুতে এবং মুখভ্যন্তরে ও অনেকস্থলে বসন্ত শুটকা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রভাবশালী নিষেধ আয়ুর্কৌদোক্ত শক্তি তাহাতেও ব্যাহত নয় ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি—রাজবল্লভোক্ত নিষেধ সাধারণ গুণ বর্ণনার আছে বটে “নিষপত্রং সূতং নেত্রাঃ” কিন্তু বঙ্গদেশে নেত্র রোগাধিকারেই সৈন্ধব ও শুঠের সহিত শেখিত নিষপত্র উষ্ণাবস্থায় বস্ত্র খণ্ডে জড়াইয়া পুলটিসের মত চক্ষুতে সেক দিলে নেত্রভ্যন্তরোপিত ত্রণজনিত ক্ষীতি ও ব্যথা নিবারিত হয় বলিয়া বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নিজেরই উক্তি—“শুষ্ঠী নিষদলৈঃ শিঙঃ সুখোক্ষঃ স্বল্পসৈন্ধবঃ ধার্ষ্যচক্ষুঃ সংকোপাৎ শোথ কণ্ডুব্যথাপংঃ”। এই স্থানে শুষ্ঠী সৈন্ধবের উল্লেখ থাকিলেও উহা গোণ, নিষ-ত্রই নেত্র রোগনাশনে মুখ্য-দ্রব্য। মহামতি বাগ্ভট দত্ত বেটগত ও তালু-গত মুখ রোগে নিষমূল ত্বকের কাথে কবল ধারণের কথা বলিতেছেন, চিকিৎসা স্থানে তাঁহার নিজের উক্তি ‘কাথশ্চ নিষমূলস্য দস্তাদি ত্রণ ধারণঃ’ এ স্থলে দস্ত ত্রণের উল্লেখ থাকিলে ও তালুকর্তৃ গর্ত ত্রণ নাশনেও নিষ মূলের শক্তি অসীম বলিয়া অভিপ্রেত ইহা আদি শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে, বলা বাহুল্য যে আয়ুর্কৌদে মতে ত্বকের বাবতীয় উৎসেধ অর্থাৎ ক্ষীতি এবং বিবিধ ক্ষত ত্রণশব্দবোধক স্তরায় মূত্রিকাও ত্রণেরই অন্তর্ভুক্ত। সূক্ষ্মত ত্রণের নিরুৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

বৃণোতি আচ্ছাদয়তি বচমিতি ত্রণঃ। অতএব শাস্ত্র বাক্য পর্যালোচনা করিয়া বেশ প্রতীতি হইতেছে যে বসন্ত রোগের উৎপত্তির পূর্বে হইতে বসন্ত শুটকার পাকাবস্থা পর্য্যন্ত রোগের সকল অবস্থাতেই সহজ লভ্য নিষ একটী প্রধান প্রশমক পরম শক্তিশালী ভেষজ। একমাত্র ইহার স্বতন্ত্র শক্তিতেই যে বসন্ত রোগ আরোগ্য হইতে পারে ইহা শাস্ত্রশক্তির দ্বারা একরূপ সমর্থিত হইল।

ইহার অনাগতপ্রতিষেধক শক্তি (Priventive power) বসন্তরোগ বিয়রে বিরূপ অপরিমেয় তাহা পরে দেখাইব, সম্ভ্রুতি বসন্তরোগের কোন অবস্থায় ইহা বিরূপভাবে প্রয়োগ করিয়া রোগ আরোগ্য করা গিয়াছে সংক্ষেপে তাহাই বলিতেছি। আয়ুর্কৌদে মুহুরিকা চিকিৎসায় নিষকে অত্যন্ত দ্রব্যের সহিত প্রয়োগ করিবার কথা অধিক কিন্তু ইহাকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রয়োগ করিয়া রস বীর্ঘের শক্তির অভীত যে ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে এ স্থলে সেই অচিস্তনীয় প্রভাবের কথাই বলা হইতেছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে নিমের ছাল, পাভা, ফুল, ফল ও মূল অর্থাৎ মূলের ছাল ওষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আয়ুর্কৌদোক্ত পারভাষায় “নিষাদীনাঞ্চ বক্লম্” নিমম অল্পসংসারে নিমের ছাল মাত্র গ্রহণীয় হইলেও রক্তশোধনাদি কার্যে নিষের পূর্কোক্ত পাচটী অঙ্গেরই ব্যবহারের বিশেষ বিধান আছে।

বসন্ত রোগে পঞ্চনিষবটীই প্রশস্ত (পত্র, পুষ্পাদি প্রত্যেক সমভাগে লইয়া জলে শেখণ করতঃ ফুলের আঠির মত বটী করিয়া

রাখিতে হয় উহাই পক্ষনিষ বটী, রোগাংশতির পূর্বে পক্ষনিষ বটী সেবনে রোগ কখনই দারাদ্রক হইতে পারে না। অধিকন্তু বসন্ত-বিষ ভিতরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া অর গাত্র বেদনা প্রভৃতি অচিরে দূরীভূত হয়। ২য় ওয় অবস্থার পক্ষ নিষেব কাথ পান অমোঘ ফল প্রাপ্ত হইতে বসন্তেব বিষ কমিয়া গিয়া দানা গুলি সংখ্যায় কম হয় এবং খুব শীঘ্র বাহির হইয়া পড়ে এবং কাস কঠিন্যে প্রভৃতি দারুণ উপসর্গ সকল উপস্থিত হইতে পারে না। এই অবস্থার পক্ষনিষ বটী তেমন ফল দারক নহে। শরীরের অংশবিশেষে দানা বহির্গত না হইলে এবং আভ্যন্তরীণ বজ্রণা হইলে পক্ষ নিষের পাচন সেবনের সত্ত্বে ঐ সকল স্থানে কাথ জলের সিঞ্চন পরম উপকারী, অথবা নিষপত্র ঘেঁষি কিম্বা আতপ তণ্ডুল ভিজান জলে উত্তমরূপে সেবন করিয়া এবং ঐ জলে গুলিয়া সেই জল সিক্ত বস্ত্র খণ্ডের দ্বারা পীড়িত স্থান ব্যৱহার আবৃত করিয়া দিলে শব্দর বসন্তের গুটি বাহির হইয়া যায়, কিন্তু এইরূপ আর্দ্রবস্ত্র প্রয়োগ বন্ধস্থলে বিশেষ করা সম্ভব নহে, তাহাতে শৈত্যাতিশযা নিঃকন উৎকট কাস, অরবেগ বৃদ্ধি, কুস্কুস্ প্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। চক্ষুতে ও মুখাত্যন্তরে দানা উঠিলে পূর্কলিখিত প্রয়োক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিতে হয়, মলমূত্র ত্যাগের পর পক্ষনিষের কাথে শৌচাদির ব্যবস্থা করিলে সেই মল মূত্রজাত পীড়কাগুলি পীড়া দারক হইতে পারেন। এই তৃতীয় অবস্থা পর্যন্ত আসিয়া অধিক সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়া উঠে, অল্প সংখ্যক রোগীই সাংঘাতিক ঔর্ধ অবস্থায় গিয়া পড়ে।

বসন্ত রোগের চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ বধন বৈশী পরিমাণে বহির্গত সমস্ত পক্ষ দানাগুলি গলিয়া এক হইয়া যায় সেই সময়টী বর্ধ ভগ্নাবহ, কোন রোগী ঘোর বিকার দ্বিধা ওয়া প্রাপ্ত থাকে, অথবা কোন রোগী অসহ্য বাতনার ছটফট করে এবং কেবলই বাহ্যিক শীতলতার জন্ত করুণ আর্তনাদ করিতে থাকে, পূর্ক হইতেই পক্ষনিষের কাথ রীতিমত সেবিত হইলে প্রায়ই বিকারাদি উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। রোগীর বাহ্যসস্তাপাদি দারুণ বাতনা উপস্থিত হইলে পেথিত নিষপত্র সত্ত্বে উচ্চত নবনীতের সহিত আলোড়িত করিয়া রোগীর সর্বাত্মক রাখাইতে হয় এবং ডাল ছাড়া রাশি রাশি কাঁচা নিষ পত্র একত্র কবিতা অন্যান্য অর্ক হস্ত পরিমিত উচু করতঃ ঐ নিষ পত্রের শয্যায় রোগীকে শয়ন করাইয়া রাখিতে হয়, প্রত্যহ দুই বেলা পাতা পরিবর্তন করিয়া নূতন করিয়া দিতে হইবে, এই ব্যবস্থা যে কিরূপ অমোঘ প্রশমক ও রোগীর আরাম দারক তাহা প্রত্যক্ষ না হইলে ভাষার দ্ব্যান বাইবে না। নিষপত্রে স্নাত মাখাইয়া তাহা আঙনে পোড়াইয়া রোগীর গৃহেদিনে ৩৪ বার ধূম করিতে হইবে, ঐরূপ নিষপত্রের শয্যায় শয়নের পর হইতে রোগীর শরীরের সমস্ত রৈশাদি, পত্র সমূহে সংগ্ৰহ হইয়া যায় এবং ক্রমে নূতন পুরাদি সঞ্চিত হয় না, কাঙ্ছেই দেহের হর্গন্ধ ও ভগ্নাবহ কীতি এই উপায়ে অচিরে দূরীভূত হইয়া যায়, এই সময়ে কাহারো কাহারো দেহের কোন কোন অংশের কত বেশ পরিষ্কার শুষ্কোদ্রুখ এবং কোথাও বা পূরবৃত্ত কতের উপরে চামড়া আচ্ছাদিত হইতে পাওয়া যায়, এই অবস্থায়

যে অংগের ক্ষত অপেক্ষাকৃত শুকানুগ্রহ তথায় দাহ ও আকর্ষণবৎ বেদনা হয় এবং পুণঃযুক্ত হানে বীজ ও তার বোধ হয়, বিধাতার মূর্ত্তিমান আশীর্বাদ মহোপকারী নিষেধ এই উভয় ক্ষেত্রেই আশ্চর্য্য প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, পুরাণি রহিত ক্ষত নিষফলের তৈল কিম্বা নিষপত্র ভাঙ্গা ঘূতের দ্বারা সিক্ত করিয়া রাখিলে রোগীর শরীরে টানেন্ন মত বাতনার শান্তি হয় এবং সম্বরই ক্ষত শুকাইয়া যায় আর ক্রৈদব্রুত চর্ম্মাচ্ছাদিত ক্ষতে শুক নিষপত্রের চূর্ণ উত্ত্বরণে বস্ত্রে ছাঁকিয়া সেগুলি একটা স্থল বস্ত্রখণ্ডে কিম্বা রেশমী বস্ত্রে বাটিয়া পুটুলী করতঃ তৎপর উহা আস্তে আস্তে টিপিয়া কিম্বা ঝাঁকিয়া তদগতঃ নিষ পত্র চূর্ণ ক্ষতে প্রক্ষেপ করিলে খুব শীঘ্র ক্ষত শুক হইয়া যায়, কেহ কেহ উপরি উক্ত নিষপত্র চূর্ণের সহিত সম পরিমাণ হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া থাকেন কিন্তু কেবল নিষপত্রের স্থল চূর্ণও পুণঃযুক্ত বসন্ত শুক করিয়া থাকে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এইরূপে শুক হইয়া ক্রমে বসন্ত ক্ষতের শুক চর্ম্মগুলি সমস্তই স্বরং খসিয়া পড়ে, তখন সর্কাদে পোষিত নিষপত্র মাখাইয়া নিষপত্র লিঙ্ক জলে রোগীর গাত্র ধুইয়া কেবলিতে হয় । তৎপর পক্ষ কাল পর্য্যন্ত নিষ ফলের তৈল কিম্বা নিষপত্র ভজ্জিত ঘৃত সর্কাদে আস্তে আস্তে মর্দন করিলে বিগত-বসন্ত ব্যক্তির দেহ ক্রমে ক্রমে বৈবর্ণ্য বিযুক্ত হইয়া লাবণ্য যুক্ত হইয়া থাকে, এইরূপে বসন্ত রোগের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রে নিষেধ যে সকল প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম ।

বিচারের চক্ষে দেখিতে গেলে বসন্ত রোগ

বিকৃত বায়ুশিত কক্ষের একটা ছোট্ট কিম্বা সকলের সহিত মিশ্রিত দূষিত রক্ত জনিত চর্ম্মের বিকৃত মাত্র, স্তভরাং পিত্ত ও ক্লত দোষ নাশক এবং কিঞ্চিং কফাদি প্রশমক নিষেধ কার্য্যকারী এজি তাহার উপর সামান্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে বটে, কিন্তু গুলঞ্চ চিরতা প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করিলে এবং বসন্ত রোগের উপর নিষেধ অনন্ত সাধারণ প্রভাব প্রত্যক্ষ করিলে এই অল্প জাত উপেক্ষিত গ্রাম্য গাছটিকে বিধাতার অপূর্ণমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয় । সাধারণতঃ বসন্ত চিকিৎসার “নিষাদি কবার” প্রভৃতিতে অজ্ঞাত দ্রব্যের সহিত ইহার প্রয়োগ প্রণালী বর্ণিত হওয়ার প্রায়শঃ গোণ ভাবেই ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে । স্বতন্ত্রভাবে ইহার কার্য্যকারী শক্তি দেখাইবার জন্য আজ আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিলাম সম্প্রতি ইহার রোগ প্রতিষেধক-তার সংক্ষিপ্ত কথা বলিয়া উপসংহার করিতেছি, পূর্বেই বলিয়াছি দূষিত বায়ু বসন্ত রোগোৎপত্তির অন্ততম কারণ, নতুবা একই সময়ে বহু-হান ব্যাণী রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না, বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্পাদন ও বায়ু প্রবাহ গত রোগ বিধনাশনে নিষেধে নাভ্যন্ন প্রভাব বাত-রক্ত, কুষ্ঠ রোগীর নিষজ্ঞারার অবহিতি ও বিদর্পাদিতে বৃদ্ধবৈত্তের নিষদ্রব্য ব্যঞ্জে অঙ্গীকৃত হইয়াছে, বহুবার ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে নিষপত্র বহুল ক্ষুদ্র শাখা সমূহের দ্বারা গৃহের বা প্রকোষ্ঠের স্বত জল দ্বার ও গবাক্স আছে সবগুলির শীর্ষদেশ ঘন ভাবে সজ্জিত করিলে সেই গৃহে কিম্বা প্রকোষ্ঠে বসন্ত রোগের আবির্ভাব হয় নাই, বসন্ত রোগের সময় প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি ৩টা নিষপত্র ও ১টা

গোলমরিচ জলে শিবিয়া উপযুগপরি ৩৪ দিন
কিষ্ণ। ১ দিন অন্তর সপ্তাহ ১-১০ ল সেবন করিলে
বসন্ত রোগ হয় না। ২১০টি বড় নিষবৃক
যে বাড়ীতে আছে সেই বাড়ীর নিত্য অধি-
বাসিনদিগের কেহই বহু বর্ষ যাবৎ বসন্ত পীড়িত
হয় নাই এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু সংগ্রহ করিয়াছি।
পূর্ববক্তের স্থানে স্থানে বসন্ত উৎসবে নিষ-
পত্রের ছায়া সমস্ত গৃহস্থার সজ্জিত করা ও
নিষপত্রের ধুম প্রদক্ষিণ করা প্রভৃতি কতক-
গুলি আবশ্যকরণীয় প্রথাব প্রচলন আছে,
অল্পসঙ্কালে অবগত হইয়াছি এই রীতি বসন্ত
রোগে প্রতিবেধক বলিয়াই অভিজ্ঞ প্রাচীনগণ
কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া এখন গৃহস্থদিগের
অবশ্য পালনীয় বাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে,
সেই সকল স্থানের এই প্রথা বেশ কলবতী
বলিয়াই মনে হয় কারণ, এতদঞ্চলের মত
বসন্ত-রোগ-বিকৃত মানব-মুগ্ধমণ্ডল তথার
ষড় একটা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এ হেন
উপকারী বৃক্ষকে আমরা গ্রামান্তে বিচার
করিয়া দিয়াছি, বাহার সর্বাপেক্ষ মানব কল্যাণে
ব্যস্তিত হয়, মাধবীর প্রতি রোষেই হউক বা
অন্ত যে কারণেই হউক যে নিষ বসন্তের
চিরশত্রু, বসন্ত আসিবার পূর্বে চটতেই
যে পত্র পুষ্প লইয়া সরণের পথ হইতে
মাছুষকে টানিয়া আনিবার জন্য আত্মত্যাগে
প্রস্তুত থাকে তাহাকে গৃংগার্ষে স্থান দিতে

কুটিত হইয়াই আজ আমরা এই রোগের
করাত কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে
পারিতেছি না উপকারী প্রতিকূপেকাতেই
আজ আমাদের এই শোচনীয় পরিণাম
বৎসর বৎসর এই কালব্যাপির ক্রমশঃ
কলিকাতার কত লোক যে অকালে কবলিত
হইতেছে তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয়কম্প
উপস্থিত হয়। এই জন্য কর্পোরেশনের
কর্তৃপক্ষকে আমি নিম্নের অনাগত প্রতি-
বেধক শক্তি (Priventive Power) পরীক্ষা
করিতে অনুরোধ করি, নগরীর প্রশস্ত রাস্তার
উভয় পার্শ্বে রোপিত ক্ষীণজাত বৃক্ষগুলির
পরিবর্তে তাঁহারা যদি সেই সেই স্থানে সুন্দর
ছায়া বিস্তরণকারী নিষবৃক্ষ রোপণ করেন তাহা
হইলে কালে বসন্ত রোগের তাণ্ডব গীলা
সংঘত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস, আপাততঃ
তাঁহারা কোন একটা রাস্তার কেবল নিষবৃক্ষ
রোপণ করিয়া ৭৮ বৎসর পরে সেই বসন্তিতে
বসন্ত রোগের প্রাহুর্ভাব পরীক্ষা করিতে
পারেন, ইহাতে ক্ষতি মোটেই নাই কিন্তু
লাভের আশা বধেই।

আজ এই পর্যন্ত বলিয়া এবং ১টি তিলক
পদার্থের পর্যালোচনায় ঐশ্বর্যশীল পাঠকবৃন্দকে
আমার আনন্দিক প্রদা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন
করিয়া বিরত হইলাম।*

* স্বাস্থ্যকর্ম সভার বিগত অধিবেশনে পঠিত ও সমাদৃত, এতদ্ব্যতীত নিষপত্রের পাত্র
প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জল পান ও নিমহ্নের রস পান বসন্ত প্রতিবেধক ও প্রথমক বলিয়া
সভাস্থলে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। আং সং।

ডেঙ্গু-জ্বর

(কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

—::—

বর্তমানে কলিকাতা সহরে এবং তন্নিকট-বর্তী পরগনাসমূহে ডেঙ্গুজ্বরের বিশেষ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। ইহা একটা কালকৃত ব্যাধি।

গায়ে প্রবল বেদনা, শিরোবেদনা এবং সস্তাপাধিক্য এই জ্বরের অব্যভিচারী লক্ষণ। এ রোগে গাত্র বেদনা এত অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় যে, রোগী মনে করে যেন তাহার হাড়ের ভিতর হইতে বেদনা আসিতেছে।

এই রোগ সাধারণতঃ দুই প্রকার, যথা :—

(১) পীড়কা যুক্ত (eruptive)

(২) পীড়কা বিহীন

ডেঙ্গুজ্বরের আয়ুর্কেন্দ্রীর নাম লইয়া অনেক মত ভেদ থাকিলেও আমাদের মনে হয়, তাবপ্রকাশোক্ত শীতলাধিকারের ‘বটী শীতলা’ ও ‘পীড়কাযুক্ত ডেঙ্গু’ একই ব্যাধি। এই বটীশীতলার লক্ষণে—তাবমিশ্র বলেন,—

“কোঠবজ্জ্বরে বটী লোহিতোরত
মণ্ডলা।”

জ্বর পূর্ব ব্যাধি যুক্ত। জ্বরন্তিষ্ঠেদিনত্রয়ম্ ॥

অর্থাৎ বোলতার কামড়াইলে গায়ের চামড়ার উপর যে প্রকার ফোঁড়ির উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ পীড়কা সকলকে কোঠ বলে।

এই বটী শীতলা রোগে গায়ে রক্তাক্ত মণ্ডলাকার কোঠ উৎপন্ন হয়।

কোঠ উৎপন্ন হইবার পূর্বে, গায়ে গুরুতর বেদনা ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয়। এই জ্বর মাত্র ৩ দিন অবস্থান করে।

ডেঙ্গু জ্বরে যে পীড়কা (Eruption) দেখা যায়—তাঁহাও কোঠ সদৃশ মাত্র। সুতরাং পীড়কা যুক্ত ডেঙ্গুকে আমরা বটীশীতলা নামে অভিহিত করিতে পারি।

শীতলা রোগ (মহরিকার জ্বর) সংক্রামক ব্যাধি। ডেঙ্গু ও তাই। কিন্তু যেখানে পীড়কা দেখা যায় না, সেখানে ‘শীতলা’ বলা চলে না। কারণ পীড়কাকেই শীতলা বলা হইরাছে। এখানে আমরা এই প্রকার মীমাংসা করিতে পারি—

“ইহ খলু নিদান দোষদ্বয় বিশেষেভ্যো বিকারাণ্যং বিঘাত ভাণ্ডাবপ্রতি বিশেষ্য ভবন্তি। যদা হেতে ত্রয়ো নিদানাধি বিশেষ্যঃ পরস্পরং নাহুবদ্রস্তব্যথা বা কাল প্রকর্ষাদ-বলীয়াং সোধবানুবদ্রস্তি ন তদা বিকারাভি নির্কৃতিঃ।” চরক

অর্থাৎ “নিদান দোষ ও দুহ্য ভেদে রোগ দিগের বিঘাত (উৎপত্তির ব্যাঘাত) ভাব ও অভাবের ভিন্নতা হইয়া থাকে। নিদান, দোষ ও দুহ্য—ইহারা পরস্পর অহুবদী হইলে অথবা দ্রুতল ভাবে পরস্পরের অহুবদী

হইলে রোগ উৎপন্ন হয় না অথবা রোগ হইলেও বিলম্বে হইয়া থাকে বা স্বাভাবিক হইয়া থাকে, অথবা যথোক্ত সর্বলক্ষণ সম্পন্ন হয় না ।”

এইরূপ সকল রোগের—বিবাত ও ভাবাতানের ভিন্নতার তেতু কথিত হইল ।

ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ‘বটী-নীতলা’ জর-পূর্ণা । প্রকৃপিত দোষ পূর্বে জর উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু দৌর্বল্য নিবন্ধন অগাধ্র করিয়া পীড়কা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না ।

এখানে কেহ এইরূপ আপত্তি তুলিতে পারেন যে, “ব্যথা যুক্তা—এই কথাটা বটী-নীতলাধ্য পীড়কার বিশেষণ । কিন্তু ডেজু-জরে পূর্বেই গাত্রে ব্যথা উপলব্ধি হয়, সুতরাং ইহা ডেজুজর নহে, ডেজুজর স্বতন্ত্র ব্যাধি ।” তদন্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ডেজুকে ‘নীতলা’ আখ্যা প্রদান করিবার কয়েকটা ক্ষেত্রে আছে । ডেজুজর হইলে অনেক সময় ডেজুজর হইবে কি হাম হইবে তাহা লক্ষণ দেখিয়া ততটা বুঝা যায় না । মুখ, চোখ এবং শরীরের অবস্থা উভয় রোগের কতকটা একই প্রকার । রোমান্ত্যার্যা (হাম) মন্থরিকা যে প্রকার ব্যাপক ভাবে উৎপন্ন হয়, ডেজুও সেই প্রকার ব্যাপক ভাবে উৎপন্ন হয় । রোগ উৎপন্ন হইলেও অনেক স্থলে উভয়ের পার্থক্য সহজে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না । ভাবমিশ্র বলেন, “দেব্যা নীতলা, ক্রান্তা মন্থর্যেব হি নীতলা ।” সুতরাং নীতলা ও মন্থরিকা একই জাতীয় ব্যাধি । আরও এখানে ‘ব্যথাযুক্তা’—গাত্র ব্যথাযুক্তা এই লক্ষণ দ্বারা নির্দেশ করিতে হইবে । এইরূপ

নির্দেশ করিলে ডেজু ও বটী নীতলা যে একই ব্যাধি, তাহাতে আর কোনই সংশয় থাকে না । বিশেষতঃ লোহিতোরত-মণ্ডলা কোঠবৎ পীড়কা এবং ‘অরন্তিষ্ঠেদিনজরম্’ এইরূপ নির্দেশের দ্বারাই উভয়ের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে । চিকিৎসাক্ষেত্রেও দেখা যায়,—রোমান্ত্যবিধানোক্ত চিকিৎসার ইহাতে বিশেষ ফল লাভ হয় ।

এই জরে সকল স্থানে যে এক প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, তাহা নহে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই ।

কিন্তু গাত্র বেদনা করিয়া জর আসাই ইহার অব্যভিচারী লক্ষণ ।

১। গাত্র বেদনা পুরঃসর জর আইসে, মাথার স্বর্ণা বিজ্ঞান থাকে, জরের তাপ ১০৩-১০৪° পর্য্যন্ত উঠে । প্রথম দিন প্রবল-বেগে জর হয়, দ্বিতীয় দিন কমিতে থাকে এবং তৃতীয় দিন জর ছাড়িয়া যায় । এরূপ অবস্থার কোনও প্রকার ঔষধ না দিলেও চলে । তবে যদি রোগী একাত্তই ঔষধ খাইতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলেই প্রথম দিন পানের রস ও মধু সহ এবং দ্বিতীয় তৃতীয় দ্বিতীয় দিন পটোলের রস মধুযোগে মকরন্দজ দেওয়া চলে ।

২। উক্ত প্রকার জর সাধিয়া যাইবার দুই একদিন পরে রোগীর গাত্রে পীড়ো কোদাগম, শরীরের গ্রন্থি বেদনা এবং স্থল বিশেষে পুনরায় জর পরিলক্ষিত হয় । এরূপ অবস্থার রক্তচন্দন, বাসকছাল, মুখা, ওলক এবং ত্রাক্ষা মূলিত ২ তোলা, ইহাদের নীত-কষায় এবং প্রুত্রে ও সন্ধায় একটা মহালঙ্গী

বিলাস—পানের রস ও মধু সহযোগে প্রয়োজ্য।

৩। মূত্রপাথিক্য জন্ম—শিশুগণের অনেক সময় রসতড়কা (Convulsion) উপস্থিত হয়, সে ক্ষেত্রে মাথার বরফ কিম্বা ঠাণ্ডা জল দেওয়া একান্ত কর্তব্য। মকরধ্বজ ১ রতি ও বজ্রকার ২ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া মৌরীর জলসহ এবং বৃহদ্রাতচিন্তামণি ৩৬ বটা মৌরীর জল সহ দিতে হইবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে পানের বোটার দ্বত মাখাইয়া অথবা “Glycerine Suppository” মলদ্বারে ঢুকাইয়া বাহ্যে করান কর্তব্য।

(৪) (ক) গাত্রবেদনা,—প্রবলজ্বর। ইহাতে রোগী অভিভূতাবস্থায় পড়িয়া থাকে। একরূপাবস্থায় মকরধ্বজ ১ রতি, মহালক্ষ্মীবিলাস ১ বটা ও মৃত্যুঞ্জয় ২ বটা একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩ বার পানের রস ও মধু সহযোগে প্রয়োজ্য। পরদিন যদি রোগীর গাত্রদাহ ও অস্থিরতা দেখা যায়, তবে “সৌভাগ্য বটা” পটোলের রস ও মধু সহ দিবসে ২ বার দিতে হয় এবং রোগীর মাথা ঠাণ্ডা জল দিয়া ধুইতে হয়।

(খ) রোগীর বমন বা বিবমিষা থাকিলে শশার রস সহ ১ মাত্রা মকরধ্বজ দিলে উপকার হয়।

(গ) রক্তবমন থাকিলে ছাগদুগ্ধের সহিত আলতা গুলিয়া সেই দুগ্ধ ও চিনি সহযোগে একবটা পিত্তাস্তকরস এবং পূর্কোন্নিষিত রক্তচন্দনাদির শীতকষায় প্রয়োজ্য।

(ঘ) অত্যধিক পিপাসা বিদ্যমান থাকিলে ২ আধরতি মকরধ্বজ ও ১ আনা বজ্রকার একত্র মিশ্রিত করিয়া মৌরীর জল

সহ দেয়। ১ পোয়া গরমজল, সডীকার (Sodibicard) ২ আনা, লেবুর রস ২ ছটাক ও মিশ্রি ২ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে, রোগী যে পরিমাণ জল খাইতে চাহিবে তাহাকে সেই পরিমাণ এই জল দিতে হয়।

(ঙ) উদরাগ্নান থাকিলে মকরধ্বজ ২ রতি, বজ্রকার ২ আনা এবং বড়এলাচ চূর্ণ ২ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া মৌরীর জলসহ প্রয়োজ্য, এই ভাগে ১ মাত্রা করিয়া দিবসে ২ বার দিতে হয়।

(চ) কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আরবষাদি পাচন দেওয়া হাইতে পারে।

(ছ) আমাশা (প্রবাহিকা) থাকিলে মরিচ চূর্ণ ৩ রতি, কাঁটানটের শিকড় হেঁচরা সেই রস ও চালুনিজলের সহিত ভুবনেশ্বর দিবসে ২ বার দিতে হইবে।

(জ) উদরাময় থাকিলে ইন্দ্রযব ভিজান জলসহ সর্কাস সুল্লর বা মহাগন্ধক অবহাতিয়ারী অম্লপান ভেদে দিবসে ২ বার প্রয়োগ করিতে হইবে।

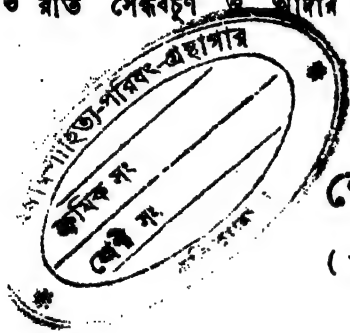
(ঝ) রক্তভেদ থাকিলে হ্রীবেরাদি কষায় এবং সর্কাস সুল্লর বা মহাগন্ধক ইন্দ্রযব ভিজান জলসহ প্রয়োজ্য।

এই রোগে অনেক সময় রোগীর স্খা সম্যক বর্তমান থাকে দেখা যায়। সেইরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে খাইতে দেখা উচিত। যদি কোন উপসর্গ না থাকে, তাহা হইলে টাটকা মুড়ি দেওয়া যায়। বমন উপসর্গ থাকিলে, জলবারি, চিড়ার মণ্ড, ঘোল প্রভৃতি দেওয়া যায়, রক্তবমন ও রক্তাভীসার থাকিলে ছাগদুগ্ধ ও বারি প্রয়োজ্য।

সংক্ষেপে ডেজুরের সকল লক্ষণ ও তাহারে চিকিৎসা ও পথ্য বলা হইল। রোগাবস্থার রোগীর বত না রূপ অল্পভূত হয়, সারিরা বাঁড়ার পর তদপেক্ষা অধিক রূপ হয়। এই সময় সাধারণতঃ হুর্লতা, অরুচি এবং গাত্র বেদনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং রোগী নানা প্রকার অস্থিতি বোধ করে। এই সময় রোগীর অরুচি শাস্তির নিমিত্ত রোগীকে পলতার ঝোল এবং পলতার বড়া খাইতে দেওয়া উচিত। ১ বটী মহালক্ষ্মীবিলাস, ৩ রতি সৈন্ধবচুর্ণ ও আদার রস সহ

প্রাতঃকালে এবং ১ রতি মকরন্দক ৩.১ বটী শুড়ুচ্যাদিলৌহ সন্ধ্যাকালে ডালিম অথবা বেদনার রস সহ প্রয়োগ্য। এই ভাবে কয়েকদিন ঔষধ সেবন করিলে রোগীর হুর্লতা প্রকৃতি উপসর্গ বিদূরিত হয়।

বিশেষতঃ অনেক ক্ষেত্রে এই রোগের পুনরাবর্তন দৃষ্ট হয়। সেইজন্য এই ব্যবস্থানুসারে কয়েকদিন ঔষধ সেবন করিলে আর পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। ইনুসুয়েঞ্জা প্রসঙ্গে যে সকল প্রতিবেদের উল্লেখ করা গিয়াছে, ডেজুরও সেইগুলি প্রতিবেদক।



শোথ চিকিৎসা।

(মহিলাদিগের জাত লিখিত)

বাতজ শোথ হয় যার,
দশমূলের কাথ প্রশস্ত তা'র
কোঠিবদ্ধ থাকে যদি
এরও তৈল খাও—দুখে বিধি। ১
চো না কিছা পুরাণমান
মণ্ড ক'রে খেতে দাও বিধান। ২
বাসকছাল, গুলঞ্চ, কটকারি
চৌবড়িকুঁচে ওজন করি
আধসের জল শেষ আধপোরা
ব্যবস্থা কর মধু দিয়া।
অর বমি শোথ, খাঁস, কাস
সবগুলির হ'বে নাশ। ৩
খেত পূর্ণবা নিমেরছাল

পলতা, কটকী, শুঠ—খাল,
গুলঞ্চ—গাঁট বাদ দিয়ে
দারু হরিদ্রা, হস্তুকি নিয়ে
এক একটি সিকিভরি
আধসের জলে কাথ করি
আধপোরা থাকতে খাওগো ঢেলে
সর্বোজ পোখে হুঁকল মেলে।
পাখশূল বাস পাঁজুরোঁগে
ব্যবস্থা দিও এই ঝোগে। ৪
বেলপাতার রস মরিচ চুড়
ত্রিদোষ যুক্ত শোথ করে দূর।
কোঠিবদ্ধ, অর্শ, কামল,
এ সবও বড় স্থকল। ৫

চিরতা, তুঁট বেটে জলে,
খেলে-মোখে ফুল ফলে
এট খেয়ে সুনর্বার কাথ
খেলে শোভের সব নিপাত ।
কুলেখাড়ার রস ঔষধ বড়
শোধে সদাই ব্যবহা কর ।

ককজ শোধে চোমার সহ
জল দিয়া পৈত্তিকে দেহ । ৭
মানকন্দ করি পেষণ
হৃথের সহ কর সেবন
মীহা ও শোধ সব রকমের
সেরে যাবে উক্তি শিবের । ৮

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোট্কা ।

(কবিরাজ শ্রীহরিচরণ গুপ্ত)

—:o:—

গ্রহণী রোগে ।—

মরিচ, শুষ্ক, ইন্দ্রযব—সমানভাগে লইয়া
(৥ আখতোলা) ৥০ সের জলদিয়া ৥০
পোয়া থাকিতে নামাইরা ঠাণ্ডা করিয়া প্রত্যহ
২১৩ দিন হুবেলা সেবনে গ্রহণী রোগ আশু
নিবারিত হয় ।

মেহজরে:—*

জাংকা, গুলক, হরীতকী, তুঁট, গোবর,
কটিকারী, ধনে, মুখা, জীরা, হরিদ্রা, দারু
হরিদ্রা, সোনামুখী, ছাতিমছাল, নিমের

*মেহজরে এই পাঁচনটি বজরাপুর নিবাসী
স্বনামখ্যাত কবিরাজ বর্গীর নকরচন্দ্র গুপ্ত
কবিরত্ন, ঠাকুর দাদা মহাশয় প্রথমে যে সময়ে
আমাকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দেন, সেইসময়
আমি এই পাঁচনটির গুণ বহুল রোগীকে
দিতে দেখিরা অতীব আশ্চর্য্যবিত হইয়া-
ছিলাম ।—লেখক ।

ছাল, পালিঙ্গা মাদারের ছাল, আকনাদি,
প্রত্যেক ৯০ আনা পরিমাণে লইয়া ৥০
সের জল দিয়া জালদিয়া ৥০ পোয়া থাকিতে
নামাইরা মধু প্রক্ষেপ দিয়া ঠাণ্ডা হইলে সপ্তাহ
কাল হুবেলা পান করিলে যে কোন প্রকারের
মেহজর নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে,
এইটি বিশেষ পরীক্ষিত ।

রক্তআমাশয়ে:—(ক)

ডালিমের কচিপাতা ১ তোলা, তেঁতুলের
কচিপাতা ১ তোলা, জামের কচিপাতা
১ তোলা, ডালিমের কুঁড়ি ১ তোলা, জীরা ১০
সিকিতোলা একত্রে বাটিয়া ৥০ পোয়া
জল দিয়া গুলিয়া পর পর ২১৩ দিবস খাইলে
অতিশয় বহুপাদারক রক্ত আমাশা সম্পূর্ণরূপে
আরোগ্য হয় ।

পাকা বেল বা পোড়া বেলের খাঁস ৯০
পোয়া, ইসবগুল ১ তোলা, দধি ৯০ পোয়া,
চিনি ৯০ একছটাক ও গব্যমূত্র ৯০ পোয়া

একত্রে মিথাইয়া ক্রমাগত ২৩ দিন প্রত্যহ হইবে। হইবার ১ তোলা পরিমাণ খাইলে রক্ত আমাশয়ে আশুফল হয়।

শিরঃপাড়ারঃ—

কুলের পাতার উন্টারিকে কলিচূর্ণ মাখাইয়া রগে বসাইয়া দিলে ২৩ ঘণ্টার মধ্যে শিরঃ পাড়ার শান্তি হয়।

প্রদরেঃ—

গব্যজঙ্ঘ ১০ পোয়া, আয়ুর্বেদী বাটা ১ তোলা ও একটা পাকা চাপাকলা একত্রে চটকাইয়া প্রত্যহ ২৩ দিবস সেবন করিলে যে কোনপ্রকারের প্রদর আশু নিবারিত হয়।

কর্ণশোধে প্রলেপঃ—

রসমাণিক ১০ আনা, রসসিন্দূর ১০ আনা খেত অপরাঞ্জিতার ফুল (টাটকা) ২টা ও মনসাগিঞ্জের পাতা আশুণে তাতাইয়া তাহার রস ১০ একছটাক; সমস্তগুলি একত্রে বাটিয়া কর্ণশোধে প্রলেপ দিলে বেক্রগ কষ্টদায়কই হউক না ২ দিনের মধ্যে উপশম হইবে।

মস্তকের উকুন মারিবার ঔষধঃ—(ক)

মস্তকের চুলে উকুন হইলে রাত্রিতে শরন

করিবার সময় পানের রস পানের তলার ভালরূপ মর্দন করিতে হইবে এবং চাপাকুলের পাতার রস চুলে মাখাইয়া শুকাইয়া ধোত করিলে উকুন মরিয়া যায়। এইরূপে ৭ দিবস করিতে হইবে।

(খ) কাঁজির সহিত নালিতা শাকের বীজ বাটিয়া চুণে মাখাইয়া শুক করিয়া ধৌত করিলে 'উকুন মরিয়া' যায়—এইরূপে ২৩ দিবস করিতে হইবে।

ত্রণ শোধেঃ—

ছোট ঈশেরমূল ১ ভাগ, কেলেকড়ার মূলহাল ১ ভাগ, সাদা ১ ভাগ কোকালতার পাতা ১ ভাগ, কটু হাঁকার জলে মাড়িয়া ত্রণশোধে প্রলেপ দিলে বস্ত্রাদি আশু নিবারিত হয় এবং ক্রমশঃ ঘা কমিয়া আসে। এইরূপ ৭৮ দিবস ব্যবহার করিলে ঘা শুকাইয়া যায়।

দন্তরোগেঃ—

চালতা ফলের মজ্জা কাঁজিতে শেবণ করিয়া সজ্জিত লৌহ পাত্রে রাখিবে গরে ঐ পাত্র রোজে রাখিলে উহা হইতে যে তৈল চুয়াইয়া পড়িবে তাহার নস্ত ও অভ্যাস করিলে ও দন্তরোগ নষ্ট হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আয়ুর্কেদ সভা।—গত ২৪শে ভাদ্র সন্ধ্যা ৬টা ভাটায় কলেজ স্কোয়ার ট্রডেন্স হলে কলিকাতা “আয়ুর্কেদ সভা”র একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। অষ্টাদ আয়ুর্কেদ বিদ্যালয়ের অন্ততম অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ “বসন্ত রোগে নিষেধ প্রস্তাব” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছিলেন।

হরনাথ সাধন সভ্য। গত ১৫ই ভাদ্র শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের উপস্থিতিতে অষ্টাদ আয়ুর্কেদ বিদ্যালয় ভবনে “হরনাথ সাধন সভ্যের ১ম সাধারণ অধিবেশন মহা সমারোহে হইয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ, ডি, পিট মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কার করিয়াছিলেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরজন সভাপতির উদ্দেশ্য বিবৃতি করণোদ্দেশে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। কটক মেডিকেল স্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষক ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, বি, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র বি, এল, কবিরাজী শ্রীযুক্ত বামিনীভূষণ রায় কবিরঙ্গ এম, এ, এম, বি প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় ৫০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন।

হরনাথ আয়ুর্কেদ ভবন। অষ্টাদ আয়ুর্কেদ বিদ্যালয় হইতে সম্মানে চরম পরীক্ষার উত্তীর্ণ কৃতবিদ্য ছাত্র শ্রীমান ইন্দুভূষণ সেন

গুপ্ত ভিষগরত্ন আয়ুর্কেদ শাস্ত্রী, ঠাকুর শ্রীশ্রীহরনাথের আদেশ পাইয়া এবং তাঁহাকে উপস্থিত রাখিয়া গত ১৬ই ভাদ্র ৫৪ নং বড়তলা স্ট্রীট বড় বাজারে—“হরনাথ আয়ুর্কেদ ভবনে”র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গত ২৩শে ভাদ্র এই আয়ুর্কেদ ভবনের মাসিক অমুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৮মত্যা-নারায়ণের শিরশি বিতরণ ও ঠাকুর হরনাথ সধকে সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বামিনীভূষণ রায় কবিরঙ্গ এম, এ, এম, বি, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী এম, এ, হুগলী কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাগবত শাস্ত্রী এম, এ, অমৃতবাজার পত্রিকার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্র কান্তি ঘোষ, বড়বাজারের প্রসিদ্ধ ধনী, ধর্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ শেঠ, মিলিটারি অফিসের আফাউন্টেন্ট পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারী চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত উৎকল নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ২০০ শত গণ্যমান্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

হরনাথের পত্র। ঠাকুর হরনাথের নিকট হইতে কবিরাজ শ্রীমান ইন্দুভূষণ ঐ দিন যে উপদেশ পূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি, সে পত্র খানি এই—“স্নেহের ভাই ইন্দু, তোমার পত্র ও স্নেহের বাবার পত্র পেয়ে পরম আনন্দিত হইলাম। ভাই, তোমার

নব উজ্জ্বল, প্রভু সফল করুন। তোমার হাতে
অমৃত সিঁকিত হ'ক। তোমার স্পর্শে বেনে
রোগীর রোগ-বাতনা দূর হয়। তাই, রোগের
নির্যাস করিবার ইচ্ছা সর্বদা প্রাণে আগাইয়া
রাখিবে। অর্থের দিকেই কেবল দৃষ্টি করিওনা,
তা'তে কবিরাজ না হ'রে নৃশংস কথারের মত
হৃদয় হ'রে পড়ে। জীবন রক্ষার জন্য অর্থ
লইবে, তবে অর্থ নিয়ে সর্বদা রোগীর বিষয়
চিন্তা করিবে। সকল কর্মের প্রথমে প্রভুর নাম
স্মরণ করিবে। প্রভু কর্তা, মানুষ নিমিত্ত
মাত্র মনে ক'রে সকল কাজ করিবে। সকল
রকমে উন্নত হও। +++ তোমরা সকলে
টির স্থখে থাক, প্রভু তোমাকে কর্মক্ষেত্রে
হাতে ধ'রে নিয়ে চলুন।" আমরাও আমা-
দের পরম স্নেহ ভাজন নবীন কবিরাজ শ্রীমান

ইন্সপেক্টর প্রভুর হৃদয়ঙ্গম এই অমূল্য
উপদেশ স্বর্গে-বর্গে পালন করিবার জন্য আবেশ
করিতেছি। এই উপদেশ শুধু আমান ইন্স-
পেক্টরের প্রতি ব্যক্তিগত নহে, কর্মক্ষেত্রে
প্রত্যেক চিকিৎসকেরই ইহা পালন করা
উচিত।

আত্মকোষ বলিয়াছেন,—

কপিলা কোটি দানার্ছি বংকলং পরিকীতিতম্।

কলং তৎ কোটি শ্রুতীতমেকাভূরা চিকিৎসরা।

অর্থাৎ কোটি কপিলা দান করিলে বে
কল লাভ হয়, একটি মাত্র আত্মকে নিকট্যাদি
করিলে তাহাপেক্ষাও কোটি শ্রুতীত কল লাভ
হইয়া থাকে—আমাদের সকল ছাত্রই ইহা
মনে রাখিলে আত্মকোষ-জগতে সত্যই যুগান্তর
উপস্থিত হইবে।

কবিরাজ শ্রীমদ্রত্নকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্তৃক ২০২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, গোবর্দ্ধন প্রেস
হইতে মুদ্রিত ও ১৭১২নং গ্রামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্তৃক প্রকাশিত।

